শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

তা'লীম ওয়া তারবিয়াত

আফজাল হোসাইন

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

(তা'লীম ওয়া তারবিয়াত)

শিক্ষকমন্ডলী ও অভিভাবকদের জন্য

মূলঃ আফজাল হোসাইন

(এম. এ. এল. টি)

অনুবাদঃ অধ্যাপক মোশাররাফ হোসাইন

সম্পাদনায়ঃ

১) অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমিন

২) মাওলানা মুহাম্মদ সফিকুল্লাহ

৩) অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
(তা'লীম ওয়া তারবিয়াত)

প্রকাশক ঃ

পরিচালক,
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি
৭৩, আউটার সার্কুলার রোড,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকালঃ
জমাদিউল আউয়াল-১৪১৪ হিজরী
কার্তিক-১৪০০ বাংলা
নভেম্বর-১৯৯৩ ইংরেজী

www.nagorikpathagar.org

পারি[illegible] গ্রন্থাগার

[illegible]না বিনতে মুজাহিদ

تم طباعة هذا الكتاب على نفقة اللجنة الكويتية ـ

المشتركة للاغاثة مكتب بنغلاديش ـ

কুয়েত জয়েন্ট রিলিফ কমিটির সহযোগিতায় ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত

বিনা মূল্যে বিতরনের জন্য

يوزع مجانا ولايباع

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

ওহীর সর্ব প্রথম বাণী হল "ইকরা" অর্থ পড়। মানব সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হলে লেখাপড়া ও জ্ঞান চর্চা অত্যাবশ্যক। কুরআনুল কারীম এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছে। রাসূল (সঃ) জ্ঞান চর্চাকে ফরয ঘোষণা করেছেন, সঠিক মানে ইবাদত ও খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে হলে ইলম বা জ্ঞান চর্চার বিকল্প কিছু নেই। ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি পেতে হলে ইলম অর্জন করতে হবে। এরপর অর্জিত শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে হবে। ইলম অর্জন ও জ্ঞান–বিজ্ঞান চর্চা যাতে সঠিক ও অর্থবহ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও সু–সাহিত্যিক মরহুম আফজাল হোসাইন "ফান্নে–তালীম ও তারবিয়ত" গ্রন্থখানা রচনা করেছেন। গ্রন্থকার উক্ত বইখানাতে শিক্ষার সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা, শিশুমন, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সমাজের সর্ব স্তরের লোকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যধিক ফলপ্রসূভাবে আলোচনা করেছেন। বইখানা শিক্ষা জগতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে।

সম্মানিত লেখক উক্ত গ্রন্থে ছাত্রদের নৈতিক মান উন্নয়ন ও সামাজিক অবক্ষয়

www.nagorikpathagar.org

বোধ করতে হলে কি ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন সে দিকেও গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

বইখানা উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় বাংলা ভাষাভাষীগণ সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন না, এ বড় ধরনের অভাব পূরণের লক্ষ্যে ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি বইখানা অনুবাদ করার কাজে হাত দেয়।

কোলকাতার ইসলামিক এডুকেশনাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সেক্রেটারী মুহতারাম ভাই আমিরুল ইসলাম সাহেবকে এ গুরুত্বপূর্ণ বইটি পাঠানোর জন্যে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক মাওলানা মোশাররফ হোসাইন বহু কষ্ট করে বইখানা অনুবাদ করেছেন, এ জন্যে জানাই তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বইখানা সম্পাদনার কাজে যারা আমাকে সহায়তা করেছেন তাঁরা হলেন সর্বজনাব মাওলানা অধ্যাপক মুহাম্মদ রুহুল আমিন ও মাওলানা মুহাম্মদ সফিকুল্লাহ। এ মহান কাজে সহযোগিতা করার জন্যে তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

বইখানা অনুবাদের ব্যাপারে কোন পরামর্শ থাকলে অথবা ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে অবহিত করবেন বলে আশা করছি। বইখানা নৈতিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সামান্যতম ভূমিকা রাখলে এবং পাঠক–পাঠিকাদের উপকারে এলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে ভবিষ্যতে আরও এ জাতীয় বই প্রকাশের তাওফিক দান করুন। আমিন।

(অধ্যক্ষ) মুঃ আবদুর রব
পরিচালক
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

www.nagorikpathagar.org

অনুবাদকের আরয

"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে" কবিতাংশটি বাস্তবতারই অভিব্যক্তি। আজকের শিশু কিশোর আগামী দিনের জাতির কর্ণধার। পারিবারিক পর্যায়ে কথাটির গুরুত্ব যেমন অপরিসীম, জাতীয় দৃষ্টিতেও রয়েছে এর ততোধিক উপযোগিতা। এহেন বাস্তবতার নিরিখে শিশুদের "শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ" কেবল ব্যক্তি ও জাতিকেই প্রভাবিত করে না বরং এর সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে দুনিয়া গড়ার মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দানেও। সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের উভয় জগতের পরিসরে বিশাল বিস্তৃত প্রভাব রয়েছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের। ব্যক্তির ইহকালের সাথে এর যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে তার চেয়ে অধিক সম্পৃক্ততা রয়েছে পরকালের সীমাহীন জীবনের সাথে। শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পেছনে মাতাপিতা ও শিক্ষকের দায়িত্ববোধ ও ভূমিকা অধিকতর ফলপ্রসু হয়ে থাকে। অবশ্য পরিবেশের আনুকূল্য সেজন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। আর পরিবেশের আনুকূল্য সৃষ্টিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা থাকে সর্বাধিক। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে উক্ত তিনটি উপাদানই শিশুদের সত্যিকার মানুষরূপে গড়ার বা গড়ে উঠার মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে থাকে। এ তিনের সমন্বিত সহযোগিতা একটা জাতির ভবিষ্যত বংশধরদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য হাসিলে সফল ভূমিকা রাখতে পারে।

উপমহাদেশের বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ জনাব আফজাল হোসাইন গ্রন্থটিতে উপরোক্ত বাস্তবতার আলোকে আমাদের শিশু কিশোরদের একদিকে যেমন একজন সুনাগরিক ও আদর্শ ব্যক্তি গঠনের কার্যকর কর্মসূচী পেশ করেছেন অন্যদিকে তেমনি শিশুদের সুন্দর ও সার্থকভাবে কর্মবীররূপে গড়ে তোলার একটা সঠিক ও সফল রূপরেখা পেশ করেছেন। তাঁর মূল গ্রন্থ "তা'লিম ওয়া তারবিয়াত" এক্ষেত্রে একটা অনন্য সৃষ্টি। তিনি বইটিতে শিশু শিক্ষার সাধারণ পদ্ধতি ও কৌশলের সাথে সাথে স্বভাবজাত পদ্ধতি তথা ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জাতি গঠনের কাঠামো রচনা করেছেন। এটা তাঁর অতিরিক্ত কৃতিত্ব। নৈতিকতার বর্তমান চরম দেওলিয়াপনার যুগে তাই গ্রন্থটির গুরুত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্কের এই অসংগত পরিস্থিতিতে এগুলোর স্বাভাবিক সম্পর্ক ও অবস্থান নির্ণয়ের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। শিক্ষার মানের অধোগতি,

www.nagorikpathagar.org

সত্যিকারের শিক্ষার অভাব, পরীক্ষায় নকল নির্ভরতা, অসদোপায় অবলম্বনের হিড়িক ইত্যাদির কারণে আজকের শিক্ষাঙ্গন এক বিভীষিকাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করছে। আর অভিভাবক ও বুদ্ধিজীবিদের মাঝে নৈরাজ্য আর শিক্ষকদের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা এবং ছাত্রদের পরিস্থিতিতে গা ভাসিয়ে দেয়া তারই সূচনা মাত্র। জাতীয় সংকট ও দুর্যোগময় মুহূর্তে সংকট উত্তরনের জন্যে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, দায়িত্বশীল ও নেতৃবৃন্দের সচেতন পদক্ষেপ জাতিকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্যে একান্ত কাম্য। আর সে জন্যই গ্রন্থটিকে মূল উর্দু ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

"ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি" বাংলাদেশের শিক্ষা জগতে একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির অবদানের কথা জাতি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করছে। দেশ গড়ার পূর্ব শর্ত দেশের ভবিষ্যত বংশধরদের আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠান "ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি" তাই জনাব আফজাল হোসাইন বিরচিত "তা'লীম ওয়া তারবিয়াত" গ্রন্থটিকে বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে বাংলায় অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। আমাকে গ্রন্থটি অনুবাদের দায়িত্ব দেয়ায় আমি সোসাইটির শুকরিয়া এ জন্যে জ্ঞাপন করছি যে, এতে করে আমি একটি জাতীয় কাজে নিজেকেও জড়িত করতে সক্ষম হয়েছি।

অশান্ত পৃথিবীতে আধুনিক প্রযুক্তির যুগেও যখন বিশ্ববাসী শান্তির অভাবে নিদারুণ অসহায়তার স্বীকার, ঠিক সে সময়ে গ্রন্থটি কালের চাহিদা ও সমাজের প্রয়োজনীয়তার দাবী পুরণের দিক নির্দেশনায় করুণাময় রাব্বুল আলামীনের অসীম কৃপার নমুনা স্বরূপ। উপমহাদেশের বাংলা ভাষাভাষীদের জন্যে এই সময়ে বইটির ভাষান্তর বিশেষতঃ বাংলাদেশীদের জীবনে বয়ে আনুক জাতীয় জাগরণের ফলগুধারা। এই কামনা করে জাতির দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ, সচেতন বুদ্ধিজীবি, বুদ্ধিমান অভিভাবক মন্ডলী যদি বইটির গুরুত্ব অনুধাবন করেন আর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন আমাদের ক্ষয়িষ্ণু শিক্ষার ক্ষেত্রে এর বাস্তবায়নের জন্যে তবেই আমার শ্রম স্বার্থক মনে করব। আল্লাহ্ তা'য়ালা লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশকের এ মহৎ কাজ কবুল করুন। আর সবাইকে এর জাযায়ে খায়ের দিন। আমীন।

মোশাররফ হোসাইন

www.nagorikpathagar.org

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

প্রাথমিক কথাঃ

শিশুদের নির্ভুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান একটা দ্বীনি দায়িত্ব। এ জন্যে পূর্ণ সতর্কতা আবশ্যক। অন্যথায় কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ দায়িত্বে যদিও পুরো জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্র জড়িত, তবুও তা প্রত্যক্ষভাবে অর্পিত হয় পিতামাতা ও শিক্ষকমন্ডলীর ওপর। সুতরাং এ ব্যাপারে তাদেরকেই সবচেয়ে বেশী ভাবতে হবে। বিশেষতঃ বর্তমান অবস্থায় এদিকে সবিশেষ দৃষ্টি দেয়া অতীব জরুরী, কেননা অনেক সময় সামান্যতম অবহেলাও মারাত্মক পরিনতির সৃষ্টি করতে পারে।

আল্লাহর শুকরিয়া, আজকে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভূত হতে চলছে এবং বিভিন্ন সংস্থা ও দলের ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক প্রচেষ্টায় মানুষ এদিকে মনোযোগ দিচ্ছে। এ দিক থেকে যে সব প্রতিষ্ঠান দুর্বলতার শিকার হয়েছিল সেগুলোকে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগানো হচ্ছে। যে সব প্রতিষ্ঠান স্বীয় শৈথিল্য ও অন্যের সংকীর্ণতার শিকার হয়েছিল সেগুলোকে নব জীবন দান করা হচ্ছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সকাল–সন্ধ্যা মকতব চালু হতে যাচ্ছে। মোটকথা জীবনের বেশ কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

যা কিছু হচ্ছে জাতির প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্ত অপ্রতুল। কিন্তু যে সব সীমিত উপায়-উপকরণ সমেত এবং যে সব বাধা বিপত্তি ও প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে এসব কাজ হচ্ছে তাতে এগুলোকে বিরাট গনীমত বলা চলে।

সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানে এমনিতেই অনেক অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তবে তম্মধ্যে নিম্ন লিখিতগুলো সবিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ

* নতুন প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্যে যোগ্য ও উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া দুরূহ।

* যে সব শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাদান কাজ চলছে তাদের অধিকাংশই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অনভিজ্ঞ।

* শিশুদের শিক্ষা–দীক্ষার ক্ষেত্রে পিতা–মাতার পক্ষেও পূর্ণ সহযোগিতা দান সম্ভব হয়না। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যতটুকু লেখাপড়া শিখায় তাও

www.nagorikpathagar.org

পানি ছিটিয়ে দেয়ার সমতুল্য।

এসব অসুবিধা দূর করা এবং শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষাকে কার্যকর ও বাস্তবমুখী করে তোলার ব্যাপারে সহায়তা দানের জন্যে এ গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে। এতে শিশুদের মানসিকতা, শিক্ষার মূলনীতি, শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ কৌশল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, সহযোগিতা লাভের পন্থাসমূহ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়েছে যেন,

* ভাষা সহজ ও সরল, সাবলীল এবং বর্ণনাভংগী সর্বজনবোধ্য এবং স্পষ্ট হয়।

* শিক্ষক, মাতা-পিতা ও শিক্ষানুরাগী সবার জন্য সমভাবে আকর্ষণীয় ও উপকারী হয়।

* শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভ করা যায়।

* প্রতিটি সমস্যা নিয়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা হয়।

* যথা সম্ভব পারিভাষিক শব্দসমূহ এবং পান্ডিত্যধর্মী আলোচনা পরিহার করা যায়।

* যে সব নির্দেশনা ও পরামর্শ দেয়া হবে তা বাস্তবধর্মী ও কর্মপযোগী হয়।

* সঠিক শিক্ষা-দীক্ষার অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং স্বীয় কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ পরিপূর্ণরূপে পালনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

* মাতাপিতা ও শিক্ষকমন্ডলীর চেষ্টা সাধনা ফলপ্রসূ হয় এবং শিশুদের উপর তাদের সাধ্যাতীত বোঝার চাপ না পড়ে।

উপরোক্ত প্রয়াসসমূহ কতটুকু সফল হয়েছে তার বিচার কেবল পর্যবেক্ষণকারীগণই করতে পারেন। সুধী মহলের নিকট আরয তাঁরা যেন কল্যাণকর পরামর্শ থেকে আমাদের বঞ্চিত না করেন। আল্লাহতায়ালা আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন এবং একে আমাদের আসল উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বানান।

আফজাল হুসাইন

দিল্লী ১০ই জুন-১৯৬৩ ইং

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

১।	**শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঃ**		১৫
	০	ব্যর্থতার কারণসমূহ	১৭
	০	অবহেলার পরিণাম	১৯
২।	**শিক্ষা বলতে কি বুঝায় ঃ**		২৩
৩।	**শিক্ষাদীক্ষায় প্রভাবশীল সহায়ক শক্তিসমূহ ঃ**		২৭
	০	পরিবার	২৭
	০	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৯
	০	নিকটতম পরিবেশ	৩১
	০	সমাজ	৩২
	০	রাষ্ট্র ও সরকার	৩৩
৪।	**শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ**		৩৫
	০	শিক্ষার সঠিক উদ্দেশ্য	৩৭
৫।	**শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ ঃ**		৪১
	০	সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা দর্শন	৪১
	০	গণতান্ত্রিক শিক্ষা দর্শন	৪৬
	০	ইসলামী শিক্ষা দর্শন	৫২
৬।	**সর্বোত্তম আদর্শের আলোকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঃ**		৬২
	০	শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলী	৬৩
	০	শিক্ষকের কণ্ঠস্বর	৬৬
	০	শিক্ষকের ভাষা	৬৮
	০	শিক্ষাদান পদ্ধতি	৭০
	০	ক) কথোপকথন পদ্ধতি	৭১
		খ) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি	৭২
		গ) বর্ণনামূলক পদ্ধতি	৭৪
		ঘ) বক্তৃতামূলক পদ্ধতি	৭৫
		ঙ) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ	৭৫
	০	শিক্ষার্থীদের সাথে আচরণ ঃ	৭৬
৭।	**আধুনিক শিক্ষার প্রবণতা ঃ**		৭৯
৮।	**শিশু ও তার স্বভাব প্রকৃতি ঃ**		৮৩
	০	অপরিহার্য প্রতিক্রিয়াজাত শক্তিসমূহ	৮৫
	০	সহজাত আবেগসমূহ	৮৫
	০	অপরিহার্য প্রতিক্রিয়াজাত শক্তিসমূহ ও প্রশিক্ষণ	৮৬
	০	এমনটি হয় কেন?	৮৭
	০	লক্ষণীয় বিষয়সমূহঃ	৯০
৯।	**সহজাত প্রকৃতি ও আবেগ প্রবনতাসমূহ ঃ**		৯২

www.nagorikpathagar.org

o সহজাত প্রকৃতির বৈশিষ্টসমূহ ৯৩
o মানুষের সহজাত প্রকৃতি ও আবেগ প্রবনতা ৯৫
o আবেগ অনুভূতির বৈশিষ্ট ৯৭
o সহজাত প্রকৃতি ও আবেগ অনুভূতির গুরুত্ব ৯৯
১০। বিকাশের স্তরসমূহ ঃ ১০৪
o শৈশবকাল ১০৫
o বাল্যকাল ১১২
o কৈশোরকাল ১১৭
o যৌবনের উন্মেষকাল ১২৩
১১। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ স্বভাব ও প্রকৃতি ঃ ১৩০
o অন্বেষা ও অনুসন্ধিৎসা ১৩০
o সঞ্চয় প্রবনতা ১৩৩
o নির্মাণ ও গড়ার মনোবৃত্তি ১৩৪
o আত্মপ্রকাশ ১৩৬
o হীনমন্যতাবোধ ১৩৮
o যুদ্ধংদেহী বা ঝগড়াটে স্বভাব ১৩৯
o তাকলীদ বা অনুকরণ ১৪১
o পুনরাবৃত্তি ও পুনরুক্তির ইচ্ছা ১৪৩
১২। খেলাধূলা ঃ ১৪৫
o শিশুরা কেন খেলে? ১৪৭
o খেলাধূলার প্রকারভেদ ১৪৮
o খেলার মাধ্যমে শিক্ষা ১৫৪
o খেলাধূলার উপকারিতা ১৫৫
১৩। শিশুদের তারবিয়ত ঃ ১৫৮
o মৌলিক আশা আকাংখা এবং এসবের প্রশিক্ষণ ১৫৯
o কামনা বাসনার প্রশিক্ষণ ১৬১
১৪। মাতাপিতা ও প্রশিক্ষণ ঃ ১৬৬
o লালন ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ ১৬৮
১৫। মুরুব্বী, অভিভাবক এবং লালন ও নৈতিক প্রশিক্ষণ ঃ ১৭৩
o অভিভাবকের ভূমিকা ও আচরণ ১৭৪
o তারবিয়ত বা নৈতিক শিক্ষাদানের নিয়ম পদ্ধতি ১৭৫
১৬। অভ্যাস, স্বভাব ও চালচলন পর্যালোচনা ঃ ১৭৭
o অভ্যাসসমূহ কি? ১৭৭
o অভ্যাসের উপকারিতাসমূহ ১৭৯
o শিক্ষাদীক্ষায় অভ্যাসের গুরুত্ব ১৮০
o পছন্দনীয় অভ্যাস সৃষ্টির পদ্ধতি ১৮১
o পছন্দনীয় অভ্যাস ও আচরণসমূহ ১৮৩

www.nagorikpathagar.org

	০	শিশুরা কেন বিগড়ে যায়?	১৮৪
	০	প্রতিকার	১৮৭
	০	অপছন্দনীয় অভ্যাস ও আচরণ	১৮৯
১৭।	**শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাফল্যের শর্তাবলী ঃ**		১৯৩
	০	সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য	১৯৫
	০	জনসাধারণের সহযোগিতা	১৯৫
	০	উপযুক্ত ভবন নির্মাণ	১৯৭
	০	প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি	১৯৭
	০	খেলার মাঠ, নিয়ম শৃংখলা	১৯৮
১৮।	**শিক্ষকের গুণাবলী ঃ**		২০০
	ক)	ছাত্রদের দৃষ্টিতে	২০০
	খ)	অভিভাবকদের দৃষ্টিতে	২০২
	গ)	দায়িত্বশীলদের দৃষ্টিতে	২০৩
	ঘ)	জনসাধারণের দৃষ্টিতে	২০৪
	ঙ)	শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে	২০৪
১৯।	**প্রধান শিক্ষক ও তাঁর দায়িত্ব ঃ**		২০৬
২০।	শ্রেণী শিক্ষক (Class teacher) ও তাঁর দায়িত্ব ঃ		২১৪
২১।	বিষয় শিক্ষক (Subject teacher) ও তাঁর দায়িত্ব ঃ		২১৮
২২।	দৈহিক প্রশিক্ষণঃ		২২২
	০	দেহের প্রবৃদ্ধির জন্যে আবশ্যকীয় সামগ্রী	২২২
	০	আহার (খাদ্য)	২২২
	০	পরিস্কার পানি	২২৭
	০	আলো	২২৯
	০	মেহনত, শ্রম অথবা ব্যায়াম ও খেলাধূলা	২৩০
	০	উপযোগী পোষাক	২৩০
	০	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	২৩১
	০	গভীর নিদ্রা	২৩৩
	০	আনন্দ ও প্রশান্তি	২৩৪
	০	নির্মল চরিত্র	২৩৪
	০	শিশুদের স্বাস্থ্য ও বিদ্যালয়	২৩৫
	০	বিদ্যালয়ের দায়িত্ব	২৩৫
২৩।	**শিক্ষাগ্রহণ (জ্ঞান বিজ্ঞান হাসিল) ঃ**		২৩৮
	০	শিক্ষা গ্রহণে নিপুণতা ও দক্ষতা	২৪২
	০	শিশুদের শিক্ষাগ্রহণ কার্যে প্রভাবশালী উপাদানসমূহ	২৪৪
২৪।	**মনোনিবেশ ও চিত্তাকর্ষণ ঃ**		২৪৬
২৫।	**স্মৃতি (মনে রাখা) ঃ**		২৫৬
২৬।	**শিক্ষাদান (লেখাপড়া করানো) ঃ**		২৬৬

www.nagorikpathagar.org

২৭। কুরআনের আলোকে শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ ২৬৯
২৮। শিক্ষাদানের সাধারণ মূলনীতি ঃ ২৮১
o উদ্বুদ্ধকরণ নীতি ২৮১
o নির্বাচনের মূলনীতি ২৮২
o জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করার মূলনীতি ২৮৩
o নিজে করে শেখার মূলনীতি ২৮৩
o পাঠ্য বিষয় বিভক্তির মূলনীতি ২৮৪
o পুনরাবৃত্তির মূলনীতি ২৮৪
২৯। শিক্ষাদানে কতিপয় সুক্ষ্ম রহস্য ঃ ২৮৫
৩০। শিক্ষাদানের উপযোগী উপাদান ও উপায়ঃ ২৯৩
o প্রশ্ন ও উত্তর ২৯৩
o বিবরণ বর্ণনা ৩০০
o ব্লাকবোর্ডের গুরুত্ব ও ব্যবহার ৩০৫
o ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ৩০৭
o ছবি, মডেল ও চার্ট ইত্যাদি ৩০৯
o অন্যান্য সহায়ক সামানাদি ৩১৫
o বাড়ীর কাজ ৩১৫
o পাঠ্য পুস্তকসমূহ ৩২০
o লাইব্রেরী ও পাঠাগার ৩২২
o পরীক্ষা নির্বাচন ও পাশ ৩২৫
৩১। ব্যক্তিগতভাবে ও সামষ্টিকভাবে শিক্ষাদান ঃ ২৩৮
৩২। বিষয়াদির পারস্পরিক সম্পর্কের সুদৃঢ়তা ঃ ৩৪২
৩৩। পাঠদান পদ্ধতিসমূহ ঃ ৩৪৬
o শিক্ষাদানের আন্তঃক্রিয়া (সরাসরি) পদ্ধতি ৩৪৭
o শিক্ষাদানের বহিঃক্রিয়া পদ্ধতি ৩৪৯
o অনুসন্ধান পদ্ধতি বা আবিস্কার পদ্ধতি ৩৫৩
o কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি ৩৫৫
o মানটেসুরী শিক্ষা পদ্ধতি ৩৬০
o পরিকল্পিত পদ্ধতি (প্রজেক্ট মেথড) ৩৬৫
o ডাল্টিন প্লান ৩৬৮
৩৪। বিবিধ সমস্যাবলী ঃ ৩৭২
o উপস্থিতির সমস্যা ৩৭২
o স্থূল বুদ্ধি ৩৭৬
o অবসাদ ৩৭৯
o ক্লাশ রুটিন ৩৮৪
o রেজিষ্টার এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র ৩৯০
o সিলেবাস বহির্ভূত কার্যক্রম ৩৯৫

www.nagorikpathagar.org

	০ পরিবার ও বিদ্যালয়ের সহযোগিতা	৩৯৮
	০ শিক্ষা সাপ্তাহ বা বার্ষিক সভা	৪০১
	০ ছাত্রাবাস (বোডিং হাউস)	৪০৩
৩৫।	**পাঠ ও পাঠদান পদ্ধতি ঃ**	৪০৮
৩৬।	**বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ**	৪১৯
	০ ইসলামিয়াত	৪১৯
	০ মাতৃভাষা (বাংলা)	৪২২
	০ অংক	৪২৭
	০ ভূগোল	৪৩১
	০ সাধারণ বিজ্ঞান	৪৩৩
৩৭।	**ইসলামী চিন্তাবিদগণের দৃষ্টিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঃ**	৪৩৫

www.nagorikpathagar.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا (قرآن)
مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ - (ترمذى)

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

শিশুরা বেহেস্তের ফুল

"সন্তানদের সঠিক শিক্ষাদীক্ষা দেয়াই হলো মা-বাপের সর্বোৎকৃষ্ট দান।"

বিয়ের পর প্রত্যেক দম্পতির এ কামনাই থাকে যে, তাদের কোল জুড়ে নতুন মুখ আসুক। বিলম্ব হলে সেজন্যে তারা শত যত্ন তদ্বির করে, কাঁদে, আহাজারি করে, দোয়া চায়, মানত মানে এমনিভাবে আরও কত কি করে থাকে। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে আশা পুরণ হলে তাদের অন্তর আনন্দে ভরে উঠে। আল্লাহ্ সেই দম্পতির কোল জুড়ে সন্তান দেন এবং তাকে আনন্দের উপকরণ বানান। প্রিয়জনেরা আনন্দ প্রকাশ করে আর বন্ধু-বান্ধব উপহার উপঢৌকন নিয়ে হাজির হয়। শিশু নিঃসন্দেহে আনন্দের অনেক সওগাত নিয়ে আসে। তার সাথে ঘরে বরকত নাজিল হয়। তার লাবনীয় চাঁদমুখ ও কমনীয় রূপ সকলের চক্ষু শীতল করে। পিতামাতা নিজেদের কলিজার টুকরোকে ক্রমাগত বড় হতে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়। সম্ভবতঃ তাদের জন্যে এর চাইতে অধিক খুশীর আর কিছুই নেই। মাতো দিনের শান্তি রাতের আরাম হারাম করেও আনন্দ পায়। চেহারা দেখে পিতার সব চিন্তা ও শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। কেবল মাতাপিতার কথাই বা বলি কেন শিশুদের নিষ্পাপ চেহারা আর তাদের আধো আধো চিত্তাকর্ষক কথা কার না হৃদয় কেড়ে নেয় না? এমন কে আছে যে শিশুদের হাসতে খেলতে দেখে আনন্দ পায়না। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব শিশুদের নির্মল আচার-আচরণ দেখে অজান্তে হেসে দেয়। বেহেস্তের এসব ফুলের খেলাধুলায় প্রতিটি ঘরে আসে অপরূপ সৌন্দর্য আর প্রতিটি বাগানে আসে বসন্ত, চারিদিকে আনন্দের হাওয়া বয়ে যায়। সুগন্ধি ছড়ায়। আর সবাইকে কাতুকুতু দিয়ে হাসায়। তরুলতা আন্দোলিত হয়। পাখীকুল কলরব করে, মুকুল ফোটে প্রস্ফুটিত হয়, ফুল হাসে, এমনি করে সর্বদিক আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে।

শিশুর জন্মের কারণে এহেন অসাধারণ আনন্দ উল্লাস অহেতুক নয়।

* বেহেস্তের এ ফুল প্রকৃত শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্যের অমূল্য উপহার।
* তার অসিলায় ঘরে কল্যাণ ও বরকত নাযিল হয়।

www.nagorikpathagar.org

* মাতাপিতার পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে ও আত্মীয়তা সুদৃঢ় করণের সে হচ্ছে উৎকৃষ্টতম মাধ্যম।

* তার মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা অসাধারণ আকর্ষণীয় শক্তি রেখেছেন।

* তাকে পেয়ে চক্ষু শীতল, অন্তর শান্ত ও চিন্তা-ক্লান্তি দূর হয়।

* তার কারণে বংশ ধারা অব্যাহত থাকে।

* সে হচ্ছে আশা-আকাংখা ও কামনা-বাসনার কেন্দ্রস্থল। ভবিষ্যতে তার সাথে কত শত আশা আকাংখা সংশ্লিষ্ট থাকে তার ইয়ত্তা নেই।

বলা বাহুল্য এহেন অমূল্য উপহার ও অনুপম নেয়ামত পেয়ে কোন হতভাগা খুশী না হয়ে পারে? তবে হাঁ, শিশু এসব আনন্দের সাথে সাথে অসংখ্য দায় দায়িত্বও নিয়ে আসে।

* খুশী মনে তাকে লালন-পালন করা।

* তার সাথে ভালবাসা ও আদর সোহাগের আচরণ করা।

* সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা নিয়ে তাকে বিদ্যাশিক্ষা দান করা।

* ক্রমান্বয়ে উত্তম ও পছন্দনীয় অভ্যাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করা।

* আদব কায়দা শেখানো।

* মার্জিত ও ভদ্র আচরণ শিক্ষা দেয়া।

* আকীদা দুরস্ত করা, আমল ঠিক করা ও চরিত্র সংশোধন করা।

* তার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা এবং উন্নতি ও সফলতার চেষ্টা করা।

এগুলো হচ্ছে শিশুদের প্রতি মাতাপিতার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য। সম্ভবতঃ এমন পিতা কেউ নেই, যিনি এসব দায়িত্বের অনুভূতি রাখেন না এবং এসব দায়িত্ব পালনে বিমুখ। আপন সন্তানের জন্যে তিলে তিলে জান ক্ষয় করা তো একটা স্বভাবজাত কাজ। জেনে শুনে এ ব্যাপারে কে ত্রুটি এবং অবহেলা করে? পিতাইতো এমন ব্যক্তি একমাত্র যিনি আপন সন্তানকে নিজের চাইতেও অনেক বড় দেখতে চান। তবে এমন সৌভাগ্যবান পিতা জগতে খুবই বিরল, যাদের এরূপ আশা পুরন হয়ে থাকে এবং যারা নিজ দায়িত্বসমূহ পুরোপুরি পালন করে থাকেন। কেবল আশা আকাংখা করাতেই তো সব কিছু হয়ে যায় না। শিক্ষাদীক্ষার জন্যে মেধা, প্রজ্ঞা, বিচক্ষনতা ও যোগ্যতাও চাই। আবার অসাধারণ ও আপ্রাণ প্রয়াস প্রচেষ্টাও চাই। এসবের মধ্যে ঘাটতি হলে সুফল পাওয়ার কোনই আশা করা যায় না।

www.nagorikpathagar.org

ব্যর্থতার কারণ সমূহ ঃ

শিশুদের সঠিক শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে আজকাল প্রায় ব্যর্থতাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর কারণসমূহ নিম্নে দেয়া গেলঃ

১) শিক্ষাদীক্ষা ভীষন ধৈর্য, সংযম এবং কঠিন অধ্যবসায়ের কাজ। এ কাজের জন্য যতটা একাগ্রতা, ঐকান্তিকতা, আন্তরিকতা ও চেষ্টা সাধনা আবশ্যক, কার্যতঃ তার প্রতি খুব কম লোকই আগ্রহী ও উৎসাহী হয়ে থাকে।

২) সাধারণভাবে শিশুদের বয়স এবং মেধা ও যোগ্যতার তুলনায় তাদের থেকে অনেক বেশী আশা করা হয়ে থাকে। আর যখন তাদের থেকে বার বার ত্রুটি-বিচ্যুতিও স্খলন ঘটতে থাকে এবং উন্নতির গতিও যখন আশানুরূপ না হয়ে দুর্বল ও নিম্নগামী দেখা যায় তখন তার বর্তমান অবস্থার সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে মানুষ নিরাশ ও হতাশ হয়ে গিয়ে কেবল নিজের উদ্যোগ আয়োজন ও প্রচেষ্টাই হ্রাস করে না বরং সাথে সাথে নিজেদের ভূমিকা ও কথাবার্তায় শিশুদেরকেও হতাশ ও নিরাশ করে ছাড়ে। পরিণামে তাদের মধ্যে আর কোনরূপ আত্মবিশ্বাস বাকী থাকে না।

৩) আমাদের গোটা সমাজটাই হচ্ছে বিকৃত। বড়দের ভুল দৃষ্টান্ত এবং সমবয়সীদের অসৎ সংগের প্রভাব শিশুরা অজান্তে প্রতিনিয়ত গ্রহণ করে যাচ্ছে। এতে অনেক ভাল ও ভদ্রঘরের সন্তানদের ভেতরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অজ্ঞাতসারে বহুবিধ ত্রুটি শিকড় গেড়ে বসেছে।

৪) যে কোন শিশুকে পরীক্ষা করলেই দেখতে পাবেন, কেউ কেউ তাকে সংশোধণের চেষ্টা করলেও অনেকেই তাকে নষ্টের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

৫) জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বর্তমানে কেবল অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়নি, বরং সেগুলোর তালিকা বেশ দীর্ঘ হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক কাঠামোও দিন দিন জটিলতর হয়ে যাচ্ছে। ফলে প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যাদি যোগানোর জন্যে যে ব্যস্ততা, তা থেকে অবকাশ পাওয়া দুস্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি একটু নজর দেয়ার সুযোগ রাখার সময় ও সৌভাগ্য তাঁরা কোথায় পাবেন।

www.nagorikpathagar.org

৬) উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষার জন্যে যে ধরণের যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তা থেকে অধিকাংশ লোকই বঞ্চিত। সুতরাং তাদের প্রচেষ্টা সুফল বয়ে আনার পরিবর্তে প্রায় ক্ষেত্রে বিপরীত ফলাফলই দিয়ে যাচ্ছে।

৭) মাতাপিতার পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিকূলতা, তাদের বিচ্ছিন্নতা, কারো মৃত্যু, অনুপস্থিতি অথবা বাড়ী থেকে দূরে অবস্থান ইত্যাদি ব্যাপারও শিশুদের সঠিক শিক্ষা দীক্ষার পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

৮) বাতিল ব্যবস্থা জীবনের মূল্যমান ও মূল্যবোধ সমূহে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। বস্তু পূজা মানুষের মনমানসিকতার ওপর এতটা প্রাধান্য পেয়ে গেছে যে, আপন সন্তানদের পার্থিব উন্নতি এবং তাদের ভবিষ্যত উজ্জলতর করার জন্যে ভাল ভাল লোকেরা পর্যন্ত তাদের কলিজার টুকরোদের ঈমান ও নৈতিকতাকে নিজেদের হাতেই শয়তানের সামনে বলি দিতে কুন্ঠাবোধ করছেন না।

৯) অনেক লোক নিজেদের আর্থিক পেরেশানী, অসুস্থতা কিংবা অন্যান্য বাস্তব অক্ষমতা ও বাধ্য বাধকতার কারণে নিজেরা তাদের সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার কোন খোঁজ খবর নিতে পারছেন না। কেননা শিল্প বিপ্লব মানুষের পারস্পরিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। সামাজিক বন্ধনও শিথীল হয়ে পড়েছে। তাই মাতাপিতার অক্ষমতা, অপরাগতা ও অবহেলার অবস্থায় পরিবারের অন্য সদস্যরাও এই দায়িত্বের বোঝা বহনের জন্যে নিজেরা ও এগিয়ে আসে না, সমাজও তাদেরকে এ ব্যাপারে বাধ্য করছে না এবং সমাজ নিজেও এ শিশুদের কোন যুক্তিসংগত ব্যবস্থা করছে না।

১০) শিশুদের ব্যস্ত রাখতে ও তাদের অবসর সময়কে কাজে লাগানোর জন্যে আকর্ষণীয় গঠনমূলক কাজ অথবা কোন উপযোগী খেলাধুলা ইত্যাদির কোন যুক্তিসংগত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয় না। ফলে শিশুদের যোগ্যতা ভুল পথে ধাবিত হয়। তারা দুষ্কৃতির শিকার হয়ে পড়ে এবং নানা ধরণের অশোভনীয় কাজে লিপ্ত হয়ে যায়।

১১) আজকের সমাজে ক্রমবর্ধমান অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, চারিত্রিক উচ্ছৃংখলতা, চোখে চমক সৃষ্টিকারী ধোকাপূর্ণ দৃশ্য ও প্রদর্শনী, অশ্লীল সাহিত্য, নগ্ন ছবি, ঘৃণ্য পোষ্টারের ছড়াছড়ি, চরিত্র বিধ্বংসী ফিল্ম, কল্পকাহিনী ও নাটক–নভেলের আধিক্য প্রভৃতি সংস্কার প্রচেষ্টাকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে নস্যাত করে দিচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

১২) শিশুদের ব্যক্তিত্বের ওপর পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রত্যেকটিরই কিছু না কিছু প্রভাব পড়ে থাকে। উপযুক্ত ও উন্নতমানের শিক্ষাদীক্ষার জন্যে এসবের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় অপরিহার্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। সমন্বয় তো দূরের কথা এদের প্রায় প্রত্যেকেরই প্রচেষ্টা হয় বিপরীতমুখী। পরিবারের লোকেরা খুব ভাবনা চিন্তা করেও কোন ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পায় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি দায়িত্ব সচেতন হয় তখন অন্যদের সহায়তা পাওয়া যায় না। ফলে অধিকাংশ শিশুই এ টানা পোড়েন ও সংঘাতের শিকার হয়ে পড়ে।

অবহেলার পরিণাম ঃ

শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন কোন ব্যক্তি বা পরিবারেরই নয় বরং দেশ ও জাতির পক্ষেও মারাত্মক পরিণতি ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কেননা এতে–

* শিশুরা অকর্মন্য ও অকেজো হয়ে পড়ে। তাদের প্রতিভা ও যোগ্যতাসমূহ বিনষ্ট অথবা বিপথগামী হয়ে যায়।

* নানা প্রকার মন্দ ও অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে শিশুরা তাদের দুনিয়া–আখিরাত উভয় জাহান ধ্বংস করে ফেলে।

* তাদের চক্ষুশীতলকারী ও বৃদ্ধকালের যষ্ঠি হওয়া তো দূরের কথা বরং উল্টো তারা পথের কাঁটা ও মাতা–পিতার বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

* বাপ দাদার কষ্টার্জিত সম্পদ নিতান্ত অবহেলায় ও নির্মমভাবে উড়িয়ে দেয়।

* বংশের গৌরব ও বাতি না হয়ে বংশের নাম ডোবায়।

* নিজের খারাপ আচরণ দ্বারা জাতি ধর্মের দুর্নাম রটায়।

* পেশাদার অপরাধী হয়ে সবার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং দেশ ও জাতির নানারূপ ক্ষতি করে থাকে।

* জাতি সৎলোক, সমাজ নিষ্কলংক ও নিষ্ঠাবান কর্মী আর দেশ সুনাগরিক থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

* তাদের জন্যে সরকারকে জেল, আদালত, থানা ও হাসপাতাল ইত্যাদির ব্যবস্থাপনাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

* রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সামাজিক নৈতিকতার ক্ষেত্রে তারা ঘৃণিত বস্তুতে পরিণত হয়। এভাবে যে বেহেশতের ফুল সুগন্ধি বিতরণের জন্যে প্রস্ফুটিত হয়েছিল এবং শুরুতে সবার জন্যে আনন্দ উল্লাসের বস্তু ছিল, তা অবহেলা ও অসতর্কতার ফলে পরিণত হয় আবর্জনার স্তুপে। আর অসহনীয় দুর্গন্ধে সবার প্রান ওষ্ঠাগত করে ছাড়ে। এভাবেই অবহেলা ও অসতর্কতার প্রতিশোধ আল্লাহ্ তায়ালা সবার থেকে গ্রহণ করে থাকেন।

পক্ষান্তরে যদি শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাহলেঃ

* তাদের যোগ্যতা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটে। চরিত্র উন্নত হয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তারা কল্যাণ ও সফলতা লাভে সক্ষম হয়।

* আল্লাহ্ তাদের যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন সে উদ্দেশ্য সাধনেও পূর্নতা বিধানে তারা সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়।

* তারা তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক, সামাজিক দায়িত্ব পালনের যোগ্য হতে পারে।

* তারা আল্লাহর সৎ বান্দা, সমাজের নির্মলও নিষ্ঠাবানকর্মী এবং রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত ও অনুগত নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

* তাদের অস্তিত্ব স্বয়ং তাদের নিজেদের এবং দেশ ও জাতি সবার জন্যে রহমত, বরকত ও কল্যাণের কারণ হতে পারে।

* সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নতি সাধনে তাদের এসব যোগ্যতা কাজে আসে।

* রাষ্ট্রীয় আর্থিক মান ও জাতীয় আমদানীতে প্রবৃদ্ধি ঘটে এবং সরকারের ব্যয় ও সংকট হ্রাস পায়।

এভাবে সঠিক ও নির্ভুল শিক্ষা দীক্ষার খাতে ব্যয়িত শক্তি, শ্রম ও সম্পদ সকলের জন্যেই লাভজনক প্রমাণিত হয়।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, আমাদের অবহেলা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতার কারণে বিশ্বময় এমন এক শিক্ষা-ব্যবস্থা শেকড় গেড়ে বসেছে, যা তার বিপুল সংখ্যক প্রবন্ধাবলীও পাঠ সহায়ক গ্রন্থরাজি, পাঠ্য বহির্ভূত কার্যক্রম ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী প্রভৃতির মাধ্যমে হয়তো আল্লাহর আনুগত্য, দায়িত্ব সচেতনতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ শেখানোর পরিবর্তে খোদাবিমুখ বানায়, পরকালে জবাবদিহির ব্যাপারে বেপরোয়া মনোভাব সৃষ্টি করে এবং সর্বোচ্চ মানবিক মূল্যবোধের অসম্মান না শেখায় ; কিংবা শিরক ও প্রবৃত্তি

www.nagorikpathagar.org

পূজারী, গোঁড়ামী ও স্বজনপ্রীতি, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও আত্ম প্রচারনা, বিলাসিতা ও আরাম প্রিয়তা ইত্যাদিতে মগ্ন করে। আর বৈষয়িক উন্নতি ও অর্থনৈতিক প্রাচুর্যকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু চরিত্র সংশোধন এবং নৈতিকতার উন্নতি বিধানের প্রতি কোন দৃষ্টি দেয় না।

বলা বাহুল্য যতদিন এই শিক্ষা-ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন করা না হবে ততদিন এর অধীনে লালিত পালিত ও বর্ধিত এই প্রজন্ম থেকে সামগ্রিকভাবে কোন কল্যাণ আশা করা বাতুলতা মাত্র। অবশ্য দুস্কৃতির আশংকা সব সময় থাকবে। বাকী যে সব দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সঠিক শিক্ষাদীক্ষার পতাকাবাহী অজ্ঞতার চরম অন্ধকারেও আলোক বর্তিকা এবং হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের উৎস আল্লাহর সৃষ্টির রুহানী শক্তি সঞ্চয়কারী ছিল, সে সব দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও আজ নিজেদের সচেতনতা, জাতির অবজ্ঞা ও অবহেলা, বিরোধীদের শত্রুতা, বাতিলের ভয়ে সন্ত্রস্ততা, দ্বীনি মর্যাদাবোধ ও গৌরব বোধের শূন্যতা, কুরবানী ও নিষ্ঠার হ্রাস প্রাপ্তি, শিক্ষকমন্ডলীর ইলম ও আমলের দৈন্যতা এবং শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা, শিক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যত ধর্মীয় ও পার্থিব রূপে দুভাগে বিভক্ত করণ, নিজের একদেশদর্শিতা, যুগের অনুপযোগী পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা-ব্যবস্থা ইত্যাদির কারণে ভিত্তি আজ কম্পমান। দিন দিন এগুলোর উপযোগিতা হ্রাস পাচ্ছে এবং এসবের প্রভাব বলয় সংকুচিত হয়ে আসছে।

এই পরিস্থিতির দাবী হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি ও দল যেন এ দুরবস্থার সংশোধন প্রচেষ্টা চালায় এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে যথাসাধ্য কিছু করতে এগিয়ে আসে। অসাধারণ সংগ্রাম সাধনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, দৃঢ় মনোবল নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করলে অবশ্যই তার গতি পরিবর্তন করা সম্ভব।

পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জটিল ও ধ্বংসাত্মক এবং নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক। দেশ তো বাহ্যতঃ কোন সঠিক বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত আছে বলে দেখা যাচ্ছে না। অধিকাংশ লোকই হয়তো বস্তুপূজা ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ কিংবা পুনর্জাগরনবাদী মানসিকতার শিকার। এরা হয়ত চোখ বন্ধ করে পাশ্চাত্যের পেছনে দৌড়াচ্ছে, নয়ত প্রাচীন সভ্যতাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা নিজেরাও এই সয়লাবের স্রোতে ভেসে ও তলিয়ে যাচ্ছে। আর

www.nagorikpathagar.org

আমাদেরকেও তাতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। পক্ষান্তরে মুসলিম উম্মার অবস্থা হচ্ছে তাদের কোন শৃংখলা ও ঐক্য নেই। তারা ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে বিভেদে লিপ্ত। তাদের উপায়-উপকরণ সীমিত, সাহস ও হিম্মত উধাও এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মনোবল অত্যন্ত কম। এমতাবস্তায় কোন ব্যাপক বিপ্লবের দাওয়াত দেয়া পাগলের প্রলাপই হবে, কিন্তু আমরা যে সয়লাবে ঘিরে আছি তার স্রোতে ভেসে যাওয়ার মানে জাতির অস্তিত্ব লবনের মত বিগলিত হওয়া এবং দেশের নীতি নৈতিকতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়ার সমতুল্য হবে। তাই জাতি রাষ্ট্র ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে বীরের ন্যায় রুখে দাড়ানো এবং সয়লাবের গতি পরিবর্তনের জন্যে পূর্ণ প্রয়াস-প্রচেষ্টা করা ছাড়া আর কি উপায় আছে? বস্তুতঃ এতেই রয়েছে আমাদের সব রকম বিজয়।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা বলতে কি বুঝায়?

শিশুদের শিক্ষা এমন একটি বিষয় যে ব্যাপারে সকলেরই কমবেশী আগ্রহ থাকে। কোন বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করে দেখুন। পুরুষমহিলা, ধনী গরীব, শহুরেগ্রামীন, মুসলিমঅমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেক সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মানুষই তাতে উৎসুক হয়ে যাবে। আর সুযোগ পেলে প্রত্যেকে নিজ নিজ বুঝ মুতাবিক কিছু না কিছু মন্তব্যও করে বসবে। সকলের স্বাভাবিক আগ্রহ অনেকটা সহজাত, কেননাঃ

* আল্লাহর ফজলে সবারই সন্তান, সন্ততি আছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যত চিন্তাও করে থাকে।

* প্রত্যেকে নিজ নিজ সন্তানকে নিজের চাইতে উন্নত দেখতে চায় এবং সে জন্যে শিক্ষা দীক্ষার উপায় অন্বেষণ করে থাকে।

* প্রত্যেকের জীবনে এমন কিছু আশা-আকাংখা থাকে যা সে নিজে পূরণ করতে পারেনা বরং অপূর্ণই থেকে যায়। সে আপন সন্তানের মাধ্যমে এ সবের পূর্ণতা বিধান করতে চায়। সুতরাং এজন্যে সে যথোপযুক্ত পন্থা জানতে আগ্রহী হয়।

* নিজের আদর্শ অনুসারে আপন সন্তানদের গড়ে উঠতে না দেখলে প্রত্যেকে আর্তনাদ করে উঠে এবং অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকে।

* ভবিষ্যতের প্রস্তুতির জন্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ শৈশবের যে দীর্ঘ সময় দান করেছেন প্রত্যেকেই তা কাজে লাগাতে চায়।

কিন্তু এ সমস্যা সম্পর্কে মানুষের মন্তব্য সমূহ বিশ্লেষণ করে দেখুন, "নানা মুনির নানা মত" পাবেন। বুঝতে পারবেন প্রত্যেকের কাছে এক একটা পৃথক পৃথক অর্থ রয়েছে এবং প্রত্যেকেরই রয়েছে আলাদা আলাদা চিন্তা ও ধ্যান- ধারনা। কদাচিত এমন কিছু সংখ্যক লোক পাওয়া যাবে যারা কোন

www.nagorikpathagar.org

একটি অর্থ কিংবা ধারণায় একমত হবেন। এমনকি শিক্ষা বিজ্ঞানীদের মাঝেও এ বিষয়ে পাওয়া যায় চরম মতবিরোধ। প্রকৃতপক্ষে চিন্তার এ বিভ্রাট ও অনৈক্যের পেছনেও রয়েছে কতিপয় কারণ–

জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যঃ

জীবন সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। কোন কোন ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার ভোগ এবং স্বাদ আস্বাদনকেই সব কিছু মনে করে। আর কিছু লোক মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসী এবং পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে। কারো মতে জীবনের উদ্দেশ্য কেবল সম্পদ সঞ্চয় ও পুঞ্জীভূত করা এবং ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি করা। কারো মতে শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করা ও অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করা। কোন কোন লোক দুনিয়ার ঝামেলামুক্ত সন্যাস জীবনে আস্থাশীল। আর কেউ সংসার ঝামেলা অতিক্রম করার মধ্যে সন্তুষ্টি লাভ করাকে জরুরী মনে করে। জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির এ পার্থক্যই শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কিত মতবাদ ও ধ্যান-ধারনায় পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ।

আদর্শের পার্থক্যঃ

বিভিন্ন ব্যক্তির আদর্শ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কেউ তার ছেলেকে ডাক্তার বানাতে চায়, কেউ ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চায়। কেউ চায় লীডার বানাতে আর কেউ চায় উকিল বানাতে। কারো লক্ষ্য থাকে কৃষি অথবা ব্যবসায়, কারো উদ্দেশ্য থাকে সাংবাদিকতা কিংবা রাজনীতি। কেউ আলেমে দ্বীন বানাতে আগ্রহী আবার কেউ সরকারী চাকুরীজীবী। মোট কথা যত মানুষ তত আদর্শ। আদর্শের ব্যাপারে মত পার্থক্যের ফলে মতবাদ ও চিন্তাধারায় ও পার্থক্য সুচিত হয়ে থাকে।

পরিবেশের পার্থক্যঃ

প্রত্যেক অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। নিজ নিজ পরিবেশে ফিট হওয়ার জন্যে ব্যক্তির এমন কিছু গুণাবলী ও যোগ্যতা থাকা আবশ্যক যা কেবল শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমেই বিকাশ ঘটানো সম্ভব। পরিবেশ ও তার দাবীসমুহের এই পার্থক্যই শিক্ষা সম্পর্কিত

www.nagorikpathagar.org

চিন্তাধারায়ও মতপার্থক্যের সূচনা করে।

অবস্থা ও প্রয়োজনের বিভিন্নতাঃ প্রত্যেক মানুষেরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা হয়ে থাকে। হয়ে থাকে আলাদা আলাদা প্রয়োজন। শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই সব অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য না রাখা হলে মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে।

ব্যক্তিত্বের জটিলতাঃ

মানুষের ব্যক্তিত্ব খুবই জটিল। তারও রয়েছে একাধিক দিক। যেমন- মানসিক, দৈহিক, কর্মগত, চারিত্রিক ও নৈতিক ইত্যাদি। কারো নিকট এর কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ হলে আরেকজনের নিকট অন্যটি। প্রত্যেকেই শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে তার পছন্দনীয় দিকেরই বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনের প্রতি গুরুত্ব দেয়। আর তাতে কোনরূপ কমতি বা ঘাটতি হলেই অস্বস্তি ও অস্থিরতা প্রকাশ করে থাকে।

শিক্ষা পরিকল্পনায় মতভেদঃ

শিক্ষা বিশারদগণ গভীর চিন্তা গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা পরিকল্পনা প্রনয়ণ করেছেন। কেউ একধরনের স্কীম পছন্দ করলে অন্যজন করেন আরেকটি।

শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদঃ

বিভিন্ন মানুষ নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষাদীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতিকে ফলপ্রসূ ও সফল পেয়েছেন। তাই বর্তমানে শিক্ষার অনেক পদ্ধতি চালু আছে। প্রত্যেকেই মনে করে থাকেন তাঁর পছন্দনীয় পদ্ধতিই একমাত্র সঠিক ও যুক্তি সংগত।

কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিটি ধারনা ও মতবাদ কিছুতেই সঠিক ও নির্ভুল হতে পারে না। কোন একটিই কেবল নির্ভুল ও সঠিক হতে পারে।

আরবী তা'লীম এর অর্থঃ

আরবী তা'লীম শব্দের উৎপত্তি এর (تعليم) মূল ধাতু

(علم)(باب تفعيل) থেকে। তা'লীম (تعليم) এর আভিধানিক অর্থ কাউকে কিছু শিখিয়ে দেয়া, পড়ানো, অবহিত করা। কেউ কেউ ভুলবশত একে আরবী তাদ্‌রীস (تدريس) এর সমর্থক মনে করে থাকেন। তাঁদের মতে এর অর্থ হচ্ছে ছাত্রদের কোন কোন বিষয়ের প্রবন্ধাদি বা বই পত্র শিখিয়ে দেয়া, লেখাপড়া ও হিসাব-কিতাব, অংক ইত্যাদি শিক্ষাদান করা। অথচ আরবী তা'লীম হচ্ছে এক ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, এর অর্থের মধ্যে তাদরীস (تدريس) এর সাথে সাথে তাদরীব (تدريب) (বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করা) তারীর (تأديب) (আদব কায়দা শিক্ষা দেয়া) এবং তারবিয়াত (تربيت) (ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের সুসমন্বিত বিকাশ সাধন করা) ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তা'লীম শব্দের সীমাবদ্ধ ও ব্যাপক ধারণাঃ

তা'লীম শব্দ শোনামাত্র আমাদের মন সাধারণত এমন সব সুশৃংখল ও বিধিবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি ধাবিত হয় যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রদের জন্যে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে বিধিবদ্ধ ও প্রথাগত FORMAL বিদ্যাশিক্ষা এটাই। আর এর প্রভাবও হয় অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। কিন্তু এহচ্ছে শিক্ষার নেহায়েত সীমিত ধারণা। কারণ, শিশুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত স্বল্প সময় অতিবাহিত করে থাকে এবং সেখান থেকে তারা খুবই সীমিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পায়। অথচ তাদের জানার, শেখার এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের কাজ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত চালু থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধ শিক্ষা ছাড়াও তারা নিজেদের ঘর, মহল্লা, প্রতিবেশী, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং তার চারপাশের বিস্তৃত জগত ও তাতে বসবাসকারী লোকদের কাছে কত কিছুইনা শিখে থাকে তার কোন ইয়ত্তা নেই। যদিও এই শিক্ষা প্রথাগত ও বিধিবদ্ধ নয়, বরং INFORMAL কিন্তু তবুও প্রভাব এবং ফলাফলের দিক থেকে তা বিধিবদ্ধ শিক্ষার চাইতে কম নয়।

এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি মাতৃক্রোড় থেকে কবর পর্যন্ত নিয়মিত, অনিয়মিত, বিধিবদ্ধ, প্রথাগত এবং অনিয়মিত (INFORMAL) যেসব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে অথবা তাকে হাসিল করানো হয়, তা সবই তা'লীম এর ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষাদীক্ষায় প্রভাবশীল সহায়ক শক্তিসমূহঃ

শিক্ষার এই ব্যাপক অর্থ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার ওপর বিভিন্ন প্রভাবশীল সহায়ক শক্তি (AGENCIES) প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষগুলো হচ্ছে (১) পরিবার (২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (৩) পরিবেশ (৪) সমাজ (৫) রাষ্ট্র অথবা সরকার।

১) পরিবারঃ

শিক্ষাদীক্ষা লাভের সর্ব প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি হচ্ছে পরিবার। জন্ম থেক চার পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুদের যাবতীয় চাল-চলন পরিবারের গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ সময় পরিবারের সদস্যমন্ডলী ও পারিবারিক পরিবেশের যে প্রভাব শিশু গ্রহণ করে তা খুব সুদূর প্রসারী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। এখানে সে ওঠাবসা, চলাফেরা, খাওয়াদাওয়া, কথাবার্তা বলা মোটামুটি সব কিছুই শিখে থাকে। এখানেই সে প্রকৃত ভালবাসা, স্নেহ, প্রেম-প্রীতি, আদর-সোহাগ, আন্তরিকতা, সহযোগিতা, আরাম-আয়েশ এবং আনন্দ-উল্লাস পেয়ে থাকে, যা তার লালন ও প্রতিপালনের জন্যে অতীব জরুরী। এখানে মাবাপ, ভাই বোন, দাদা দাদী এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বিভিন্নভাবে তার শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাদের স্বভাব-চরিত্র, রীতি, নীতি, চাল-চলন ও গতিবিধি অনুকরণ করে শিশুরা নিজেদেরকে নানা গুণে গুনান্বিত করে তোলে। শিশুদের নির্দোষ ও কোমল মন-মস্তিষ্কে পারিবারিক জীবনের যে গভীর ছাপ রেখাপাত করে তা সারা জীবন অক্ষুন্ন থেকে যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পরেও পরিবারের গুরুত্ব হ্রাস পায় না। কারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুরা মাত্র কয়েক ঘন্টা অবস্থান করে। দৈহিক, নৈতিক ও কর্মগত লালন ও সংস্কার সাধন, তাদের অভ্যাস ও স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি দান এসব কাজ পরিবারের সহযোগিতা ভিন্ন এককভাবে কোন প্রতিষ্ঠান কিছুতেই কোনক্রমেই আঞ্জাম

www.nagorikpathagar.org

দিতে পারে না। পরিবারকে সর্বাবস্থায় নীচের কর্তব্য কর্মগুলো আঞ্জাম দিতেই হবে।

কর্তব্য সমূহঃ

লালন-পালন, দৈহিক প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখা, খানাপিনা ও জামা কাপড়ের সুব্যবস্থা করা, শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা, নিয়মিত ধোয়া, গোসল করা, খেলাধুলা বা ব্যায়াম ও স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাবলী মেনে চলার প্রতি অভ্যাস গড়ে তোলা।

* শিশুদের অভ্যাস ও আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখা, স্নেহ-মমতার সাথে তাদেরকে আদব কায়দা শেখানো, আস্তে আস্তে পছন্দনীয় অভ্যাস ও আচরণের অনুসারী বানানো।

* শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রদত্ত উপদেশসমূহ মেনে চলতে বাধ্য করা।

* পারিবারিক জীবনকে পবিত্র করা এবং পরিবারের লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় ও ঘনিষ্ট রাখার চেষ্টা করা-যাতে শিশুরা সচেতন বা অবচেতনভাবে অনুকরণের জন্যে তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ পেতে সক্ষম হয়।

* গৃহকর্মে অংশ গ্রহণের সুযোগ দান করা। অবসর মুহূর্তে সময় কাটানোর জন্যে চিত্তাকর্ষক একটা কিছুর ব্যবস্থা করে দেয়া। তাছাড়া যোগ্যতানুসারে তাদের উপর পারিবারিক কোন দায়িত্ব অর্পন করা যেন শ্রম-মেহনত, কষ্ট, সহিষ্ণুতা, দায়িত্বানুভূতি, গভীর মনোনিবেশ ও পারস্পরিক সহযোগিতা সহমর্মিতা প্রভৃতি গুণে অভ্যস্ত করা যায়।

* সমবয়স্কদের সাথে খেলাধুলা এবং বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে মেলামেশা করার সুযোগ দেয়া যাতে তারা সামাজিক আদব-কায়দা শিখতে পারে। অবশ্য সমবয়স্কদের অভ্যাস ও আচরণের প্রতি নজর রাখা ও কুসংসর্গ থেকে তাদের রক্ষা করা জরুরী।

* শিশুদের আত্মমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং বৈধ সীমারেখার মধ্যে তাদের রুচি ও ঝোঁক প্রবণতার প্রতি পুরোপুরি আনুকূল্য প্রদর্শন করা।

* যদি শিশু এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করতে বাধ্য হয়, যেখানে দ্বীনি শিক্ষাদীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই' তবে অভিভাবকের কর্তব্য ব্যক্তিগতভাবেই এর ব্যবস্থা করা।

www.nagorikpathagar.org

এগুলো হচ্ছে সেসব মৌলিক ও বুনিয়াদী দায়িত্ব ও কর্তব্য যা সঠিকভাবে একমাত্র পরিবারই আঞ্জাম দিতে পারে। আর তা দেয়াও উচিত। কিন্তু অজ্ঞতা, দারিদ্র, উপায় উপকরণের অভাব, মাতাপিতার ব্যস্ততা এবং সাধারণ বিপর্যয়ের দরুন অনেক কম পরিবারই এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে থাকে বা পালন করতে পারে। শিল্প বিপ্লব পারিবারিক ব্যবস্থাকে আরো বেশী চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। পিতা থাকেন কোথায় আর কোথায় থাকে সন্তান তার কোন হদীছ থাকে না। কে তাদের দেখা শোনা করবে? পরিণামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণতঃ পরিবারের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত থাকে। সুযোগ সুবিধার স্বল্পতার কারণে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও সাধারণত আবাসিক হতে পারছে না। তাই সেগুলোর পক্ষে শিক্ষাদীক্ষার পুরো দায়িত্ব একা পালন করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। সুতরাং শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা সীমাহীনভাবে প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পারিবারিক ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর ও ঘনিষ্ট রাখা এবং পরিবারের সদস্যদেরকে শিশুদের সাথে সংশ্লিষ্ট আপন আপন কর্তব্য সমূহ আঞ্জাম দেয়ার প্রতি সদা সর্বদা দৃষ্টি দান করা উচিত। তা না হলে ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার কোন উপায় থাকবে না।

২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ

শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী দ্বিতীয় কার্যকর সংস্থা হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিককে সুসমন্বিতভাবে বিকাশ সাধনের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের উপরই ন্যস্ত হয়ে থাকে। শিশুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে যা কিছু শেখে তাতে না থাকে কোন শৃংখলা, না থাকে কোন শ্রেণী বিন্যাস। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই একমাত্র এমন সুশৃংখল প্রতিষ্ঠান যেখানে সুযোগ্য শিক্ষকদের সাহায্যে এক বিশেষ নিয়ম, শৃংখলা, শ্রেণী বিন্যাস ও ধারাবাহিকতার সাথে শিশুদের শিক্ষা দেয়া হয় এবং তাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের বিকাশ সাধন করা হয়। গৃহের ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিও শিশুদের আবেগপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। তারা নিজেদের শিক্ষককে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি মনে করে এবং তাঁদের জ্ঞান সম্পর্কে অস্বাভাবিক আস্থা রাখে। তাঁদের স্বভাব চরিত্র আচরণ ও রীতিনীতিকে নিজেদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ মনে করে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ তাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

এখানে শিশুদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উপর যে ছাপ অংকিত হয় তা আজীবন অক্ষুন্ন থাকে। এসব করণেই এই সংস্থা (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) সব চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তব্যঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিম্নের দায়িত্বগুলো আঞ্জাম দিতে হয়–

* শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় ও জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি সৃষ্টি করা। শিশুরা এখান সেখান থেকে যা কিছু শিখে বা যেসব জ্ঞান অর্জন করে তা সাধারণত অসম্পূর্ণ বা অপ্রতুল হয়ে থাকে। তাতে কোন শৃংখলা ও ধারাবাহিকতা থাকে না। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয়ের কর্তব্য তারা যেন একটা বিশেষ স্তর বিন্যাস, শৃংখলা ও ধারাবাহিকতার সাথে ছাত্রদের জ্ঞান দান করে এবং দক্ষতা ও যোগ্যতার সৃষ্টি করে।

* সংশোধন করা ও আদব–কায়দা শেখানো, জ্ঞান ও কর্মগত, দৈহিক কিংবা নৈতিক দিক থেকে শিশুদের মাঝে যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি ও মন্দ জিনিস শিকড় গেড়ে বসতে চায়, সেগুলো সংশোধন করা, পছন্দনীয় অভ্যাস ও আচরণের ধারকরূপে তৈরী করা, তাদের আভ্যন্তরীন যোগ্যতা ও প্রতিভাগুলোকে সঠিক পথে প্রবাহিত করা। তাছাড়া তাদেরকে এমন সব বাস্তব ও নৈতিক গুণাবলীতে বিভূষিত করা যা তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্বসমূহ সুন্দরভাবে আঞ্জাম দানে সহায়ক হয়।

* শিশুদের মাঝে ভাল মন্দের পার্থক্য, হক ও সত্যের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা, বাতিলের প্রতি তীব্র ঘৃণা, সৎকাজের প্রচার প্রসার এবং অসৎকাজের প্রতিরোধ করার জজবা ও প্রেরণাকে জাগিয়ে তোলা যাতে তারা সমাজের ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় ঝোঁক প্রবণতার মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। নিজেরা যেন এর শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং অন্যদেরকেও রক্ষা করতে ব্রতী হয় তজ্জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

* শৈশব ও যৌবন, পাঠ্য জগত ও কর্ম জগত, বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে যে শূন্যতা থাকে তা পূরণ করা, যাতে শিশুরা বাস্তব জগতে সফলতার সাথে জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

* গোটা মানব জাতির কর্মোপযোগী ও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাসমূহ এবং পূর্বসুরীদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান বিজ্ঞানমূলক, প্রযুক্তিগত এবং

www.nagorikpathagar.org

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারিত্বের সংরক্ষণ এবং তাতে যথাযথ সংযোগ সাধন করে পরবর্তী প্রজন্মের নিকট হস্তান্তর করা। আমাদের পূর্বসূরীগণ বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞানের যে সব উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, সে সবকে ধ্বংস ও বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষা করা এবং নিজেদের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা তাকে আরো সমৃদ্ধ করে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট হস্তান্তর করা বিদ্যালয় সমূহের অবশ্য কর্তব্য।

* সমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মান মর্যাদার মাপকাঠি সরবরাহ করা। অর্থাৎ বিদ্যালয় প্রদত্ত সার্টিফিকেটগুলো থেকে সমাজ যেন সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে যে, কোন্ সার্টিফিকেটের অধিকারী ব্যক্তি কোন ধরণের যোগ্যতার অধিকারী এবং সে কি ধরণের দায়িত্ব পালনে সক্ষম।

* ছাত্রদের মাঝে মেধা, মন মানসিকতা, শারীরিক ও সামাজিক এবং নৈতিক ও চারিত্রিক দিক দিয়ে যে তারতম্য রয়েছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাদের প্রতি ভিন্নভাবে ব্যক্তিগত দৃষ্টি দেয়া উচিত, যেন প্রত্যেকটি শিশুই নিজ নিজ শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতা অনুসারে সামনে অগ্রসর হতে পারে।

৩) নিকটতম পরিবেশঃ

এ হচ্ছে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি। শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার উপর তাদের পরিবেশেরও অতি গভীর প্রভাব পড়ে। শিশু যে ভৌগলিক পরিবেশে থাকে, যে ধরণের দৃশ্যাবলী দেখে, যে শ্রেণীর সাথে সম্পর্ক রাখে, যেসব ছেলের সাথে উঠে বসে ও খেলাধূলা করে, তাদের সবারই সামষ্টিক প্রভাব গ্রহণ করে থাকে। আশপাশের লোকদের চাল-চলন, আকিদা-বিশ্বাস, কাজকর্ম, ও রীতিনীতি ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরিবেশ যদি ভালো হয় তাহলে বিদ্যালয় ও পরিবার উভয়ের প্রচেষ্টা ফলবতী হয়। নতুবা উভয়কেই বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় ভদ্র ঘরের সন্তান এবং বিশিষ্ট ও নামকরা বিদ্যাপিঠের ছাত্ররাও সর্বপ্রকার চেষ্টা তদ্বির সত্বেও অসৎ পরিবেশের শিকার হয়ে পড়ে। ফলে লক্ষ্যস্থান পর্যন্ত তাদের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়না। এজন্যে পরিবেশকেও শিক্ষাদীক্ষার স্বার্থে অনুকূল করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

www.nagorikpathagar.org

৪) সমাজঃ

মানুষ সাধারণতঃ নিজ পরিবেশ ও সমাজেরই ফসল। খুব কম লোকই এমন বিপ্লবী মানসিকতা কিংবা উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়ে থাকেন যারা নিজ পরিবেশের উর্ধ্বে থেকে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। সমাজে যেসব জিনিস চালু হয়ে যায় মানুষ সচেতন কিংবা অবচেতনভাবে সে সবকে গ্রহণ করে থাকে।

আজকের সমাজে দেখা যাচ্ছে নানাবিধ উপাদান কর্মতৎপর রয়েছে এবং মানুষের উপর নিজেদের ভালোমন্দের ছাপ অংকন করে চলছে। যেমন, বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দল, ক্লাব, সমিতি, প্রেস, প্লাটফর্ম, সিনেমা, রেডিও, আনন্দমেলা, পাঠাগার, লাইব্রেরী, যাদুঘর, নাট্যমঞ্চ, প্রদর্শণীর জায়গা, জনসেবা ও জন কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। মানুষ সারা জীবন এগুলো থেকে কিছু না কিছু শিখে এবং এগুলোর প্রভাব গ্রহণ করে থাকে।

এসব সামাজিক সংস্থা যদি সঠিক ভিত্তিতে কাজ করে, তাহলে মানুষকে উপরে তুলতে ও মানুষের উন্নতি বিধানে এবং তাদের আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের বিকাশ সাধনে সহায়ক হয়। তাদেরকে সমাজের অকৃত্রিম ও নিষ্ঠাবান সেবক হিসেবে তৈরী করে। অন্যথ্যায় এসব সংস্থার কারণে মানুষ বিগড়ে যায়, গোমরা হয়। আর সমাজ সহ স্বয়ং এসব সংস্থাকেও সাথে নিয়ে অতলে তলিয়ে যায়।

সমাজের কর্তব্য ও দায়িত্ব সমূহঃ

সমাজের কর্তব্য হলো সে-

* সামষ্টিক বিবেককে জাগ্রত রাখবে। যাতে খারাপ সংস্থাগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠে গোটা সমাজকে বিকৃত করতে না পারে।

* নানা রূপ প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ও সমিতি প্রভৃতি দিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ রাখবে; যাতে সব ধরণের যোগ্যতা ও ঝোঁক প্রবণতার মানুষ নিজের রুচি, স্বাদ ও সাধ্য অনুযায়ী নিজেও উপকার লাভ করতে পারে এবং সমাজকেও উপকৃত করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

* ব্যক্তি ও সংস্থা সমূহের কর্মতৎপরতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে। ভাল কাজে তাদের পূর্ণ সহযোগিতা করবে এবং মন্দগুলো প্রতিহত করার জন্যে সদা তৎপর থাকবে।

* সমাজের অনুন্নত, পশ্চাদপদ, অক্ষম, পতিত ও নিষ্পেষিত লোকদের আশ্রয়দান এবং তাদের যোগ্যতাসমূহের সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করবে।

রাষ্ট্র ও সরকারঃ

সরকারের ক্ষমতার সীমা দিন দিন ব্যাপকতর হতে চলছে। সামাজিক বিষয়াদি অতিক্রম করে এখন তা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও প্রবেশ করতে শুরু করেছে। তার উপায় উপকরণ ব্যাপক। নাগরিকদের জীবনের কোন বিভাগই তার প্রভাব মুক্ত নয়। সুতরাং শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারেও তা শ্রেষ্ঠ ও সব চেয়ে বড় প্রভাবশালী শক্তি। এমতাবস্থায় তার দায়িত্বও বেড়ে গেছে অনেক।

কর্তব্য ও দায়িত্ব সমূহঃ

রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব সমূহ নিম্নে দেয়া গেলঃ-

* প্রত্যেক নাগরিকের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা।

* বয়স্কদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা।

* জাতি-ধর্ম ও বর্ণ-বংশ নির্বিশেষে সকলের যোগ্যতানুসারে শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া।

* জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও অপারেশন, ব্যবসা-বানিজ্য ও শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি প্রভৃতির উন্নতির জন্যে ছোট বড় সব ধরণের প্রতিষ্ঠান কায়েম করা।

* সংখ্যা লঘুদেরকে তাদের পছন্দ মাফিক নিজস্ব প্রতিষ্ঠান চালানোর সুবিধা দান করা।

* প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাসাধ্য স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া।

* নাগরিকদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা এবং জাতীয় বাজেটে সে জন্যে অধিক থেকে অধিকতর খাত বের করা।

* গরীব ও নিঃস্ব ছাত্রদের জন্যে বৃত্তি ও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা।

www.nagorikpathagar.org

* বোবা, বধির, অন্ধ, অমেধাবী, দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে পঙ্গু ও অক্ষম শিশুদের জন্যে তাদের অবস্থার আলোকে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা।

* শিক্ষাদীক্ষাকে সহজ আকর্ষণীয়, প্রভাবশীল সার্বজনীন করার নিয়ম পদ্ধতিগুলোর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণামূলক কাজ করার এবং উন্নত মানের পাঠ্য ও পাঠ্য বহির্ভূত গ্রন্থসমূহ রচনা করার জন্যে সুযোগ সুবিধা দান করা। উন্নত চরিত্রের দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন বিপুল সংখ্যক শিক্ষক সৃষ্টি করা।

এসব হচ্ছে শিক্ষাদীক্ষার বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান। এসব উপাদানের ভালো মন্দ, দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ এবং বেপরোয়াভাবের উপরেই শিক্ষা-দীক্ষার ভালমন্দ ফলাফল নির্ভরশীল। তবে যতদূর এসব উপাদানের ভাল মন্দ হওয়ার সম্পর্ক তা নির্ভর করে এমন সব মৌলিক ধ্যাণ-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসের উপর, যা ওসব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানও চলার পেছনে ক্রিয়াশীল থাকে। এ কারণে সুশিক্ষার জন্যে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উন্নত এবং দায়িত্ব কর্তব্য বোধ সম্পন্ন করে গড়ে তোলার চেষ্টা সাধনা থাকা উচিত। আর এ কাজ তখনি বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে। যখন এগুলোর পেছনে যেসব চিন্তাধারা ও বিশ্বাস ক্রিয়াশীল, তা সংশোধন করা যাবে।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার অর্থের ন্যায় 'শিক্ষার উদ্দেশ্য' সম্পর্কেও সম্ভবত মতভেদ রয়েছে। মাতাপিতা নিজ সন্তানদের সাধারণতঃ শিক্ষা দান করে থাকেন, যেন তারা লেখাপড়ার পর আয় উপার্জন করে জীবন ধারণের যোগ্য হতে পারে। "জীবিকার জন্যে শিক্ষাই" তাদের মূল উদ্দেশ্য। যদিও খুব কম লোকই কথাটি মুখে স্বীকার করেন। নিঃসন্দেহে উপার্জন করা ও খাওয়া পরা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। প্রায় সে কারণে যে কোন অবস্থায় পূর্ণ চেষ্টা থাকা উচিত যেন সন্তানাদি লেখাপড়া করে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু মানবতার লক্ষ্য তো শুধু এতটুকুই হতে পারে না। কেবল এটাকেই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করলে সন্তান 'অর্থনৈতিক জীব' অবশ্যই হবে কিন্তু মানুষ কখনো হতে পারবে না। অথচ একজন মুসলমানের দৃষ্টিতে ঈমান তার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। এমতাবস্থায় জীবিকাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য স্থির করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা প্রকৃত পক্ষে সন্তানের উপর অনুগ্রহ হয় না বরং তা হয় তাদের উপর প্রকাশ্য জুলুম।

ঠিক তেমনি অধিকাংশ শিক্ষকই শিক্ষার উদ্দেশ্য মুখে যা-ই বলুন না কেন কার্যতঃ দেখা যায় তাঁরা "শিক্ষার জন্যে শিক্ষণ নীতিতেই বিশ্বাসী।" তারা চান, ছাত্ররা নিজেদের সমস্ত দৃষ্টি ও মনোযোগ কেবল লেখা পড়া, শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি ও অধিক নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রতিই কেন্দ্রীভূত রাখুক। ব্যক্তি সত্তার অন্যান্য দিক (দৈহিক, বাস্তব ও নৈতিক ইত্যাদি) তাদের দৃষ্টির বাইরে থাকে। অথচ একটা ভারসাম্যপূর্ণ ও সফল জীবনের জন্যে এসব দিক কেবল ততটুকুই নয় বরং তার চাইতেও অধিক

www.nagorikpathagar.org

গুরুত্বের বিষয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি অতীব জরুরী সন্দেহ নেই এবং এর প্রতি সীমাহীন মনোযোগ দিতে হয় তাও সত্য। কিন্তু ব্যক্তি সত্তার অপরাপর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা কিংবা কেবল শিক্ষা হাসিলের পেছনে সেগুলোকে বিসর্জন দেয়ার পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ। আমাদের অভিজ্ঞতা হলো বেশ কিছু উচ্চ শিক্ষিত ও শিক্ষায় উচ্চমানের যোগ্যতাসম্পন্ন লোক স্বাস্থ্য, চরিত্র অথবা কর্মের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ থেকে নিজের ও অন্যদের জন্যে উপকারী হওয়ার পরিবর্তে চরম নিষ্কর্মা ও ক্ষতিকারক প্রমাণিত হচ্ছে।

শিক্ষার আরো কতিপয় উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়ে থাকে তার বিশেষ বিশেষ কয়েকটি হলো---

১) সমাজের নিঃস্বার্থ খাদেম তৈরী করা।

২) রাষ্ট্রের সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলা।

৩) ব্যক্তিত্বের সুসমন্বয়ের সাথে বিভিন্ন দিক ও বিভাগের বিকাশ সাধন করা।

৪) ব্যক্তি সত্তার বিকাশ এবং আত্মবোধের পূর্ণতা বিধান।

৫) জীবন যাপনের জন্যে পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত করা অর্থাৎ ছাত্রদের এমনভাবে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, যেন তারাঃ

* নিজ সত্তার নিরাপত্তা বিধান করতে পারে।
* জীবনের সাধারণ প্রয়োজনগুলোর সংস্থান করতে পারে।
* সন্তানাদি ও পরিবারের লালন-পালন ও রক্ষনাবেক্ষণ করতে পারে।
* সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখতে পারে।
* অবসর মুহূর্তগুলো ভালোভাবে কাটাতে পারে।

৬) স্বভাব চরিত্র ও আচার-আচরণ সুন্দর ও সংশোধন করতে পারে।

৭) সুস্থ দেহে মন-মস্তিষ্কের লালন ও বিকাশ সাধন ইত্যাদি।

শিক্ষার উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলীর গুরুত্ব ও উপকার অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এগুলোর কোন একটিও স্বতন্ত্রভাবে উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা এর প্রত্যেকটিই পৃথক পৃথকভাবে অপূর্ণাঙ্গ, একদেশদর্শী কিংবা অস্পষ্ট।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষার সঠিক উদ্দেশ্যঃ

"আল্লাহর নেক ও সৎ বান্দাহ তৈরী করা" অর্থাৎ বিদ্যার্থীদের স্বাভাবিক যোগ্যতা সমূহের বিকাশ ঘটানো। তাদের মানসিক ও প্রকৃতিগত ঝোঁক প্রবণতাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করা এবং মানসিক, দৈহিক, কর্মগত নৈতিক দিক থেকে তাদেরকে ক্রমান্বয়ে এমন উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যেন তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহ হয়ে থাকতে পারে এবং বিশ্বে তাঁর মর্জি মোতাবেক জীবন যাপন করতে পারে। তা ছাড়া তাদের স্রষ্টা ও মালিকের পক্ষ থেকে তাদের উপর যে সব ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামজিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা পুরোপুরি আদায় করতে পারে।

শিক্ষার এটাই হচ্ছে যথার্থ পূর্ণাঙ্গ ও মৌলিক উদ্দেশ্য।

কারণঃ আল্লাহই সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সবার লালন-পালন করেন এবং সকলের প্রয়োজন সমূহ পূরণ করেন। তিনিই সকলের মালিক, মাবুদ, বিচার কর্তা ও বাদশাহ। তাঁর সাম্রাজ্য বিশাল ও অসীম। আমাদের এই বিস্তৃত পৃথিবী তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। আল্লাহ তাআলা একে বহুবিধ নিয়ামতরাজি দ্বারা ভরপুর করে রেখেছেন। এসব নিয়ামত আমাদের হাতে অর্পণ করে আমাদেরকে এখানে আবাদ করেছেন। সৃষ্টি জগতের সব কিছুর প্রকৃত মালিক একমাত্র তিনি। আমরা যা কিছুই পেয়েছি তা কেবল তাঁরই দেয়া আমানত মাত্র। আমরা তাঁর বান্দা ও গোলাম। তিনি আমাদেরকে জীবন যাপনের বিস্তারিত পদ্ধতি, আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি সবই দিয়েছেন। তাঁর নিয়ামত সমূহের শোক্‌র আদায় করা, তাঁর বাতলে দেয়া পন্থা অনুযায়ী চলা, তাঁর সাম্রাজ্যে তাঁর ইচ্ছা ও মর্জি পূরণ করা আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। তিনি আমাদের উপর নানা প্রকার দায়িত্ব অর্পন করেছেন। যে সব দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্যে তিনি আমাদের দান করেছেন একটা সুঠাম দেহ। তার মধ্যে আমানত রেখেছেন বিভিন্ন ধরণের শক্তি, সামর্থ, প্রতিভা, যোগ্যতা। আমাদের চার পাশে যোগান দিয়ে রেখেছেন নানাবিধ উপায় উপকরণ। তাঁর দান করা কোন কিছুই

www.nagorikpathagar.org

অযথা ও নিরর্থক নয়। তাঁর দেয়া এসব শক্তি–সামর্থ, প্রতিভা ও যোগ্যতা এবং মাল সামান তাঁরই মর্জি মোতাবেক ব্যয় ও ব্যবহার করার মধ্যেই রয়েছে আমাদের কল্যাণ। অর্থাৎ তাঁর কৃতজ্ঞ ও নেক বান্দা হয়ে থাকার মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের প্রকৃত সফলতা।

প্রকাশ থাকে যে, এই উদ্দেশ্য কেবল তখনি হাসিল হতে পারে, যখন শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়ঃ

১) দৈহিক স্বাস্থ্যঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে সুঠাম দেহ্ দান করেছেন তার সুস্থতা ও বিকাশের জন্যে আবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করা। স্বাস্থ্য রক্ষার মূল নীতিগুলো নিয়মিত পালন করানো, কায়িক শ্রম, ব্যায়াম অথবা খেলাধুলা ও পরিস্কার–পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং স্বাস্থ্য হানিকর বিষয়গুলো থেকে সতর্কতা অবলম্বনের পন্থাগুলো বাতলে দেয়া।

২) সহজাত শক্তি, প্রতিভা ও যোগ্যতা সমূহের বিকাশ সাধনঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে যেসব স্বভাবজাত শক্তি ও যোগ্যতা সুপ্ত রেখেছেন তা সবই মানুষের জন্য অতীব জরুরী ও কার্যপোযোগী। সুপ্ত শক্তি ও প্রতিভার বিকাশ সাধনের চিন্তা ভাবনা করা, এসবের যথোপযুক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাহায্য–সহযোগিতা ও পথ প্রদর্শন করা, এগুলোর কোন একটিকেও দমিয়ে না দেয়া, দলিত না করা এবং এগুলোকে উপেক্ষা না করা।

৩) সৃষ্টিগত ও স্বভাবজাত কামনা–বাসনা ও ঝোঁক প্রবনতাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করা এবং পছন্দনীয় ও উপকারী কার্যাবলীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা। ইসলামিয়াত, ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে তা আঞ্জাম দেয়া উচিত যেন শিশুরা নিজেদের অবসর সময়গুলোকে পছন্দনীয় ও উপকারী কাজে লাগাতে অভ্যস্ত হয়।

৪) সঠিকভাবে চিন্তা করার, ভালোমন্দ এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার মাপকাঠি সরবরাহ করা যেন ভ্রান্ত মতবাদ ও বাতিল চিন্তাধারা সমূহের শিকার হয়ে না যায়।

৫) ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান এবং তা আঞ্জাম দানের বাস্তব প্রশিক্ষণ দান।

৬) আল্লাহর সৃষ্টি জগতের কারখানার জ্ঞান এবং তাঁর এই বিশাল প্রকাশ্য–অপ্রকাশ্য বিপুল সম্পদের সঠিক ব্যয়ের খাত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করা।

৭) লেখাপড়ার সাথে সাথে অন্যান্য বিষয়ে ও জ্ঞান দান করা।

www.nagorikpathagar.org

৮) নিখুঁত চরিত্র ও সদাচরণের অধিকারী করা। এসবই হচ্ছে উচ্চাংগীন ও পবিত্র উদ্দেশ্য, যা শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা দানের সময় বড়দের দৃষ্টির সামনে থাকা উচিত। কিন্তু তার অর্থ কখনো এ নয় যে, শিশুদেরকে সময় হওয়ার পূর্বেই সাবালক বানিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। কিংবা তাদের শিশুসুলভ বৈশিষ্ট সমূহের আগ্রহ, আকর্ষণ ও মানসিকতা ও ঝোঁক প্রবনতাগুলোকে উপেক্ষা করে শিক্ষা-দীক্ষার একটি কর্মসূচী বানাতে হবে। মানুষ ভবিষ্যত চিন্তায় সাধারণতঃ এরূপ ভুল করে বসে। ফলে শিশুদের উপর এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাদের ব্যক্তিত্ব বিদ্রোহ ও শঠতার জীবানুতে আক্রান্ত হয় এবং তাদের দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা ও প্রতিভা অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এজন্যে সর্বদাই উপরোক্ত উচ্চাংগীন উদ্দেশ্য সমূহ অবশ্যই নিজেদের দৃষ্টির সামনে রাখা উচিত। কিন্তু শিশুদের থেকে যেমন অনেক উচ্চাশা পোষণ করা উচিত নয়, তেমনি অসময়ে কোন জিনিস তাদের উপর চাপানোও ঠিক নয়। বরং শিক্ষাদীক্ষার কর্মসূচী প্রনয়নকালে তাদের শিশু সুলভ বৈশিষ্ট, আকর্ষণ ও ঝোঁক প্রবনতার প্রতি যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখা এবং এসব পন্থায় আস্তে আস্তে উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়ন করা উচিত।

১) শিক্ষার উদ্দেশ্যঃ আন্তরিক সততার মাধ্যমে আনন্দ লাভ করা।

--এরিষ্টটল

২) শিক্ষার উদ্দেশ্য আদর্শ মানুষের পূর্ণতা বিধান। --পিয়েন

৩) শিক্ষার অর্থ পূর্ণ মানবের দীক্ষা দান। --কামিয়েস

৪) শিক্ষা মানে চেতনা শক্তি বা ইচ্ছা শক্তির উন্নতি বিধান। --ডিউটসন

৫) শিক্ষা একটা বিদ্যা, যদ্বারা বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞ নয় বরং মানুষ তৈরী করা হয়। --মন্টিন

৬) মর্মর পাথরের টুকরোগুলোর জন্যে যেভাবে পাথর কাটা প্রয়োজন, তদ্রুপ মানবাত্মার জন্য শিক্ষা প্রয়োজন।[১] --এডিসন

৭) শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানে পরিপূর্ণ করে দেয়া নয়, বরং শক্তির তরবিয়ত দান।

--আর্কিট

www.nagorikpathagar.org

৮) শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বচ্ছ একনিষ্ঠ নির্দোষ ও পাক-পবিত্র জীবন যাপনের যোগ্য করে গড়ে তোলা। --ফ্রুবল

৯) শিক্ষার মানে, অভিজ্ঞতার পূনর্বিন্যাস সাধন; যাতে ব্যক্তিকে তার নিজস্ব শক্তিগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের যোগ্য করে, তার অভিজ্ঞতাকে আরো ব্যাপকতর করা যায় এবং তাকে সামাজিক দিক দিয়ে অধিকতর উপকারী করে গড়ে তোলা যায়। --ডিউভী

১০) সাধারণতঃ মানবতার সর্বোচ্চ লক্ষ্য নৈতিক চরিত্রকেই স্বীকার করা হয়ে থাকে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও তাই। --হার্বার্ট

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগের ন্যায় 'শিক্ষা' সম্পর্কেও রয়েছে বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি। তবে নিম্নে কেবল তিনটা বিশেষ মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে–

১) সমাজতান্ত্রিক

২) গণতান্ত্রিক

৩) ইসলামী

আজকে সারা পৃথিবীর নেতৃত্ব আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার কবজায়। মতবাদের ক্ষেত্রেও এ দু'টো দেশই সবার অগ্রভাগে রয়েছে। আমেরিকা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আর রাশিয়া সমাজতন্ত্রের। পৃথিবীর যেসব দেশ আমেরিকার বশ ও প্রভাবাধীন, তারা জাতি পূজারী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাদের শিক্ষা কাঠামো সে দৃষ্টিভঙ্গিতেই রচিত। আর যারা রাশিয়ার তাবেদার তারা একনায়কতন্ত্রের সমর্থক, সমাজতন্ত্রের অনুসারী, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও থাকে এর গভীর ছাপ ও সুদূর প্রসারী প্রভাব। তাই শিক্ষা সংক্রান্ত অনৈসলামিক মতবাদগুলোর মধ্যে কেবল এ দু'টোকেই আলোচনার জন্য নির্বাচন করা হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা দর্শন

সমাজতন্ত্র হচ্ছে একটি বস্তুবাদী ব্যবস্থা। এ মতবাদ নিজ ধর্মের প্রতি বৈরিতা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলোর মুলোৎপাটনের জন্যে

www.nagorikpathagar.org

কুখ্যাত। শ্রেণী সংগ্রাম ছড়িয়ে দিয়ে সে তার মতলব হাসিল করে। এ মতবাদে জনগণ ও তাদের ব্যক্তি সত্তার কোন গুরুত্বই নেই। নাগরিকদের জান মাল, তাদের ইজ্জত আব্রু এবং দেশের সমস্ত উপায় উপকরণের মালিক হলো রাষ্ট্র। যেহেতু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আল্লাহর সাথে পূর্ণ বিদ্রোহ ঘোষণা এবং জনগণের ব্যক্তি সত্তার দলন করে যায় তাকে অবিরাম মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যেতেই হয়, প্রতি মুহূর্তে প্রতিবিপ্লবের আশংকা তার লেগেই থাকে। সেজন্যে তাকে নিজের টিকে থাকা ও হাত শক্ত রাখার জন্যে জোর জবরদস্তি ও জুলুম-পীড়ন এবং একনায়ক ও স্বৈরাচারের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা দাবী তো করে থাকে শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা তারা জনগণকে সমাজের নিঃস্বার্থ সেবক বানাতে চায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ছাত্রদের প্রকৃতিগত যোগ্যতা এবং ব্যক্তিক বৈশিষ্টসমূহকে এমনভাবে ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করে যে, জনগণ তাদের ব্যক্তি সত্তাকে সামাজিক বস্তুবাদী স্বার্থের যুপকাষ্ঠে বলি দিতে এবং নিজের ব্যক্তি সত্তাকে সমাজের মধ্যে বিলীন করে দিতে বাধ্য হয়। সমাজতন্ত্রীরা ছাত্রদেরকে বস্তুপূজারী, ধর্মবৈরী ও খোদাদ্রোহী বানায়। তাদের মধ্যে শ্রেণী বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে হিংস্র জন্তুর চেয়েও জঘন্যতম বানিয়ে ছাড়ে।

এভাবে শীর্ষস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি অথবা একটি ক্ষুদ্র দল রাষ্ট্রের সমগ্র উপায়-উপকরণ এবং সকল জানমালের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। দু'বেলা আহারের বিনিময়ে সকলকে নিস্প্রাণ, বাকহীন ও স্বীয় স্বার্থের হাতিয়ারে পরিণত করে। অথচ প্রচার করে বেড়ায় আমরা মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছি।

উপরোক্ত দাবী মেনে নিলেওঃ

দৈনিক রেশনের নির্ধারিত রিযিক যার চাবি থেকে অন্যদের হাতে, তা পরিমাণে প্রচুর হলেও তৃপ্তিদায়ক নয়। কারণ তাতে স্বাধীনভাবে আকাশে উড্ডয়নে যে অক্ষমতা আসে, স্রেফ শরীরের স্থূলতা তার প্রতিবিধান করতে পারে না।

১) গ্রন্থটি অনেক পূর্বে রচিত। বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়া আর বিশ্ব শক্তি নেই। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বেও সমাজতন্ত্র বর্জিত। লেনিন আজ যাদু ঘরে রক্ষিত। দুনিয়াব্যাপী মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ভ্রান্ত বলে স্বীকৃত ও প্রমানিত। গ্রন্থে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে উল্লেখিত কথাগুলো সে দৃষ্টিতে বিচার্য। --সম্পাদক।

www.nagorikpathagar.org

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্টসমূহঃ

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা দর্শনের ভিত্তিতে যে শিক্ষা ব্যবস্থার রূপদান করা হয় তাতে নিম্নের বৈশিষ্টসমূহ পাওয়া যায়ঃ

১) শিক্ষা সকলের জন্যে সাধারণ ও বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে, যেন রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক সমাজতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সেই ব্যবস্থার সাহায্যকারী ও সেবক হতে পারে।

২) গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই থাকে রাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। সরকার প্রণীত কাঠামো অনুযায়ী প্রত্যেককে শিক্ষা দেয়া হয়। বেসরকারী ও ব্যক্তিগত কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন আইনতঃ সম্পূর্ন নিষিদ্ধ যেন শিক্ষার্থীদের কর্ণকুহরে সরকার অথবা সমাজতন্ত্রের বিরোধী কোন কথা ঢুকতে না পারে।

৩) শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক। সাধারণ শিক্ষা হোক কিংবা পেশা ভিত্তিক, শিল্পজাত হোক বা কৃষি শিক্ষা–যাবতীয় ব্যয়ভার রাষ্ট্রই বহন করে। ছাত্রদের খাদ্য,, বস্ত্র, শিক্ষা সরঞ্জামও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে স রবরাহ করা হয়।

৪) শৈশবকাল থেকেই প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের বন্দোবস্তের চেষ্টা করা হয়, যাতে প্রথম থেকেই শিশুদের মনে সমাজতন্ত্রের গভীর ছাপ পড়ে । এ উদ্দেশ্যে মাতাপিতাকে বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং শিশু বিদ্যালয়ের (নার্সারী স্কুল) ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়।

৫) জাতি ধর্ম, বর্ণ–বংশ গোত্র ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকলকে একই শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। দৈহিক ও মানসিক কর্ম জীবীদের মধ্যেও কোন রূপ পার্থক্য করা সম্ভব হয় না। সবাইকে একই ডান্ডা দিয়ে হাঁকানো হয়।

৬) ধর্ম, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা অথবা জীবনের স্থায়ী মূল্যবোধগুলোর কোন স্থান এ শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। পক্ষান্তরে বস্তুবাদ, নাস্তিকতা, ধর্মদ্রোহিতা এবং শ্রেণী বিদ্বেষ কানায় কানায় ভরে দেয়ার চেষ্ট করা হয়, যেন বর্তমান সমাজ

www.nagorikpathagar.org

কাঠামোর মূলোৎপাটন করে খাঁটি বস্তুপূজা ও নাস্তিকতার ভিত্তিতে নতুন সমাজ কাঠামো রচনা করা যায়।

৭) বিদ্যালয়ের সব পাঠ্য বিষয় তৎপরতা ও ব্যস্ততায় বৈষয়িক স্বার্থ হাসিল করার দৃষ্টিভঙ্গীই পরিব্যাপ্ত। কেবল সেসব কিছুই পড়ানো, শেখানো ও করানো হয়ে থাকে, যদ্বারা কোন বৈষয়িক স্বার্থই লাভ হবে এবং রাষ্ট্রীয় উৎপাদন বাড়বে এবং জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। এজন্যে কারিগরি ও শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনকেই গুরুত্ব প্রদান করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় শিল্প কারখানার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয় এবং ছাত্রদের বিভিন্ন ফার্ম অথবা কারখানা ইত্যাদিতে বাস্তব জ্ঞান লাভ বাধ্যতামূলক করা হয়।

৮) রাষ্ট্রের অন্যান্য সংস্থা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে থাকে। যেহেতু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্ত শিল্প ও কারিগরি, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি থাকে রাষ্ট্রেরই নিয়ন্ত্রণে, এজন্যে কারখানা, ফার্ম এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে।

৯) রাষ্ট্রের নিজস্ব পরিকল্পনায় যেরূপ যোগ্যতা, দক্ষতা ও নিপুনতা এবং যে প্রযুক্তিতে যত দক্ষ কর্মী প্রয়োজন, রাষ্ট্র নিজস্ব পরিকল্পনা মোতাবেক সবাইকেই নিজের নিয়ন্ত্রণে ও তত্ত্বাবধানে তৈরী করে নেয়, যেন রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন এবং ব্যক্তিক যোগ্যতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

১০) পাঠ্য তালিকা; পাঠ্য বই এবং শিক্ষা পদ্ধতি সবকিছুই রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের আলোকে হয়ে থাকে। ছাত্রদের পাঠ্য বিষয় নির্বাচনের এবং শিক্ষকদের শিক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতির ব্যাপারে কোন স্বাধীনতাই দেয়া হয় না। এজন্যেই গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা হয়ে পড়ে স্থবির ও নিরস এবং তাতে দেখা দেয় অস্বাভাবিক রকমের সমতা এবং সামঞ্জস্যশীলতা।

এই ব্যবস্থার দোষ গুণঃ

এ ব্যবস্থার কিছু কিছু গুণ ও আছে, যেমনঃ

* লোকদের মধ্যে সামাজিক স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দেয়ার অস্বাভাবিক স্পৃহা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

* ছাত্রদেরকে দৈহিক শ্রম ও মেহনতে অভ্যস্ত করা হয়। তারা নিজ হাতে কাজ করতে লজ্জাবোধ করে না।

* তত্ত্বের চেয়ে বাস্তব ও ব্যবহারিক জ্ঞানের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। ফলে ছাত্ররা নিজেদের জ্ঞানকে বাস্তবভাবে কাজে লাগানোর পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হয় এবং তাত্ত্বিক না হয়ে বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী মানুষে পরিণত হয়।

* সামাজিক ও আর্থিক সাম্য এবং সম্পদের সমবন্টনের উপর প্রথম থেকেই অস্বাভাবিক জোর প্রয়োগের কারণে ছাত্রদের মধ্যে উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদির পার্থক্য ও ভেদাভেদ থাকে না।

* অবৈতনিক সাধারণ ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কারণে প্রত্যেকটি লোকই শিক্ষিত হয়।

* শিক্ষায় সাম্যের কারণে জনগণের মধ্যে চিন্তার ঐক্যের সম্ভাবনা থাকে অধিক এবং চিন্তা ও কর্মে অনৈক্য ও বিপর্যয় সৃষ্টির বেশী আশংকা থাকে না।

* সব কিছু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে হওয়ার কারণে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থার মাঝে পূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় হয়ে থাকে। এতে শিশুদের শিক্ষালাভ খুব সহজসাধ্য হয়।

* শিক্ষার উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রন থাকায় রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা দেয়া হয়। এজন্যে শিক্ষিত বেকার সমস্যার কথাই উঠে না।

কিন্তু এ সব গুণের পাশা-পাশি এমন কিছু মৌলিক ত্রুটি পাওয়া যায় যা এ মতবাদের সমস্ত কল্যাণকর দিকগুলো মলিন করে দেয় এবং একে অগ্রহণযোগ্য বানিয়ে ছাড়ে। যেমনঃ

দোষ ত্রুটি সমূহঃ

* খোদাদ্রোহিতা, ধর্মের প্রতি বৈরিতা এবং নৈতিক মূল্যবোধগুলোর ধ্বংস সাধনের পাঠ নিয়ে যারা পাশ করে বের হয়েছে তারা মানবতার জন্যে হিংস্র জন্তুই হতে পারে। তাদের থেকে কোন কল্যাণ আশা করা যায় না। তারা কেবল অন্যদের পক্ষেই জালেম হয় না বরং নিজেদের উপর ও নিজেরা জুলুম করে। আর সুযোগ পেলে রাষ্ট্রকেও ছাড়ে না।

* জনগণের ব্যক্তি সত্তাকে দলিত-মথিত করে দমিয়ে রাখে।

* জবরদস্তি ও বাইরের চাপের কারণে ছাত্রদের নিজের ইচ্ছা-বাসনা, মতামত ও মনের সাথে অব্যাহতভাবে যুদ্ধ করে চলতে হয়। তারা মানসিক

www.nagorikpathagar.org

দ্বন্দ্ব–সংঘাতের শিকার হয়ে যায়। আর এটা স্পষ্ট যে, এমন ধরণের ছাত্ররা কখনো পরিপূর্ণ চরিত্র ও কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারে না।

* বস্তুপূজা ও স্বার্থবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্যের কারণে স্বার্থপরতা সার্বজনীন হয়ে পড়ে।

* প্রত্যেকটি জিনিস উপর থেকে চাপিয়ে দেয়ার ফল হয় এই যে, ছাত্র–শিক্ষক সবাই সব কাজকর্মকে নিরর্থক মনে করতে থাকে। সাধারণভাবে কামচুরি ও কর্তব্যে ফাঁকি দেয়ার অভ্যাস সৃষ্টি হয় এবং গোটা জাতি ডান্ডার জোরে চলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

* জনগণের ব্যক্তি সত্তার বিভিন্ন দিক উপেক্ষা করা হয়, ফলে সুসমন্বিতভাবে এসব দিক বিকশিত না হওয়ার কারণে অনেক অপরিপক্ক ও অপরিণত লোকই দায়িত্বশীল হয়ে পড়ে।

* উৎপাদন ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা দীক্ষার মাধ্যমে মানুষকে অর্থনৈতিক জীবজন্তুর স্তরে উন্নীত করা হয়। খাওয়া ও আয় করা ছাড়া জীবনে আর কোন কিছুর গুরত্বই অবশিষ্ট থাকতে দেয়া হয় না।

* রাষ্ট্রের কতিপয় শীর্ষস্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তি ছাড়া বাকী সমস্ত জনশক্তিকে মানসিক স্থবিরতা ও বন্ধ্যাত্বের শিকার বানিয়ে দেয়া হয়।

* জনগণকে দুনিয়ার শান্তি, আখেরাতের মুক্তি ও সাফল্য উভয়টি থেকেই বঞ্চিত করে দেয়া হয়।

গণতান্ত্রিক শিক্ষা দর্শনঃ

একনায়কতন্ত্র বা রাজতন্ত্রের বিপরীত গণতন্ত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের মালিক হলো দেশের সমস্ত জনগণ। তাদেরই মতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয় ও আইন রচিত হয়। রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠির ইজারাদারী হয় না। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সরকার পরিচালনা করেন। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সাধারণতঃ চার পাঁচ বছর অন্তর। অধিকাংশের রায়ের ভিত্তিতে যারাই নির্বাচিত হন নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তারাই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পান। সাধারণতঃ বয়স্ক ভোটাধিকারই নির্বাচনের মূল ভিত্তি হয়ে থাকে। সবাই ভোটদানের বা ভোট প্রার্থী হওয়ার অধিকার রাখে। প্রত্যেকের ভোটের

www.nagorikpathagar.org

মর্যাদা সমান গণ্য করা হয়। সংখ্যাধিক্যের মতামতের ভিত্তিতে সরকার পরিবর্তনও করা যেতে পারে। এভাবে গণতন্ত্র নিম্ন বর্ণিত বিষয়ে বিশ্বাস রাখে বলে দাবী করে।

১) ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসঃ

অর্থাৎ প্রত্যেক নাগরিকের জীবিত থাকার, চলাফেরা করার, দল গঠন করার, সভা সমিতি করার স্বাধীনতা আছে, লেখা, বক্তৃতা, বিশ্বাস, বিবেক, মত ও পথ ইত্যাদির স্বাধীনতা, শিক্ষা ও প্রচারের অধিকার আছে। তবে শর্ত হলো তাতে যেন দেশ ও জাতি অথবা অন্যান্য নাগরিকের কোন ক্ষতি না হয়। কিংবা অন্যের অধিকারে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করা না হয়।

২) সমতায় বিশ্বাসঃ

অর্থাৎ প্রত্যেক নাগরিক সমান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ, বিশ্বাস, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ও সম্পদের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য ও ভেদাভেদ করা যাবে না। প্রত্যেকেই উন্নতি করার সমান সুযোগ পাবে। যে কেউ আবশ্যকীয় গুণাগুণ ও যোগ্যতা অর্জন করলে যে কোন পদ মর্যাদায় আসীন হতে পারবে।

৩) সামাজিক সম্প্রীতি ও সহ অবস্থানে বিশ্বাসঃ

রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক মিলে মিশে থাকবে। একে অন্যের ব্যক্তিত্ব ও আলাদা সত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং দেশ ও জাতির স্বার্থে পরস্পর সহযোগিতা করবে।

৪) গতিশীলতায় বিশ্বাসঃ

গতিশীলতা প্রাকৃতিক বিষয়। এটাই জীবন ও উন্নতির লক্ষন। প্রতি মুহূর্তে যুগ পরিবর্তিত হতে থাকে। দেশের অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তায়ও পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তা নতুন নতুন পরিস্থিতি ও সমস্যা সৃষ্টি করে। এজন্যে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা, সংহতি, সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্যে তার বিধি ব্যবস্থা,

www.nagorikpathagar.org

নীতিমালা এবং কর্মসূচীতেও প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তন সাধন করা উচিত। তবে এই পরিবর্তন তখনই উপকারী ও ফলপ্রসূ হতে পারে যখন তা করতে জনগণের রায় ও মতামত নেয়া হয়। কোন কিছু উপর থেকে জবরদস্তি চাপানো না হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্যঃ

যেহেতু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে রাষ্ট্রের নাগরিকদের যোগ্যতার উপর, তাই গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের দৃষ্টিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য জনগণকে রাষ্ট্রের সুনাগরিকে পরিণত করা। কিন্তু জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রেও বস্তুগত উন্নতি, অর্থনৈতিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দকেই মৌলিক গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং তা হাসিলের জন্যে নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সদা সর্বদা একটা প্রতিযোগিতা লেগেই থাকে।

জনগণকে অব্যাহতভাবে দেশ পূজা এবং জাতীয় সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির নেশায় নেশাগ্রস্ত করে রাখা হয়।

এজন্যে এখানেও নৈতিক মূল্যবোধগুলো বাস্তবে আপেক্ষিক হয়ে যায় এবং এসব মূল্যবোধের স্বতন্ত্র কোন স্থায়ী বৈশিষ্ট অবশিষ্ট থাকে না। আর যেখানে রাষ্ট্রের স্বার্থে ও নৈতিক মূলনীতিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, সেখানে নৈতিক মূলনীতিগুলো পরিহার করা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধসমূহ বিসর্জন দেয়ার প্রত্যাশাই একজন সুনাগরিক থেকে করা হয়ে থাকে। অথচ একজন সৎ মানুষ থেকে কখনো এমনটা আশা করা যেতে পারে না। এজন্যে 'সূ' শব্দটি দ্বারা ভুল বোঝা উচিত নয়। কারণ সুনাগরিক ও সৎ মানুষের গুণাবলী অধিকাংশ ব্যাপারেই পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে।

গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্টসমূহঃ

এই দর্শনের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার যে কাঠামো দাঁড় করানো হয় তাতে নিম্নের বৈশিষ্টসমূহ পাওয়া যায়ঃ

www.nagorikpathagar.org

১) প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে। প্রতিটি নাগরিক যেন মৌলিক শিক্ষাদীক্ষা লাভ করতে পারে সে চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

২) সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়ে থাকে, অর্থাভাবে কোন নাগরিকই যেন মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না থাকে।

৩) জাতি, ধর্ম, বংশ, বর্ণ কিংবা কোন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী প্রভৃতির প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনাপন যোগ্যতা কাজে লাগানোর সমান সুযোগ পেয়ে থাকে। কারো সাথে কোন পার্থক্য ও বৈষম্য করা হয় না।

৪) ছাত্রদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট ও তাদের পারস্পরিক যোগ্যতার পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের প্রতি স্বতন্ত্র যত্ন নেয়া হয়, যেন প্রত্যেকেই নিজের যোগ্যতানুসারে সামনে অগ্রসর হতে পারে।

৫) ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের প্রতিই গুরুত্ব অরোপ করা হয়। কোন একটিকে অপরটির জন্যে বিসর্জন দেয়া হয় না। বরং যেখানে ব্যক্তিকে অধিক থেকে অধিকতর উন্নতির সুযোগ দেয়া হয় সেখানে তাকে সামাজিক দায় দায়িত্বসমূহ আঞ্জাম দানের জন্যেও সমানভাবে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

৬) ছাত্র শিক্ষক উভয়ের ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। শিক্ষকগণ এক নায়ক হওয়ার পরিবর্তে দরদী ও স্নেহবান দিশারী হিসেবে কাজ করেন। জবরদস্তি কিংবা বাইরের চাপ প্রয়োগে কোন কাজ করেন না। বরং স্বাধীন পরিবেশেই শিক্ষা দেন। শিক্ষকগণকেও শিক্ষা-পদ্ধতি এবং বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির ব্যাপারে বেশী থেকে বেশী স্বাধীনতা দেয়া হয়।

৭) বস্তুগত ও ব্যক্তি স্বার্থগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবে জীবনের উচ্চ মূল্যবোধগুলোকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয় না। অন্ততঃ জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্তরে জীবনের গুরুত্ব দেয়া হয়।

৮) ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করা হয় এবং একে ব্যক্তিগত উপাসনা, আরাধনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারাদিতে দখলদারিত্বকে সঠিক মনে করা হয় না। এজন্যে ধর্মীয় শিক্ষাকে ব্যক্তি ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামতের উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়া হয়। সরকার তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এর কোন ব্যবস্থা করে না।

www.nagorikpathagar.org

৯) রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধর্মীয়, ভাষাগত, কৃষ্টিগত ও শ্রেণীগত গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে অধিকতর অভিন্ন মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। আর তাদের পৃথক স্বাতন্ত্র্য বোধকে ক্রমশঃ সীমিত করে অবশেষে সবাইকে এক জাতি ও এক সংস্কৃতি পর্যন্ত নিয়ে আসার চিন্তা করা হয়।

১০) ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় আপন আপন সন্তান-সন্ততিকে নিজেদের ইচ্ছা মাফিক শিক্ষাদানের অধিকার স্বীকার করা হয়।

১১) শিক্ষা ব্যবস্থায় কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ হয় ন্যূনতম। স্থানীয় প্রশাসন ও প্রাদেশিক সরকারগুলোকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করা হয়। যেন, গণতন্ত্রের রূপ-বৈশিষ্ট বজায় থাকে, জনগণ অধিক থেকে অধিকহারে স্বাধীন পরিবেশ অনুভব করে এবং স্বাধীনভাবে সব কিছু যাচাই বাছাই করতে পারে।

১২) সমগ্র দেশবাশীকে ঐক্যবদ্ধ রাখার এবং তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টির জন্যে জাতিপূজা ও স্বাদেশিকতার চেতনাকে অধিক থেকে অধিকতর বিকশিত করা হয়।

সমালোচনা ঃ

জাতিপূজামূলক গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কতগুলো ভালো দিক ও আছে, যেমন--

* ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যে স্বাধীন পরিবেশ।

* সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা।

* সমানাধিকার এবং উন্নতি ও অগ্রগতি হাসিলের সমান সুযোগ-সুবিধা।

* যোগ্যতা ও শ্রমের ভিত্তিতে উন্নতি করার পূর্ণ অবকাশ।

* তাহজীব, তমদ্দুন এবং ধর্ম নৈতিকতার প্রতি কোন কোন স্তরে কিছুটা হলেও লক্ষ্য রাখা প্রভৃতি। তবে এতে অনেকগুলো মারাত্মক মৌলিক ত্রুটিও রয়েছে। যেমন-

* প্রথম থেকেই জাতি পূজা ও স্বাদেশিকতার নেশায় মাতোয়ারা করে

www.nagorikpathagar.org

নাগরিকদেরকে অন্ধগোঁড়ামী অনুদারতা ও সংকীর্ণতা এবং জাতীয় স্বার্থপরতার আবর্তে নিক্ষেপ করা হয়। দেশের সীমার বাইরে যেসব মানুষ বাস করে তাদের জন্যে এদের অন্তরে সাধারণতঃ কোন স্থানই থাকে না। বরং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতার মনোভাবই বাড়তে থাকে। সুতরাং এটা অতি স্পষ্ট যে, এরূপ লোকদের দ্বারা মানবতার স্বার্থে কোন কল্যাণের আশা খুব কমই করা যেতে পারে।

* ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করে অথবা অভিভাবকদের ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান সমূহের মতামতের উপর ছেড়ে দিয়ে বাস্তবে ধর্ম ও নৈতিকতার সাথে বিপুল সংখ্যক লোকের সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা হয়। কেননা লোকজন সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবে অত্যন্ত সীমিত এবং অপূর্ণাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ ব্যবস্থাই করতে পারে।

* জীবনের প্রতিটি বিভাগ, বিশেষতঃ সামাজিক কার্যক্রমগুলোতে নাগরিকদেরকে আল্লাহর হেদায়াত থেকে বিমুখ বানিয়ে দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণ ও সাফল্য থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়।

* নিজেদের ও অন্যদের জন্যে পৃথক পৃথক মাপকাঠি ঠিক করে দিয়ে নৈতিক মূল্যবোধগুলোকে আপেক্ষিক বানিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। সুতরাং জনগণের মধ্যে মৌলিক নীতিমালা মেনে চলার মন মানসিকতা অবশিষ্ট থাকে না। অবশেষে আস্তে আস্তে তারা নিজেদের সাথেও আত্মপ্রবঞ্চনা ও বেঈমানী করা শুরু করে।

* সত্য, ন্যায় ও ইনসাফ এবং জীবনের স্থায়ী মূলনীতিগুলোর পরিবর্তে সংখ্যাধিক্যের মতামতকে সিদ্ধান্তের ভিত্তি নির্ধারন করার কারণে সংখ্যালঘুদের সাথে সাধারণতঃ খুব কমই ইনসাফ করা হয়ে থাকে।

অতএব জাতি পূজামূলক গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষাদানের ফলে সাধারণতঃ কেবল 'নীতি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী' –ই জন্ম নিতে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী শিক্ষা দর্শনঃ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আল্লাহ্‌র নিকট সমগ্র মানবতার জন্যে একমাত্র প্রমানসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য জীবন বিধান এটাই। কেবল এটিকে গ্রহণ করেই মানবজাতি দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি লাভ করতে পারে।

ইসলামী ব্যবস্থার বুনিয়াদঃ

১) তাওহীদ–সমগ্র সৃষ্টি লোকের স্রষ্টা, রিযিকদাতা, মালিক, বাদশাহ্, শাসনকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকর্তা হলেন আল্লাহ্–তায়ালা। সমস্ত মানুষ তাঁর বান্দাহ্ ও দাস। কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁর জন্যেই নির্দিষ্ট। প্রত্যেককে তাঁরই নির্দেশাধীন হয়ে থাকতে হয় এবং তাঁরই সামনে মাথা নত করা উচিত।

২) রিসালাত–আল্লাহ্ তায়ালা মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে তাঁর নবী–রাসূল পাঠিয়েছেন। রাসূলগণ আল্লাহ্‌র বিধানাবলী সাথে নিয়ে এসেছেন। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র সর্বশেষ রাসূল। তাঁর ওপর রিসালাত ও নবুয়তের সমাপ্তি ঘটেছে। তিনি আল্লাহ্‌র বিধান পবিত্র কুরআন নিয়ে এসেছেন এবং আল্লাহ্‌র মর্জি মুতাবিক কাজ করে বিশ্ববাসীকে পথ দেখিয়ে গেছেন। আল্লাহ্‌র কিতাব (আল কুরআন) এবং রাসুল (সঃ)–এর সুন্নাহ্ এর অনুসরণের মধ্যেই গোটা মানব জাতির মুক্তি নিহিত।

৩) আখিরাত–প্রতিটি মানুষকে মৃত্যুর পর একদিন আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হতে হবে এবং নিজের সমস্ত কাজের হিসেব দিতে হবে। কেউই তাঁর পাকড়াও থেকে রেহাই পাবে না। প্রত্যেককেই নিজের কৃতকর্মের ভালমন্দ ফলাফল ভোগ করতে হবে।

৪) খিলাফত–আমাদের এই পৃথিবী আল্লাহ্‌র অসীম সাম্রাজ্যের একটা ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র নায়েব, খলীফা বা প্রতিনিধি। তাদের জন্যে বিশুদ্ধ পথ হলো আল্লাহ্‌র জমীনে আল্লাহ্‌র মর্জি মুতাবিক জীবন

www.nagorikpathagar.org

যাপন করা। আল্লাহর ভয়, তাকওয়া পরহেজগারী, প্রশাসনিক যোগ্যতা এবং জনগণের আস্থা, নেতৃত্বের এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অপরিহার্য গুণাবলী। ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। অন্যায়ের প্রতিরোধ, ন্যায়ের প্রচার ও প্রসার এবং জনগণকে আল্লাহর মর্জি মুতাবিক পরিচালনা করা দায়িত্বশীলগণের অবশ্য কর্তব্য।

৫) বনি আদমের এক জাতিত্ব, সমতাবোধ ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বঃ সমস্ত মানুষ একই মাতা পিতার সন্তান। এজন্যে তারা পরস্পর সমান ও ভাই ভাই। বর্ণ ও রক্তের পার্থক্য ও ভেদাভেদ, জাত পাত, স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা এসবই ভ্রান্ত ও মনগড়া কথা। অনারবের উপর আরবের, কৃষ্ণাংগের উপর শ্বেতাংগের, গরীবের উপর ধনীর, অস্পৃশ্যের উপর ব্রাহ্মণের কোন মর্যাদা নেই। সবার চেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী ও আল্লাহ ভীরু।

৬) স্বাধীনতাঃ বড় ছোট, ধনী দরিদ্র, নারী পুরুষ, মালিক ভৃত্য সবাই আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর বিধানের অধীন। নিরংকুশ স্বাধীন কেউই নয়। অবশ্য মানুষে মানুষে সম্পর্কের ব্যাপারে সবাই স্বাধীন। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকেই তার মায়ের গর্ভ থেকে স্বাধীনই সৃষ্টি করেছেন। অপরের স্বাধীনতা হরণ করা কিংবা আল্লাহর বান্দাদের নিজের গোলাম ও দাসে পরিণত করা এবং তাদেরকে নিজের মর্জিমত পরিচালিত করার কোন অধিকারই কোন মানুষের নেই।

৭) আকিদা-বিশ্বাস, ধর্মীয় পথ, বিবেক ও মতামতের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। যে কোন আকিদা-বিশ্বাস, ধর্মীয় পথ অথবা মতামতের উপর যার আস্থা হয় সে তা গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য যদিও সকল মানুষের জন্যেই ইসলাম গ্রহণ করে উভয় জাহানের কল্যাণ ও সফলতা অর্জন করা হলো সঠিক ও নির্ভুল কর্মপন্থা।

৮) সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহর পরিজন। সকলেরই মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া অপরিহার্য। প্রত্যেক অভুক্ত খাদ্য, বস্ত্রহীন বস্ত্র এবং রুগী চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারী। তার এই অধিকার যে কোন অবস্থায় হোক, তার পাওয়া উচিত।

৯) প্রত্যেক ব্যক্তির জানমাল, ইজ্জত-আব্রু সম্মানিত। এতে হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

১০) সৎকাজে সহযোগিতা করতে হবে। অসৎ কাজে কাউকে সহযোগিতা করা যাবে না।

১১) জীবন যাপনের সত্য সরল পথ সম্পর্কে যিনি অবহিত আছেন তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে যিনি অবহিত নন, তাঁকে জানাবেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্যঃ

উপরোক্ত মৌলিক ধারণা সমূহ্ থেকে স্বতঃই প্রকাশ পাচ্ছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষাদীক্ষার উদ্দেশ্য "মানুষকে আল্লাহর নেক বান্দারূপে গড়ে তোলা"

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্টসমূহঃ

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্টসমূহ এই –

১) দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা প্রত্যেক মুসলিম নারী পুরুষের জন্যে বাধ্যতামূলক, কেননা (طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ (ابن ماجه)) ইলম হাসিল করা প্রত্যেক মুসলিম নর–নারীর উপর ফরজ—(ইবনে মাজা)।এই ফরজ আদায়ের জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই পথ সুগম করে দেয়া হয়। শিক্ষার্থী নিজেও সেজন্যে চিন্তা–ভাবনা করে। আর শিক্ষক, অভিভাবক, মুসলিম সমাজও ইসলামী ব্যবস্থা সবই এই কল্যাণকর কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করে থাকে।

২) শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের এবং শিক্ষাকে সার্বজনীন করার পুরোপুরি চেষ্টা করা হয়ে থাকে, যেন কেউই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে না যায়।

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَ عَلِّمُوْهُ النَّاسَ. (بيهقى)

ইলম শিক্ষা কর এবং মানুষদেরকে শিক্ষা দাও।

৩) উপকারী ও কল্যাণকর জ্ঞান–বিজ্ঞান শিক্ষা করা ও শিক্ষা দান সওয়াবের কাজ বলে গণ্য এবং পূর্ণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও একাগ্রতা সহকারে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

اَلْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْاَجْرِ. (ابن ماجه)

ওস্তাদ ও ছাত্র উভয়ই প্রতিদানের অংশীদার। –ইবনে মাজা

مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ. (مسلم)

যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজের পথ দেখায় সে ভালো কাজকারীর সমান সওয়াব পথ প্রদর্শণকারী ও পায় –মুসলিম

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ. (مسلم)

যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে কোন পথ চলে আল্লাহ্ তার বেহেশতের পথ সুগম করে দেন –মুসলিম

مُعَلِّمُ الْخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهٗ كُلُّ شَيْئٍ. (ترمذى)

কল্যাণ শিক্ষাদানকারীর জন্যে সব কিছুই আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করে। –তিরমিযী

مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ. (ترمذى)

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণে ঘর থেকে বের হয় সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই (জিহাদেই) থাকে

–(তিরমিযী)

اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ (ابو داؤد)

ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্যে তাদের সামনে ফিরিশতারা নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয়।

–আবু দাউদ

৪) অপকারী ও ক্ষতিকর শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বিরত রাখা হয়।

تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ. (ابن ماجه)

যে শিক্ষায় কোন উপকার হয়না সে শিক্ষা থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা কর। –ইবনে মাজা

www.nagorikpathagar.org

৫) প্রয়োজন পরিমাণ শিক্ষা অবৈতনিক দেয়া হয়। অসমর্থ ও নিঃস্ব ছাত্রদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরনের দায়িত্ব বহনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তি এখাতে সাহায্য করাকে নেক কাজ এবং যাকাত ও সাদাকাতকে সর্বোত্তম ব্যয়ের খাত মনে করে।

৬) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ইলম অনুযায়ী কাজ করার এবং অন্যদের নিকট ইলম পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয় ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمٌ فِى الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ. (دارمی)

ইলম দু' প্রকারঃ প্রথমতঃ যে ইলম মানুষের (মুখ অতিক্রম করে) অন্তরে স্থান করে নেয়, এটাই উপকারী ইলম। দ্বিতীয়, যে ইলম মুখেই থাকে –তা আল্লাহর আদালতে বনি আদমের বিরুদ্ধে দলীল হবে। –(দারেমী)

بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً. (بخاری)

আমার শিক্ষার একটি কথা হলেও মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দাও–বুখারী

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ. (ترمذی –ابوداؤد)

যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে জানে, সে বিষয়ে তার নিকট কেউ কোন কথা জানতে চাইলে যদি সে তা গোপন রাখে তাহলে কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের ল্যাগাম ল্যাগানো হবে। –(তিরমিযী, আবু দাউদ)

لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهُمْ وَلَيَعِظَنَّهُمْ وَلَيَأْمُرَنَّهُمْ وَلَيَنْهَوْنَّهُمْ وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَ يَتَّعِظُوْنَ وَ يَتَفَقَّهُوْنَ اَوْ لَاُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا. (طبرانی)

মানুষ অবশ্য, অবশ্যই যেন তাদের প্রতিবেশীদের শিক্ষাদান করে, তাদের উপদেশ দেয় তাদের সৎকাজের আদেশ করে, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। ঠিক অনুরূপভাবে অবশ্য অবশ্যই সবাইকে তাদের প্রতিবেশীদের থেকে ইলম অর্জন করতে হবে, উপদেশাবলী গ্রহণ করতে হবে এবং নিজেদের মধ্যে বুঝ–সমঝ সৃষ্টি করতে হবে। অন্যথায় আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই অতি সত্তর শাস্তি দেব।–(তিবরানী)

৭) ছাত্র শিক্ষক উভয়েরই ব্যক্তি সত্তার সম্মান এবং উভয়ের মান–মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। শিক্ষক মন্ডলী হয়ে থাকেন স্নেহময়, দয়ালু, অভিভাবক ও আধ্যাত্মিক পিতা এবং শিক্ষার্থীরা হয়ে থাকে দায়িত্ব কর্তব্যবোধ সম্পন্ন ও

www.nagorikpathagar.org

অনুগত সন্তানের মত।

عَلِّمُوْا وَلاتُعَنِّفُوْا فَاِنَّ الْمُعَلِّمَ خَيْرٌ مِنَ الْمُعَنِّفِ (بيهقى)

ইলম শিক্ষা দাও, কঠোরতা করোনা, কেননা শিক্ষক কঠোরতাকারীর চাইতে উত্তম। –বায়হাকী

যার কাছে ইলম শেখ তার সম্মান কর।–হাদীস

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তো বেয়াদবী হওয়ার ভয়ে তাঁর শিক্ষকের বাড়ীর দিকে পা দিয়ে শুইতেন না।

৮) পবিত্র পরিবেশে শিক্ষা দেয়া হয়। পরিবার, মহল্লা, পরিবেশ, রাষ্ট্র ও বিদ্যালয় প্রতিটি পরিবেশকে পবিত্র রাখতে এবং নিজের সাহায্য–সহযোগিতা পেশ করতে প্রস্তুত থাকে। প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের বিশেষতঃ শিক্ষকগণের সুন্দর আচরণ ও ব্যবহার, হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, অন্তরঙ্গতা ও উত্তম আদর্শ, শিক্ষার্থীদের উপযোগী প্রশিক্ষণ এবং আদর্শিক ও দৃষ্টান্তমুলক নিয়ম শৃংখলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

৯) ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক দায়িত্বের সঠিক জ্ঞান দান করা হয়ে থাকে। আর এসব দায়িত্ব যেন আস্তে আস্তে আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) বিধান মুতাবিক আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়, ক্রমাগত তার বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১০) অমুসলিমদেরকে তাদের বিশ্বাস ও ধর্ম এবং ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ প্রদান করা হয় তাদের ধর্ম বিশ্বাস বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু জোর জবরদস্তিভাবে পড়ানো হয় না।

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ. (٣ : ٢٥٦)

দ্বীন–ধর্মের ব্যাপার কোন জোর জবরদস্তি নেই–(৩ঃ২৫৬)

১১) ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধগুলোর প্রতি স্বতন্ত্র মর্যাদা ও সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সর্বাবস্থায় এ সবের চাহিদা পূরণ করা হয়। কোন অবস্থাতেই এসব মূল্যবোধের অমর্যাদা করা হয় না।

بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ . (موطأ امام مالك)

"চারিত্রিক গুণাবলীকে সমুন্নত করা এবং পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্যেই আমি

www.nagorikpathagar.org

প্রেরিত হয়েছি।-(মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

قُلْ رَبِّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ. (حديث)

বল, আল্লাহ্ আমার রব আমি তাঁর উপর ঈমান এনেছি। অতঃপর তার উপর দৃঢ় থাক। –হাদীস।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ তোমাদের কাছে দ্বীনি ইলম শিখতে ও সমঝ–জ্ঞান লাভ করতে আসবে। যখন আসবে তোমরা তাদেরকে ভালো ভালো উপদেশ দেবে। –হাদীস

১২) শিক্ষার্থীর বয়স, প্রয়োজনীয়তা, মন–মেজাজ, ব্যক্তিগত বৈশিষ্টসমূহ এবং প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে শিক্ষা দেয়া হয়। শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে অশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। বিভিন্ন রূপ কষ্টে ও বিপদে ফেলে তাদের মন খারাপ ও হতাশ করে দেয়া হয় না। শিক্ষাকে ও তাদের বোঝা বানিয়ে দেয়া হয়না। একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে–

كَلِّمُوا النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ

মানুষের সাথে তাদের বুদ্ধি অনুপাতে কথা বল।

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَاتُنَفِّرُوْا. (حديث)

সহজ করে দাও, কঠিন করে তুলো না , সুখবর শোনাও, বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করোনা।– হাদীস

انِّىْ اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

(عبد اللّٰه بن مسعود (رض) بخارى مسلم)

আমি কয়েকদিন বিরতি দিয়ে তোমাদেরকে ওয়াজ নসীহত করে থাকি, যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরতি দিয়ে আমাদেরকে ওয়াজ নসিহত করতেন। আর আমাদের বিরক্ত হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি এরূপ করতেন।

–আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) –(বুখারী, মুসলিম)

নিরাশ হওয়া ইসলামে কুফরী। সংশোধন ও প্রশিক্ষণের দিক থেকে ছাত্র শিক্ষক, অভিভাবক কিংবা অন্যান্য দায়িত্বশীলের কেউই নিরাশ হয় না। বরং প্রত্যেকেই নিরাশ হওয়া থেকে বাঁচেন এবং ছাত্রদেরকেও বাঁচান।

www.nagorikpathagar.org

وَلَا تَيْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهُ لَاتَيْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ. (قُرآن) ١٢ – ٨٧

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। তাঁর রহমত থেকে তো একমাত্র কাফেররাই নিরাশ হয়ে থাকে। –(কুরআন –১২ঃ ৮৭)

اِنَّ لِلْقُلُوْبِ شَهَوَاتٍ وَ اقْبَالاً وَ اِدْبَارًا فَأْتُوْهَا مِنْ لَبْلِ شَهْوَاتِهَا وَاِقْبَالِهَا فَاِنَّ الْقَلْبَ اِذَا اُكْرِهَ عَمِىَ (عَلِى رض كتاب الخراج لابى يوسف)

মানুষের মনের কিছু কামনা–বাসনা ও ঝোঁক প্রবণতা থাকে। কোন কোন সময় তা কথা শুনতে প্রস্তুত থাকে আর কোন কোন সময় প্রস্তুত থাকে না। তোমরা মানুষের মনের সেসব আগ্রহ ও ঝোঁক প্রবণতার ভেতর দিয়ে প্রবেশ কর এবং তখনি তোমার কথা বল, যখন সে তা শোনার জন্যে প্রস্তুত থাকে। কেননা মনের অবস্থা হলো যখন তার উপর জোর করা হয় তখন সে অন্ধ হয়ে যায় (এবং সে কথা শুনতে অস্বীকার করে বসে)।

–হযরত আলী

১৩) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের সব দিকগুলোর সুসমন্বয়ের সাথে বিকশিত করে তোলার চিন্তা করা হয়ে থাকে। স্বভাবজাত যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের চেষ্টা করা হয় এবং এসবকে বাস্তবে প্রয়োগের অনুকূল সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। কেননা শিশুদেরকে আল্লাহর আমানত, তাদের দেহ ও দৈহিক শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতা–প্রবণতা সমূহকে আল্লাহর বিরাট দান এবং মানুষের জন্যে একান্ত জরুরী ও উপকারী মনে করা হয়। তাই এসবকে দমিয়েও রাখা হয়না এবং উপেক্ষাও করা হয় না, বরং সঠিক খাতে বিকাশের ব্যবস্থা করা হয়।

১৪) শিক্ষার্থীদের সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা, কষ্ট সহিষ্ণু ও কঠোর পরিশ্রমী হওয়া, নিজের কাজ নিজে করা এবং আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করায় অভ্যস্ত করে তোলা হয়, যেন তারা নিজ হাতে কাজ করতে লজ্জাবোধ না করে। আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে সব কাজ করতেন। খোলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্যান্য বুজর্গ ও মনীষীবর্গের আদর্শও এটাই ছিল।

১৫) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আল্লাহর সৃষ্টির উপকার সাধনই হলো ইলম হাসিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আজকের মত বড় বড় ডিগ্রীর ভীতি সঞ্চার,

www.nagorikpathagar.org

গৌরব-অহংকার, প্রভাব প্রতিপত্তি, উচ্চ মর্যাদা, ধন-দৌলত এবং জ্ঞানগত পান্ডিত্যের দম্ভ গৌরব কিংবা বৈষয়িক স্বার্থ হাসিল নয়।

مَـنْ تَعَلَّمَ عِـلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ لاَ يَتَعَلَّمُـهُ الاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا (ابو داؤد - ابن ماجه احمد)

"যে ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া হয়, যে ব্যক্তি দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সে ইলম শিখে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবেনা। -আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমদ

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَا (ترمذى وابن ماجه)

যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে বিতর্ক বাহাস করা অথবা নির্বোধ লোকদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার জন্যে কিংবা জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্যে ইলম হাসিল করলো, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে ঢোকাবেন। (তিরমিজি, ইবনে মাজাহ)

عَنْ عمربن الخطاب (رض) قال لِكَعْبٍ مَنْ اَرْبَابُ الْعِلْمِ. قَالَ الَّذِىْ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ قَالَ فَمَا اَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوْبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ. (دارمى)

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত কায়াব (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, আলেম বলতে কাদের বুঝায়? তিনি জবাবে বললেন, যারা নিজেদের ইলম অনুসারে আমল করে। হযরত উমর (রাঃ) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন আলেমগণের অন্তর থেকে কোন্ জিনিস ইলমকে বের করে দেয়? তিনি জবাব দিলেন, লোভ লালসা।

-দারেমী

১৬) বড় ছোট, শিক্ষিত অশিক্ষিত, নির্বিশেষে সবাইকে ইলমের অনুরাগী বানিয়ে দেয়া হয়। পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, গবেষণাগার স্থাপন এবং বিভিন্ন আলোচনা সভা অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্ভাব্য সব উপায়ে জ্ঞানার্জনের দ্বার এমনভাবে উম্মোচন করে দেয়া হয় যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম হাসিল করার সুযোগ পায়।

www.nagorikpathagar.org

. لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ. (ترمذى)

মুমিনের পেট ভাল কথা (ইলম) দ্বারা ভরে না। সে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তা শুনতে থাকে।

–তিরমিযী

এগুলো হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট। এথেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কেবল ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাই যাবতীয় গুণাবলী সমন্বিত এমন এক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে মানব সত্তার প্রতিটি দিক ও বিভাগ, তার সমস্ত স্বভাবজাত শক্তি, যোগ্যতা ও প্রতিভা এবং তার প্রয়োজনের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। একমাত্র এটাই এমন শিক্ষা ব্যবস্থা যা প্রত্যেক দিক দিয়েই, পূর্ণাঙ্গ, কল্যাণকর এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে সংগত ও যুক্তিযুক্ত। আর যত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তার সবগুলোই মানব রচিত, একদেশদর্শী, অসম্পূর্ণ, ত্রুটিযুক্ত এবং সামগ্রিক দৃষ্টিতে মানবতার জন্যে ক্ষতিকর। একমাত্র ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাই এমন এক ব্যবস্থা যাতে মানবতার যাবতীয় শিক্ষা সমস্যার সমাধান এবং আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করা সম্ভব। নতুবা মানবতার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ ও মর্মান্তিক হবে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাসমূহ নবাগত বংশধরদের মধ্যে কত দ্রুত বিকৃতি ও ভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলছে তা সবারই জানা আছে। আল্লাহ তায়ালা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করার তাওফীক দিন এবং সেই ভয়াবহ পরিনতি থেকে রক্ষা করুণ, যা চিন্তা করলে গা শিউরে উঠে।

www.nagorikpathagar.org

সর্বোত্তম আদর্শের আলোকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ ايْتِنَا وَ يُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

যেমনিভাবে আমি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্যে থেকেই রাসূল প্রেরণ করছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করছেন, তোমাদের পবিত্র করছেন আর তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন কুরআন ও হিকমাহ্ আর তাও, যা তোমরা জানতে না। (২ঃ১৫১)

بُعِثْتُ مُعَلِّمًا আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। (মিশকাত)

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ. (موطاامام مالك)

আমাকে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও পূর্ণতা বিধানের নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়েছে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الاَنْبِيَاءِ وَ اِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَ اِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. (ابو داؤد، ترمذى)

নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিস–উত্তরাধিকারী, আর নবীদের মীরাস অর্থ–সম্পদ নয়, বরং তাঁদের মিরাস হলো "ইলম"। তাঁরা একমাত্র ইলমকেই মীরাস হিসেবে রেখে গেছেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীস সমূহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান নবীর দায়িত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জীবনের অন্যান্য বিষয়সমূহের ন্যায় এক্ষেত্রেও তাঁরই সর্বোত্তম আদর্শ আমাদের সকলের জন্য যুক্তি সংগত, প্রামান্য ও অনুকরণীয় আদর্শ। এখন পর্যালোচনা করে দেখা উচিত, এ ব্যাপারে আমরা কি দিকদর্শণ পেতে পারি যাতে মহানবী (সঃ) এর অনুকরণ ও আনুগত্যের ভিত্তিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কাজকে ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর রূপে গড়ে তোলা যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলীঃ

ছাত্রদের শিক্ষা দীক্ষায় শিক্ষকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলীর ভূমিকা সবচেয়ে গরুত্বপূর্ণ। ছাত্ররা সচেতন বা অবচেতনে সর্বদাই তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। আর এই প্রভাব এত গভীর হয় যে, আজীবন তা সুস্পষ্টরূপে অনুভূত ও পরিলক্ষিত হয়।

* মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বের নিম্নোক্ত দিকগুলোর প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত–যেন প্রত্যেক শিক্ষক এগুলোর আলোকে নিজের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলতে পারেন এবং তাঁদের অনুকরণ যোগ্য জীবনাদর্শ ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হন।

* তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, প্রিয় ও প্রভাবশীল। যে দেখতো, নির্দ্বিধায় আকৃষ্ট হতো, জান দিতো তাঁর ইংগিতে, নিজের সব কিছু কুরবান করে দিতে চেষ্টা করতো। একজন শিক্ষকেরও এসব গুণাবলীর অধিকারী হওয়া উচিত যেন ছাত্ররা তাঁর থেকে দূরে সরে না গিয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে, আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শোনে এবং শিক্ষকের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। এসব গুণাবলী অর্জন ছাড়া একজন শিক্ষক কখনো তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে পারে না।

* জীবনে ছোট বড় প্রতিটি ব্যাপারে রাসূল (সঃ) এর জীবনাদর্শ অনুসরণীয় ছিল, তাঁর পুরো জীবনটাই ছিল একটা উম্মুক্ত কিতাব। ভিতর বাহির ছিল একরকম, যেসব কথা শিক্ষা দিতেন, তা আগে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতেন, মুখে যা কিছু বলতেন, কাজে তা প্রমাণ করে দেখাতেন।

ছাত্ররা তাদের শিক্ষকদের কথার চেয়ে তাঁদের আদর্শের অনুকরণ করে বেশী। এজন্যে তাঁদের নিজ নিজ চরিত্রের সমস্ত দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা গোটা শিক্ষক সমাজের উচিত, যেন ছাত্ররা তাঁদের মধ্যে অনুকরণীয় আদর্শ পায়। নতুবা নিজেদের ক্রটি ও দুর্বলতার পরিণতি তো ভোগ করতেই হবে, অধিকন্ত আদর্শহীনতার যে কুপ্রভাব ছাত্রদের উপর পড়বে তার পরিনতি–ও শিক্ষকদেরকেই বহণ করতে হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন জ্ঞান–বিজ্ঞানের আধার। শিক্ষক সমাজের ও জ্ঞান–বিজ্ঞানের প্রতিভু হওয়া উচিত। কেননা সঠিক ও পরিপক্ক জ্ঞান ছাড়া ছাত্রদেরকে যথযথভাবে সুশিক্ষা দেয়া সম্ভব নয় এবং হিকমত ও শিক্ষা কৌশল ব্যতীত তাদেরকে

www.nagorikpathagar.org

প্রশিক্ষণ ও সদাচার শিক্ষা দেয়া অসম্ভব। মানবীয় গুণাবলীর প্রশিক্ষণ অসাধারণ হিকমত ও বিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। শিক্ষক সমাজের উচিত নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা ও তাতে পরিপক্কতা আনা এবং নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টির জন্যে অবিরাম চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাওয়া। শিক্ষার ব্যাপারে ছাত্ররা শিক্ষকদেরকেই উপযুক্ত সনদ মনে করে। সুতরাং নিজেদের জ্ঞানের উপরই যদি স্বয়ং শিক্ষকদের আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে তাহলে ছাত্রদের বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে যাবে। কোন বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ও স্পষ্ট ধারণা না থাকলে সে বিষয়ে ছাত্রদের ভুল শেখানোর চেয়ে হাসি মুখে অকপটে নিজের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করা উচিত এবং পরে জেনে এসে বাতলে দেয়া কর্তব্য। এতে ছাত্রদের আস্থা অটুট থাকবে এবং শিক্ষক-ও ভুল শিক্ষাদানের কুপরিণতি ও বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন। ভুল শিক্ষাদনের বিপদ ও শাস্তি সম্পর্কে নীচের হাদিসটিতে ইংগিত করা হয়েছেঃ

"কেউ যদি না জেনে কোন মাস্‌আলা বর্ণনা করে তাহলে এর শাস্তি বর্ণনাকারীকেই ভোগ করতে হবে।"

মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও অনেক প্রশ্নের জবাবে 'না জানার' কথা অকপটে প্রকাশ করেছেন এবং অহী আসার পরে তা প্রশ্নকারীকে বলে দিয়েছেন।

মাফ ও ক্ষমা প্রদর্শন এবং সংযম ও সহনশীলতার ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই নিজের উদাহরণ ছিলেন। একজন শিক্ষককেও অজ্ঞ ছেলে-মেয়ের সম্মুখীন হতে হয়। তাদের পক্ষ থেকে সব সময় ভুল-ত্রুটি ও স্বভাব বিরোধী আচার-আচরন প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্যে যে শিক্ষকের মধ্যে এসব গুনাবলীর সমাবেশ ঘটে, সে শিক্ষকের পক্ষেই শিক্ষকতায় সফল হওয়া সম্ভব। খিটখিটে মেজাজী ও রগচটা লোক কখনো ভালো শিক্ষক হতে পারেনা।

* মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারিত্রিক মাধুর্য ও মেলামেশা এত অনুপম ছিল যে, তিনি আপন পর, শত্রু মিত্র এমনকি যাদের তিনি পছন্দ করতেন না, তাদের সাথেও অত্যন্ত নম্র ব্যবহার করতেন, হাসিমুখে কথা বলতেন ও শিষ্ট আচরণ করতেন। অন্যদের মনোরঞ্জনের প্রতি তিনি অত্যন্ত বেশী খেয়াল রাখতেন, মনে যত কষ্টই থাক হাসি মুখেই মিশতেন। স্মিত হাসি, শান্ত মেজাজ ও শিষ্ট স্বভাবের তিনি ছিলেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একজন শিক্ষকেরও

www.nagorikpathagar.org

এরূপ চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী, মিশুক ও শিষ্ট হওয়া উচিত। তাঁকেও ছাত্র, অভিভাবক, জনসাধারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষীয় বিরোধী সব রকম লোকের সম্মুখীন হতে হয় এবং সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। এসব গুনাবলী অর্জন ছাড়া নিজের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

* রাসূল (সাঃ) পোশাক–পরিচ্ছদে অনাড়ম্বরতা, সারল্য, বিনয় ও অকৃত্রিমতার সাথে সাথে পাক–পবিত্রতা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। সুতরাং একজন শিক্ষকেরও অপরের পোশাকের অনুকরণ ও ফ্যাশন পরিহার করা উচিত। সরলতা ও পরিচ্ছন্নতার মাঝেই ইসলামের শান ও মাধুর্য নিহিত।

* মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বে ছিল অসাধারণ শৃংখলা, নিয়মতান্ত্রিকতা এবং কথায় ছিল সবিশেষ সামঞ্জস্য ও সমতা। যে কেউ তাঁর সাথে মিশলেই বুজতে পারতেন, তিনি কি পছন্দ করেন, আর কি পছন্দ করেন না। আমাদের কোন্ কথার প্রতিক্রিয়া তাঁর উপর কি হবে? একজন শিক্ষকের মধ্যেও এসব গুণাবলী বর্তমান থাকা অপরিহার্য। তবেই ছাত্ররা তার আবেগ প্রবনতার প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শনের সক্ষম হবে। অন্যথায় সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ছাত্ররা মারাত্মক সংঘাত ও দ্বিধা–দ্বন্দের শিকার হয়ে যায়। তারা জানতেই পারেনা যে, তাদের শিক্ষক কোন কথায় খুশী হন, আর কোন কথায় হন বেজার।

* মহানবী সাল্লাল্লাহ আলইহি ওয়া সাল্লামের এই সাদাসিদা ও অনাবিল শিক্ষার জবাব সেই অজ্ঞ মুর্খেরা ইট–পাথর দ্বারা দিয়েছিল। তবুও তিনি শেষ পর্যন্ত ওদের সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হননি, বরং আশান্বিত ছিলেন। অবশেষে সাফল্য তাঁর পদচুম্বন করলো। শিক্ষকদেরও শিক্ষা দীক্ষা ও সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হওয়া কিছুতেই উচিত নয় এবং ছাত্র বা অভিভাবকদেরও নিরাশ হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত নয়। আমরা বয়স্করা নিজেদের সংশোধনের ব্যাপারে এখনো পুরো আশাবাদী। শিশুদের সংশোধনের জন্যে তো পুরো বয়সটা এখনো অবশিষ্ট রয়ে গেছে। অজ্ঞতার কারণে তাদের থেকে তো ত্রুটি–বিচ্যুতির অবকাশ অনেক বেশী থাকাই সম্ভব।

* আত্মত্যাগ ও নিজের চেয়ে অন্যকে প্রাধান্য দেয়া, অল্পে তুষ্টি ও তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। একজন শিক্ষককেও সাধারণভাবে সর্বকালে এবং বিশেষতঃ বর্তমান যুগে

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হওয়া উচিত। শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ন্যায় এমন কল্যাণকর ও নেক কাজে বরকত লাভ করা কেবল এসব গুণাবলী দ্বারাই সম্ভব। যার নিকট কেবল দুনিয়াটাই সর্বাধিক প্রিয়, এ অংগনে তার পদচারনা না করাই উচিত।

* মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দায়িত্ববোধ, একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা এতটা ছিল যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেনঃ (لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ)-' সম্ভবত আপনি নিজেকে যেন ওদের পেছনে ধ্বংস করে দেবেন।' শিক্ষা-দীক্ষাও চরম সংযমশীলতার কাজ। একজন শিক্ষক কখনো উপরোক্ত গুণাবলী অর্জন ছাড়া সুচারুরূপে নিজের দায়িত্ব আন্জাম দিতে সক্ষম হবেনা।

* পরিস্থিতি যতই জটিল আকার ধারণ করুক না কেন নবী (সঃ) সব ব্যাপারেই অত্যন্ত দুরদর্শিতার সাথে ও সহজভাবে সমাধান করতেন। তাঁর কয়েকটি বাক্যই ছিল আগুনে পানি ঢেলে দেয়ার মত এবং তাতে উভয় পক্ষই শান্ত হয়ে যেত। একজন শিক্ষকও প্রতিদিন ক্লাসে এবং বাইরেও নানা রূপ জটিলতার সম্মুখীন হন। যদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার যোগ্যতা না থাকে, তবে তাঁকে অনেক দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হবে।

* শিশুদের সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছিল অসাধারণ হৃদ্যতা ও মমত্ববোধ এবং স্বভাবগত মিল। তাদের শিশুসুলভ আচার-আচরণের প্রতি তাঁর ছিল উদার মনোভাব। তিনি কখনো কোন শিশুকে প্রহার করেননি। কোথাও তাদের প্রহারের কথা বললেও তা বলেছিলেন শেষ উপায় হিসাবে। এজন্য শিক্ষকেরও উচিত নিজের মধ্যে এসব গুণাবলী বিকশিত করে তোলা। যদি শিশুদের সাথে কারো হৃদ্যতা, মমত্ববোধ ও আন্তরিকতা না থাকে, তবে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করা তার উচিত হবেনা।

শিক্ষকের কণ্ঠস্বর

পাঠদানে প্রভাবশীল, আকর্ষনীয় ও সফল হওয়া অনেকাংশে শিক্ষকের কণ্ঠস্বরের উপর নির্ভর করে। কণ্ঠস্বর যদি মনোযোগ আকর্ষণকারী, সুললিত ও মধুর হয়, তাহলে ছাত্ররা অতি সহজে মনোযাগী হয় এবং পাঠে দীর্ঘক্ষন পর্যন্ত কোনরূপ বিরক্তি বা অস্থিরতা অনুভব করেনা। কণ্ঠস্বর যদি কর্কশ হয়, অথবা

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষক যদি খুব চিৎকার দিয়ে কথা বলেন, তবে শুনতে খুব খারাপ লাগে, ছাত্ররা তাড়াতাড়ি বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং অস্থিরতা বোধ করে। কর্কশ আওয়াজে প্রার্থমিক শ্রেণী সমূহের ছোট ছোট ও কোমলমতি শিশুদের উপর সব সময় একটা ত্রাসের ভাব চেপে থাকে। ফলে শিক্ষকের কথায় স্বাভাবিকভাবেই তারা কিছুতেই মনোনিবেশ করতে পারেনা এবং কথাগুলো পরিপূর্ণরূপে তাদের বুঝেও আসেনা।

উচ্চস্বরে বলা বা জোরে চিৎকার দেয়া স্বয়ং শিক্ষকের নিজের স্বাস্থ্যের জন্যেও ক্ষতিকর। এতে গলাও নষ্ট হয় এবং ফুসফুসও দ্রুত আঘাতপ্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ অনেক বেশী কথা ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে থাকা শ্রোতাদের মনোযোগ ও আকর্ষণ নষ্ট করে দেয়। কথা যতই জোরদার ও আকর্ষণীয় হোকনা কেন স্বরের উঠা নামা না হলে একই সুরে বলতে থাকলে বক্তব্য আকর্ষণ হীন হয়ে পড়ে। কণ্ঠস্বর সম্পর্কে পথ নির্দেশনার জন্যে নীচে মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শ থেকে দৃষ্টান্ত হিসেবে কিছু কথা পেশ করা হচ্ছে। পাঠদানকে কল্যাণকর, উপকারী ও আকর্ষনীয় করে তুলতে হলে এসব দৃষ্টান্তের অনুসরণ অতি জরুরী।

* মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের গলার আওয়াজ না খুব বড় ছিল না খুব ক্ষীন। বরং তাঁর আওয়াজ ছিল মধ্যম পর্যায়ের ও পরিমিত, যা ছিল খুবই শ্রুতিমধুর। অবশ্য শ্রোতৃবর্গ পর্যন্ত আওয়াজটি পৌঁছানোর জন্য নবী (সাঃ) প্রয়োজন মাফিক উচ্চস্বরেও কথা বলতেন। একজন শিক্ষকের আওয়াজও এতটা উচ্চ করা উচিত নয় যাতে শ্রুতিকটু লাগে আর না এতটা ক্ষীন যে, শোনাই যায়না–যার কারণে শ্রেণীর নিয়ম শৃংখলায় ব্যাঘাত ঘটে, বরং আওয়াজ এতটা বড় হওয়া উচিত যাতে ক্লাসের সব ছাত্র–ছাত্রী সহজে শুনতে পায়। হুংকার দিয়ে, কিংবা চিৎকার করে অথবা কর্কশ স্বরে কথা বলা কোন ক্রমেই শোভনীয় নয়। আল্লাহ পাক স্বয়ং পবিত্র কোরানেও গাধার আওয়াজের নিন্দা করে বলেছেনঃ

إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. (قرآن : ٢١ - ١٩)

'নিশ্চয়ই গাধার আওয়াজই হলো সবচেয়ে কর্কশ।' (লুকমান–১৯)

* মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদ্যোপান্ত পুরা বক্তব্যই পরিস্কার করে বলতেন। (অর্ধেকটা মুখের ভেতর– থেকে যাওয়ার মতো অস্পষ্ট

www.nagorikpathagar.org

কথা বলতেন না।) শিক্ষকেরও এদিকে পুরাপুরি লক্ষ্য রাখা উচিত।

* মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কথা বলতেন, তখন বাক্যগুলোর শেষ পদ এবং শেষ পদের শেষ হরফগুলো পর্যন্ত পরিস্কার শোনা যেত। একজন শিক্ষকেরও এটা খুব অনুশীলন করা উচিত। বাক্য ও বর্ণের উচ্চারণ সঠিক হলে বক্তব্য সহজে ও সুন্দরভাবে বুঝে আসবে এবং সাথে সাথে ছাত্রদের বাক্যও বর্ণের উচ্চারনের সংশোধন এবং পরিশুদ্ধও হয়ে যাবে। প্রকাশ ভংগিও সুন্দর হবে।

* মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওয়াজে প্রয়োজনীয় মাফিক উঠানামা হতো। সুতরাং তাঁর কথায় অসাধারণ আকর্ষণ সৃষ্টি হতো। শিক্ষকেরও একই সুরে ও স্বরে কথা বলা পরিহার করা উচিত এবং প্রয়োজনমাফিক স্বরের উঠা নামা যাতে হয় তার চেষ্টা করা উচিত।

* অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের ন্যায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওয়াজের কোন প্রকার কৃত্রিমতা ও আড়ম্বর ছিলনা। একজন শিক্ষকের আওয়াজেও অকৃত্রিমতা এবং অনাড়ম্বরতা বহাল রাখা উচিত। কথার ধরণ স্বাভাবিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন কোন শিক্ষক মুখ বাঁকা করে কথা বলা এবং গলার আওয়াজে কৃত্রিমতা সৃষ্টি করার মধ্যে তাঁর কৃতিত্ব রয়েছে বলে মনে করেন। অথচ এরূপ করায় ছাত্রদের দৃষ্টিতে তারা হাস্যাষ্পদ হয়ে পড়েন।

* মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজন পরিমান বলতেন। অতিরিক্ত এবং অনর্থক কথা বলতে তিনি নিষেধ করতেন। একজন শিক্ষককেও প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা এবং জীবনভর কথাই বলতে হয়। এজন্যে কথা বলতে খুব সতর্ক থাকা উচিত। কম কথায় যেন কাজ সারে সেজন্য বিভিন্ন কাজের ইংগিতবহ বিভিন্ন ইশারা নির্ধারণ করে নেয়া উত্তম। নিরর্থক ও নিস্প্রয়োজনে কথা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। যথা সম্ভব ছাত্রদেরকেই কথা বলা ও কাজ করার বেশী সুযোগ দিতে হবে।

শিক্ষকের ভাষা

ছাত্রদের শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষকের ভাষার গুরুত্ব ও অনেক বেশী। কেননা ভাষাই হলো এমন একটি হাতিয়ার ও উপায় যার মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর কথা ছাত্রদের পর্যন্ত পৌঁছান এবং নিজ নিজ ধ্যান–ধারণা, আবেগ ও মনোভাব আদান প্রদান করেন। তা ছাড়া স্বয়ং ছাত্ররাও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শিক্ষকের ভাষার

www.nagorikpathagar.org

অনুকরণ করে থাকে। এজন্যে ভাষা ব্যবহারে শিক্ষকের সতর্ক থাকা উচিত। শিক্ষকের ভাষা ত্রুটিপূর্ণ হলে ছাত্ররাও ত্রুটিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতে থাকবে, আর বক্তব্যও পুরোপুরি বুঝে আসবে না। এ ক্ষেত্রেও আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করতে পারি।

* মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত স্পষ্ট, সহজ, সরল ও সর্বজনবোধ্য এবং প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করতেন। অলংকারে আড়ষ্ট ও ছন্দময় বাক্য এবং কৃত্রিমতাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার থেকে তিনি বিরত থাকতেন। যেকোন কঠিন সমস্যা দেখা দিলে, তিনি এমন ভাষায় বক্তব্য পেশ করতেন যে, একজন নিরক্ষর ও সাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন লোকও খুব ভালভাবেই বুঝে নিতেন। শিক্ষকদেরও ছোট ছোট শিশুদের সম্মূখীন হতে হয়। তাদের শব্দ ভান্ডার ও শব্দজ্ঞান খুবই সীমিত। বক্তব্য পেশ করার সময় এদিকে লক্ষ্য না রাখলে শিশুরা কিছুই বুঝতে পারবেনা।

* তিনি ভাষার অলংকার এবং শৈল্পিক ও সাহিত্যিক গুনের খুব বেশী লক্ষ্য রাখতেন। অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ও কম শব্দ সম্ভারে তিনি আপন মনোভাব পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ করতেন। বাক্য হতো সংক্ষিপ্ত এবং শব্দাবলী হতো অর্থবোধক। এতদসত্বে ও তাঁর মনোভাব ও উদ্দিষ্ট বিষয় পূর্ণরূপে ব্যক্ত হতো ও প্রকাশ পেত। একজন শিক্ষকের ও উচিত ছোট ছোট বাক্যে এবং অপেক্ষাকৃত কম কথায় বক্তব্য ব্যক্ত করা। বাক্যসমূহ হওয় উচিত সুগঠিত ও বিষয় বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বাগাড়ম্বর ও অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত।

* তিনি অতিশয় শুদ্ধ, পরিমার্জিত শালীন ও প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করতেন। যেসব কথা বিস্তারিত বলা শালীনতা ও ভদ্রতার পরিপন্থী হতো, সেসব কথা তিনি ইশারা ইংগিতে বলে দিতেন। একজন শিক্ষকেরও ভাষা ব্যবহারে, ভাষার বিশুদ্ধতা, পরিমার্জন, শালীনতা ও প্রাঞ্জলতার প্রতি পুরো লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যাতে ছাত্রদের ভাষা ও এসব গুনাবলীতে সমৃদ্ধ হয়। অশুদ্ধ ভাষা ও অশালীন কথা একজন শিক্ষক অবশ্যই পরিহার করে চলবেন। এ ব্যাপারে ছাত্রদেরও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে যথাসময়ে তা সংশোধন করে দেয়া উচিত। শিশুদের মুখে অচেতনভাবে অধিকাংশ সময় অনেক অশালীন কথাবার্তা কিংবা হাটবাজারে প্রচলিত শব্দ ও বাক্য উচ্চারিত হয়। এসব শব্দ বাক্য বা কথা তারা লেখা ও বক্তৃতায় অকপটে ও অনায়াসে ব্যবহার করতে থাকে। শিশুদের এমনটি করা থেকে বিরত রাখতে হবে।।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষাদান পদ্ধতি

এ বিষয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র থেকে আমরা নিম্নোক্ত দিক নির্দেশনা পেয়ে থাকি।

* পাঠের উদ্দেশ্য থাকবে সুনির্দিষ্ট এবং তা শিক্ষক ছাত্র উভয়ের সামনে থাকবে পরিস্কার। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলতেন বা শেখাতে চাইতেন তার মৌলিক উদ্দেশ্য স্বয়ং তাঁর দৃষ্টিতে তো অবশ্যই পরিস্কার ও নির্দিষ্ট ছিলই এমনকি শিক্ষার্থীর নিকটও অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল যে, তাঁরা কি বিষয কোন্ উদ্দেশ্যে শিখতে যাচ্ছেন। একজন শিক্ষককেও এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যেন পাঠদানকালে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পুরো সময় ও মনোযোগ সেই বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের পেছনেই ব্যয় হয় এবং নানারূপ বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পায়।

* ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করে অথবা তাদের অনুসন্ধিৎসু স্পৃহা জাগ্রত করে পাঠদান করতে হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রোতাদের কোন প্রশ্ন করে অথবা কোন কথার অংশ বিশেষ পেশ করে তাঁদের অনুসন্ধিৎসার স্পৃহা জাগ্রত করে দিতেন এবং তাদেরকে নিজের দিকে ভালোভাবে মনোযোগী করে নিতেন। তারপর কোন কথা পেশ করতেন। যেমন, তিনি প্রশ্ন করতেন 'সব চাইতে অধিক দাতা কে?' তারপর নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কিংবা একদিন মিম্বরে ওঠার সময় তিনবার বললেন, 'সে ব্যক্তি ধ্বংস হল, সে ব্যক্তি ধ্বংস হল...........।' তারপর আসল কথাটা বলে দিলেন। বস্তুত মুল কথা হলো শিক্ষার্থীরা যতক্ষণ পর্যন্ত অনুসন্ধিৎসু বা মানসিকভাবে ইচ্ছুক না হবে, ততক্ষণ তারা পাঠের প্রতি মনোনিবেশ করতেই সক্ষম হবেনা। আর শিক্ষার্থীদের মনোযোগ, ঐকান্তিকতা ও গভীর একাগ্রতা ছাড়া শিক্ষকের যাবতীয় প্রয়াস প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হওয়া সম্ভব নয়।

* শ্রেণীতে সবকিছু একসাথে বলে দেয়ার পরিবর্তে পাঠ্য বিষয়কে সংগত ও যুক্তিযুক্ত অংশে ভাগ করে নেয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে একটা অংশ পেশ করতে হবে। এ অংশ পুরোপুরি অনুধাবন করা ও মনে গেঁথে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়েই পরবর্তী অংশ উথাপন করতে হবে। হযরত

www.nagorikpathagar.org

মুয়ায (রাঃ) এর হাদীসে এ বিষয়ে পুর্ণ দিকদর্শন পাওয়ার যায়। এ পদ্ধতিতে পুরো পাঠ অতি সহজই মনে বসে যায়।

* শিক্ষার্থীদের উপর যথাসম্ভব বহনযোগ্য সহজ বোঝা চাপানো উচিত। এমন কোন কঠিন বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া ঠিক হবেনা যাতে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয় ঘাড় বাঁকিয়ে দেয়।

হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে- يَسِّرُوْا وَ لاَتُعَسِّرُوْا

(লেখকদের জন্য ও সহজ করে দাও তাদের মুশকিলে ফেলোনা)

সহজে থেকে আস্তে আস্তে কঠিন বিষয়ের দিকে অগ্রসর হবে যাতে শিশুরা সহজে কঠিন বিষয় আয়ত্ব করতে পারে।

* পাঠদানকালে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন মনোযোগ নষ্ট না হয়, অথবা বিরক্তি উৎপাদন না হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। যদি তিনি এর কোন লক্ষণ অনুভব করতেন তখনি ক্ষনিকের জন্যে হয়তো বিষয়বস্তু পাল্টে দিতেন অথবা যতটুক্ বলতেন ততটুকু পর্যন্তই যথেষ্ট মনে করতেন।

* মুল বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহের যে কোনটি অবলম্বন করা যেতে পারেঃ

১) কথোপকথন পদ্ধতি (Conversational Method)

২) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (Question-Answer Method)

৩) বর্ণনা বা বিবরণমুলক পদ্ধতি (Narrative - Descriptive - Method)

৪) বক্তৃতামুলক পদ্ধতি (Lecture Method)

ক) কথোপকথন পদ্ধতি

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথায় কথায় অনেক আকর্ষণীয় কথা বলে দিতেন। এই পদ্ধতি বেশ হৃদয়গ্রাহী, সহজ, সরল, স্বভাবগত ও উপকারী। বিদ্যার্থীরা খুব অকপটে নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করে দেয়। শিক্ষার্থীদের সমস্যা ও অসুবিধা সমূহ তাদের ধ্যান-ধারণা ও ঝোঁক প্রবণতাসমূহ শিক্ষকগনের ঠিক ঠিকভাবে অনুমান করতে সহজ হয় এবং তাদের সংশোধন ও প্রশিক্ষনের স্বাভাবিক সুযোগ হাতে আসে। তবে কথাবার্তা তখনই

www.nagorikpathagar.org

উপকারী ও ফলপ্রসূ হতে পারে যখন, এ ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎঃ

* কথাবার্তা যেন অত্যন্ত অকৃত্রিম পরিবেশে হয়, যাতে প্রত্যেকে নির্দ্বিধায় নিজের মনের কথা ব্যক্ত করতে পারে। অবশ্য সর্বাবস্থায় শালীনতা বজায় রাখতে হবে।

* পূর্ণ মনোযোগ সহকারে ও হাসিমুখে কথা শুনতে হবে।

* কথা কাটাকাটি করা যাবেনা। এক সময়ে কেবল একজনই কথা বলবে। একজন তার কথা শেষ করলে পর অন্যজন কথা বলবে। কথার মাঝে কেউ কথা বলতে পারবে না।

* সম্পূর্ণ বিষয় বহির্ভূত অথবা বাস্তবতা বিবর্জিত কিংবা অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা হতে থাকলে সংগত পন্থায় তা সংশোধন করা আবশ্যক।

* কথোপকথনের মাঝে শিক্ষাও প্রশিক্ষনদানের কোন স্বাভাবিক সুযোগ এসে গেলে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত।

* কথা বার্তায় শব্দ উচ্চারণ দ্রুত গতিতে না করে, থেমে থেমে ধীরে সুস্থে শান্তভাবে তা আদায় করতে হবে কোন বিশেষ কথা বা বাক্যাংশের ওপর গুরুত্বারোপ করতে চাইলে প্রয়োজনবোধে দু'তিন বার তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেই চলবে যেন কথাগুলো ভালভাবে মনে গেঁথে যায় এবং এসব কথা ও বাক্যের গুরুত্ব সুন্দরভাবে অনুভূত হতে থাকে।

* কথোপকথনে শ্রোতার যোগ্যতা, রুচি ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি যথা সম্ভব লক্ষ্য রাখতে হবে।

খ) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পদ্ধতিতে অনেক বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাতেন। কোন কিছু জানাতে চাইলে প্রথমে প্রশ্নের আকারে তা পেশ করতেন। অতঃপর নিজেই এর সঠিক উত্তর দিয়ে দিতেন। অন্যদেরকেও স্বাধীনভাবে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতেন। অবশ্য নিরর্থক বা আজেবাজে প্রশ্ন করা থেকে সুসংগত উপায়ে নিষেধ করতেন অথবা তা এড়িয়ে যেতেন। অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলে বক্তব্য শেষে স্বতন্ত্রভাবে উত্তর দিতেন। এই পদ্ধতিটি বেশ উপকারী। এর সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো, এতে শিক্ষার্থীর মন-মানসিকতা প্রশ্নের উত্তর

www.nagorikpathagar.org

অনুসন্ধ্যানে পুর্ণশক্তি নিয়োগ করে অথবা অন্ততঃ পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতা সহকারে প্রশ্নের উত্তর শোনার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। এ প্রসংগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ থেকে আমরা নিম্নোক্ত দিক নির্দেশনা পেতে পারি।

* প্রশ্নসমূহ সংক্ষিপ্ত ও পুর্নাঙ্গ হতে হবে। এছাড়া স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন করতে হবে, যেন শ্রোতা খুব ভালভাবে বুঝতে পারে, তার কাছে কি প্রশ্ন করা হয়েছে। আর প্রশ্নের ভাষাও শ্রোতার মুখে এসে যেতে হবে এবং মুখস্থ হয়ে যেতে হবে, যাতে উত্তর চিন্তা করতে অথবা শুনে ভালভাবে অনুধাবন করতে সুবিধা হয়। কারণ, প্রশ্নটা যতক্ষণ পুরোপুরি স্মরণে না থাকবে ততক্ষণ পুরো জবাব দেয়া যেমন সম্ভব হয় না, তেমনি অন্যের উত্তরও সুন্দর ভাবে বুঝে আসেনা।

* প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ধরণ হতে হবে এমন, যেন সবাই উৎসুক ও উৎকর্ণ হয়ে উঠে, আপাদমস্তক মনোযোগী হয়ে যায় এবং মন-মস্তিষ্ক উত্তর ভাবতে বা শুনতে পুরোপুরি আগ্রহী হয়ে যায়।

* প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পর চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দিতে হবে। অতঃপর হাসিমুখে উত্তর শুনতে হবে।

* ভুল উত্তর সংশোধন করে দিতে হবে যদি উত্তরই 'না পাওয়া যায় কিংবা পাল্টা প্রশ্ন করা হয়, তাহলে নিজেই বিস্তারিতভাবে উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করে দিতে হবে। অনুসন্ধিৎসার স্পৃহা জাগ্রত করে শান্ত করার মালমসলা সংগ্রহ করে না দেয়া অতিশয় ক্ষতিকর এবং অস্থিরতা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

* শিক্ষার্থীদেরকেও প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে, কারণ যে অধিক প্রশ্ন করে সে অধিক শেখে। কিন্তু নিরর্থক বা আজেবাজে প্রশ্ন করলে প্রতি উত্তরে ধমক না দিয়ে বরং তা এড়িয়ে যেতে হবে। অথবা সংগত ভাবে তা থেকে বিরত রাখতে হবে।

* অপ্রাসংগিক তবে উপকারী এবং জরুরী কোন প্রশ্ন হলে বক্তব্য শেষে আলাদাভাবে জবাব দিয়ে দিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

গ) বর্ণনামূলক পদ্ধতি

কোন বিষয়ে কিছু বর্ণনা করার অথবা কোন ঘটনা শোনানোর প্রয়োজন হলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো স্পষ্ট বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। তবে তাঁর বর্ণনার বৈশিষ্ট ছিল এইঃ

* সংক্ষিপ্ততা–তিনি বর্ণনাকে খুব বেশী দীর্ঘায়িত করতেন না। বরং সংক্ষেপে বলার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যেন লোক বিরক্ত হয়ে না যায়।

* নিদর্শন উপস্থাপন–কথা বলার সময় তিনি এমন এমন নিদর্শন উপস্থাপন করতেন, অদেখা জিনিসগুলো পর্যন্ত মানুষের এমনভাবে বুঝে আসতো, যেন তারা সেসব চর্ম চক্ষে দেখতে পাচ্ছে।

* দৃষ্টান্ত ও উদাহরণের মাধ্যমে বিবরণ পেশঃ কথাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ ও স্পষ্ট করার জন্যে তিনি প্রয়োজন ও স্থান মাফিক যথোপযুক্ত দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ পেশ করতেন। এতে বিষয়টির সব দিক সহজেই বুঝে এসে যেত।

* স্থান, কাল, পাত্রের প্রেক্ষিতে বাচনভংগী, কন্ঠস্বরের উঠানামা এবং শব্দ ও বাক্যের প্রতি জোর দেয়া–

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই পদ্ধতি গ্রহণের ফলে তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব, দৃঢ়তা ও কঠোরতা পূর্ণরূপে হৃদয়পটে অংকিত হয়ে যেত।

* চেহারা–অবয়ব, উঠানামা, চাল–চলন, জজবা, আবেগ প্রবণতা ও গতিবিধি, প্রভাব প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অভিষ্ট পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়াস–

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ধরণের প্রভাব প্রতিক্রিয়া অন্যের মধ্যে সৃষ্টি করতে চাইতেন সর্ব প্রথম তার প্রভাব তিনি নিজের মধ্যেই সৃষ্টি ও উপলব্ধি করে নিতেন। এতে তাঁর অনুরূপ অবস্থার প্রভাব শ্রোতাদের ওপরও গভীর রেখাপাত করত এবং প্রভাব ফেলতো। আর এটা তো স্পষ্ট কথা যে, অন্তর থেকে নিঃসৃত কথা প্রভাবিত করেই ছাড়ে।

* প্রয়োজন মাফিক বাস্তব উদাহরণ অথবা দৈনন্দিন জীবনে কথা ও কাজে সামঞ্জস্যশীলতা–

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম কোন কথা কেবল মৌখিক বা মৌলিক নীতি হিসেবে বলে দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না। বরং প্রয়োজন বা সুযোগ

www.nagorikpathagar.org

হলে তা নিজে করেই কিংবা নিজের দৈনন্দিন জীবনে তা বাস্তবায়িত করে কথা ও কাজের মিল দেখিয়ে দিতেন এবং কথা বা নীতির সম্পর্কও খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতেন। একজন শিক্ষককেও নিজের বক্তব্য পেশে এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

ঘ) বক্তৃতামূলক পদ্ধতি

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য পেশের সাধারণ ধরণই ছিল বক্তৃতা প্রকৃতির। সম্মিলিত শিক্ষা-দীক্ষার বেলায় তিনি এ পদ্ধতিই অবলম্বন করতেন। তিনি খুতবা প্রদানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো মাত্রই পুরো অনুষ্ঠানে নিরবতা বিরাজ করতো। তিনি খুব সংক্ষিপ্ত অথচ পুর্ণাঙ্গ খুতবা প্রদান করতেন, তাঁর বক্তৃতা হতো অত্যন্ত জোরদার, উদ্দীপনা পুর্ণ ও প্রভাবশালী। তাঁর বক্তৃতার ধরণও ছিলে অতিশয় উদ্দীপনাকারী এবং আবেগ ও জজবায় সৃষ্টি করতো ঢেউয়ের দোলা ও আলোড়ন। স্থান-কাল ও পরিবেশ পরিস্থিতি অনুপাতে তাঁর আওয়াজও উঠানামা করতো। গরম ও ঠান্ডা হতো। দৈহিক অংগ ভংগী, অবস্থান, চেহারা ও অবয়ব এবং চোখের দৃষ্টিতে তাঁর মনের অবস্থা পুর্ণরূপে প্রকাশ পেয়ে যেতো। ফলে শ্রোতৃমন্ডলীর প্রতি প্রভাব পড়তো সীমাহীন, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ত্যাগ ও কুরবানী, উদ্যম-উদ্দীপনা, জোশ ও প্রেরণা এবং সৎ ও ন্যায় কাজের প্রতি অশেষ শক্তি সৃষ্টি ও বৃদ্ধি প্রাপ্তির ব্যাপারে তাঁর বক্তৃতামালার ও সবিশেষ প্রভাব ছিল। বক্তৃতামুলক পদ্ধতি আয়ত্ব করার সময় শিক্ষকগণের ও এসব বিশেষত্ব অর্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

ঙ) ব্যাখা বিশ্লেষণ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় বক্তব্য স্পষ্টরূপে তুলে ধরা ও ভালোভাবে হৃদয়ংগম করানোর মানসে প্রয়োজন অনুযায়ী নীচের পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করতেনঃ

* বাস্তব উদাহরণ পেশ করতেন, নিজে করে দেখাতেন, অথবা হাত ও আংগুলের ইশারা ইংগিত দ্বারা বুঝাতেন।

www.nagorikpathagar.org

* কখনো কখনো মাটিতে চিহ্ন ও রেখা অংকন করে নিজের বক্তব্য পরিস্কার করতেন।

*কোন কোন পরিচিত ও চেনা জানা জিনিসের উপমা পেশ করে বক্তব্য হৃদয়ংগম করাতেন।

* কোন উপযুক্ত কাহিনী, ঘটনা, চুটকি অথবা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বক্তব্য বুঝাতেন।

* বিপরীত কথার সাথে মুকাবেলা করে দু'য়ের পার্থক্যকে ভালোভাবে স্পষ্ট করতেন।

* প্রয়োজন বোধে একই কথাকে দু'তিন বার উল্লেখ করে খুব সুন্দরভাবে হৃদয়ংগম করাতেন।

একজন শিক্ষকের ও এসব পদ্ধতি থেকে খুব বেশী বেশী উপকৃত হওয়া উচিত।

শিক্ষার্থীদের সাথে আচরণ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষার্থীদের সাথে সদাচরণের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর আদর্শ ছিল এরূপঃ

*তিনি হাসিমুখে উজ্জ্বল চেহারায় সবার সাথে মিলিত হতেন। সাক্ষাত করতেন নম্রতা ও স্নেহশীলতার সাথে। সবার আত্মমর্যাদার প্রতি তিনি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। তিনি কখনো কাউকে হেয় চোখে দেখেননি কিংবা অবজ্ঞা করেন নি।

* তাদের সান্ত্বনা দান ও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি নির্মল হাস্যালাপ ও মার্জিত হাসি কৌতুকের সাহায্য ও নিতেন।

* কেউ অসুস্থ হলে দেখাশোনা, সেবা শুশ্রুষার জন্যে তিনি যেতেন। মন মেজাজের অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন, সান্ত্বনা দিতেন, দোয়া করতেন।

* তাদের যোগ্যতা, রুচি ও আকর্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কথাবার্তা বক্তৃতা বা ওয়াজ ও তালকীনকে কখনো তাদের বোঝা হতে দিতেন না। আকর্ষণহীনতা ও অমনোযোগিতা অনুভব করা মাত্র বিষয়ান্তরে চলে যেতেন কিংবা কথা শেষ করে দিতেন।

* প্রত্যেকের কথা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন। ভাল কথার প্রশংসা

www.nagorikpathagar.org

করতেন আর অনুপযোগী কথা সম্পর্কে অবহিত করে দিতেন। আদব-কায়দা শিষ্টাচারে সীমা লংঘন করলে তিনি পূর্ণ সংযম ও সহনশীলতার সাথে তা সহ্য করতেন। অপছন্দনীয় কথা উপেক্ষা করতেন এবং এড়িয়ে যেতেন।

* তাদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতেন। নিরর্থক অথবা আজেবাজে প্রশ্ন করতে নিষেধ করতেন অথবা তা এড়িয়ে যেতেন।

* কোন ত্রুটি দেখলে সাধারণভাবে উল্লেখ করে সাবধান করে দিতেন অথবা অন্য কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করতেন।

* তাঁদের দুঃখ-কষ্টে পাশে এসে দাঁড়াতেন, সান্ত্বনা দিতেন, সাহস যোগাতেন, মনোবল সৃষ্টি করতেন। নিঃস্বদের সাহার্য নিজেও করতেন এবং বিত্তশালী সাহাবাদের (রাঃ) থেকেও সাহায্য নিয়ে দিতেন।

* শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে অসাধারণ আন্তরিকতা ঘনিষ্ঠতা, সহমর্মিতা, নৈকট্য ও ভালবাসার প্রমাণ পেশ করতেন। তাদের সামনে বসে যেতেন, বুকে বুক মিলিয়ে দোয়া করতেন। উভয় কাঁধে হাত রেখে অত্যন্ত স্নেহ-মমতা ও আন্তরিকতা সহকারে শিক্ষা দিতেন। কখনো কখনো তাদেরকে নিজের সাথে বসিয়ে খাওয়াতেন।

* কেউ কোন প্রকার সামান্যতম খেদমত করলেও তার শুকরিয়া আদায় করতেন,তাঁর জন্যে দোয়া করতেন।

* বৈঠকে প্রত্যেকের প্রতি সমান দৃষ্টি দিতেন, আচরণের ক্ষেত্রে কারো মধ্যে যেন শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধাণ্যের ভাব না আসে। প্রত্যেকেই অনুভব করতো, তার সাথেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত হৃদ্যতা রয়েছে।

* শিশুদের সাথে তো তাঁর আচরণ ছিল আরো অধিক মায়া-মমতাপূর্ণ। তিনি শিশুদের দেখলে খুব খুশী হতেন, নিজেই সালাম করতেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, কোলে তুলে নিতেন, কাঁধে উঠিয়ে নিতেন, স্নেহ করতেন, দোয়া করতেন। তাদের আকর্ষণীয় কথা বলতেন। শিশুদেরকে কাতারে দাঁড় করিয়ে পুরস্কারের দৌড় প্রতিযোগিতা করাতেন। শিশুরা দৌড়ে গিয়ে তাঁর বুকে ও পেটে ভেঙ্গে পড়তো। তিনি হাসিমুখে সব সয়ে যেতেন। রসাত্মক ও হাসি কৌতুকের কথা বলতেন, খানাপিনায় তাদেরকে অংশীদার করতেন। সস্নেহে ও সোহাগভরে আদব-কায়দা শিক্ষা দিতেন। পথে দেখা হলে নিজের যানবাহনে তুলে নিতেন। ভুল করলে তা বুঝিযে সুজিয়ে মাফ করে দিতেন। শিশুদের মারপিট করতে নিষেধ করতেন। তাদের ব্যাপারে বারবার ক্ষমা

www.nagorikpathagar.org

প্রদর্শনের শিক্ষা দিতেন। যুদ্ধের সময় কোন কোন সাহাবী অমুসলিমদের কতিপয় শিশুকে হত্যা করেছিলেন, তিনি শুনে অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হলেন , চেহারার রং বদলে গেল। তিনি চুপে চুপে বললেনঃ

("ঐ শিশুরা তোমাদের চেয়ে ভালো ছিল, সাবধান শিশুদের কখনো হত্যা করো না।")

একটি শিশুকে চুমু দিতে দিতে তিনি বললেন "এই শিশুতো বেহেস্তের ফুল।"

শিশুরাও তাঁকে খুব ভালোবাসতো, পথে ঘাটে শিশুরা তাঁকে দেখলেই খুশীতে লাফালাফি করতে থাকতো, দৌড়ে তাঁর কাছে আসতো, তাঁর সাথে মিশতো, মিশে অত্যন্ত খুশী হতো। তাদের আনন্দের আর সীমা থাকতো না।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাদীক্ষার আদর্শিক পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের সাথে তাঁর এরূপ আচরণের ফলেই তাদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের অসাধারণ আগ্রহ-একাগ্রতা সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর প্রতিটি কথা অন্তর দিয়ে শুনেছিল। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এসব কার্যকরী করেছিল। তাঁর অমীয় বানীসমূহকে মনে গেঁথে ফেলেছিল, আজীবন স্মরণ রেখেছিল এবং তাঁর শিক্ষাগুলো অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে কায়মনোবাক্যে লেগে গিয়েছিল। এপথে সব রকম দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিল। দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে সব পরিস্থিতির মুকাবেলা করেছিল। সর্বাবস্থায় সত্যের ওপর অটল ছিল। আল্লাহর সত্য কালেমার বিজয় কেতন ওড়াতে গায়ের ঘাম আর রক্ত একাকার করে দিয়েছিল, আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আজও পরিস্থিতির আমুল পরিবর্তন হতে পারে। তবে শর্ত হলো, শিক্ষকগণকে নিজেদের মধ্যে ওইসব গুণাবলীর ঝলক সৃষ্টি করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

আধুনিক শিক্ষার প্রবণতা

اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا

হেকমত ও বিজ্ঞানের কথা একজন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তির হারানো বস্তু। সুতরাং সে যেখানেই তা পাবে সেই হবে তার অধিক হকদার (মালিক)। (তিরমিযী)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাধারণভাবে শিক্ষা সম্পর্কীয় যেসব দৃষ্টিভংগী বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে এবং যেসব শিক্ষা-ব্যবস্থা সেসব দেশে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাতে কোন কোন মৌলিক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও যদিও বিশেষভাবে সংশোধনযোগ্য তবুও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং শিশুদের মানসিকতা অধ্যয়নের আলোকে এমন বেশ কিছু প্রবণতা প্রকাশিত হয়ে সামনে আসছে, সেগুলো উপকারী এবং ইসলামী শিক্ষাদীক্ষার সাথে কোনরূপ সাংঘর্ষিকও নয়। এজন্য(خُذْ مَا صَفَا دَعْ مَا كَدرَ) ভালোটা গ্রহণ কর মন্দটা ত্যাগ কর নীতির ভিত্তিতে সেগুলোকে বরণ করে নেয়ার চেষ্টা করা উচিত। যেমনঃ

১) শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মর্মকে কেবল লেখাপড়ার গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা অথবা কিছু বই, বিষয়বস্তু বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে দেয়ার পরিবর্তে তাদের জ্ঞানের সীমা আরো সম্প্রসারিত করে দিতে হবে। অর্থাৎ-

ক) শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সমস্ত দিক ও বিভাগ মানসিক ও দৈহিক, ব্যবহারিক ও নৈতিক, উদ্দীপক ও আত্মিক্য এর সুসমন্বিত বিকাশ ও ভারসাম্যপূর্ণ ক্রমোন্নতি সাধন।

www.nagorikpathagar.org

খ) ব্যক্তিক ও সামাজিক উভয় দিক দিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর যেসব দায়িত্ব অর্পিত হয় তা পুরোপুরি আঞ্জাম দান ও সম্মিলিতভাবে কাজ করার যোগ্যতা বিধান।

গ) আত্মনির্ভরশীলতার প্রেরণা, উপস্থিত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার যোগ্যতা এবং দৈনন্দিন কার্যাবলী অবাধে আঞ্জাম দেয়ার শক্তি সামর্থ।

ঘ) অবসর সময়কে উপযোগী কাজে ব্যয় করার অভ্যাস।

ঙ) ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের মধ্যে অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রেরণা এবং অধিক জ্ঞানার্জনের আগ্রহ।

২) সিলেবাস, বিষয়বস্তু অথবা পাঠ্যপুস্তকাদির স্থলে শিশুদেরকে কেন্দ্রীয় মর্যাদা ও মৌলিক গুরুত্ব দান করা। অর্থাৎ

ক) সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, "শিক্ষা শিশুদের জন্যে, শিশুরা শিক্ষার জন্যে নয়" যেন শিক্ষার সমস্ত প্রয়াস প্রচেষ্টাই বিভিন্ন উপায়ে শিশুদের কল্যাণ সাধণের জন্যেই হয়ে থাকে, শিক্ষার জন্যে বিসর্জন দেয়ার জন্যে নয়।

খ) ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতির চিন্তায় শিশুদের বর্তমান ঝোঁক-প্রবণতাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা যাবেনা। অন্যথায় এর প্রতিক্রিয়া হবে মারাত্মক। যে উদ্দেশ্যে তাকে বর্তমান আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে তা কখনো অর্জিত হবেনা। বরং ব্যক্তিত্বের কোন কোন দিক আহত হবে এবং সুষমা মন্ডিত ক্রমোন্নতি কখনো সম্ভব হবেনা।

গ) শিশুদের বয়স, মানসিক যোগ্যতা, দৈহিক অবস্থা, তার চাহিদা এবং পারিবারিক পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষাদান করতে হবে।

ঘ) শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যক্তিগত পার্থক্য এবং তাদের বিশেষ ঝোঁক প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। পুরো ক্লাসের পরিবর্তে প্রত্যেক শিশুকে স্বতন্ত্র একক হিসেবে মেনে নিতে হবে। তার আলাদা সত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তার ব্যক্তি সত্তার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে। পুরো শ্রেণীকে একই লাঠি দিয়ে হাঁকানো যাবেনা।

ঙ) শিক্ষার্থীদের জন্মগত শক্তি সমূহ এবং স্বভাবজাত ঝোঁক প্রবণতাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার সুযোগ করে দিতে হবে।

৩) শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার সিলেবাস ঠিক করার সময় নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক) শিশুদের বয়স, তাদের স্বাভাবিক শক্তি সামর্থ, প্রকৃতি, আবেগ, ঝোঁক

প্রবণতা, আশা-আকাংখা, দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতাও ক্ষমতা।

খ) শিশুদের বিকশিত হওয়ার বিভিন্ন স্তর এবং প্রত্যেক স্তরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্টাবলী, তাদের আকর্ষণ ও প্রয়োজনীয়তা।

গ) সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তার মধ্যে ফিট হওয়ার জন্য জরুরী যোগ্যতা ও গুনাবলী।

ঘ) দেশ ও জাতির প্রয়োজনীয়তা, তাদের সংকল্প সমূহ ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার।

ঙ) শিশুর ব্যক্তিত্বের সকল দিকের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ স্ফুরণ, প্রশিক্ষণের জন্যে শিরোনাম, বিষয়বস্তু, বিভিন্ন ব্যস্ততা ও কার্যকলাপ।

চ) শিশুর ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতির জন্যে সহায়ক বিষয়াদি।

৪) শিক্ষা-পদ্ধতিকে এমনভাবে আত্মকরণ করতে হবে যাতে পাঠদান শিশুদের জন্যে সহজ, আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী হয়। অর্থাৎ

ক) খেলাধূলার মধ্যে দিয়েও অনেক কথা শিক্ষা দিতে হবে।

খ) কাহিনী, নাটক এবং অভিনয়ের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

গ) প্রতিটি বিষয় বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ছবি, চার্টস এবং অন্যান্য বর্ণনামূলক ও শিক্ষামূলক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা উচিত যাতে পাঠ আকর্ষণীয় হয়, দৃষ্টিভংগী ও ধ্যান-ধারণা স্পষ্ট ও অভিজ্ঞতা হাসিলের সুযোগ পাওয়া যায়।

ঘ) উপকারী ও চিত্তাকর্ষক কাজকর্ম এবং পরিকল্পিত বিষয়ের ব্যবস্থা করে গঠনমূলক যোগ্যতার বিকাশ ঘটাতে হবে এবং তাদেরকে নিজে নিজেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে শেখার অধিক থেকে অধিকতর সুযোগ করে দিতে হবে।

ঙ) ক্লাসের পরিবেশ এমন করে তুলতে হবে যাতে শিশুরা নিজ নিজ অসুবিধা ও অস্থিরতার কথা নির্দ্বিধায় খুলে বলতে পারে।

চ) নিজেদের আবেগ প্রবণতা ও ধ্যাণ-ধারণা প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যমকে কাজে লাগানোর বুদ্ধি শেখাতে হবে। অর্থাৎ শিশুরা যেন মৌখিক অথবা লিখিতভাবে বিষয়বস্তু তৈরী, প্রবন্ধ রচনা, বক্তৃতা করা এবং আর্ট প্রভৃতির মাধ্যমে মনোভাব প্রকাশে সমর্থ হতে পারে।

ছ) শিক্ষক নিজেকে স্বেচ্ছাচারী শাসকরূপে পেশ করার পরিবর্তে একজন পরামর্শ দাতা, সাহায্যকারী, ও রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে পেশ করবে।

www.nagorikpathagar.org

জ) পাঠ সামনে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা লাভ করতে হবে। ক্লাশে সব কথা নিজেই উপস্থাপন না করে বরং শিশুদের জন্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে হবে যেন তারা স্বয়ং জ্ঞানার্জনের প্রয়াসে ব্রতী ও সচেষ্ট হয়।

ঝ) বিষয়বস্তু ও পাঠসমূহকে আপোষে সুসম্পর্কিত করে পড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং শিশুদের দৈনন্দিন জীবনের সাথেও তার পাঠের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

ঞ) শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হবে।

৫) বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতা, সমতা, গণতন্ত্র ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রাণ সঞ্চার করতে হবে। অর্থাৎঃ

ক) বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকমন্ডলীর পরামর্শসমূহকে গুরুত্ব দিতে হবে।

খ) শিক্ষকগণ নিজেদের মধ্যে এবং শিক্ষার্থীরাও নিজেদের মধ্যে আপোষে যেন সমতা ও ভ্রাতৃত্বভাবের পরিবেশ অনুভব করে। কোন প্রকার বৈষম্য ও ভেদাভেদ রাখা যাবেনা।

গ) ছাত্ররা বাইরের চাপের পরিবর্তে নিজেরাই যেন নিয়মানুবর্তী ও সময়ানুবর্তী হয়, তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

ঘ) মিলেমিশে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং বিভিন্ন অধ্যয়নের দায়িত্ব পালনের জন্যে অনেকগুলো দল বানাতে হবে এবং প্রতিটি দলকেই নিজ নিজ মনিটর বা মূল দায়িত্বশীলের নেতৃত্বাধীন কাজ করা শিখতে হবে।

ঙ) পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবকবর্গের সহায়তা লাভের চেষ্টা করতে হবে।

চ) সকলের জন্যে শিক্ষা যথাসাধ্য সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক হতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

শিশু ও তার স্বভাব প্রকৃতি

শিশুদেরকে কখনো বড়দের উপর কিয়াস বা ধারণা করা ঠিক নয়। তাদের জগতটাই হলো ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা হলো, যেসব বড় বড় ঘটনা দুর্ঘটনা স্বয়ং এসব শিশুদের জীবনে অতিশয় প্রভাব ও গভীর রেখাপাত করে থাকে, সেসব ঘটনাও তাদের নিকট কোন গুরুত্বই বহন করেনা। বরং উল্টো তাদের আনন্দ-উল্লাসের খোরাক হয়ে থাকে। ঘরে আগুন ধরে গেলে, চুরি হয়ে গেলে অথবা ঘরের কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলে, হতে পারে শিশুরা অন্যদের দেখাদেখি সাময়িকভাবে কিছুটা প্রভাবিত হয়ে দু'চার ফোটা অশ্রুপাত করে। কিন্তু এসব অবস্থায় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী এবং তাদের শিশু সন্তানদের একত্র হওয়ার ফলে ঘরে যে হৈ হল্লা সৃষ্টি হয় শিশুদের মূল আকর্ষণ সেদিকেই থাকে। এসব দুর্ঘটনা কালে শিশুদের গতিবিধি ও আচরণ পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, তাদের অন্তরে মূলতঃ ওসব দুর্ঘটনার কোন বিশেষ প্রভাবই নেই। সুযোগ পেলে তারা সে মুহূর্তেও পুরো মন দিয়ে লাফালাফি, নাচানাচি ও হৈ হুল্লোড়ে অংশ নেবে। প্রকৃত পক্ষে তারা তাদের স্বভাব প্রকৃতির নিকট বাঁধা, তাই এসব করতে বাধ্য।

শিশু হচ্ছে একটা সজীব অনুভূতি প্রবণ সত্তা। তার বিভিন্ন ধরণের শক্তিও যোগ্যতা সুপ্ত থাকে। তার থাকে কিছু মৌলিক আশা-আকাংখা ও আবেগ প্রবণতা, থাকে নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ, ইচ্ছা ও আকর্ষণ। তার চিন্তা ভাবনা করার, বুঝার, বৃদ্ধি, অনুভব করার, প্রভাবিত হওয়ার, শেখার ও অভ্যস্ত হওয়ার, মনোযোগী ও অনুরাগী হওয়ার, মুখস্থ ও পুণরাবৃত্তি করার থাকে একটা বিশেষ ধরণ। বয়ঃপ্রাপ্ত এবং বড়দের জগতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তাকে

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়। প্রতিটি স্তরের থাকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট সেসব বৈশিষ্টের থাকে কিছু মৌলিক চাহিদা। শিক্ষাও প্রশিক্ষণের ধারা প্রয়াস ঠিক তখনই ফলপ্রসূ হতে পারে, যখন বৈশিষ্ট সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানলাভ করে এগুলোর প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হয়।

জন্মগত ভাবেই শিশুরা অনেকগুলো সুপ্ত শক্তি ও যোগ্যতার অধিকারী হয়ে থাকে। আর অনেকগুলো তারা এসবেরই ভিত্তিতে নিজেদের অথবা অন্যদের প্রচেষ্টায় হাসিল করে নেয়। জন্মের সাথে প্রাপ্ত শক্তি, প্রতিভা ও যোগ্যতাগুলোকে বলা হয় জন্মগত শক্তি, প্রতিভা, স্বভাবগত যোগ্যতা অথবা 'ফিতরাত' বা প্রকৃতি। এ হচ্ছে শিশুর জন্যে সম্পূর্ণ আল্লাহর বিশেষ দান। এসব শক্তি ও যোগ্যতা-প্রতিভা অর্জনে কোন ব্যক্তির নিজের অথবা অন্য কারো চেষ্টার কোন হাতই থাকেনা এবং তাতে কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি করাও সম্ভব নয়। মানবিক প্রয়াস-প্রচেষ্টায় কেবল ঐসব শক্তি ও যোগ্যতা-প্রতিভার বিকাশ সাধণ করা এবং কোন বিশেষ খাতে প্রবাহিত করা যেতে পারে মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাও প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকৃতিগত ও স্বভাবজাত এসব শক্তির বিকাশ, সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধন, জাগিয়ে তোলা এবং সঠিক খাতে প্রবাহিত করা। আর আল্লাহ্ না করুন, যদি এসব ভুল পথে প্রবাহিত হয়ে যায়, তবে এগুলোর সংশোধন করা।

আল্লাহ্ তা'য়ালার দান অসংখ্য। তবে শিক্ষাও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে শিশুদের নিম্ন বর্ণিত স্বভাবজাত সুপ্ত শক্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জ্ঞান ও সেগুলোকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার পদ্ধতি জেনে নেয়া অতীব জরুরী।

১) অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া জাত শক্তি সমূহ।

২) প্রকৃতিগত বা সহজাত আবেগ প্রবণতা সমূহ।

৩) সহজাত যোগ্যতা ও ক্ষমতাসমূহ।

১। অপরিহার্য প্রতিক্রিয়াজাত শক্তিসমুহ্ (REFLEXEE)

আল্লাহ্ তা'য়ালা মানব দেহে প্রায় পঞ্চাশটি এমন শক্তি নিহিত রেখেছেন, সেগুলো দেহের বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগকে আকস্মিক দুর্ঘটনা অথবা আকস্মিক সংঘটিতব্য ক্ষতি থেকে রক্ষার কাজে সীমাহীন সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এসবের কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে অপরিহার্যরূপে এমন কতিপয় কল্যাণকর

www.nagorikpathagar.org

কাজ সাধিত হয়ে যায়, যাতে আমাদের অনুভূতি ও ইচ্ছার কোন হাতই থাকেনা, যেমন, হাঁচি দেয়া, কাশি দেয়া, থুথু ও কফ বের করা, চিৎকার দেয়া, হাঁপিয়ে উঠা, কেঁপে উঠা, মোড়ামুড়ি দেয়া, হাঁসা, বমি করা, কপাল কুঞ্চিত করা, জ্বরের পূর্বে কম্পন আসা এবং শরীরের বিভিন্ন জোড়া থেকে তরল পদার্থ বের করা ইত্যাদি।

অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া জাত কাজ সমূহের বৈশিষ্টঃ

এসব স্বভাবজাত শক্তি সমূহের কারণে যেসব অপরিহার্য কাজ সাধিত হয়ে থাকে তাতে নিম্নের বৈশিষ্টসমূহ পাওয়া যায়ঃ

* দ্রুত প্রতিভাত হওয়া।
* সদাসর্বদা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে হওয়া।
* অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে যাওয়া।
* ইচ্ছা ও চেতনার হাত না থাকা।
* কাজ সাধনের জন্যে সদাসর্বদা প্রস্তুত ও উন্মুখ।
* স্থানীয় হওয়া অর্থাৎ দেহের কোন একটি নির্দিষ্ট অংগে সীমাবদ্ধ থাকা।
* **অপরিবর্তনশীল হওয়া।**

২। সহজাত আবেগ সমূহ (INSTINCTS)

এ হচ্ছে সেসব প্রকৃতিগত শক্তি বা সহজাত আবেগ-প্রবণতা যেগুলোর মাধ্যমে পূর্ব অভিজ্ঞতা, শিক্ষা বা ট্রেনিং লাভ করা ছাড়াই আমরা বেশ কিছু কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকি। এসব আবেগ ও ঝোঁক প্রবণতা কোন সাময়িক উত্তেজনা ও আন্দোলন বশতঃ দেহের মধ্যে বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করে থাকে এবং গোটা দেহটা তখন একটা বিশেষ ও নির্দিষ্টরূপে ক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। যেমন ক্ষুধা লাগলে খাবার তালাশ করা, ভয়ংকর জিনিস থেকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করা, শত্রুর সাথে লড়াই করা, কোন নতুন বস্তু দেখলে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্যে অনুসন্ধিৎসু হওয়া ইত্যাদি। কোন্ আবেগের প্রকাশ কিরূপ হবে তা পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি শিশুই কথা বলতে চায়। কিন্তু কোন্ ভাষায় কথা বলবে? এটা নির্ভর করে তার পরিবেশের উপর। সে যা কিছু তার চার পাশে বলতে শুনবে তারই অনুকরণ সে করবে।

অপরিহার্য প্রতিক্রিয়াজাত কাজের তুলনায় সহজাত আবেগ অনেক জটিল।

www.nagorikpathagar.org

–এতে মানুষের ইচ্ছাও চেতনারও কিছুটা ভূমিকা থাকে।
–পূর্ণ দেহটাই জড়িত হয়ে পড়ে।
–বিভিন্ন পদ্ধতিতে কার্যকর হতে পারে।
–প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এসব শক্তিতে কিছুটা পরিবর্তন সাধন সম্ভব হয়।

সহজাত যোগ্যতা ও ক্ষমতাসমূহ (CAPACITY)

যেসব সহজাত যোগ্যতা যা কার্যকর হতে বুদ্ধি, মেধা, চেতনা ও ইচ্ছার অসাধারণ ক্ষমতা থাকে, যেমন প্রশাসনিক যোগ্যতা, কোন বিশেষ বিষয়বস্তু বা বিষয়ের প্রতি বিশেষ ঝোঁক এবং নেতৃত্বের যোগ্যতা ইত্যাদি। যেহেতু এসবের সম্পর্ক মেধার সাথেও হয়ে থাকে, তাই অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের ফলে এসবের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন পরিবর্ধণেরও সম্ভাবনা থাকে। এজন্যে বিভিন্ন ব্যক্তির মাঝে এসব যোগ্যতা বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে।

অপরিহার্য প্রতিক্রিয়াজাত শক্তিসমূহ ও প্রশিক্ষণঃ

যেহেতু অপরিহার্য প্রতিক্রিয়াজাত শক্তিসমূহের কাজ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে এবং তাতে কোনরূপ পরিবর্তন সম্ভবই নয়; তাছাড়া এসব বাস্তবায়িত হওয়ার ব্যাপারে চেতনা ও ইচ্ছার কোন হাত থাকেনা; তাই এদিক দিয়ে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দানের কোন প্রশ্নই উঠেনা। অবশ্য অপরিহার্য প্রতিক্রিয়াজাত কার্যাবলীর ব্যাপারে দু'দিক দিয়ে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা, রয়েছেঃ

(ক) কতিপয় অপরিহার্য প্রতিক্রিয়াজাত কাজ এমন রয়েছে যেগুলো প্রকাশ পাওয়ার প্রাক্কালে সাধারণতঃ চেতনায় এসে যায়। যেমন হাঁচি দেয়া, মোড়ামুড়ি দেয়া, কাশি দেয়া, থুথু বা কফ বের হওয়া ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে শৈশবকাল থেকেই নিম্নের বিষয় গুলোতে অভ্যস্ত বানানো উচিত–

* কাশি দেয়া, হাই তোলা, বা হাঁচি আসা শুরু করলে মুখে হাত অথবা রুমাল ধরবে।

www.nagorikpathagar.org

* কফ বা থুথু গিলে ফেলার অভ্যাস পরিহার করতে হবে, কারণ এসব অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ।

* এক পাশে গিয়ে থুথু ফেলবে বা নাক সাফ করবে। যেখানে সেখানে এসব ঘৃণিত জিনিস ফেলবে না।

* নামাজ বা সভায় থাকা কালীন কাশি দেয়া ও হাই তোলাকে যথাসাধ্য দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ বার বার উচ্চ স্বরে কাশি দেবেনা এবং হাই তুলতে মুখ অধিক খুলবেনা।

* হাঁচি দেয়ার পর (اَلْحَمْدُ لِلّٰه) বলবে আর হাই তোলার পর বলবে (لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه) -এবং অপরের হাঁচির জবাবে বলবে-(يَرْحَمُكَ اللّٰهُ)-

(খ) দ্বিতীয় লক্ষ্যনীয় দিক হলো অপরিহার্যতাকে শর্তাধীন বা সংশ্লিষ্ট করে নেয়া বা হয়ে যাওয়া (Conditioning of Reflexes)। অনেক সময় সহজাত ক্রিয়াকর্ম বা অপরিহার্য কার্যাবলী প্রকৃত কার্যকারণ ছাড়াও কোন কৃত্রিম (Artificial) কার্যকারণ হেতু কার্যকরী হতে থাকে। এসবকে শর্তাধীন বা সংশ্লিষ্ট অপরিহার্য কার্যাবলী বলে।

এমনটি হয় কেন?

জন্ম গ্রহণের পরেই প্রত্যেক ব্যক্তিই নিত্য দিন অসংখ্য অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। তাতে কিছু থাকে তিক্ত আর কিছু মিষ্ট, কিছু উপকারী আর কিছু ক্ষতিকর। প্রকাশ থাক যে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সহজাত বা অপরিহার্য কার্যাবলী বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এখন যে লোক পরিবেশ পরিস্থিতি বা বস্তুরাজির সাথে যেরূপ অভিজ্ঞতার মিলন ঘটবে, তাদের সাক্ষাত ঘটার সাথে সাথেই ঠিক তদ্রূপ কাজই সংগঠিত হতে থাকবে। বাস্তবে এরূপ অভিজ্ঞতার সুযোগ না আসলেও তাই হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অন্ধকার রাত মুলতঃ স্বয়ং রাত হিসেবে কোন ভয়ের জিনিস নয়। কিন্তু একটি শিশু যদি অন্ধকার রাতে কোন কষ্টদায়ক জন্তু বা পোকামাকড় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কোন কিছুর সাথে ধাক্কা খেয়ে চোট পায় তখন থেকে সে অন্ধকারকে ভয় করতে শুরু করে। সেখানে কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর কিছু না থাকলেও সে ভয় পাবেই। একটা

www.nagorikpathagar.org

দুগ্ধ পোষ্য শিশুর জন্যে মাতৃক্রোড়ের চেয়ে অধিক আকর্ষণীয় জিনিস আর কী থাকতে পারে? কিন্তু দুগ্ধ বন্ধ করার জন্যে তিক্ত ঔষধ, কুইনাইন বা কোন কড়া তিক্ত জিনিস স্তনে লাগিয়ে দেয়া হয় এবং স্তন মুখে দেয়া মাত্রই শিশু যখন মুখে বারবার তিক্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন সে কেবল মুখ লাগানোই বন্ধ করেনা বরং মায়ের বুক দেখা মাত্রই সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কোন জন্তু অথবা আশেপাশে সচরাচর যেসব জীবজন্তু পাওয়া যায়, অবোধ শিশুরা সেসব জীবজন্তুকে খুব পছন্দ করে ও ভালবাসে। এসবের সাথে খেলতে চায়, কান্নার সময় ওদের দেখলে থেমে যায়। কিন্তু যে কচি শিশুটির আংগুলে তোতা পাখী ঠোকর দিল, অথবা ঘেউ ঘেউ করে একটা কুকুর তাকে তেড়ে আসলো, কিংবা দু'টি বিড়ালের লড়াইয়ের বিকট আওয়াজে যে শিশুর ঘুম ভয়ে ভেঙে গেল, সে এসবের কারো নাম শুনা মাত্র ভয় পায় এবং এগুলোকে দেখলেই তার গায়ের পশম খাড়া হয়ে যায়।

কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে মোকাবিলায় বারবার ব্যর্থ পরাজিত শিশু ময়দানে অবতরন মাত্রই তার দেহের ঘাম নির্গত হতে থাকে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্র পরীক্ষার নামে ভয় পায়। পক্ষান্তরে বিজয়ী বালক এবং মুকাবিলায় অধিক নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র পরীক্ষাকে স্বাগত জানায়।

যদি একটি কচি শিশুর সামনে রংগীন খেলনা তুলে ধরা হয়, আর সে নেয়ার জন্যে হাত বাড়ায় তখন পেছন থেকে ভয়ংকর ও বিকট শব্দ করা হলে সে ভয় পেয়ে যায়। একাজটি যদি বারবার করা হয় তবে এর ফলে খেলনার মত আকর্ষণীয় জিনিসও যখন সামনে তুলে ধরা হয় তখন শিশু ভয় ও শংকার ভাব প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু যখন ভীতিকর বিকট আওয়াজ সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ঐ একই খেলনা তুলে ধরার সাথে সাথে প্রত্যেকবার কিছু মিষ্টান্নও তাকে দেয়া হয়, তাহলে খেলনার প্রতি তার যে ভয় জন্মেছিল, আস্তে আস্তে তা বিদুরিত হয়ে যায়।

একটি বালককে অত্যন্ত স্নেহ-মমতা দিয়ে কালামে পাক পড়ানো হয়। তার হাতে যে কুরআন মজীদ দেয়া হয়, তা কাগজে খুব সুন্দর হরফে ছাপা হয়, জিলদ পাক-পবিত্র, উত্তম, মূল্যবান এবং গেলাফ রংগীন। যখনই সে কুরআন হাতে নিয়ে পড়তে বসে, তাকে সাবাস ও বাহবা দেয়া হয় এবং খুব সুনজরে তাকে দেখা হয়, ক্রমাগত এসব আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতা লাভের ফলে কুরআন মজীদের সাথে তার একটা অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং সে তা দেখা মাত্র

www.nagorikpathagar.org

নেয়ার জন্য লাফিয়ে পড়ে। কিন্তু আচরণ ও ব্যবহার যদি হয় এর উল্টো, তবে সে কুরআনের আকৃতি দেখেই ভয় পেয়ে যায় এবং মনের আগ্রহে তিলাওয়াতটুকুও করতে চায় না।

কোন ছেলে অংকের ঘন্টায় প্রায়ই শিক্ষকের হাতে মারধোর ও ধমক খেয়ে থাকে। আস্তে আস্তে এ বিষয়টির প্রতিই ছেলেটির ঘৃণা জন্মে যায়, কেননা এ বিষয়টির সাথে তার অতি তিক্ত অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে রয়েছে। মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এমনটিই হয়ে থাকে। একজন শিক্ষক শিশু ছাত্রদের সাথে অত্যন্ত স্নেহ-মমতা পূর্ণ আচরণ করেন। কঠোর পরিশ্রম করে পড়ানোর সাথে সাথে তাদের খেলাধূলা করা ও আমোদ ফূর্তি করার সুযোগও করে দেন। একান্ত জরুরী অবস্থায় কখনো অপারগতা সত্ত্বেও কঠোরতা অবলম্বন করলেও দরদী মাতা পিতার মতই স্নেহ-মমতাও সুন্দর আচরণ দ্বারা তৎক্ষনাৎ তার প্রতিবিধান করে দেন। এ ধরণের শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়লে ৭/৮ বছরের বালক তার সেবা শুশ্রূষার জন্যে যায়। স্বাস্থ্যের উন্নতি কামনা করে দোয়া করে। দীর্ঘ ছুটির পর ঐ শিক্ষক বাড়ী থেকে আসতে বিলম্ব হলে ছাত্ররা অস্থির হয়ে পড়ে এবং সত্বর আসার জন্যে তারা চাঁদা করে তারবার্তা পাঠায়। পক্ষান্তরে যে শিক্ষক ছাত্রদের প্রায়ই বকাবকি, মারধোর ও ধমকা-ধমকি করে থাকে, বৈধ গন্ডির মধ্যেও তিনি ছাত্রদের আকর্ষণীয় চিত্তবিনোদনের প্রতি খেয়াল রাখেন না, ছাত্ররা তাঁর চেহারা দেখেই ভয় পেতে থাকে। তাকে অভিশাপ দেয়। তিনি অসুস্থ হলেই ছেলেদের মধ্যে রটে যায় যে তিনি মরে গেছেন, এমনকি কোন অভিভাবক সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্যে এসেও যান। মূলতঃ এটা হচ্ছে ঐ শিক্ষকের দুর্ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ঘৃণার বহির্প্রকাশ। অনুমান করুন, যার চেহারা দেখা মাত্র ছাত্রদের মধ্যে দারুন বিস্ময় ও ভীতিকর ভাব সৃষ্টি হয়, এমন শিক্ষকের কি প্রভাব তারা গ্রহণ করবে?

মিথ্যা, চুরি, সচ্চরিত্র, সম্প্রীতি ও মিশুকতা, বদমেজাজী ও রুক্ষতা, ধৈর্য, সংযম ও সহনশীলতা, কিংবা খিটখিটে মেজাজ, কোন বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বা ঘৃণা, কোন ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা কিংবা শত্রুতা ও বিদ্বেষ, বিড়াল কুকুর বা অন্ধকারকে ভয় করা, জন্তু-জানোয়ারদের পীড়ন করা বা তাদের প্রতি দয়া করা, লেখাপড়ায় পরিশ্রম করা বা তা থেকে পলায়নী মনোভাব প্রভৃতি মূলতঃ শর্তাধীন, অপরিহার্য ও সহক্রিয়া কর্ম মাত্র, যা সারা জীবন সংঘটিত হতে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

লক্ষ্যণীয় বিষয়ঃ

অপরিহার্য প্রতিক্রিয়াজাত শক্তিসমূহের পরিবেশ এবং এ পরিবেশের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সাথে এরূপ শর্তাধীন ও সংশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়া মানব চরিত্র ও আচরনের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। জীবন শুরুর কোন কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা মানুষের মন-মস্তিষ্কে এমন গভীর নক্‌শা অংকন করে দেয়, আজীবন যা অক্ষয় হয়ে থাকে। আর যেসব মানুষ পরিস্থিতি বা ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতির সাথে এসব তিক্ত অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়, এসবের সম্মুখীন হওয়া মাত্র অপরিহার্য রূপে সেই অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমনঃ উত্তেজনা, ক্রোধ, ভীতি, অনীহা, খুশী, বিষাদ, প্রেম, ভালোবাসা, সহমর্মিতা ইত্যাদির অবস্থা। চাই তা সঠিক উপকারী ও জরুরী হোক কিংবা ভ্রান্ত, অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর; এরই ভিত্তিতে অপরিহার্য শক্তিগুলোর শর্তাধীন বা সংশ্লিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনঃ

* মাতাপিতার উচিত, পছন্দনীয় ও সুন্দর অভ্যাস, আচার-আচরণ, কাজকর্ম ও নীতি-নৈতিকতা বিকশিত করে তোলার ব্যাপারে পরিচালিত সমস্ত প্রয়াস প্রচেষ্টার সঙ্গে জীবনের প্রারম্ভ থেকেই সন্তোষজনক অভিজ্ঞতা সমূহকে সম্পৃক্ত করে দেয়া। তাতেই শিশুরা অনুরূপ করতে আনন্দবোধ করবে এবং বারবার এসব কাজ অনুভব করবে এবং বার বার এমনি ভাবে করতে থাকলে, করতে করতে তারা সুন্দর ও পছন্দনীয় অভ্যাস ও স্বভাব এবং সচ্চরিত্র ও আচরণের অধিকারী হবে।

* বাড়ীতে এর তেমন কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে না পারলে অবিলম্বে শিশুদেরকে কোন ভালো বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিতে হবে।

* শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা একান্ত আনন্দঘন পরিবেশে এবং অত্যন্ত স্নেহ্ মমতার মধ্যে হওয়া উচিত। তাছাড়া তা হবে এমন ব্যস্ততা ও কর্মোদ্দীপনার মাধ্যমে, যাতে শিশুদের মানসিক আকর্ষণ থাকে,তাহলে লেখাপড়া এবং বিভিন্ন বিষয় ও কাজকর্মের সাথে শিশুদের আন্তরিকতা ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হবে।

* পড়ার সময় যদি কোন কথা সহজে শিশুদের বুঝে না আসে, তাহলে তাতে উত্তেজিত হওয়া যাবেনা এবং শাস্তি দেয়া চলবেনা। কারণ, এতে

www.nagorikpathagar.org

বিষয়টির প্রতি শিশুদের ঘৃণা-সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। শান্ত মেজাজে বুঝানোর চিন্তা করতে হবে।

* অবহেলা বা অমনোযোগিতার কারণে যদি শিশুদের মাঝে কোন অপছন্দনীয় শর্তযুক্ত অপরিহার্য স্বভাব স্থান পেয়ে যায়, যেমন মাতাপিতা অথবা শিক্ষকগণের অসংগত আচরণের দরুন তাঁদের প্রতি ঘৃণা, কুকুর, বিড়াল কিংবা অন্ধকারের ভয়, বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও কাজকর্মের প্রতি অনীহাভাব ইত্যাদি, তাহলে এসবের সাথে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতাসমূহ সম্পৃক্ত করে যথাশীঘ্র সম্ভব এরূপ স্বভাবের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। ঘৃণা ও বিক্ষুব্ধভাব কাটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষক ও মাতাপিতাকে ছেলে-মেয়েদের সাথে ক্রমাগত স্নেহ মমতা পূর্ণ আচরণ প্রদর্শন এবং সুন্দর ও সদাচরণের মাধ্যমে পূর্বের ভুল ত্রুটিও অবহেলার পুরোপুরি প্রতিবিধান করতে হবে। যেসব বিষয় ও কাজ কর্মের প্রতি তারা বিরক্ত ও অনীহা প্রকাশ করে, সেগুলোর পাঠদানকে সহজতর ও আকর্ষণীয় করার জন্যে মডেল, চিত্র ও চার্ট ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। ছেলেমেয়েরা যে কোন স্তরেই উন্নতি করুক না কেন, তাদেরকে সাহস দিয়ে আরো বেশী চেষ্টা সাধনা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অন্ধকারে খেলার সরঞ্জাম ও খাওয়ার সামগ্রী রেখে দিয়ে তা আনার জন্যে তাদেরকে আগ্রহী করতে হবে। মোটামুটি এভাবে শিশুদের তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রশমনের জন্যে ঐসব জিনিসের সাহায্যে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা সমূহকে সম্পৃক্ত করার চিন্তা করতে হবে। আশা করা যায় ইনশায়াল্লাহ, বাল্যকালেই দ্রুত সংশোধন হয়ে যাবে। অন্যথায় তাদের ওসব অভ্যাস দৃঢ় হয়ে সারা জীবন তাদের ব্যক্তি সত্তাকে দুর্বল করে রাখবে এবং অশোভনীয় আচরণ ও অপছন্দনীয় কাজের প্রদর্শনী করে ছাড়বে।

www.nagorikpathagar.org

সহজাত প্রকৃতি ও আবেগ প্রবনতাসমূহ

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ

প্রত্যেক শিশু ইসলামের স্বভাব প্রকৃতির উপরই জন্ম নেয়। (হাদীস)

আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। এই পদের দাবিসমূহের মধ্যে মানুষের উপর তিন ধরনের দায়িত্ব অর্পিত হয়- ১) ব্যক্তিগত, ২) পারিবারিক ও ৩) সামাজিক।

এসব দায়িত্বের নিরীখে আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রত্যেক মানুষকে জন্মগতভাবে বিভিন্ন প্রকার শক্তি ও যোগ্যতা দান করে সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে সহজাত প্রকৃতিগুলো উল্লেখযোগ্যঃ-

সহজাত প্রকৃতি বলতে মূলতঃ এমন সব স্বভাবজাত দাবিসমূহ্ বা মৌলিক আশা-আকাংখা ও কামনা বাসনাকে বুঝায় যা শিশুকাল থেকেই আমাদের প্রতিটি ক্রিয়া কর্মের ও ব্যস্ততার নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। আমাদের এই নিয়ামক শক্তিই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াকান্ড, গতিবিধি এবং অভ্যাস-আচরণের পেছনেও সক্রিয় থাকে এবং আমাদের আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতি সাধনে সাহায্য করে থাকে। এভাবে সহজাত প্রকৃতিগুলোকে তিন শ্রেণীতে বিন্যাস করা যেতে পারেঃ-

* ব্যক্তিসত্তা সংক্রান্তঃ এমন সব সহজাত প্রকৃতিকে বলা হয়, যা প্রাণ রক্ষা ও দেহের সঠিক কার্যাবলীতে সহায়তা করে। যেমন, খাদ্যের অন্বেষণ, সম্পদ পুঞ্জিভূত করণ, অনুসন্ধান, যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি, পলায়নী মনোবৃত্তি ইত্যাদি।

* পরিবার সংক্রান্তঃ অর্থাৎ পরিবারের স্থায়িত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের সহায়ক। যেমনঃ দাম্পত্য ও জনক-জননী সংক্রান্ত প্রকৃতিসমূহ।

www.nagorikpathagar.org

* সমাজ সংক্রান্তঃ অর্থাৎ এমন সব সহজাত প্রকৃতি, যা মানুষকে সামাজিক জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন- গোষ্ঠী স্বভাব, আত্মমর্যাদা বোধ, আত্মমর্যাদাহীণতা বোধ, প্রভাবান্বিত হওয়া, প্রভাবশীলতা, সহমর্মিতা, অনুকরণপ্রিয়তা ইত্যাদি।

সহজাত প্রকৃতির বৈশিষ্টসমূহঃ

মানুষের সহজাত প্রকৃতিতে নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টগুলো পাওয়া যায়। শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এসব বৈশিষ্টের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করলে শিশুদের সুষমামন্ডিত ও ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশে অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে থাকে।

১) সার্বজনীনতাঃ অর্থাৎ এসব সহজাত প্রকৃতি সকল মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়। কোন বিশেষ ব্যক্তি গোষ্ঠী বা জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। অবশ্য কঠোরতা ও নম্রতা অনুপাতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য হয়ে থাকে। একই স্বভাব একজনের মধ্যে থাকে অতি কঠোর আর অন্যজনের মধ্যে থাকে তুলনামূলকভাবে কোমল। তেমনিভাবে এ সবের বাস্তব রূপ লাভ করার অবস্থা ও পন্থার মধ্যেও পার্থক্য থাকে। এক ব্যক্তি নিজের পরিবেশ, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও প্রভাবশালী আদর্শের প্রভাবাধীন থেকে নিজের একটি প্রকৃতিকে যেভাবে কার্যকর করে, অন্য ব্যক্তি সেই একই ধরনের প্রকৃতিসমূহের প্রভাবাধীনে সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করে থাকে। এ জন্যেই বিভিন্ন লোকের চরিত্র ও আচরণ-অভ্যাসের মধ্যে এত বিপুল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

২) সহজাত প্রকৃতিসমূহ স্বভাবজাত এবং জন্মের সাথেই পাওয়া যায়। তবে সবগুলো এক সময়ে প্রকাশিত হয় না বরং আস্তে আস্তে শক্তি ও প্রয়োজন অণুপাতে নিজস্ব গতিতে সময়মত এগুলো প্রকাশ পায়। প্রথমে শিশুদের সেই সব সহজাত প্রকৃতিসমূহ কাজ করা শুরু করে তাদের ব্যক্তি সত্তার সাথে যেগুলোর সম্পর্ক। তন্মধ্যেও খাদ্যের অন্বেষণ সর্বাগ্রে। শিশু ভূমিষ্ট হওয়া মাত্র খাদ্য তালাশ করে, অতঃপর ক্রমান্বয়ে কিছু ধরা, হামাগুড়ি দেয়া, বসা, দাঁড়ানো ইত্যাদি প্রকৃতি প্রকাশিত হয়। তারপর আস্তে আস্তে অনুসন্ধান, পলায়ন,

www.nagorikpathagar.org

যুদ্ধভাব, নির্মাণ ও সঞ্চয়ী মনোবৃত্তি ইত্যাদি প্রকৃতির প্রকাশ ঘটে।

ব্যক্তিগত প্রকৃতির পর গোষ্ঠী ও সমাজগত স্বভাব কাজ করা শুরু করে। যৌবনের সূচনায় যৌন প্রবৃত্তির চিহ্নসমূহ প্রকাশ পায়। আর সবশেষে দৃষ্ট হয় পিতৃমাতৃ স্বভাবের। এভাবে একটি স্বভাব জীবনের স্তরে থাকে অত্যন্ত জোরদার। কিন্তু জীবনের অন্য পর্যায়ে তা হয়ে পড়ে স্তিমিত। যেমন, শৈশবকালে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু স্বভাব থাকে পূর্ণ। যৌবনকালে থাকে যৌন স্বভাবের জোর। শিক্ষাদানের সময় এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। জীবনের যে স্তরে যে স্বভাবের প্রকাশ ও তীব্রতার সময় হয়, তখন সেই স্বভাবের প্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত দিক নির্দেশনা দিতে হবে। সময় হওয়ার পূর্বে তাতে সুড়সুড়ি দেয়া অথবা সময় হলেও উপযুক্ত দিকনির্দেশনার ব্যবস্থা না করা উভয়ই ক্ষতিকর।

৩) উত্তেজক ও উদ্দীপক শক্তি ছাড়া সহজাত প্রবৃত্তিসমূহ সক্রিয় হয় না। অর্থাৎ সহজাত প্রকৃতিসমূহ নিস্প্রয়োজনে নিজে নিজেই সক্রিয় হয়ে যায় না। বরং এসবকে সক্রিয় করতে হলে কোন না কোন উত্তেজক ও উদ্দীপক শক্তির প্রয়োজন হয়। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী হলেই যুদ্ধভাব জাগ্রত হওয়ার সুযোগ আসবে। বিস্ময়কর কোন জিনিস দেখলেই তখন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু মন জাগবে। অবশ্য অনেক সময় প্রকৃত উদ্দীপক শক্তির স্থলে কেবল তার ধারণাই উত্তেজনা সৃষ্টির কাজ করে থাকে।

৪) নিস্ক্রিয় ও অব্যবহৃত রাখলে দুর্বল হয়ে পড়ে। অর্থাৎ কোন সহজাত শক্তির প্রকাশ বা উন্মেষের জোরদার হওয়ার যে সময়, তখন যদি তাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো না হয় বরং নিস্ক্রিয় রাখা হয় তবে সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তা খুব দুর্বল হয়ে পড়ে কিংবা অনেক সময় মরে যায়। ফলে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ এ অমূল্য সম্পদ দান করেছিলেন, সেই উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে আমাদের সামনে নেকড়ে বাঘের আশ্রয়ে পালিত মানব শিশুদের উদাহরণ বিদ্যমান। কথা বলা, উঠা বসা, চলা ফেরা ইত্যাদির ব্যাপারে এরা যথা সময়ে আপন পিতামাতার অনুকরণের সুযোগ পায়নি। ফলে মানুষের হাতে আসার পর সারা জীবন তাদের শিক্ষা দেয়া সত্ত্বেও এ সবকিছু তাদের শেখানো সম্ভব হয়নি। অথচ প্রত্যেক মানব শিশুই মাতাপিতার পক্ষ থেকে বিশেষ কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই কেবল অনুকরণের মাধ্যমে এ জিনিসগুলো নিজে নিজেই শিখে নেয়। এজন্যে এসব সহজাত শক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন অথবা সেগুলোকে দমিয়ে রাখার পরিবর্তে এসবের যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থা

www.nagorikpathagar.org

নেয়া উচিত।

৫) সান্তনাদানে আনন্দিত নতুবা অস্থির হয়ে থাকে। অর্থাৎ সহজাত শক্তির দাবী–চাহিদাগুলো পূরণ হয়ে গেলে মানুষ আনন্দ, শান্তি ও স্বস্তি পায়। কিন্তু তা পূরণে কোন বাধার সৃষ্টি হলে কিংবা অন্য কোন কারণে তা অপূর্ণ থেকে গেলে সে লোকটি পেরেশানী, অশান্তি, অস্বস্তি ও অসন্তুষ্টি অনুভব করে। এজন্যে বৈধ সীমা ও গন্ডির মধ্যে তাদের আনন্দ দান ও চিত্তবিনোদনের পূর্ণ ব্যবস্থা করা উচিত। অন্যথায় শিশুদের ব্যক্তিসত্তার ওপর এর অনেক খারাপ প্রভাব পড়তে পারে।

৬) মানুষের সহজাত প্রকৃতিসমূহ অনেক বেশী গতিশীল। শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে এসবের যথেষ্ট পরিবর্তন সূচিত করা সম্ভব। জীবজন্তুর তুলনায় মানুষের সহজাত প্রকৃতিসমূহের মধ্যে গতিশীলতা অধিক। অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ, অনুকরণ ও চিন্তা–ভাবনার ফলে এসবের প্রকাশের দিকগুলোতে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন, আমাদের সমাজে জীবিকা লাভের কত পন্থা প্রচলিত আছে। অথচ সবার পেছনে একই সহজাত প্রকৃতি অর্থাৎ খাদ্য অন্বেষণ শক্তি কার্যকর রয়েছে। সুতরাং নিজস্ব এই বৈশিষ্টের কারণে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফায়দা উঠানোর ক্ষেত্রে অন্যান্য জীবজন্তুর চেয়ে মানুষ অনেক বেশী সার্থক। মৌমাছি অতি সুন্দর সুপরিমিতভাবে তার মৌচাক বুনে। কিন্তু চিরকাল সে সর্বাবস্থায় কেবল একই ধরনের বাসা তৈরী করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে মানুষ নিজেদের নির্মাণ সত্তাতে বহুমূখী পদ্ধতি কার্যকর করে আসছে। বস্তির ঝুপড়ি থেকে আকাশচুম্বী শানদার কার্যময় প্রাসাদসমূহ, ভারী যন্ত্রপাতি ও বিশালায়তনের কারখানাগুলো কিসের ইঙ্গিত করছে। মানব জাতিকে একটা চমৎকার ও উৎকৃষ্ট সভ্যতা–সংস্কৃতির অধিকারী বানানোর পেছনে প্রকৃত পক্ষে সহজাত প্রকৃতির শিক্ষা লাভের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

মানুষের সহজাত প্রকৃতি ও আবেগ প্রবণতা

আবেগ অনুভূতি বলতে বুঝায় মানুষের সেসব প্রিয়–অপ্রিয়, মনঃপূত ও অসহনীয় শক্তিশালী প্রতিক্রিয়াসমূহ, যেগুলো মানুষের মন মস্তিষ্কে সংকট সৃষ্টি করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। এ সবের প্রভাবাধীনে আমাদের থেকে যেসব

www.nagorikpathagar.org

ক্রিয়াকান্ড প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাতে জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেকের তেমন কোন হাত থাকে না। যেমনঃ ক্রোধ, ভয়, বিস্ময়, ঘৃণা, দুঃখ, অহংকার ইত্যাদি।

সহজাত প্রকৃতি ও আবেগ অনুভূতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রায় প্রত্যেক সহজাত প্রকৃতির সাথে কোন না কোন আবেগ অবশ্যই সম্পৃক্ত থাকে। কোন লোক যদি বিশেষ কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং কোন উত্তেজক ও উদ্দীপক শক্তি তার কোন সহজাত প্রকৃতিকে উস্কিয়ে দেয়, তখন এর সাথের আবেগ এগিয়ে আসে ও প্রকাশ পায়। যেমনঃ

১) অনুসন্ধান, গবেষণা ও আবিষ্কার জাতীয় সহজাত প্রকৃতির সাথে আশ্চর্য, অবাক ও বিস্ময় জাতীয় আবেগ;

২) জিঘাংসা প্রকৃতির সাথে ক্রোধ, উত্তেজনা ও বিস্ময় সূচক আবেগ;

৩) পলায়নী প্রকৃতির সাথে ভয় সূচক আবেগ প্রবণতা;

৪) পুঞ্জিভূতকরণ প্রকৃতির সাথে মালিকানা সূচক আবেগ প্রবণতা;

৫) নির্মাণ প্রকৃতির সাথে সৃষ্টি ও উদ্ভাবন সূচক আবেগ প্রবণতা;

৬) যৌন প্রকৃতির সাথে যৌনাবেগ সূচক আবেগ প্রবণতা;

৭) পিতৃ-মাতৃ সুলভ প্রকৃতির সাথে স্নেহ মমতা সূচক আবেগ;

৮) অট্রহাসি প্রকৃতির সাথে আনন্দ উল্লাস;

৯) খাদ্যান্বেষণ প্রকৃতির সাথে ক্ষুধা ও লালসা সূচক আবেগ;

১০) আত্মগৌরব প্রকাশ প্রকৃতির সাথে দম্ভ, অহংকার ও আত্মপ্রকাশের আবেগ;

১১) আত্মবিনয়ী সূচক প্রকৃতির সাথে আত্মসমর্পণ, নির্ভরশীলতা, দাসসুলভ মনোবৃত্তি ও সন্তুষ্টি কামনার আবেগ;

১২) গোষ্ঠীগত স্বভাবের সাথে স্বার্থ, চেতনা, একাকীত্বভাব ও নিঃস্বতার আবেগ;

১৩) অসন্তুষ্টি ও বিদ্বেষের সাথে ঘৃণা ও অবজ্ঞার আবেগ;

১৪) দোহাই দেয়ার সাথে দুঃখ কষ্ট ও দুশ্চিন্তার আবেগ;

সহজাত প্রকৃতি ও আবেগ প্রায়ই পরস্পর এতই সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে যে, একটা কারণ, অন্যটা কার্যকারণ ও ফলাফল। উভয়ই একই কারণের কার্যকারণ ও ফল অনুভূত হয়। এমনিভাবে অনেকগুলো সহজাত প্রকৃতি ও আবেগ প্রবণতার মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। বরং সাধারণ কথাবার্তায় উভয়ের জন্যে একই শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- গোস্বা, হিংসা, দুঃখ, ভালবাসা,

www.nagorikpathagar.org

ঘৃণা, ভয় ইত্যাদিকে আমরা আবেগও বলি তেমনি সহজাত প্রকৃতিও বলে থাকি।

আবেগ অনুভূতির বৈশিষ্ট

আবেগের নিম্নোক্ত বৈশিষ্টসমূহ রয়েছেঃ

১) মানসিক ভারসাম্যকে তা নষ্ট করে দেয় এবং মানুষকে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করার বা যথার্থ সিদ্ধান্ত নেয়ার উপযুক্ত রাখে না। এজন্যে আবেগসমূহের অধীনে এমন সব কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যার কারণে পরবর্তীকালে মানুষকে লজ্জিত হতে হয়।

২) দৈহিক সংকট সৃষ্টির কারণ হয়ে পড়ে। আমাদের অংগ-প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থায় যেভাবে কাজ করে, আবেগের বশীভূত হলে তাতে নানা প্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। হৃদ ক্রিয়া ঘন হওয়া, ঘাম বের হওয়া, বিভিন্ন ধরনের তরল পদার্থ নির্গত হওয়া, পশম খাড়া হয়ে যাওয়া, দেহে কম্পন সৃষ্টি হওয়া, মুখমন্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করা বা ফ্যাকাশে হওয়া, নাকের ছিদ্র ফুলে যাওয়া, মুখে শ্লেষ্মা এসে যাওয়া। মোট কথা সারা দেহে একটা বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয়। হজম শক্তি, রক্ত প্রবাহ, দেহের অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বের হয়ে যাওয়া প্রভৃতি প্রতিটি ব্যাপারই প্রভাবিত হয়। এ কারণেই অধিক আবেগপ্রবণ লোকদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না। তাই দুশ্চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট ও ক্রোধের সময় খানা খেতে নিষেধ করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে প্রশান্ত মনে নিশ্চিন্তে অথবা বন্ধু- বান্ধবের সাথে খেলে অধিক খাওয়াও যায় এবং সহজে হজমও হয়ে থাকে।

৩) আবেগের ধরন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তাগত, সহজাত ও আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা প্রসূত হয়ে থাকে। একই ঘটনায় বিভিন্ন ব্যক্তির উপর বিভিন্ন ধরনের আবেগপ্রবণতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। যেমন- কোন ব্যক্তির মৃত্যু তার স্ত্রী, সন্তানাদি, বন্ধু-বান্ধব ও বিরোধীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আবেগ সৃষ্টি করে। এসব আবেগের ধরন ও পরিমাণেও পার্থক্য হয়ে থাকে। স্বয়ং একই ব্যক্তির উপর বিভিন্ন পরিস্থিতি ও পটভূমিতে একই বস্তু বা একই ধরনের ঘটনা প্রবাহ যেসব অবস্থা সৃষ্টি করে তাতেও ভীষণ বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তেমনিভাবে এক ব্যক্তির উপর যা কিছু ঘটতে থাকে এর সঠিক অনুভূতি কেবল তারই হয়ে

www.nagorikpathagar.org

থাকে। অন্য কেউ সঠিকভাবে তা অনুমাণ করতে পারে না। এ জন্যেই মূলতঃ কোন ব্যক্তির আবেগ প্রবণতা সম্পর্কে বাইরে থেকে যারা অনুমানে কথা বলে, তারা বড় মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়ে থাকে।

৪) আবেগ সংক্রামক ও সঞ্চরণশীল হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক ব্যক্তির উপর যেসব আবেগ প্রাধান্য বিস্তার করে, তা প্রত্যক্ষকারীদের মধ্যেও সংক্রামিত ও সঞ্চারিত হতে থাকে। একজনকে চিন্তাগ্রস্ত ও ক্রন্দনরত দেখলে সবার চেহারায় বিষণ্নতা ছেয়ে যায়; আবার হর্ষোৎফুল্ল ও খোশমেজাজের লোকদের সংস্পর্শে সবার চেহারায় আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়।

৫) আবেগ সাধারণ কথায়ও উত্তেজিত হতে পারে। আর উত্তেজনার কোন সীমা থাকে না। লেনদেনের ব্যাপারে একটি নতুন পয়সার জন্যে ঝগড়া করা, সাধারণ কথায় কথায় চাকু মারামারি ও খুন করার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া, হাস্য রস করতে করতে সারা জীবনের জন্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি নিত্য দিনের অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুস ঘটনা।

৬) দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হওয়ার ফলে ভিন্ন রূপ ধরে মুড পরিবর্তন হয়ে যায়। দুই ব্যক্তি পরস্পর ক্ষিপ্ত হলে সাধারণ কথায় সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে যায় বরং অনেক সময় ক্ষিপ্ত হয় একজনের উপর। কিন্তু আক্রোশ ঝাড়তে থাকে অন্যের উপর। খুশী ও আনন্দের কিংবা স্নেহ-প্রীতি ও ভালবাসার আবেগ প্রবল ও কার্যকর হলে অপ্রিয় ও অপ্রীতিকর কথাও সহজে হজম করা যায়।

৭) আবেগ প্রবণতার মধ্যে ফিরে যাওয়া বা গতি পরিবর্তন করার যোগ্যতাও থাকে। যেসব শিশু মারামারি করে, পরস্পরকে বিরক্ত ও উত্তেজিত করে অথবা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে, তারা আপোষে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যায়। তাদের পরস্পরের মারামারি ঝগড়া ঝাটি করা বা একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলাও মূলতঃ তাদের আন্তরিকতারই প্রমাণ। বিশেষতঃ শৈশবকালে সহোদর ভাইবোনদের মধ্যে আপোষে যে ঝগড়া ও মারামারি তা তো সাধারণতঃ অস্বাভাবিক গাঢ় সম্পর্কেরই ফল।

৮) আবেগ প্রবণতা সার্বজনীন। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সকলের আবেগই উত্তেজিত হতে পারে। অবশ্য অবোধ ও অবুঝ শিশু এবং যুবকদের মধ্যে তা হয় অত্যন্ত তীব্র। শিশুরা অতি দ্রুত উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তাদের আবেগ এত তীব্র যে সাধারণ কথায়ও তারা চিৎকার করতে ও মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকে। কিন্তু এই অবস্থা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে। সে অতি সত্তর তা ভুলেও যায়।

www.nagorikpathagar.org

অশ্রু সিক্ত মুখমন্ডলে হঠাৎ তাদের হাসি ফুটে উঠতে সম্ভবতঃ সবাই দেখতে পেয়েছেন। যৌবনকালে আবেগের আতিশয্যে বেপরোয়া হয়ে আত্মহত্যা করতে পর্যন্ত তা বাধ্য করে।

৯) আবেগকে উত্তেজিত করার পেছনে মানুষের মেজাজেরও হাত রয়েছে। শ্লৈষ্মিক মেজাজের লোকের তুলনায় রক্তিম মেজাজের লোকেরা অতি দ্রুত উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। গম্ভীর মেজাজের লোকেরা দ্রুত ক্ষিপ্ত ও অতি আবেগ প্রবণ হয় এবং সব কিছুই নিজের দিকে টেনে নেয়। অপর দিকে কড়া ও খিটখিটে মেজাজের পিত্তরস লোকেরা নিজের আবেগকে কখনো দমন করতে পারে না এবং সত্তর নৈরাশ্য বা ভীরুতার শিকার হয়ে পড়ে। এমনটি হওয়ার কারণ, এসব আবেগ প্রবণতা প্রাধান্য বিস্তার করলে দেহের অভ্যন্তরে যেসব রাসায়নিক পরিবর্তন সুচিত হয়, সে সবের কিছু অংশ প্রথম থেকেই সক্রিয় থাকে। ফলে সামান্য আন্দোলন উত্তেজনাই 'সোনায় সোহাগা'র কাজ করে।

১০) একই আবেগ পুনঃ পুনঃ প্রাধান্য লাভ করলে তা আবেগ তাড়িত অভ্যাস সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একই ব্যক্তিকে বার বার উত্তেজিত করলে সে খিট খিটে মেজাজের হয়ে যায়। একাধারে নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার শিকার হতে থাকলে নৈরাজ্যবাদ এবং ধারাবাহিকভাবে বারংবার সাফল্য লাভের অবস্থায় আশাবাদ মানুষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। লাগাতার অবজ্ঞা ও অবহেলা করার ফলে হীনমন্যতাবোধ (inferiority complex) এবং একাধারে মর্যাদা প্রাপ্তির ফলে শ্রেষ্ঠত্ববোধ (superiority complex) বিকশিত হয়। বিভিন্ন ব্যাপারে আমাদের আচরণ অনুভূতি ও ঝোঁক প্রবণতা এরই ফলে জন্ম নিয়ে থাকে।

সহজাত প্রকৃতি ও আবেগ অনুভূতির গুরুত্ব

আমাদের জীবনে সহজাত প্রকৃতি ও আবেগ অনুভূতির গুরুত্ব অপরিসীম। এটিই আমাদের চরিত্রের ভিত্তি, কর্মের উৎস, যাবতীয় ক্রিয়া কান্ডের উদ্দীপক এবং স্বভাব ও অভ্যাসের মূল ভান্ডার। জীবন সংগ্রামে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য হাতিয়ার সাজসরঞ্জাম এবং গোলাবারুদের কেন্দ্র, জীবন যুদ্ধে এসবই হচ্ছে মানুষের হাতের অস্ত্র। যথাযথ ব্যবহারে মানুষকে মুজাহিদ ও বিজয়ী গাজী

www.nagorikpathagar.org

বানিয়ে দেয়; না হয় বানায় জালিম, অত্যাচারী, দস্যু, ছিনতাইকারী ও খুনী। সঠিক খাতে পরিচালিত হলে আল্লাহর নেককার বান্দাহ, পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি বা খলীফা এবং সঠিক অর্থে সৃষ্টির সেরা বা আশরাফুল মাখলুকাত তৈরীর সহায়ক ও নিয়ামক। উভয় জাহানে সফলতার দ্বারে পৌছিয়ে দেয়। আর ভুল পথ অবলম্বন করলে তা মানুষকে পশুর চেয়েও অধম ও নিকৃষ্ট বানিয়ে ছাড়ে এবং উভয় জাহানে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ভারসাম্য পূর্ণ স্তরে থাকলে বলা হয় চরিত্রবান এবং ব্যক্তিত্বের ঘটে স্ফুরণ, হয়ে উঠে আকর্ষণীয়। পক্ষান্তরে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়লে বলা হয় অসৎ চরিত্র ও চরিত্রহীন এবং সবার চোখে হয়ে ওঠে ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট।

নিম্নবর্ণিত গুনাবলী প্রকাশক জোড়াসমূহের প্রত্যেকটিতে সহজাত প্রকৃতি কিংবা আবেগ যে কোন একটি কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু দেখুন প্রকাশের বিভিন্ন রূপ তাকে কোথা থেকে কোথায় পৌছে দিচ্ছেঃ

১)	ভালবাসা–	সম্ভোগ কামনা বা লালসা,
২)	স্বাধীনতা–	স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্য,
৩)	সাবধানতা ও সতর্কতা–	ভয় ও কাপুরুষতা,
৪)	মানবতা, সহমর্মিতা ও সহৃদয়তা–	নীতিহীনতা ও কপটতা,
৫)	শক্তি ও কর্মতৎপরতা–	জোর জবরদস্তি,
৬)	চিন্তা গবেষণা–	উদাসীনতা, জড়তা ও স্থবিরতা,
৭)	মিতব্যয়িতা–	কৃপণতা,
৮)	আত্মনির্ভরশীলতা–	আত্মম্ভরিতা,
৯)	সম্মান প্রদর্শন–	তোষামোদ,
১০)	সাহসিকতা–	অদূরদর্শিতা,
১১)	পাঠেচ্ছা–	চপলতা ও ক্ষিপ্রতা,
১২)	আত্মবিশ্বাসী–	সংশয়বাদিতা বা দুর্বলমনা।

মোট কথা, সহজাত প্রকৃতি ও আবেগ–অনুভূতি প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকতে পারে। এগুলোর কোন কোনটা পছন্দনীয় আর কোন কোনটা অপছন্দনীয়। এগুলোকে আয়ত্ব করার পন্থা শেখানো, প্রবাহিত করার এবং ভুল পথে চলে গেলে তাকে সংশোধনের প্রয়াস চালানোই হলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের একমাত্র কাজ।

www.nagorikpathagar.org

লক্ষ্য রাখার বিষয়সমূহঃ

আবেগ-অনুভূতির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যকঃ

* শিক্ষকমন্ডলী ও পিতামাতার উচিত, তারা যেন শিশুদের সাথে একান্ত স্নেহ মমতা ও ভালবাসার দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন। কখনো ধমক অথবা শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলেও অবিলম্বে যেন সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে তার প্রতিবিধান করে ফেলেন।

* ভাইবোন, সংগী সাথী ও সহপাঠীদেরকেও পরস্পরে যেন সদাচার, সুন্দর ব্যবহার এবং স্নেহ মমতা ও ভালবাসার আচরণ প্রদর্শন করে তার প্রতি সদা সর্বদা উদ্বুদ্ধ করেন। কখনো তাদের মাঝে তিক্ততা দেখা দিলে কালবিলম্ব না করে তা আপোষ ও মীমাংসা করে দেন। এভাবে শিশুদের মধ্যে মাতাপিতা, শিক্ষকমন্ডলী, বাসা বাড়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভাই বোন, সংগী সাথী ও সহযোগী সকলের সাথে আবেগময় সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। এটাই সম্পর্ককে সুদৃঢ় করণে এবং সর্বাবস্থায় তা দৃঢ় রাখার ব্যাপারে সহায়ক প্রমাণিত হবে।

অন্যায় আচরণ কিংবা পারস্পরিক তিক্ততা শিশুদের মধ্যে ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার মনোভাব লালন করে এবং তাদেরকে শত্রুতা ও বিচ্ছিন্নতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এর পরিণাম অনেক সময় মারাত্মক আকার ধারণ করে। দ্বীনদার পরিবার ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বালক বালিকাদের বড় হয়ে নাস্তিক ও খোদাদ্রোহীদের কাতারে শামিল হওয়া, ভদ্র পরিবারের বধু ও কন্যাদের আত্মহত্যা করা কিংবা তাদের ইজ্জত বিক্রির পর্যায় পর্যন্ত নেমে আসা, বড় লোকদের সন্তানদের অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠা ইত্যাদি সাধারণতঃ পুনঃ পুনঃ অন্যায় আচরণেরই ধারা ও বিপর্যয়। এজন্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গাঢ় করার প্রতি অপরিসীম নজর দিতে হবে।

* সুরুচি ও স্পর্শকাতর আবেগ-প্রবণতা সমূহ লালনের জন্যে ঘর দরজা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরিবেশকে যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মনোরম ও আকর্ষণীয় করে বানাতে হবে। আসবাবপত্র সাজানোর ব্যাপারে সুনিপুণ দক্ষতা, কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা ও আচার-আচরণে, শিষ্টাচার ও সদাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আদব-কায়দার পূর্ণ পাবন্দী করতে হবে। যথাসম্ভব নিজস্ব রীতি নীতির উপর আমৃত্যু অটল থাকতে হবে। হস্তশিল্প, আর্ট, ক্রাফট এবং বাগান করা শেখানোর বন্দোবস্ত করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

* পবিত্র আবেগসমূহ ও উচ্চ ধারণাগুলোকে বিকশিত করে তোলার জন্যে আদর্শ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনের ঘটনা পঞ্জী, উচ্চমানের সাহিত্যিক দিকগুলো এবং সংস্কারমূলক কাহিনীগুলো প্রভৃতি থেকে সাহায্য নিতে হবে।

* গৃহকর্মগুলো এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়গুলো ও অন্যান্য কর্ম ব্যস্ততার সাথে মনোরম ও চিত্তবিনোদনমূলক বাস্তব অভিজ্ঞতার সংযোগ সাধন করতে হবে। শিশুদের চেষ্টা সাধনাগুলোর প্রশংসা করতে হবে। ভাল ফলাফলের জন্যে মন খুলে সাবাস ও বাহবা দিতে হবে। নম্বর দিতে উদারতা দেখাতে হবে। এসবই হচ্ছে আনন্দ দান ও মনযোগ আকর্ষণের উপায়। এরূপ করলে শিশুদের মন বড় হয়। তারা অধিক শ্রম, অধ্যবসায় ও মনোযোগের সাথে কাজে আত্মনিয়োগ করে। নৈরাশ্য অথবা হতাশার শিকার হয় না।

* কুরআন মজীদ ও মসজিদের সাথে আবেগপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। সুষ্ঠু পরিবেশে কুরআনের শিক্ষা দিতে হবে। তিলাওয়াত করার জন্যে যে জিলদ সরবরাহ করা হবে, তার কাগজ, ছাপা, মুদ্রণ, যথাসাধ্য উত্তম হতে হবে, মনোরম বাঁধাই ও আকর্ষণীয় কভার বিশিষ্ট হতে হবে। অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে তা উঠাতে ও রাখতে হবে। কুরআন শিক্ষাদানের সময় কঠোরতা পরিহার করতে হবে। মায়া-মমতা, উৎসাহ বৃদ্ধি ও উপযুক্ত দিকদর্শনের পুরো ব্যবস্থা করতে হবে। কুরআন মজিদের শিক্ষাদানকে কখনো বোঝা বানানো যাবে না। অন্যথায় আবেগ আপ্লুত সম্পর্ক সৃষ্টির পরিবর্তে ঘৃণার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

* মসজিদগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পূর্ণ আকর্ষণীয় হতে হবে। পরিবেশ পুরো শান্ত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ হতে হবে। বড়দেরকে মসজিদের মর্যাদা ও আদবের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখতে হবে। অবোধ কচি শিশুদেরকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। অবশ্য পাঁচ ছয় বছর বয়সের শিশুদের পুরো পাক-পরিচ্ছন্নতা ও ছতর ঢাকার ব্যবস্থা করে কখনো কখনো নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে যেতে হবে। মসজিদে গেলে শিশুদের প্রতি সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা মুসল্লীদের উচিত। নাক মুখ কুঞ্চিত করা কিংবা ধমকের সুরে তাদেরকে কিছু বলা উচিত নয়। আদবের খেলাফ কিছু করে ফেললে তাদেরকে সস্নেহে বুঝিয়ে দিতে হবে। বড়রা নিজেরাই যদি মসজিদের আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাহলে শিশুরাও আস্তে আস্তে আপনা-আপনি এর পাবন্দ হয়ে যাবে। অনেক সময় বড়রা, বুড়োরা মসজিদে এলে শিশুদেরকে অতি নির্দয়ভাবে ধমক দিয়ে থাকে। ফলে শিশুরা মসজিদে আসা ছেড়ে দেয়। মনে রাখা উচিত, এ ধরনের আচরণ শিশুদের উপর

www.nagorikpathagar.org

বেশ খারাপ প্রভাব বিস্তার করে।

* শিশুরা যতই বড় হতে থাকবে, ততই তাদেরকে আল্লাহ্ তা'য়ালা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য নবীগণের দয়া ও অবদানসমূহ, সাহাবায়ে কিরাম, নেক মনীষী বৃন্দ, বুজর্গগণ, ইসলামের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ, প্রখ্যাত সংস্কারকবৃন্দ এবং সমাজ ও জনকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহের সেবামূলক কার্যাবলীর বিবরণ শুনিয়ে তাদের মধ্যে এসবের অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে এবং এসব ব্যক্তি ও সংস্থার সাথে আবেগাপ্লুত সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। এই সম্পর্ক তাদেরকে হকের প্রতি ভালবাসা ও বাতিলের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করবে। ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত লোক এবং অন্যায়াচারীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে বাধা দেবে এবং দ্বীন ও মিল্লাতের খিদমতের প্রতি সর্বদা অনুপ্রাণিত করতে থাকবে।

* আবেগ প্রবণতার চরম উত্তেজনার মুহূর্তে শিশুদের উত্তেজিত করা ঠিক নয়; বরং বৈধ সীমা রেখার মধ্যে তাদের শান্ত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। অবশ্য অন্যায় পথ অবলম্বন করা থেকে বাধা দানের জন্য অতিশয় প্রজ্ঞা, কৌশল ও যুক্তিসংগত পন্থা গ্রহণ করতে হবে।

* নিজ বাড়ী, বিদ্যালয় অথবা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের বাসভবনের অনুষ্ঠানসমূহে শিশুদের অংশ গ্রহণ করার ও তাদের আবেগ অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। বিশেষতঃ মেহমানদের আগমনে আনন্দ উল্লাস ও তাদের মেহমানদারী, খাতির যত্ন, আপ্যায়নের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এতে শিশুদের আবেগ-অনুভূতি শান্ত হবে, স্বস্তি পাবে। পছন্দনীয় আবেগ অনুভূতি উদ্রিক্ত হবে এবং আবেগপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

* আল্লাহ্ না করুন, যদি কখনো শিশুদের আবেগ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে ফেলে তখন এর সঠিক কারণ উদঘাটন করে তা নিরসনের চেষ্টা করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এর কোন সুযোগই না আসে। যদি স্বাস্থ্যগত কোন কারণে এমনটি হয়ে থাকে, তবে এর চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি বিরত রাখার জন্যে শাস্তি প্রদান অপরিহার্যই হয়ে পড়ে তাহলে অনেক চিন্তা ভাবনার পর বেশ বুঝে শুনে শাস্তি দেয়া এবং অতি সত্তর যন্ত্রণা দূরীভূত করা উচিত।

www.nagorikpathagar.org

বিকাশের স্তরসমূহ

শিশুরা আস্তে আস্তে সাবালকত্বের স্তরে উন্নীত হয়। বড়দের জগতে প্রবেশের জন্যে তাদেরকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়। বিকাশের এসকল স্তর নিজস্ব আলাদা আলাদা বৈশিষ্টের অধিকারী। শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার সময় যদি এসব বৈশিষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় তবেই চেষ্টা সাধনা ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে। অন্যথায় অশেষ শ্রমদানের পরেও সাফল্য সন্দেহযুক্ত থাকবে। বরং অনেক সময় এসব চেষ্টা সাধনার ফল বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়।

বিভিন্ন স্তর

দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত শিশুদের নিম্নোক্ত স্তরসমূহ অতিক্রম করতে হয়।

১) শৈশব কাল- জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত।

২) বাল্যকাল- ছয় বছর থেকে নয় বছর বয়স পর্যন্ত।

৩) কৈশোর কাল- নয়-দশ বছর থেকে বার-তের বছর পর্যন্ত।

৪) যৌবন কাল- তের-চৌদ্দ থেকে সতর-আঠার বছর পর্যন্ত।

শিশুদের বিকাশে আবহাওয়া, পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার অশেষ প্রভাব পড়ে থাকে। সুতরাং প্রত্যেক শিশুর বিশেষ অবস্থার কারণে এসব কালের মুদ্দতের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য সূচিত হয়ে থাকে এবং সকল শিশুর মধ্যে পরিপূর্ণ সমতা পাওয়া যায় না। এভাবে একটি শিশু আস্তে আস্তে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে প্রবেশ করে। এজন্যে উপরে বর্ণিত স্তরসমূহের যে মেয়াদকাল উল্লেখ করা হয়েছে, তা একটা সাধারণ অনুমান বলে মনে করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

শৈশব কাল (জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত)

এই স্তরটি বিভিন্ন দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা তাদের মায়ের কোলে বা পারিবারিক পরিবেশে যা কিছু দেখে, তার ছাপ আজীবন স্থায়ী থাকে। এজন্যে এ স্তরটিকে জীবনের মূল ভিত্তি বলা হয়। খাওয়া-দাওয়া, উঠাবসা, চলাফেরা, মেলামেশা, বলাকওয়া, পরা-গায়ে দেয়া, শিশুরা এ সময়েই শিখে থাকে। প্রেম-প্রীতি, ঘৃণা- বিদ্বেষ, ভয়-নির্ভয়, স্বাধীনতা ও নিয়ম মেনে চলা, সৌহার্দ ও সহমর্মিতা, সহায়তা, ত্যাগ তিতিক্ষা, নম্রতা ও দৃঢ়তা, ঠান্ডা ও গরম হওয়া, দুঃখ- সুখ ইত্যাদির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি এই স্তরেই বিকশিত হয়।

দৈহিক দিক থেকেও এই স্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে এমন কতিপয় দৈহিক ত্রুটি সৃষ্টি হতে পারে যার প্রতিবিধান পরবর্তী জীবনে কখনো সম্ভবপর হয়ে উঠে না। বিশেষতঃ দৃষ্টি, শ্রবণ ও বাক প্রভৃতি সমূহে বিভিন্ন ত্রুটি এমন, যেগুলো কেবল দেহকেই প্রভাবিত করে না, বরং মানসিক ক্রমবিকাশেও অনেক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

এই স্তরে বৃদ্ধির গতিও অত্যন্ত তীব্র হয়ে থাকে। বিশেষতঃ দুধ পানের সময়ে, সাড়ে চার বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর উচ্চতা এতটা হয়ে যায় যে, যৌবনে সে যতটুকু লম্বা হবে, ঠিক তার অর্ধেক পরিমান লম্বা এ সময়ে হয়ে যায়।

বৈশিষ্টসমূহঃ

এই স্তরের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টসমূহ হলোঃ

১) মানসিক ও দৈহিক দিক থেকে শিশুরা অত্যন্ত দুর্বল ও প্রতিটি কাজে বড়দের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। বিশেষ করে ক্ষুধা ও বিপদের সময় বড়দের সাহায্যের খুব বেশী মুখাপেক্ষী থাকে। প্রথম দুই-আড়াই বছর তো দুগ্ধ পানে অতিবাহিত হয় এবং মায়ের কোলই হয় সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তারপরেও শিশু মাতা ও পারিবারিক পরিবেশের সাথেই অধিক অনুরক্ত ও অনুরাগী থাকে।

www.nagorikpathagar.org

আর সত্য কথা হলো শিশুরা প্রতিপালনের জন্যে যে ধরনের স্নেহ-মমতা, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতা, ত্যাগ ও অন্তরঙ্গতার প্রয়োজন হয়, তা মাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ ছাড়া আর কারো কাছে পাওয়াও সম্ভব নয়। যে শিশু কোন কারণে এই স্তরে পরিবারের স্নেহ-মমতা ও আদর-আহলাদ থেকে বঞ্চিত হয়, সে স্পর্শকাতর ও নাজুক মানবিক আবেগ-অনুভূতি থেকেও সম্পূর্ণ বঞ্চিত থেকে যায়। তাই শিশুর শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে পারিবারিক পরিবেশকেই উত্তম করে তৈরী করা আবশ্যক এবং যতক্ষণ পর্যন্ত চরম বাধ্যবাধকতায় না পড়ে এই দাযিত্ব কখনো নার্সারি স্কুলের উপর ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। মায়া-মমতা ও আদর-যত্নের ব্যাপারে ছোট শিশুদের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে মা-বাপের বিকল্প প্রমাণিত হওয়ার পুরোপুরি চেষ্টা করা উচিত এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শ্রেণীর অবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত যেন পরিবারের তুলনায় তা অপরিচিত বলে মনে না হয়। কোন কোন লোক শিশুদের নিয়ম মাফিক পাঠদান শুরু করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে থাকে। এটা স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশ উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। পাঁচ-ছয় বছরের পূর্বে কখনো এমনটি করা উচিত নয়।

২) শর্তহীনভাবে এবং অন্য কাউকে কোনরূপ অংশীদার না করে শিশুরা একাই স্নেহ-মায়া-মমতা পেতে চায়। তারা চায় তার ব্যক্তিসত্তাকে ভালোবাসুক, তাদের গুণাবলীকে নয়; একমাত্র তাকেই ভালোবাসুক। আর স্নেহ-মমতা কেবল তারই সাথে করা হোক। এ কারণেই ভাই-বোন অথবা পরিবারের অন্যান্য শিশুদের সাথে বিদ্বেষ ভাব জেগে উঠার আশংকা থাকে। শিশুদের ব্যক্তিসত্তাকে স্নেহ-মমতা করতে হবে। এতে তাদের আস্থা বহাল থাকবে। সব শিশুকে একই রূপ ভালোবাসতে হবে। কোন শিশু যেন অনুভব করতে না পারে যে, তাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে বিশেষ করে নবজাতকের আগমনে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে, যেন শত্রুভাব সৃষ্টি হতে না পারে।

৩) শিশু স্বভাবগতভাবে স্বাধীন চেতা ও হুজুগপ্রিয় হয়ে থাকে। আবেগ বড় তীব্র ও প্রবল হয়ে থাকে, তবে এই তীব্রতা ও প্রবলতার সাথে তা ক্ষণস্থায়ীও হয়ে থাকে। সুতরাং সহজেই এবং অতি শীঘ্র ভুলেও যায়। কথায় কথায় সজোরে চিৎকার করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়া, মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়া, আবার ভুলানোর মত কেউ থাকলে কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ হেসে দেয়া এবং অশ্রু ভেজা মুখে হাসির লহর ফুটে উঠা আমাদের নিত্য দিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

www.nagorikpathagar.org

কঠোর নিয়ন্ত্রণ শিশুদের বিকাশ ও পূর্ণতা প্রাপ্তির পক্ষে খুবই ক্ষতিকর এবং তা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মধ্যে প্রদর্শণী ভাব ও মুনাফেকীর বীজ সৃষ্টি করতে পারে। এজন্যে শিশুদের হৈ-হল্লা, হাঙ্গামা ও বিশৃংখলাকে যথা সম্ভব সহ্য করা উচিত। তাদের আবেগের তীব্রতা ও কঠোরতাকে মায়া-মমতা দিয়ে ভুলানোর চেষ্টা করতে হবে। ধমক দেয়া, তিরস্কার করা বা মারধর করা উচিত নয়। কৌশলে কাজ করলে সহজেই শান্ত করা সম্ভব।

৪) শিশুরা সহজাত প্রকৃতি ও আবেগের অধীন হয়ে থাকে এবং এসবের চাহিদাসমূহের তাৎক্ষণিক পূর্ণতা বিধান চায়। পূর্ণতা বিধান বাধাগ্রস্ত হলে চরম অস্থির হয়ে পড়ে এবং রাগ করে বসে। তারা বর্তমান নিয়েই ব্যস্ত থাকে; ভবিষ্যতের কোন চিন্তাই করে না। বায়োলজিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই তার জন্যে যথার্থ। এজন্যে ওসব বৈশিষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। সহজাত প্রকৃতি ও আবেগ-প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণের জন্যে আস্তে আস্তে মশ্ক ও অনুশীলনের চেষ্টা করতে হবে। অভিজ্ঞতার সাথে সাথে তাদের চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। মূলতঃ এ প্রক্রিয়ায় যতদিন এশক্তি অর্জিত না হবে, তা বশ করা সম্ভব হবে না। তাই এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা ঠিক নয়।

৫) শিশুরা অত্যধিক হৈ-হল্লা ও খেলাধূলা প্রিয় হয়ে থাকে। খাওয়া-দাওয়া, খেলাধূলা, শোয়া ও কাঁদাই তাদের প্রধান কর্মকান্ড। যখনি নজর করবেন, দেখবেন তারা কিছু না কিছু ভাংগা-গড়ার কাজে রত। খেলনাসমূহ নিয়ে একাকী খেলতে তারা পছন্দ করে। মিলেমিশে কেবল এমন সব খেলা খেলে, যেগুলোতে প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকে না। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলাকে তারা ভয় পায়। না জানি কখনো পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এদেরকে খেলাধূলার নিয়মাবলী বাতলে দিয়ে এবং বিভিন্ন প্রকারের আনন্দদায়ক খেলার সরঞ্জাম ও খেলনা সরবরাহ করে তাদের খেলাধূলার সুযোগ করে দেয়া উচিত। আর যা কিছু শেখানো দরকার যথা সম্ভব খেলাধূলার মাধ্যমেই শেখাতে হবে।

৬) শিশুর আত্মসর্বস্বতা বাহ্যতঃ স্বার্থপরতা বলে মনে হয়। কিন্তু এটা বায়োলজিক্যাল দাবী এবং শিশুদের বিকাশের জন্যে অতীব জরুরী। কাজেই এজন্যে তাদের তিরস্কার করা উচিত নয়। তাদের থেকে অনেক স্বার্থ ত্যাগ ও উচ্চ কৃতিত্ব আশা করাও ঠিক নয়। কোন কিছু নিজেদের চেয়েও তাদেরকে বেশী অংশ দেয়া বড়দের উচিত এবং অনেক কিছুর মধ্যে যদি তারা সামান্য পরিমাণও

www.nagorikpathagar.org

কাউকে দেয়, তবে তাদের বাহবা দেয়া এবং মন খুলে তাদের প্রশংসা করা উচিত। এভাবে শিশুরা আস্তে আস্তে আত্মত্যাগ করতে ও অন্যকে প্রাধান্য দিতে শিখবে।

৭) শিশুরা বার বার নানারূপ প্রশ্ন করতে ও অধিক কথা বলতে আগ্রহী হয়ে থাকে। এজন্যে তাদের ধমক দেয়া উচিত নয়। প্রশ্ন করা সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচায়ক। কথায় কথায় শিশুরা অনেক কিছু শিখে ও নিজের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তোলে, তাদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেয়া উচিত এবং কথাবার্তা বলতে ও কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে উদ্বুদ্ধ করা উচিত।

৮) শিশুরা বিভিন্ন প্রকারের চাল-চলন, শব্দ, গান ও সুর অবচেতনভাবে অনুকরণ করে থাকে এবং খেলাধূলায় এসব হুবহু অনুকরণ করে থাকে। অন্যদের যেমনটি করতে দেখে নিজেরাও না বুঝে না চিনে সেরূপ করতে থাকে। ভালো-মন্দ যেসব শব্দ কানে আসে সেগুলোই তার মুখে চালু হয়ে যায়। এজন্যে বড়দের উচিত শিশুদের সামনে উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করা, পরিবেশকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা এবং অনুকরণীয় খেলাধূলার মাধ্যমে তাদেরকে খাওয়া-দাওয়া, মেলামেশা ইত্যাদির আদব-কায়দা শেখানো। ভাষার বিশুদ্ধতা, উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গীর সংশোধণ কাজে তাদের অণুকরণ প্রিয়তাকে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু এসব কাজ জবানী ও বাস্তবভাবে হতে হবে। লেখাপড়া বা শুদ্ধ পাঠের নিয়ম-কানুন ও রীতিনীতিসমূহ শেখানোর বোঝা কখনো তাদের উপর চাপানো উচিত নয়। পশু পাখীর বুলি নকল করার সুযোগ ও তাদেরকে দিতে হবে। তারা বেশ আনন্দ পায়। অবশ্য কারো দোষ-ত্রুটি অণুকরণ করা থেকে অবশ্যই বিরত রাখতে হবে।

৯) শিশুরা অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তাই কল্পনা প্রবণ শক্তি থাকে তাদের অতি প্রবল। ভূত-প্রেত, জিন-পরী, পশু-পাখী প্রভৃতির আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক কিস্সা-কাহিনীগুলোকে তারা বিলকুল সত্য মনে করে এবং সংগে সংগে তা বিশ্বাস করে ফেলে। এজন্যে যেসব কাহিনীতে শিশুদের কল্পনাপুজারী হওয়ার আশংকা থাকে এবয়সে সেসব কাহিনী তাদেরকে কখনো শুনানো উচিত নয়। নবীদের কাহিনী থেকে বিশেষ করে তাঁদের মো'জেযাসমূহ বর্ণনা এবং জীব-জন্তুর কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে তাদের নৈতিক ও মানসিক ট্রেনিংদান এবং ভাষা শেখানোর ব্যাপারে তাদের কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

১০) কড়া রঙ, কর্কশ শব্দ, অস্বাভাবিক চালচলন এবং মিষ্টি দ্রব্যের প্রতি তারা খুব বেশী অনুরাগী হয় এবং এগুলোর প্রতি বে-এখতিয়ার লাফিয়ে পড়ে। সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে রঙ্গীন, গতিশীল এবং মাটি, কাঠ ও প্লাস্টিকের শব্দকারী খেলনা সরবরাহ করা আবশ্যক। ব্যবহারের জিনিসেও পছন্দসই রঙের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। জিনিস দামী বা খুব মসৃণ হওয়া জরুরী নয়। কড়া রঙের হলেই যথেষ্ট। শিশুদের জীবনের এই স্তরে যদি তাদের উপরোক্ত কাম্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখা না হয় অথবা তা পূরণে বাধা সৃষ্টি করা হয়, তবে তাতে মানসিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, যা বড় হলে তাদের চরিত্র ও আচরণের জন্যে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়ে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে রং ইত্যাদির ব্যাপারে তাদের শিশুসুলভ মনোভাব পরবর্তী জীবনেও স্থায়ী থাকে। কারণ কামনা-বাসনার ক্রমবিকাশের জন্যে এই স্তরে তার প্রশান্তি লাভের মত কোন সাজ-সরঞ্জামই সে পায়নি। সুতরাং দেহে পূর্ণতা আসা সত্ত্বেও মানসিকতার ক্রমবিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং শিশুসুলভ মনোবৃত্তির পূর্ণতা বিধান না হওয়া পর্যন্ত এর অগ্রগতি হয় না।

১১) চারদিকের সাধারণ বস্তুরাজিকে গভীরভাবে দেখা, স্পর্শ করা, গ্রহণ করা এবং এসব সম্পর্কে জানার তীব্র আগ্রহ-অনুসন্ধিৎসা থাকে। শিশুদের জন্যে অভিজ্ঞতা অর্জন ও পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ থাকা উচিত। নিকটতম পারিপার্শ্বিক স্থানের ফল-ফলারী, তরিতরকারী, সবজী, বৃক্ষলতা, পশু-পাখী, পোকা-মাকড় ইত্যাদি দেখার এবং এগুলো সম্পর্কে জানার জন্যে কখনো কখনো শিশুদেরকে নিজের সাথে ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া উচিত। তখন তাদের দর্শণীয় বস্তুসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। অবশ্য পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সুস্থতার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করে নেয়া আবশ্যক, যেন বস্তুসমূহের সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে।

১২) এ সময়ে তাদের কোন কিছু গড়ার প্রবৃত্তি সক্রিয় হয় এবং তারা কিছু না কিছু ভাঙতে ও গড়তে থাকে। তবে ভাঙা-গড়ার মধ্যে পার্থক্য খুব কমই থাকে। কোন কিছুর আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়াই হলো তাদের নিকট গড়া। চাই তা ভাঙ্গুক বা গড়ুক। মাটি, ছেঁড়া কাগজ, খালি কৌটা, কাঠের টুকরা, সহজ-সস্তার শিক্ষা জাতীয় খেলনা ইত্যাদি যোগাড় করে দিয়ে এসব তৈরী করতে, জোড়া লাগাতে, বিন্যাস সাধন প্রভৃতিতে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া উচিত। এভাবে তারা হাত, চোখ ও মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ সম্পর্ক

www.nagorikpathagar.org

স্থাপন করতে এবং এক সঙ্গে তিনটি মাধ্যম থেকে কাজ আদায়ের মশ্‌ক ও অনুশীলন করতে সক্ষম হয়।

১৩) দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি যোগাড় করে পকেটে ভরার আগ্রহ থাকে তাদের। তবে দুষ্প্রাপ্য বস্তু সম্পর্কে তাদের রুচি থাকে অতি নিম্নমানের। একবার কোন একটি চার–পাঁচ বছরের শিশুর পকেট চেক করে দেখুন, তাতে কাগজের টুকরো, মৃতপাত্রের ভাঙ্গা কাঁচ, তেঁতুল বা অন্য কোন ফলের বিচি, সীসা ও চীনা মাটির প্লেটের সুন্দর সুন্দর ভাঙ্গা টুকরো ইত্যাদি পাওয়া যাবে। সঞ্চয় প্রবণতা ও মালিকানা স্বত্বের আগ্রহ ও ঝোঁক প্রবণতা তাদের স্বভাবজাত। এই আগ্রহকে দমিয়ে দেয়া ঠিক নয়। শিশুদের স্বল্প পরিমাণ সুরক্ষিত স্থান থাকা দরকার, সেখানে তারা নিজেদের পছন্দসই বস্তুসমূহ সাজিয়ে রাখতে পারে। এভাবে তারা আস্তে আস্তে উন্নত রুচির পরিচয় দিতে সক্ষম হবে এবং জিনিসগুলোকে বিন্যাস করে সাজিয়ে রাখতে শিখবে। উপযুক্ত ও সুরক্ষিত জায়গা পায় না বলেই তারা দ্রব্যাদি পকেটে ঢুকায়।

১৪) অপরিচিতদের সাথে মিলতে তারা ইতস্ততঃ করে। অতি কষ্টে তারা স্বাভাবিক হয়। বন্ধু বানাতেও তারা ধীর গতিতে অগ্রসর হয়। তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার–স্যাপার নিয়ে কথাবার্তা হলে তাদের খেলনা ও অন্যান্য জিনিসের প্রশংসা করতে হবে। তাদেরকে খাবার ও খেলার জিনিস দিতে হবে কিংবা তাদের সাথে খেলায় অংশ নিতে হবে। তাহলে তারা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। তারপর বেশ কথাবার্তা বলতে থাকবে এবং নিজের দুঃখ–দুর্দশা, দুশ্চিন্তা ও পেরেশাণীর কথাগুলো বলতে থাকবে।

১৫) তারা যা কিছু শোনে বা শিখে তা বার বার পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করে। এজন্যে কোন কাহিনী শোনানো, কোন ঘটনা বর্ণনা করা এবং কিছু শেখানোর পর তা পুনরাবৃত্তি করার যথেষ্ট সুযোগ দান করা উচিত। এভাবে তারা অনুশীলন করার সুযোগ পায়। যেসব কাহিনীতে বাক্যগুলো পুনঃ পুনঃ আসে অথবা একটা মনোরম বাক্য সামান্য বিরতির পর বার বার পুনরাবৃত্তি করা হয়, সেসব কাহিনীতে তারা বেশ মজা পায়।

১৬) শব্দ ভান্ডারের স্বল্পতা এবং মনোভাব প্রকাশের শক্তি না হওয়ার কারণে নিজেদের ইচ্ছা আকাংখা, প্রয়োজনীয়তা ও দুঃখ কষ্টের কথা তারা বলতে পারে না। এজন্যে তাদের ইশারা–ইঙ্গিত বুঝার এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা, অসুস্থতা বা কষ্ট–ক্লেশ অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিত। তাদের

www.nagorikpathagar.org

দৈহিক অসুবিধা, অসুস্থতা এবং মানসিক অস্বস্তির খতিয়ান নেয়া এবং তা দুরীভূত করার চিন্তা করা উচিত।

১৭) নিজের কাজে কারো হস্তক্ষেপ শিশু পছন্দ করে না। বরং নিজের কাজ নিজেই আঞ্জাম দিতে চায়। যেমন কাপড় বা জুতা পরার চেষ্টা করা, নিজেই হাত-মুখ ধোয়া, খাওয়া-দাওয়া এবং শৌচ কাজ করার আগ্রহ ইত্যাদি। এটা খুব ভালো ঝোঁক প্রবণতা; যথা সম্ভব এরূপ করার সুযোগ দিন এবং হস্তক্ষেপের পরিবর্তে প্রয়োজন মত তা সঠিক পন্থায় আনজাম দানের পদ্ধতি শিখিয়ে দিন। যাতে এভাবে সে আস্তে আস্তে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং সব কাজে বড়দের মুখাপেক্ষী হয়ে না থাকে। শরীরের বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগের উপর আয়ত্ব ও ধারণ ক্ষমতা দৃঢ় না হওয়ার কারণে কোন জিনিস ধরতে বা উঠাতে তা ছুটে বা পড়ে ভেঙ্গে যায়। এতে তার মর্জি বা ইচ্ছার কোন হাত থাকে না। তাই তাকে সে কারণে তিরস্কার করা, ধমক দেয়া ও মারপিট করা উচিত নয়। তা করলে তাদের আত্মবিশ্বাস খতম হয়ে যাবে। এ জাতীয় ঘটনায় শিশু নিজেই লজ্জিত হয়ে যায়। যদি সে অতি অল্প বয়সের হয় তবে নিজে ওই বস্তুকেই দোষী সাব্যস্ত করে থাকে, যা মুখে খাওয়া বা হাতে থাকার পরিবর্তে পড়ে ভেঙ্গে যায়। এসব ক্ষেত্রে শিশুকে আরো সাহস দেয়া উচিত যাতে তার আত্মবিশ্বাস জন্মায়।

১৮) শিশুর মাঝে দীপ্তিমান ও ভাস্বর হওয়ার, সবার ভালবাসা পাওয়ার এবং সকলের দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করার প্রবল আগ্রহ থাকে। যদি স্বাভাবিক পথে উল্লেখযোগ্য হওয়ার সুযোগ না পায়, তাহলে কোন অশোভণীয় কাজ করে হলেও দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করবে। যেমন- শোরগোল করে, চিৎকার দিয়ে অথবা বিছানায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব-পায়খানা করে, ছোট ভাই-বোনদের মেরে হলেও তা করবে। এজন্যে তাকে স্বাভাবিক পথে উল্লেখযোগ্য হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত। অন্যদের কাছে তার গুণাবলীর প্রশংসা করুন এবং তার কিছুটা তাকেও শুনিয়ে দিন।

১৯) শিশু অন্ধকারকে ভয় পায় এবং ভয়ংকর ও বিকট শব্দে শিউরে উঠে। পড়ে যাওয়ারও ভয় থাকে। শিশুদের ভয় দেখানো ঠিক নয় এবং তাদের সামনে নিজেরাও ভয় পাওয়া উচিত নয়। কারণ যে সব জিনিস দেখে আপনারা ভয় পাবেন, শিশুরাও আপনাদের দেখাদেখি সেগুলোকে ভয় করতে থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

বাল্যকাল (৬ বছর থেকে ৯ বছর)

শিশুদের জীবনে এই স্তরটিও দৈহিক বৃদ্ধি ও পরিপক্কতার সময়। মাতৃ দুগ্ধ পানের সময় যে গতিতে বাড়ে এ স্তরে বাড়ার গতি সেরূপ দ্রুততর নয়। এ সময় শিশুদের জগত ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং ঘর থেকে বাইরে যায় এবং নতুন নতুন বন্ধুও সঙ্গী-সাথী সৃষ্টি করতে থাকে। দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে শিশু নিজে নিজের কিছুটা সাহায্য করতে সক্ষম হয় এবং প্রত্যেক কাজে বড়দের মুখাপেক্ষী থাকে না। এ সময় সে নিজ হাতে শৌচ কাজ করতে পারে, পায়জামা পরতে পারে, কথাবার্তা বুঝতে পারে এবং নিজের প্রয়োজনের কথা বলতে পারে। সঙ্গী-সাথী পেলে এবং মনের মত সময় কাটানোর ব্যবস্থা হলে কয়েক ঘন্টা মাতাপিতা থেকে দূরে থাকতে পারে। এজন্যে এ সময়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়ে যথারীতি পড়ালেখা শুরু করে দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

এই স্তরের কতিপয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট নিম্নরূপ। শিক্ষা-দীক্ষার সময় এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

১) শিশুসুলভ আচরণ বৃদ্ধি পেতে থাকে, দিন দিন দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফির প্রতি আকর্ষণ এবং মহল্লা, প্রতিবেশী ও বিদ্যালয়ে বন্ধু ও সাথী বানানো এবং তাদের সাথে খেলাধূলা করার আগ্রহ বাড়তে থাকে, ঘর ও ঘরের লোকজনদের সাথে আন্তরিকতা কিছুটা হ্রাস পেতে থাকে। সহপাঠী ও সঙ্গী-সাথীদের দৃষ্টিতে নিজের স্থান ও মর্যাদা করে নেয়ার চিন্তা হয়। এসব আবেগ প্রবণতা মূলতঃ উপকারী। এসবের বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং এসবের উপর বাধা দান ও খুব বেশী বিধিনিষেধ আরোপ থেকে বিরত থাকতে হবে। সহপাঠী ও সঙ্গী-সাথীদের সাথে খেলাধূলা করতে, শোরগোলে লিপ্ত হওয়ার মধ্যে শিশুরা যে প্রকৃত আনন্দ লাভ করে, তা থেকে বঞ্চিত করলে শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। অবশ্য সঙ্গী-সাথীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। সহপাঠীদেরকে মাঝে-মধ্যে ঘরে ডেকে এনে তাদের মেহমানদারী করার সুযোগও এদেরকে দেয়া উচিত। তাতে শিশুদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গী-সাথীদের উপরও ভাল প্রভাব

www.nagorikpathagar.org

পড়ে।

২) অনুসন্ধিৎসা ও চতুর্দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার আগ্রহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। যেহেতু শিশুদের দুনিয়া এসময় প্রসারিত হতে থাকে, সেজন্যে তাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ময়দানও সম্প্রসারিত হয়ে যায়। শিশু জ্ঞান লাভ করার জন্যে নানা রূপ প্রশ্ন করে এবং খুব বেশী কথা বলতে থাকে। শিশুদেরকে মাঝে-মধ্যে বনভোজন অথবা শিক্ষা সফরে নিয়ে গিয়ে নিকটস্থ পরিবেশের বিভিন্ন জিনিস গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার ও বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দেয়া দরকার। তাদের প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করা এবং আরো বেশী প্রশ্ন করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কখনো কখনো নিজের তরফ থেকে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে তা সমাধানের জন্যে পরামর্শ দেয়ার সুযোগ দেয়া উচিত।

৩) এ সময় খেলাধূলায় ধীরে ধীরে নিয়ম শৃংখলা সৃষ্টি হতে থাকে এবং নীতিমালা মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার প্রতি চেতনাও বাড়তে থাকে। সুতরাং মিলেমিশে খেলাধূলা করার গুরুত্বের প্রেক্ষিতে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার বিধি-নিষেধ সহ্য করার প্রতি আগ্রহী হয়ে যায়। যেমন- পালাক্রমে খেলার প্রতি লক্ষ্য রাখা, খেলার সুযোগ দেয়া, যে দায়িত্ব আসে তা আদায় করা ইত্যাদি। তাদের এ ধরনের আবেগ প্রবণতা দ্বারা সামাজিক জীবনে নিয়ম-নীতি মেনে চলা, সামাজিক আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং পছন্দনীয় অভ্যাস গড়ে তোলার ব্যাপারে সাহায্য নেয়া উচিত।

৪) পরিবার ও বিদ্যালয়ের প্রতি আনুগত্য ও অনুরক্তির ভাবের উদয় হয়। এ দু'টোকে নিজের মনে করে এবং দু'টোর সদস্য হিসেবে নিজের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত হয়। নিজের বিদ্যালয় ও পরিবারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শুনতে পারে না। নিজের মাতাপিতা ও শ্রেণী শিক্ষকের প্রতি আন্তরিক সম্মান প্রদর্শন করে এবং তাদের অবমাননা সহ্য করে না। উভয় স্থানে শিশুদেরকে নিজস্ব ও আপন মনে করার অনুভূতি সৃষ্টির পুরো সুযোগ দিতে হবে এবং কিছু কিছু হালকা দায়িত্বও অর্পণ করতে হবে। এভাবে দায়িত্বানুভূতি জাগবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও একাগ্রতার প্রশিক্ষণও হবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও মেহমানদের আগমনে শিশুদের দায়িত্বে কোন না কোন কাজ অবশ্যই সম্পাদিত হওয়া উচিত।

৫) এসময় স্মরণ শক্তির মধ্যে নিয়ম-শৃংখলা সৃষ্টি হয়ে থাকে, অনেক কিছু

www.nagorikpathagar.org

না বুঝেও পুনরাবৃত্তি করতে পারে। কিন্তু এ পর্যায়ে সহজ সরল অর্থ বুঝিয়ে দিলে মুখস্থ করতে সহজ হয়। এজন্যে যা কিছু মুখস্থ করতে হবে তার উদ্দেশ্য এবং অর্থও বুঝিয়ে দেয়া উচিত। সূরাসমূহ, দোয়া-কালাম, কবিতা, নামতা ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে অধিক থেকে অধিক হারে মুখস্থ করাতে হবে। এ সময়ে যা মুখস্থ করবে, জীবনেও তা ভুলবে না।

৬) নিজের শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ব্যবহারের অন্যান্য জিনিসপত্র সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকে। মালসামান রাখার জন্যে বাক্স, আলমারী ইত্যাদি কোন জায়গা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। এর উপর তাদের পূর্ণ আধিপত্য থাকবে। এভাবে তাকে ক্রমান্বয়ে স্বীয় আসবাপত্র সাজিয়ে হেফাজতে এবং নিয়ম-শৃংখলা মতে রাখতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। কোন কিছু ব্যবহারের পর শিশুরা সাধারণতঃ এদিক সেদিক ফেলে দেয় এবং পুনরায় ঐসব জিনিস ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিলে তখন তারা পেরেশান হয়ে যায়। তাদের এদিক সেদিক পড়ে থাকা জিনিসগুলো তাদের নির্দিষ্ট স্থানে কুড়িয়ে এনে রেখে দেয়া বড়দের উচিত, যেন যথা সময়ে তারা তা পেয়ে যায়। বিশেষতঃ লেখা-পড়ার জিনিসসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যথায় বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অপরিণত বয়সের শিশুরা নিজেদের সমস্ত মালামাল নিজেরাই দেখাশুনা করবে বলে আশা করা ঠিক নয়। প্রয়োজনের সময় তারা কাঁদবে। অথবা আব্বা আম্মাকে জিজ্ঞাসা করবে।

৭) অনুকরণের ব্যাপারে এসময় কিছু পরিমাণ নিজস্ব ভাব-চেতনার দখল শুরু হয়। তারপরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুকরণ অবচেতন ভাবেই হয়ে থাকে। উঠা-বসা, চলা-ফেরা, মেলা-মেশা ইত্যাদির নিয়ম-নীতি বিভিন্ন স্থানের আদব-কায়দা নকল খেলার মাধ্যমে শেখাতে হবে। সুন্দর হস্তাক্ষর, উচ্চারণ, মডেল ইত্যাদির অনুকরণ অভ্যাস করাতে হবে। ঘর ও বিদ্যালয়ের পরিবেশকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বানানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এবং উত্তম আদর্শ তুলে ধরতে হবে, যেন অবচেতনে অনুকরণের জন্যে শিশুরা উত্তম আদর্শ পেতে সক্ষম হয়।

৮) কল্পনাসমূহ বাস্তবরূপ ধারণ করতে থাকে। ক্রমান্বয়ে সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বোধ হতে থাকে। আশ্চর্য ও অদ্ভুত কিস্‌সা কাহিনীতে তৃপ্তি পেলেও এ পর্যায়ে সে অনুভব করতে থাকে যে এটা ভ্রান্ত ও মিথ্যা। কল্পনাকে বাস্তব রূপ দানের জন্যে আঠাল মাটি, শ্লেট বা ব্লাক বোর্ড,

www.nagorikpathagar.org

রংগীন চক, রংগীন ব্রাশ, সাধারণ কাগজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেয়া উচিত।

৯) গঠনমূলক কামকাজের মাধ্যমে দক্ষতা হাসিলের ইচ্ছা আকাংখা জাগ্রত হয়। সে অধিকাংশ সময় কিছু না কিছু ভাংগা-গড়া করতে থাকে। তাকে গঠনমূলক কার্যাবলী যেমন- আর্ট, ক্রাফ্‌ট, মৃৎ কর্ম, বাগান করা ইত্যাদির সুযোগ করে দিয়ে দক্ষতা সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে। জিনিস পত্রের যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাকে পথ প্রদর্শন ও প্রয়োজণীয় সহযোগিতা করতে হবে যেন গঠনমূলক যোগ্যতা ও সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটে এবং দক্ষতা অর্জিত হয়। বিশেষ ঝোঁক প্রবণতার খতিয়ানও নিতে থাকতে হবে। যদিও এই বয়সে যেসব জিনিসের প্রতি ঝোঁক থাকে, পরবর্তী স্তরগুলোতে তা বহাল থাকা জরুরী নয়।

১০) প্রতিযোগিতার আবেগ ও সাথীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হওয়ার মনোভাব জাগ্রত হয়। এখন আস্তে আস্তে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলায় আগ্রহ নিতে থাকে। কিন্তু ব্যর্থতা ও হেরে যাওয়াকে ভয় করতে থাকে। এজন্যে সহজে হার স্বীকার করতে চায় না এবং মাঝে মাঝে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েও বসে। খেলাধূলা ও কাজেকর্মে প্রতিযোগিতার সুযোগ করে দেয়া উচিত। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন তীব্র মর্মপীড়া ও বিপক্ষ প্রতিযোগীদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি না হতে পারে। তাছাড়া খেলাধূলার হারজিতের চেয়ে সততা ও বিশ্বাসকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে। শিশুরা হারজিতকে খেলাধূলায় স্বাভাবিক ব্যাপার গণ্য করতে শুরু করবে। হেরে গেলে নিরাশ যেন না হয় এবং জিতে গেলে প্রতিপক্ষের উপর চড়াও যেন না হয় বা লাঞ্ছিত না করে।

১১) এ স্তরে শিশুদের সংগ্রহ প্রবৃত্তি ও তীব্রতর থাকে। বিদ্যালয়ের যাদুঘরের জন্যে শিশুদের দ্বারা বিভিন্ন রকমের ফুল, পাতা, পাখীর পালক, সামুদ্রিক শামুক ও ঝিনুকের খোলা, বিভিন্ন দেশের টিকেট জোগাড় করাতে হবে এবং এগুলো নিপুণভাবে সাজিয়ে রাখার শিক্ষা দিতে হবে।

১২) মনযোগ ঘন ঘন নষ্ট হতে থাকে। যেহেতু তা কোন একটি জিনিসের প্রতি খুব দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত স্থির থাকতে পারে না, সেহেতু কোন কিছুর প্রতি অধিক সময় পর্যন্ত মনোযোগী করে রাখার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তার চেয়ে নির্দিষ্ট জিনিসটির বিভিন্ন দিকের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে উত্তম। যেমনঃ আপনি একটা ফুলের দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান, তাহলে ফুলটির আকৃতি, রং, ঘ্রাণ ও পাপড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন অংশের প্রতি পৃথক পৃথক

www.nagorikpathagar.org

আলাপ করলে সামষ্টিকভাবে ফুলটির দিকেই শিশুর মনোযোগ দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আবদ্ধ রাখা যায়। তা না হলে শিশু ভাসা ভাসা একটু নজর নিয়েই দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নেবে।

১৩) কোন দুর্বলতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে সমালোচনা করা, কেবল দোষের জন্যে তিরস্কার করা, অকারণে উত্তেজিত করা, কোন আচরণের কথা তুলে ধরা এবং মজা ভোগ করা এসব কিছুই এই স্তরে আরম্ভ হয়ে যায়। এতে বড় ছোট সঙ্গী-সাথী বা সহপাঠীর কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। ভুল কথাবার্তা বা ভুল আচরণের সমালোচনা করা হলে শিশুরা হাসি মুখে তা শুনে থাকে। অবশ্য বিরক্ত বা উত্যক্ত করলে যে কষ্ট হয় শিশুদের মধ্যে সে অনুভূতি জাগিয়ে এসব থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে কঠোরতার পরিবর্তে বোঝানো-সোঝানোর পন্থা অবলম্বন করা অধিক উপকারী হয়ে থাকে। বিরক্ত করলে সে আরো বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

১৪) এ স্তরে সরাসরি নৈতিক শিক্ষা, উপদেশ দান এবং উপদেশমূলক কথাবার্তার প্রতি শিশুরা না আকৃষ্ট হয়, না কোন প্রভাব গ্রহণ করে। সামাজিক আদব-কায়দা, রীতি-নীতি মেনে চলা, নৈতিক নীতিমালা অনুসরণ ও নিয়মিত নামায আদায়ে অভ্যস্ত করার সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি হচ্ছে বড়দের উত্তম আদর্শ। শিশুরা অবচেতনে বড়দের আদর্শ অনুকরণ করে থাকে। তাছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী, নৈতিক কাহিনী এবং জীব-জন্তুর কিস্‌সা কাহিনীর সাহায্যে পছন্দনীয় চিন্তাধারা সৃষ্টি করতে হবে। শিশুরা কাহিনীর মূল নায়কের স্থানে নিজেকে কল্পনা করে কাহিনী শুনে থাকে। এজন্যে নিজেও অনুরূপই হতে চায়। নৈতিক শিক্ষাদানের এ হচ্ছে সবচেয়ে ফলপ্রসূ পদ্ধতি। কিন্তু কাহিনী শেষে অযথা ফলাফল নির্ণয় করে শিশুদের প্রতি তা ছুঁড়ে মারা গল্পের সমস্ত মজাটাই নষ্ট করে দেয়। অনেক সময় তা বিদ্রোহাত্মক ভাবও সৃষ্টি করে থাকে। এজন্যে গল্প শুনিয়ে দেয়া পর্যন্তই যথেষ্ট মনে করতে হবে। ফলাফল বের করে উপদেশ দেয়া উচিত নয়।

১৫) বিদ্যালয়ে গমনাগমন এবং নতুন নতুন সাথীদের সাথে মেলামেশার পর শিশুদের জিনিসপত্র চুরি হয়ে যাওয়ার এক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। বাড়ীতে নিজের বই ও জিনিসপত্র যেখানে সেখানে ফেলে রাখলেও সংরক্ষিত থাকতো। কিন্তু বিদ্যালয়ে তা করলে জিনিসপত্র বিনষ্ট ও হারিয়ে যায়। ফলে তার জিনিসপত্রের ব্যাপারে অন্যের উপর থেকে তাদের আস্থা সম্পূর্ণ উঠে যায় এবং

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেককে তারা সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। শ্রেণীতে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যেন শিশুরা না বলে কেউ কারো কিছু না ধরে এবং শিশুদের আস্থায় আঘাত না লাগে। এ জিনিসটিই পরবর্তীকালে গোটা দুনিয়ার উপর অবিশ্বাস ও খারাপ ধারণার সৃষ্টি করে দেয়।

১৬) এ স্তরে অন্ধকারের প্রতি ভয়-ভীতি কিছুটা হ্রাস পেতে থাকে কিন্তু অনেক খেয়ালী কথায় এখনো ভয় করে থাকে। শোয়ার সময় ভীতিজনক কোন গল্প-কাহিনী বলা কখনো উচিত নয়। শিশুদের ভয়-ভীতি দূর করার পুরো চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় ভয়-ভীতি তার মধ্যে জেঁকে বসলে শিশু পরবর্তী জীবনে ভীরু ও কাপুরুষ হয়ে যাবে।

কৈশোরকাল

(নয়/দশ থেকে বার/তের বছর পর্যন্ত)

শিশুদের জীবনের এই স্তরকে দৃঢ়তা, স্থিতিশীলতা ও কার্যকারিতার যুগ বলা হয়। কেননা পুর্ণতায় পৌছার গতি পূর্বের স্তরের তুলনায় এই স্তরে অনেক ধীর গতি হয়ে যায় এবং এ পর্যন্ত দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে যতটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, তাতে পরিপক্কতা আসে। পূর্ণতায় পৌছার যুগে শিশুরা খুব তাড়াতাড়ি এবং অধিকাংশ সময় অসুস্থ হয়ে পড়তো। কিন্তু এখন তারা বেশ পরিশ্রম করতে পারে। এজন্যে দৈহিক ও মানসিক উভয় ধরনের কাজ সুন্দর রূপে নেয়া যেতে পারে। কঠোর পরিশ্রম করে লেখাপড়া করার এটাই মূলতঃ সবচেয়ে উপযুক্ত স্তর। এই স্তরের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টগুলো হচ্ছেঃ

১) শোরগোল, চটপটে ভাব, চঞ্চলতা এবং প্রস্তুতি ও চালাক- চতুরতায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। এজন্যে এই পর্যায়ে তাদেরকে নানারূপ উপকারী তৎপরতা এবং আকর্ষণীয় কাজেকর্মে নিমগ্ন রাখতে হবে। অন্যথায় এসমস্ত শক্তি দুষ্টামী ও অসৎ কাজে লেগে যাবে। তাদের সব সময় কোন না কোন কাজ থাকতে হবে। কাজ না হলে অবশ্যই শয়তানী দুষ্টামী করবে।

২) এসময় স্মরণ শক্তি থাকে অত্যন্ত প্রবল। দশ এগার বছর বয়সে মেয়েদের এবং বার তের বছর বয়সে ছেলেদের মস্তিষ্ক পূর্ণ আকার লাভ করে। জন্মের সময়ের তুলনায় চার গুণ হয়ে যায়। মুখস্থ শক্তি অনেক বেড়ে যায়। তবে

www.nagorikpathagar.org

বুঝে নিয়ে মুখস্থ করার ঝোঁক প্রবল হয়। এজন্যে যা কিছু মুখস্থ করাতে হবে, তার উপকারিতা ও মর্ম অবশ্যই মনে বসিয়ে দিতে হবে। কুরআন শরীফের বিভিন্ন যিকির, দোয়া, রসালো কাহিনী, প্রবাদ বাক্য, কাহিনী, কবিতা ইত্যাদি অধিক পরিমাণে মুখস্থ করাতে হবে।

৩) উচ্চারণ বাচনভঙ্গী ইত্যাদিতে অন্যদের অনুকরণের আকাংখা হয়। এজন্যে শব্দের উচ্চারণ, সুর উচ্চগামী-নিম্নগামী করে পদ্য গদ্য পাঠের বা বক্তৃতা দানের মশ্‌ক ও অনুশীলন করাতে হবে। বিদেশী ভাষা যেমন- আরবী, উর্দু, ইংরেজী, কিরাআত ইত্যাদি এ স্তরের প্রারম্ভেই অবশ্যই শুরু করে দিতে হবে। অবশ্য নিয়ম-কানুন, ব্যাকরণ ও বই-পুস্তকের অধিক বোঝা চাপানো যাবে না। বরং অধিকাংশ কাজ মৌখিক বা বাস্তবভাবে হতে হবে।

৪) অনুসন্ধিৎসার আধিক্য এবং চারপাশের জিনিসসমূহ, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করার স্বভাবগত আন্দোলন হয়ে থাকে। এসব সুযোগ তার হওয়া উচিত। সাধারণ বিজ্ঞান, ভূগোল ও সামাজিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপারে শিক্ষা সফরে নিয়ে যাওয়া এবং বিভিন্ন জিনিসের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের ফলাফলকে প্রবন্ধ আকারে লিখাতে হবে। অথবা সেসব জিনিসের ছবি বা মডেল তৈরী করাতে হবে। পাঠদানে নিজের বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার জন্যে চার পাশের বস্তুরাজি এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের খুব বেশী বেশী উদ্ধৃতি দিতে হবে। কোন কোন সময় অনুসন্ধিৎসা ভুল পথে ধাবিত হয় এবং নিরর্থক ও খারাপ কথাবার্তায় কিংবা মানুষের ব্যক্তি জীবনের ছিদ্রান্বেষণে লেগে যায়। এসব ব্যাপার থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে হবে।

৫) বিভিন্ন মানসিক শক্তি, যেমন- চিন্তা, যুক্তি ও অনুমানের ক্ষেত্রে অনেকটা নিয়মানুবর্তিতা শুরু হয়ে যায়। অভিজ্ঞতার কারণে শিশুরা সম্ভব অসম্ভবের ব্যাপারে পার্থক্য করতে শুরু করে। এ পর্যায়ে তাদেরকে ভূত-প্রেত, জিন-পরী ও দেও-দানব সংক্রান্ত কিস্‌সা কাহিনীকে ভিত্তিহীন ও নিরর্থক রূপে বিশ্বাস জন্মিয়ে কল্পনা পূজা থেকে রক্ষা এবং ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। আকিদা বিশ্বাসের সংশোধনের ব্যাপারে সাহায্য নেয়া যেতে পারে এবং এ জাতীয় কিস্‌সা-কাহিনী শোনা অথবা এগুলোর অধ্যয়নে আগ্রহ সৃষ্টি থেকে বিরত রেখে উপকারী অধ্যয়নে মগ্ন রাখা অতি সহজ। এ থেকে ফায়দা

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণ করা উচিত।

৬) মূলবস্তু বা তার মডেলের পরিবর্তে এ সবের ছবি, চিত্র ও নক্‌শার সাহায্যে বিষয়টি বুঝার ও সঠিক ধারণা লাভ ও নির্ণয় করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। ভূগোল, ইতিহাস ও সাধারণ জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে নক্‌শা, ছবি, এট্‌লাস ও চিত্র ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। এ পর্যায়ে শিশুরা শিশু পত্রিকা ও শিশু সাহিত্য থেকে সুন্দর রূপে উপকৃত হতে পারে। জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার জন্যে তাদের এই সুযোগ দান করা উচিত।

৭) নিজে নিজে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে, নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে কিংবা অনুসন্ধানে উৎসাহী হয় এবং সমস্যা সংকুল কিস্‌সা-কাহিনী ও বর্ণনাদি শ্রবণে বেশ আগ্রহ নিয়ে থাকে। অবশ্য সে সব কাহিনী অধিক পছন্দ করে থাকে, যেসব কাহিনীতে মূল নায়ক নানারূপ সমস্যা সংকুল অবস্থা ও জটিলতার সম্মুখীন হতে বাধ্য হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সফল হয়। এ সময়টি হচ্ছে বিভিন্ন ভ্রমণকারীদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং আবিষ্কারকদের নানারূপ চেষ্টা সাধনার সাথে পরিচিত করার উৎকৃষ্ট যুগ। তারা এতে তৃপ্তিও লাভ করবে এবং অনুরূপ কৃতিত্বপূর্ণ কাজ সমাপনের কামনা তাদের মনে সৃষ্টিও হবে। কিন্তু যেসব কাহিনীতে মূল নায়কদের বিফলতা ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়, সেসব কাহিনী শিশুদের মনে দুঃখ-বেদনা ও নৈরাশ্য সৃষ্টি করে। সে জন্যে এ জাতীয় কাহিনী থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা উচিত। আর যদি এসব কাহিনী শিশুদের পড়াতে কিংবা শুনাতেই হয় তাহলে অন্ততঃ ব্যর্থতার মাঝেও সাফল্যের দিকটি স্পষ্টতর করে তুলে ধরতে হবে।

৮) এ স্তরে শিশুরা অনুকরণের চেয়ে গবেষণা ও আবিষ্কারের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হয়ে থাকে। এজন্যে খেলাধূলা ও কামকাজে নিজেরা দায়িত্ব আদায়ের পদ্ধতি বলে না দিয়ে শিশুদেরকেই যথাসম্ভব তা বাছাই ও নির্ণয় করার সুযোগ-স্বাধীনতা দিতে হবে। কখনো কখনো এমন সব কথা শিশুর বুঝে এসে যায় যার ধারণা কল্পনাও আমাদের থাকে না। দ্বিতীয়তঃ তারা ক্রমান্বয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর যোগ্য হতে থাকে এবং নিজেদের পছন্দানুযায়ী হওয়ার কারণে পরিশ্রম ও মনোযোগের সাথে কাজ করে।

৯) নিজেদের অভ্যন্তরীণ, পরিবার-পরিজন এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়েও বাইরের জগতের প্রতি আগ্রহ থাকে বেশী। যদি তার আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রাখা না হয়, তাহলে বিদ্যালয় থেকে পালানো এবং ঘর থেকে পালিয়ে

www.nagorikpathagar.org

বেড়ানোর অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে যায়। বিদ্যালয়ে মাঝে মধ্যে বনভোজন, ভ্রমণ করার ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ দেয়া এবং ভৌগোলিক, বিজ্ঞান ভিত্তিক ও সামাজিক জ্ঞান সংক্রান্ত স্থানে নিয়ে যথাসম্ভব এতদ্সংক্রান্ত জ্ঞানদান করা উচিত। পরিবারের লোকজনদের ও বন্ধু- বান্ধবদের সাথে সাক্ষাত করা, ভ্রমণের জন্যে হাঁটতে যাওয়া কিংবা বাজারে যাওয়ার সময় শিশুদেরকে সাথে নেয়া উচিত যাতে উপযুক্ত পন্থায় শিশুর আশা ও আগ্রহ মেটানো যায় এবং তারা পলায়নী মনোবৃত্তি বা ভবঘুরে অবস্থার শিকার না হয়।

১০) গভীর চিন্তা-ভাবনা ও বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করার আগ্রহ জাগ্রত হয়। এজন্যে শিশুদের সামনে বিভিন্ন সমস্যা পেশ করে তা সমাধানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা উচিত এবং সবকিছু নিজেরা বলে দেয়ার পরিবর্তে শিশুদেরকে চিন্তা-গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে জ্ঞান-তথ্যাদি লাভ করার সুযোগ দেয়া উচিত।

১১) বাড়ী ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ যদি ভাল হয়, মানুষ যদি মন্দগুলো পরিহার এবং ভালোগুলোকে গ্রহণ করে, পরস্পর ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি ও সহমর্মিতার আচরণ করে, তাহলে শিশুদের মধ্যেও ভাল-মন্দ পার্থক্যবোধ এবং পারস্পরিক ভালবাসা ও সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত হয়। তারাও ভালোগুলোকে গ্রহণ ও মন্দগুলোকে বর্জন করতে থাকে। নিজের হিতাকাংখী ও সঙ্গী-সাথীদের প্রতি ভালবাসা এবং দুর্বল ও অসহায়দের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করে থাকে। যেসব বিষয়কে বড়রা গুরুত্ব দেন, সেসব বিষয়কে তারাও গুরুত্ব দিতে থাকে। যেমন- নামায- রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। কিন্তু পরিবেশ যদি এইসব বৈশিষ্ট শূন্য হয়, তবে এ স্তরে ছেলেদের থেকে এসব গুণাবলী আশা করা বৃথা। এজন্যে বাড়ী ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং বড়দের আদর্শ সর্বাবস্থায় সুন্দর ও অনুকূল হওয়া উচিত।

১২) ধ্যান-ধারণা, কল্পনা, আগ্রহ ও মনোযোগে দৃঢ়তার পরিবর্তে দোদুল্যমানতা পরিলক্ষিত হয়। আজ দেখা যায় এক ধরনের চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-কল্পনা। কাল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আজ এক ধরনের জিনিস, বিষয় বা কাজে আগ্রহ থাকে, কাল থাকে অন্যটায়। এজন্যে বিভিন্ন কামকাজের ও তৎপরতার সুযোগ দিয়ে উপযুক্ত ও যথার্থতা নির্বাচনের ব্যাপারে দিকদর্শন ও সাহায্য করা উচিত। পছন্দনীয় অভ্যাস ও আচরণ সৃষ্টির পরেও নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে যেন বিপরীত করার সুযোগ না

www.nagorikpathagar.org

থাকে। অন্যথায় সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

১৩) সাত আট বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা সাধারণতঃ এমন সব জিনিস সম্বন্ধেই আগ্রহ পোষণ করে থাকে, স্বভাবগতভাবে যেসব জিনিসের প্রতি তাদের ঝোঁক থাকে। কিন্তু এই বয়সে তারা এমন সব জিনিসের প্রতিও আগ্রহী হয়ে থাকে যদ্দারা সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হওয়া যায়, বড়দের সন্তুষ্টি ও সাবাস অর্জন করা যায় এবং তাদের অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচা যায়। কর্তব্য কর্মের পাবন্দী, আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং পছন্দনীয় অভ্যাস ও আচার-আচরণ সৃষ্টির ব্যাপারে এই ঝোঁক প্রবণতা থেকে উপকারিতা লাভের চেষ্টা করতে হবে। উচ্চস্বরে কবিতা পাঠ, সমস্যা সংকুল কিস্‌সা-কাহিনী পড়া, ক্লাসে কৃতকার্য হওয়ার জন্যে পরিশ্রম করা, নিজের হাতের লেখা ঠিক করার জন্যে নিয়মিত অনুশীলন করা, মঞ্চে সতর্কতার সাথে নিজের ভূমিকা পালন করার জন্যে বক্তৃতা ইত্যাদি পরিশ্রম করে তৈরী করার জন্যে তারা আগ্রহী ও উৎসুক থাকে। সুকৌশলে তাদের থেকে পরিশ্রম আদায় করে নিতে হবে। কেউ কেউ ছেলেমেয়েদের উপর রাগ দেখিয়ে এবং ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও ধমক দিয়ে কাজ আদায় করতে চায়। এর অতিরিক্ত ব্যবহার শিশুদেরকে আত্ম-মর্যাদাহীন এবং নিজের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ব্যাপারে বেপরোয়া বানিয়ে দেবে। এজন্যে ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও রাগ ধমকের অস্ত্র খুব কমই প্রয়োগ করা উচিত।

১৪) গোষ্ঠীগত স্বভাব প্রকৃতি বড় তীব্রতার সাথে বাস্তব রূপ ধারণ করে। সংঘবদ্ধ হয়ে অলি-গলিতে, ক্ষেত-খামারে, মাঠে-ময়দানে ঘোরা ফেরা করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। শিশুরা সংগঠনের নিয়ম-নীতি ও আইন-শৃংখলার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা-সম্মান দেখায় এবং কঠোরভাবে এসব মেনে চলে। নিজের সংগঠনে উল্লেখযোগ্য হওয়ার পূর্ণ চেষ্টা করে। সংসর্গ যদি ভাল হয়, তাহলে শিশুরা এভাবে মিলেমিশে থাকার, নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলার, সংগঠনের নেতার আনুগত্য করার, পরস্পরের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এবং পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতামূলক আচরণ করার পদ্ধতি শিখে নেয়। অন্যথায় সংগঠন বানিয়ে হৈ-হাঙ্গামা করা এবং অন্যান্য সংগঠনের সাথে মারামারিতে লিপ্ত হওয়ার অপচেষ্টায় মেতে ওঠে। নিজের সংগঠন কিংবা এর নেতাকে খুশী রাখার জন্যে অশোভনীয় আচরণ করে থাকে এবং পরিবার অথবা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আরোপিত বিধি-নিষেধ অমান্য করে থাকে। শিশুদের গোষ্ঠীগত স্বভাব-প্রকৃতি এবং নিজস্ব সংগঠনে উল্লেখযোগ্য হওয়ার আকাংখা

www.nagorikpathagar.org

নিবৃত্তির জন্যে খেলাধূলা এবং শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে শিশুদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেয়া উচিত। প্রত্যেক দলের আলাদা দলনেতা থাকবে, যেমন- মনিটর, খেলার ক্যাপটেন, বিভিন্ন সমাবেশ, সম্মেলন, পিকনিক, পাঠাগার ইত্যাদির ইনচার্জ অথবা বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা বা প্রতিযোগিতামূলক দলের সদস্য হিসেবে নানারূপ দায়িত্ব বহনের সুযোগ দিতে হবে। প্রতিযোগিতাকে ভুল পথে প্রবাহিত হওয়া এবং গোষ্ঠী-প্রীতির স্বভাবকে সংকীর্ণ ও দলীয় স্বার্থের রূপধারণ করা থেকে বাঁচাতে হবে। বিভিন্ন দলে সদস্য বা নেতা হিসেবে তারা যদি কাজ করার বা খেলাধূলায় অংশ নেয়ার যথেষ্ট সুযোগ পায়, তাহলে শিশুদের প্রশিক্ষণও হবে, গোষ্ঠী-প্রীতি সহজাত স্বভাব প্রকৃতি স্বস্তিও পাবে এবং তারা খারাপ সংসর্গ থেকে বেঁচেও যাবে। কাউকে দলনেতা মানতে কিংবা কাউকে বন্ধু বা সঙ্গী-সাথী প্রভৃতি বানাতে এই স্তরের শিশুরা ধনী- দরিদ্র বা উঁচু-নীচু প্রভৃতির প্রতি কোন খেয়ালই করে না। কেবল যোগ্যতাই দেখে, পারস্পরিক সমবোধের এই মনোভাব ও আবেগকে আরো বিকশিত করে তুলতে হবে।

১৫) সহজ সরলতা ও অনাড়ম্বরতা, বেপরোয়া ভাব এবং নির্ভীকতা স্পষ্টতর হয়ে উঠে। এসব ব্যাপারে খুব বেশী বাধা-বিপত্তির পরিবর্তে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জিনিসপত্রের সংরক্ষণ ইত্যাদির অভ্যাস ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হবে। এসব গুণাগুণও যদি একটা গণ্ডীর মধ্যে থাকে, তবে এগুলোও অতি প্রয়োজনীয়।

১৬) ভবঘুরে অবস্থা, স্কুল পালানো, মাস্তানী করা ও ফিল্ডিং মারা, ঘর থেকে পালানো, বিড়ি-সিগারেট পান করা, জিনিসপত্র চুরি করা, মিথ্যা বলা, গালাগালি করা, প্রতারণা করা এবং তল্লাশীতে ধরা পড়ে কোন কোন অপছন্দনীয় আচরণ করে ফেলার অনেক আশংকা থাকে। এসব অন্যায় ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সৃষ্টির পেছনে অসৎ সঙ্গ অথবা শিশুদের সাথে অন্যায় আচরণের অনেক দখল রয়েছে। যথাসম্ভব তাদেরকে অসৎ সংগ থেকে বাঁচানো এবং তাদের সাথে স্নেহ, মায়া-মমতাপূর্ণ আচরণ করার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য অসৎ সংগ থেকে বাঁচানোর মানে এই নয় যে, সঙ্গী-সাথীদের থেকেই বঞ্চিত করে দিতে হবে অথবা বৈধ সীমার মধ্যে তাদের আশা-আকাংখা ও আগ্রহ নিবারণের কোন ব্যবস্থাই হবে না। এ ভূমিকাও মারাত্মক প্রমাণিত হয় এবং তাদের ব্যক্তিত্বের সুসমন্বিত প্রশিক্ষণও হতে পারে না। এই বয়সের মানসিক প্রতিবন্ধকতা

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তিত্বের উপর সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এজন্যে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত। বৈধ আশা-আকাংখা ও বাসনা-কামনা দাবিয়ে দেয়া মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যৌবনের উন্মেষকাল

(তের-চৌদ্দ বছর থেকে সতর-আঠার বছর পর্যন্ত)

এ সময়টি জীবনের বসন্তকাল। এই স্তরে নিষ্পাপ ফুল কুঁড়ি ফেটে প্রস্ফুটিত ফুলে পরিণত হয়। দেহের উচ্চতা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং অতি দ্রুতগতিতে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন সূচিত হয়। দেখতে দেখতে একটা হালকা-পাতলা শিশু সবল-সুস্থ সুঠাম দেহী পুরুষে এবং একটা নাজুক দেহের মেয়ে সম্মানিত মহিলায় পরিণত হয়। উচ্ছৃংখল ও বেপরোয়া ভাব তিরোহিত হয় এবং সে স্থলে রেখে ঢেকে চলা ও সাজ-গোজ নেয়ার মনোভাব ফুটে উঠে। আকার-আকৃতি ও চলন-বলন সবকিছুর মধ্যেই বড় বড় ভাব ও স্পষ্ট পার্থক্য অনুভূত হতে থাকে। রং ও রূপে এসে যায় সৌন্দর্য ও লাবণ্য। চেহারায় সদা-সর্বদা হাসি ভাব লেগেই থাকে। অংগ-প্রত্যংগে দেখা দেয় সুঠাম অবস্থা ও অসাধারণ আকর্ষণ। পোশাক-পরিচ্ছদের ফিটিং ও সৌন্দর্যের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সাধারণ পোশাকও বিশেষ দামী রেশমী পোশাকের চেয়ে অধিক মানায়। মেজাজে উম্মত্ততা ও উত্তেজনা এবং চোখে নেশা এসে যায়। পরিষ্কার পানিতেও রঙ্গিন মাদকতার স্বাদ অনুভূত হয়। শুরু হয় নতুন জীবন, নতুন আশা, নতুন বন্ধু-বান্ধব এবং নতুন ওয়াদা অঙ্গীকার। এক কথায় চারদিকে বিরাজ করতে থাকে বসন্তের বাসন্তিকা ও ফুলের সৌরভ। এ হলো যৌবন উন্মেষের একটা হালকা ঝলক মাত্র।

এ স্তরের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হচ্ছেঃ

১) এটি জীবনের অত্যন্ত নাযুকতর ও স্পর্শকাতর স্তর। যৌন আবেগের তীব্রতা দেখা দেয় এবং যৌন স্বভাব প্রকৃতি বাস্তব রূপ লাভ করে। অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার কারণে দৈহিক ও নৈতিক দিক থেকে মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থাকে। এজন্যে অশেষ দৃষ্টি দান এবং চালচলন ও

www.nagorikpathagar.org

স্বভাব চরিত্রের প্রতি কড়া নজর রাখা প্রয়োজন। অবশ্য নিজেদের আচরণ ও ভূমিকায় তাদের বুঝতে দেয়া উচিত নয় যে, তাদেরকে শোভা–সন্দেহ ও গোয়েন্দার নজরে দেখা হচ্ছে। তাছাড়া তাদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করতে হবে। যৌন প্রবৃত্তি স্রষ্টার এক বিশেষ ও বড় দান। তাকে দমিয়ে দেয়ার চেষ্টা মূলতঃ সহজাত প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করা এবং ব্যক্তিসত্ত্বার জন্যে চরম ক্ষতি ছাড়া কিছুই নয়। পৌরুষের এই মূল উপাদানের হেফাজত করা, যৌন আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভে এবং এই যৌন প্রবৃত্তির বৈধ পথ অবলম্বনে সহায়কের ভূমিকা পালন করা উচিত। আকর্ষণীয় গঠনমূলক কার্যক্রমে ও তৎপরতায়, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলায় এবং বিভিন্ন নিপুণ বৈধ শিল্প বিদ্যায় বাস্তব অংশগ্রহণের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। এতে এই স্বভাব প্রবৃত্তি স্বস্তিও পাবে এবং শিল্প বিদ্যায় দক্ষতাও অর্জিত হবে।

২) লজ্জাশীলতা ও সম্ভ্রমবোধ অতিরিক্ত বেড়ে যায় এবং সমাজ ও সামাজিকতার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। এটা হচ্ছে তরুণদের একটা সহজাত প্রকৃতিগত হাতিয়ার, যার দ্বারা তারা তাদের অদূরদর্শিতা ও অনভিজ্ঞতার এই স্তরে নিজেদের চালচলন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। চরিত্রকে নিষ্কলুষ ও অনাবিল করার এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে এটা হলো অসীম উপকারী ও জরুরী। তাই এসব আবেগ অনুভূতিকে কখনো আঘাত দিতে নেই। কারণ, অভিজ্ঞতা বলছে, এই বয়সে যদি লজ্জা শরম উঠে যায় অথবা সমাজের ভয় না থাকে, তাহলে তরুণরা যা ইচ্ছে তাই করে বসে।

৩) অবসর সময়ে অথবা নির্জনে থাকলে, প্রায় নোংরা যৌন খেলায় ও উত্তেজনা জাগরিত হয় এবং শয়তান বিভিন্ন ওয়াছ্ওয়াছা ও কুধারণায় লিপ্ত করে থাকে। "অচল মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা"। এজন্যে অবসর সময় কাটানোর জন্যে বেশী বেশী উপকারী ও আকর্ষণীয় কাজ কর্ম ও তৎপরতার ব্যবস্থা হওয়া উচিত যেন তরুণরা সব সময় কাজে রত থাকতে পারে। হালকা ও ভারী উভয় ধরনের কাজের ব্যবস্থা থাকতে হবে– যাতে সব সময় দৈহিক ও মানসিকভাবে নিয়োজিত রাখা যায়।

৪) স্বাধীন চিন্তা, মুক্ত চিন্তা, নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করা, স্বাধীনচেতা ভাব, নিজের কাজ নিজে করা, নিজস্ব ব্যাপারাদিতে নিজেই চিন্তাভাবনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এবং মাতাপিতা ও বড়দের হস্তক্ষেপ থেকে স্বাধীন থাকার মনোভাব জাগরিত হয়। বৈধ সীমারেখার মধ্যে তাদের স্বাধীনতা থাকা দরকার।

www.nagorikpathagar.org

যাতে তারা নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে। তাদেরকে সব সময় নিজেদের মুখাপেক্ষী করে রাখা উচিত নয়- যেমনটা, মা-বাপ আদর-সোহাগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে করে থাকেন। সংশ্লিষ্ট কাজে তরুণদের থেকে পরামর্শ নেয়া উচিত এবং বাধা বিপত্তি থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় বিদ্রোহী হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। নম্রতা ও স্নেহ মমতার মাধ্যমে পথে আনার চেষ্টা করতে হবে।

৫) কাল্পনিক মজা উড়ানো, শূন্যে দূর্গ নির্মাণ করা এবং পরিকল্পনা তৈরীতে, জেঠামী প্রদর্শণে, তরুণরা স্বাদ পায়। এজন্যে তারা অধিকাংশ সময় দুনিয়ার বাস্তবতা পরিহার করে গোয়েন্দা বৃত্তির উপন্যাস অথবা খোদার সেনাপতি জাতীয় কল্প-কাহিনীর মধ্যে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। তাদেরকে সমাধান সন্ধানী বিভিন্ন সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত। বিভিন্ন বিষয় আন্‌জাম দানের জন্যে তাদের দ্বারা পরিকল্পনা তৈরী করিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যেন সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখে এবং ধীরে ধীরে বাস্তববাদী হয়ে উঠে। ব্যর্থতা থেকে বাঁচানো এবং ক্রমাগত চেষ্টা সাধনা করে সফলতার দ্বারে পৌঁছানোর ব্যাপারে সাহায্য-সহায়তা ও পথ প্রদর্শন করতে হবে যেন তারা দুনিয়ার তিক্ত বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়।

৬) বিভিন্ন সংকট সমস্যা প্রিয় এবং জোট বদ্ধ হয়ে ঘোরাফেরা করে বেড়ানোর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাদেরকে শিক্ষা সফরের সুযোগ সুবিধা দেয়া উচিত। সফরের ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন দলে ভাগ করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের থেকে কাজ আদায় করে নিতে হবে। জনসেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের জন্যে তাদের বিভিন্ন গ্রুপ বানিয়ে দিতে হবে এবং খুব কাজ আদায় করে নিতে হবে। প্রতিযোগিতা-মূলক খেলাধূলায় অংশগ্রহণের ফলে সংকট সমস্যা প্রিয় আবেগ প্রবণতা স্বস্তি পায় এবং জনসেবার মাধ্যমে মায়া মমতা ও সুনজরের আবেগ প্রেরণা জাগ্রত হয়।

৭) এ সময় তারা সাবেক ও পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের ভুলে যায়, হৃদয় মন ও প্রাণের নতুন বন্ধু-বান্ধব বানায়। এই বন্ধুত্ব অত্যন্ত গভীর ও স্থায়ী হয়ে থাকে। অন্তরের গোপন কথাও এসব বন্ধু-বান্ধবের কাছে বলে দেয়। তাদের সংগে বেশী বেশী সময় কাটানোর চেষ্টা করে এবং তাদের সাহায্যের অস্বাভাবিক প্রভাব গ্রহণ করে থাকে। এটা স্পষ্ট যে, বন্ধু-বান্ধব ভালো হলে খুবই মঙ্গল। অন্যথায়

www.nagorikpathagar.org

ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। বন্ধুত্বের সম্পর্ক অন্তরের সাথে, বন্ধু নির্বাচনে ছেলেদের ইচ্ছা শক্তিই বেশী কাজ করে। বড়দের পছন্দ অপছন্দ দ্বারা বন্ধু নির্বাচন করা যায় না। এমতাবস্থায় বন্ধু নির্বাচনে কোন একটি সীমা পর্যন্ত তাদের স্বাধীনতা দেয়া উচিত। চেষ্টা করতে হবে, যাতে পরিবেশ ভালো হয়। এতে বন্ধু-বান্ধবও ভালো পাওয়া যাবে, তাদের বন্ধু-বান্ধবদের স্বভাব-চরিত্র অভ্যাস চালচলন ও আগ্রহ অনাগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। তাদের কখনো কখনো বাড়ীতে দাওয়াত দেয়ার সুযোগ দিতে হবে। তাদের সম্মান দেখানো, স্নেহ মমতা ও ভালো আচরণ দিয়ে পছন্দনীয় কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতায় আগ্রহী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। এরূপ অবস্থায় তারাও সংশোধন হবে এবং আপন সন্তান ও অসৎ সংগ থেকে রক্ষা পাবে। বেশী বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৮) দৃষ্টান্তমূলক কৃতিত্ব ও বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্বসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের গুনাবলী ও বৈশিষ্টসমূহ আয়ত্ব করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত নিজ নিজ মাতাপিতা ও শিক্ষকগণকেই আদর্শ ও অতি উচ্চ মনে করে আসছে। কিন্তু তারুণ্যের এ পর্যায়ে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে অনেক বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্বসমূহের জীবনাচরণকেই অনুকরণীয় আদর্শ বানাতে চায়। এটা সুস্পষ্ট যে, এমন একজন পুর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব- যাঁর জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগই অনুপম এবং প্রত্যেক মানুষের জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত যার সুন্দর ও উত্তম আদর্শ অনুকরণ যোগ্য- একমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই হলেন সেই ব্যক্তিত্ব। এজন্যে তাঁকে ভালবাসার এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পরিপূর্ণ চেষ্টা করতে হবে। এ ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শণ করলে তরুণরা কোন অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী নেতা অথবা কোন চিত্র তারকা ইত্যাদিকে নিজেদের হিরো বানানোর আশংকা রয়েছে।

৯) তারা এমন একটি আদর্শে তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকে যে আদর্শের জন্যে তারা নিজের জীবন নিয়োজিত করতে পারে। স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যে নিজের সবকিছু নিয়োজিত করে দেয়া নিজেরাও জীবনের সবদিক ও বিভাগে তাঁরই মর্জি মতো চলা এবং গোটা মানব জাতিকে তাঁর মর্জি মোতাবিক পরিচালনা করার চেষ্টা সাধনা করাই হলো মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও সঠিক আদর্শ। কিন্তু মানুষ নিজেদের জন্যে নানা রকমের আদর্শ ও

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্নরূপ লক্ষ্য তৈরী করে নিয়েছে। আল্লাহ্ পরস্তির পরিবর্তে বস্তু পূজা, প্রবৃত্তি পূজা, দেশ পূজা, জাতি পূজা ইত্যাদি বিভিন্ন পূজা ও ইজম (ism) এর প্রাধান্য চারদিকে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে যে, আদর্শ নির্বাচনে পদস্খলনের ভীষণ আশংকা বিরাজমান রয়েছে। এজন্যে তরুণদেরকে অত্যন্ত হেকমত, কৌশল, প্রজ্ঞা, চিন্তা-ভাবনা এবং মহব্বত ও আন্তরিকতা সহকারে সঠিক আদর্শ ও লক্ষ্য গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে হবে। তাদের শক্তি সামর্থ্য, মেধা ও যোগ্যতা এবং প্রকৃতিগত ঝোঁক প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সেই আদর্শ ও লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম সাধনার যথোপযুক্ত পথ প্রদর্শন করা উচিত। এই লক্ষ্য ও আদর্শের যেদিক থেকে তারা অধিকতর উত্তম খেদমত আনজাম দিতে সক্ষম, সেই দিকটি স্পষ্ট রূপে চিহ্নিত হওয়া উচিত।

১০) এরূপে ধর্মীয় প্রেরণা ও জোশ এবং ধর্মের জন্যে ত্যাগও কোরবানীর আবেগ আগ্রহ নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তবে আকীদা বিশ্বাসের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়। আর এসব রহস্য ও বিশ্বাসের গুঢ়তত্ত্ব জানার আকাংখা জন্মে।

ধর্মীয় জোশ ও উদ্দীপনাকে ভারসাম্যের সাথে বিকশিত করে তোলা উচিত। জোশের সাথে হুঁশের কথাও ভাবতে হবে। সন্দেহ্ সংশয়ের প্রতি কখনো রাগ ক্ষোভ দেখাবেন না। বরং সমমর্মিতার সাথে সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করতে হবে, যুক্তি প্রমাণ দিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করতে হবে এবং শরীয়তের রহস্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাতে হবে। যেহেতু এই বয়সে দৈহিক চাহিদা এক রকম, আত্মার চাহিদা ভিন্ন রকম। সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধগুলোর চাহিদা ও আকার অন্য ধরনের এবং প্রবৃত্তির চাহিদা হলো ঠিক বিপরীত। উভয়ের চাহিদাগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হওয়ার কারণে মানসিক দ্বন্দ্ব ও বিপর্যয়ের শিকার হয় এবং শরীয়তের বিধি-বিধানগুলোর যৌক্তিকতার ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় করতে থাকে। যদি দু'য়ের চাহিদাগুলোর মধ্যে সামাঞ্জস্য বুঝিয়ে দেয়া যায়, তবে সহজেই তাদের আশ্বস্ত করা সম্ভব। ইসলাম যেহেতু স্বভাব ধর্ম, তাই দেহের স্বাভাবিক দাবীগুলো উপেক্ষা করা যাবে না। তা করলে খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা তরুণদের নিকট স্বভাব ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ মনে হবে।

১১) এ বয়সে তরুণদের মধ্যে অধ্যয়নের অস্বাভাবিক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ঘন্টার পর ঘন্টা একাধারে অধ্যয়নে রত থাকে। এ সময়ে খ্যাতনামা ও

www.nagorikpathagar.org

অস্বাভাবিক কৃতিত্বের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম, মুজাদ্দেদীন, ইমামগণ, বুজর্গ মনীষীবৃন্দ এবং বিপ্লবী ব্যক্তিত্বদের জীবনী ও কীর্তিমালা সম্বলিত গ্রন্থরাজি এবং পবিত্র ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহ পাঠের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যথোপযুক্ত বই সরবরাহ করতে হবে।

১২) এ সময় নিষ্কলুষ নির্ভেজাল ভালবাসার তীব্র আবেগ সৃষ্টি হয়। এই আবেগকে সৃষ্টির সেবা এবং সত্য ইনসাফের প্রতি ভালবাসার দিকে ফেরানো এবং এর সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩) এসময় তারা অন্ধ অনুকরণের প্রতি ঘৃণা এবং যে কোন কথা নির্বিচারে বিশ্বাস করা পরিহার করতে থাকে। এ জন্যে নির্দেশদানের সময় সতর্কতা অবলম্বনের দৃষ্টি রাখতে হবে। নির্দেশকারী ও ডিক্‌টেটর সেজে নির্দেশ দানের পরিবর্তে পরামর্শ দাতার ভূমিকা অবলম্বন করতে হবে। মনের আগ্রহ দেখে নির্দেশ দেয়া উচিত– যেন অমান্য করার আশংকা না থাকে।

১৪) বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি ও চুলচেরা সমালোচনায় ভীষণ ক্রোধ ও বিদ্রোহ করার আশংকা থাকে। এজন্যে প্রকাশ্যে সমালোচনা ও ত্রুটি ধরার পরিবর্তে নির্জনে নরম সুরে অত্যন্ত আন্তরিকতা সহকারে বুঝাতে হবে।

১৫) ভালবাসার ব্যাপারে মনে হয় যেন বাল্যকালটাই পুনরায় ফিরে এসেছে। এই পর্যায়ের শুরুতে তো নিজ সত্তার সাথেই তার ভালবাসা থাকে। সাজগোছের প্রতি অস্বাভাবিক লক্ষ্য থাকে। আবার নিজের সমলিঙ্গের সাথীদের সাথে প্রগাঢ় ভালবাসা, আন্তরিকতা এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ, গভীর ভালবাসা, পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পনের আবেগ উচ্ছাস জাগ্রত হয়। এটি সহজাত প্রকৃতি। এসব আবেগ উচ্ছাসকে দাবিয়ে রাখার পরিবর্তে ভারসাম্যের উপর নিয়ে আসা ও সঠিক খাতে প্রবাহিত করা প্রয়োজন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর যথা শীঘ্র বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা করা উচিত।

১৬) এসময় তরুণদের স্বভাব চরিত্র ও আচার–আচরণে দেখা দেয় জোয়ার ভাটা এবং অস্বাভাবিক ধরনের উন্নতি–অবনতি। ঘন্টায় ঘন্টায় পরিলক্ষিত হয় বিশেষ পরিবর্তন। কখনো অত্যন্ত তীব্রতা ও পরিপক্কতার প্রমাণ দেয়। আবার কখনো চরম দুর্বলতা ও অনীহা দেখায়। কখনো অতিরিক্ত আশাবাদী হয়, কখনো সীমাতিরিক্ত নৈরাশ্য জন্মায়। বড়দের মাঝেও স্থান হয় না ছোটদের মধ্যেও জায়গা পায় না। প্রায়ই মানসিক উদ্ভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের শিকার হয়। অভিশাপ–তিরস্কারের পরিবর্তে সমবেদনা, সহমর্মিতা ও সহানুভূতি পাওয়ার

www.nagorikpathagar.org

যোগ্য থাকে।

১৭) এ সময়টি হলো জীবনের সোনালী যুগ। নতুন নতুন আশা, নতুন নতুন সংকল্প, ভবিষ্যতে নিজের পজিশন নির্ধারণ ও উন্নতি করার প্রতিভার বিকাশ ঘটে। এসব বৈশিষ্ট থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। এসবের মাধ্যমে উচ্চ গুনাবলী সৃষ্টি এবং উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করার ব্যাপারে সাহায্য-সহায়তা ও পথ প্রদর্শন করা উচিত। অন্যথায় ভুল পথে চলে গিয়ে অশেষ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

এ হচ্ছে বিভিন্ন স্তর ও স্তরসমূহের বৈশিষ্ট। শিক্ষা-দীক্ষা দানের বেলায় এ বৈশিষ্টের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শিশু যে স্তর অতিক্রম করেছে, সেই স্তরের বৈশিষ্টসমূহ অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তাদের জন্যে যে সব বিষয় কার্যক্রম বা কর্ম তৎপরতা নির্ধারণ করা হবে, তাতে এ বৈশিষ্টগুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। এসব বৈশিষ্ট উপেক্ষা করা হলে অথবা সহজাত প্রকৃতির দাবি-দাওয়া ও চাহিদাগুলোকে দাবিয়ে রাখলে, সুসমন্বিতভাবে শিশুদের ব্যক্তি সত্তার বিকাশ সম্ভব হবে না। ফলে এর দুঃসহ পরিণাম ভোগ করতেই হবে। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, মায়া- মমতা, আন্তরিকতা ও সহমর্মিতাকে ঐতিহ্য, নিদর্শন ও দৃষ্টান্ত বানিয়েই শিশুদের প্রশিক্ষণদান সম্ভব। পরিবেশকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখা এবং নিজের ভালো ও উত্তম আদর্শ সামনে তুলে ধরাই হলো সর্বোৎকৃষ্ট হাতিয়ার।

www.nagorikpathagar.org

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ স্বভাব ও প্রকৃতি

সহজাত স্বভাব এবং স্বভাবগত দাবি ও প্রকৃতির চাহিদা সংখ্যায় অনেক। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষার দৃষ্টি ভঙ্গিতে নিম্নোক্তগুলো অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যে এগুলো সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা যাচ্ছে।

অণ্বেষা ও অনুসন্ধিৎসা

অর্থাৎ অনুসন্ধান করা বা নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভের আকাংখা। অণ্বেষা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সহজাত প্রকৃতি ও সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। এরি মাধ্যমে মানুষ নিজের স্বাভাবিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভে সমর্থ হয় এবং খোলা চোখ ও খোলা কান নিয়ে জীবন যাপনের যোগ্য হয়। মায়ের দুধ পানের সময় থেকেই এই স্বভাব তার কার্যক্রম শুরু করে দেয়। যা কিছুই সামনে আসে, শিশু আপাদমস্তক জিজ্ঞাসু নয়নে তা দেখে এবং গভীর দৃষ্টিতে বারবার দেখতে থাকে, যতক্ষন পর্যন্ত ঐ বস্তু দৃষ্টির আড়াল না হয়। যখন কিছুটা বলতে সক্ষম হয় তখন প্রত্যেক নতুন জিনিস সম্পর্কেই প্রশ্নের ঝড় তুলে ছাড়ে। প্রশ্ন করে এটি কি? ওটি কি? ওটা কেমন? এমনটি হয় কেন? ইত্যাদি। এভাবে সে তার আশপাশের সবকিছু সম্পর্কে নানারূপ জ্ঞান লাভ করে থাকে। এই প্রকৃতি ও স্বভাবের সাথে বিস্ময় ও আশ্চর্যের আবেগ অনুভূতি যোগ হয়ে তার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দেয় এবং সহজাত প্রকৃতিকে অণ্বেষন, অনুসন্ধান, চিন্তা গবেষণা, ও গুঢ়তত্ত্ব আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। এই সহজাত প্রকৃতির বদৌলতে মানুষ সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন গোপন রহস্য সম্পর্কে জানতে পেরেছে এবং দিন দিন তার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর হচ্ছে। কিন্তু এই প্রকৃতিই যখন ভুল পথ অবলম্বন করে, তখন শিশু ভিত্তিহীন,

www.nagorikpathagar.org

ক্ষতিকর ও অনর্থক কথাবার্তা কিংবা মানুষের ব্যক্তি জীবনের ছিদ্রান্বেষনে পড়ে নিজের সময় ও শক্তি নষ্ট করতে থাকে। এছাড়া নানারূপ কু-অভ্যাস, অপছন্দনীয় চাল-চলন ও গতিবিধিতে লিপ্ত হওয়ার একমাত্র কারণ হলো, তারা এসব অভ্যাস আচরণের ফলাফল ও পরিণাম সম্পর্কে অবহিত হতে চায়।

এই সহজাত প্রকৃতির প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনঃ-

* নতুন নতুন তথ্য ও বিষয় অবহিত করার জন্যে এই সহজাত প্রকৃতিকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে তুলতে হবে, এতে শিশু নিজে কায়মনোবাক্যে পূর্ণ আগ্রহ ও গভীর মনোযোগের সাথে পাঠে অংশগ্রহণ করতে থাকবে। এজন্যে বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত জানার বিষয়ে পাঠদানকালে এই প্রকৃতিকে অধিক হারে কাজে লাগাতে হবে। অবশ্য নতুন জানার বিষয় বস্তুকে পূর্বতন বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত করে বোধগম্যভাবে পেশ করতে হবে। কারণ, বিষয়টি যদি একেবারেই অপরিচিত ও অবোধগম্য হয়, তবে শিশুরা সেদিকে মোটেই মনোযোগী হবে না অথবা সে সম্পর্কে ভীতি ও ঘৃণা অনুভব করবে।

* শিশুদের প্রশ্নসমূহের সন্তোষজনক উত্তর দিতে হবে এবং অতিরিক্ত প্রশ্ন করার কারণে তাদের ধমক দেয়া যাবে না। কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে শিশুদেরকে ধমকায়। এর ফলে শিশুদের এই সহজাত প্রকৃতি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে যায় অথবা মরে যায়। এই প্রকৃতিকে জীবনভর জীবন্ত ও প্রাণবন্ত রাখার চেষ্টা করা এবং বয়স, বোধ শক্তি ও আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে একে আশ্বস্ত করার উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা উচিত।

* শিশুদেরকে বাজে, অপকারী এবং স্বাস্থ্য ও চরিত্র বিনাশী কথাবার্তার পেছনে পড়া থেকে বাঁচাতে হবে। বিভিন্ন প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে এবং সুযোগ দিয়ে শিশুদেরকে সাধারণ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে নানারূপ জ্ঞান অর্জনে অথবা চিন্তা গবেষণা ও অনুসন্ধানের অভ্যাস সৃষ্টির চিন্তা করতে হবে।

* অনুসন্ধিৎসার স্তর তিনটিঃ

www.nagorikpathagar.org

(ক) দৈহিক অনসুন্ধিৎসাঃ শিশুরা দেহের অংগ-প্রত্যঙ্গ ও আশপাশের সবকিছু অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে দেখে থাকে, হাতে ধরে থাকে, উঠিয়ে নেয়, মুখে দেয় এবং হাতে নিয়ে বস্তুর আকার-আকৃতি, রঙ, পরিমাণ, ওজন, শব্দ, স্বাদ, কাঠিন্য, তরলতা, শীতলতা, উষ্ণতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট সম্পর্কে নিজস্বভাবে জ্ঞান লাভ করার প্রয়াস চালায়। সুতরাং যে শিশুর পরিবেশ, বিভিন্ন মালামাল, নানা প্রকার জিনিসপত্রে যত বেশী সমৃদ্ধ থাকে এবং সে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা লাভের যত বেশী সুযোগ পায়, তার জ্ঞান ভান্ডারও তত বেশী সমৃদ্ধ হয়। এজন্যে এর ব্যবস্থা করা দরকার।

(খ) সামাজিক অনুসন্ধিৎসাঃ যেসব জিনিস বা ঘটনাবলী ও নিদর্শনকে শিশুরা নিজেদের দেখায়, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতায় ভালোভাবে বুঝতে পারে না, সেসব সম্পর্কে তারা মাতাপিতা, শিক্ষক, নিজেদের সংগী ও সহপাঠীদের কাছে জানতে চায়। শিশুদের বিভিন্ন প্রশ্ন করা সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচায়ক। এজন্যে আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার সাথে সন্তোষজনক উত্তর দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

গ) বুদ্ধিগত অনুসন্ধিৎসাঃ যৌবনের শুরুতে পদার্পণের সাথে সাথে এটা প্রকাশ পায়। যেসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, কারবার ও ঘটনাবলী অনুধাবনে বা বুঝে নিতে অন্যদের সাহায্য নেয়া সম্ভব হয় না, শিশুরা সেসব সম্পর্কে নিজেরা গভীর চিন্তা-ভাবনার সাহায্য নেয় এবং নিজেদের যোগ্যতানুযায়ী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা সমাধান নির্ণয় করে। যা জ্ঞানের স্বল্পতা বা অনভিজ্ঞতার কারণে প্রায়ই চরম শিশু সুলভ হয়ে থাকে। শিশুদের এ জাতীয় চেষ্টা সাধনাকে উপহাস করা ঠিক নয় বরং সঠিক পন্থায় চিন্তা-ভাবনা করার ব্যাপারে সাহায্য ও পথ প্রদর্শন করা উচিত।

* ঘরে ও বিদ্যালয়ে অনুসন্ধিৎসা নিবারণের যথার্থ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই আবেগকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা উচিত। অন্যথায় এই সহজাত স্বভাব প্রকৃতি হয়তো দুর্বল হয়ে পড়বে অথবা নিজের প্রকাশ ও স্বস্তির জন্যে ভুল পথ অবলম্বন করবে। পরিণামে শিশুরা ঘর ও বিদ্যালয় থেকে পলায়ন করতে থাকবে এবং খারাপ অভ্যাস ও অপছন্দনীয় আচার-আচরণ ও গতিবিধির শিকার হবে।

www.nagorikpathagar.org

সঞ্চয় প্রবণতা

অর্থাৎ কিছু জমা করা। এটাও একটা বুনিয়াদী কামনা-বাসনা ও গুরুত্বপূর্ণ সহজাত প্রবৃত্তি। এর সাথে মালিকানার মনোভাব সক্রিয় থাকে। এরি বদৌলতে মানুষ নিজের দুর্দিনের জন্যে কিছু সঞ্চয় করে এবং পরমুখাপেক্ষিতা ও দারিদ্র্য থেকে নিজেকে রক্ষা করে থাকে। জনকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠা এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্যে ফান্ড গঠন, দূর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তুরাজি সংগ্রহ করে থাকে। যাদুঘর ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করে। হাদীস ও বাণীসমূহ, নিদর্শনাদি ও উক্তিসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, অভিধান- শব্দ কোষ এবং রেফারেন্স জাতীয় গ্রন্থমালার সংকলন ইত্যাদি অনেক কিছু এই স্বভাবেরই দান। কিন্তু এই স্বভাবই ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে মানুষকে লোভ-লালসা, ধোকা-প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, আত্মসাত, চুরি, রাহাজানি, গুদামজাতকরণ ও মওজুতদারী পুঁজিবাদের অসংখ্য অভিশাপের নিগড়ে আবদ্ধ করে ছাড়ে। যার পরিণামে ময়দান সমাজতন্ত্রের মত চরম অভিশাপের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। একটা শিশুর পকেট, থলে অথবা বাক্স তদন্ত করে দেখুন ফলের বীজ, কাগজের টুকরো, খালি কৌটা এবং আরো কতকিছু পাবেন। এসবই মূলতঃ উক্ত স্বভাবেরই ফল। এসব ব্যাপারে তাদেরকে হুশিয়ার করা অথবা এসব দূর্লভ বস্তু দূরে ছুঁড়ে মারার পরিবর্তে সঠিক প্রশিক্ষণদানের জন্যে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

* ছোট শিশুদেরকে বিদ্যালয়ের যাদুঘর এবং ক্লাস সাজানোর জন্যে বিভিন্ন রকমের বীজ, ফুল, পাতা, পাখীর পালক, সীসা ও পাথরের টুকরো, শামুক, ঝিনুক, খালী কৌটা, টিকেট, চিত্র, ছবি, মুদ্রা ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা উচিত এবং ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ জ্ঞান, আর্ট ও ক্র্যাফ্‌ট ইত্যাদি জ্ঞানার্জনে এসব থেকে সাহায্য নেয়া উচিত। তাদের সংগৃহীত দ্রব্য সামগ্রী সন্নিবেশিত করার ও মার্জিত করার পদ্ধতি দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

* বড় বড় ছেলেমেয়েদেরকে বিভিন্ন হাদীস, বাণী, প্রবাদবাক্য, পছন্দনীয় কবিতামালা, উন্নতমানের গ্রন্থরাজি ইত্যাদি সংগ্রহ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

* হাত খরচ ও ঈদ খরচ থেকে কিছু সঞ্চয় করার অভ্যাস গড়ে তুলতে

www.nagorikpathagar.org

হবে। যখন কিছু পরিমাণ সঞ্চয় ও জমা হয়ে যাবে, তখন কিছু উপকারী ও ভালো ভালো বই কিংবা জিনিসপত্র ক্রয় অথবা কারো কোন সাহায্যে খরচ করার জন্যে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

* গরীব ও নিঃস্ব ছাত্রদের সাহায্যার্থে ফান্ড গঠন অথবা পুরাতন বইপত্র সংগ্রহ অভিযানে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

* নিজের অভিধানের বই এবং নির্বাচিত কবিতা সংকলন তৈরী ও ক্ষুদ্র আকারের পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে শিশুদেরকে অনুপ্রাণিত করা উচিত। এভাবে এই সহজাত প্রবৃত্তি মরেও যাবে না, আবার প্রকাশিত হওয়ার জন্যে সঠিক পথও পেয়ে যাবে।

নির্মাণ ও গড়ার মনোবৃত্তি

দুনিয়াতে যত গড়া ও নির্মাণের কাজ সাধিত হয়েছে কিংবা হচ্ছে তার অধিকাংশই এই সহজাত প্রবৃত্তিরই অবদান। ক্ষুদ্র কুটীর, কুঁড়েঘর ও কাঠ-পাথরের অস্ত্রশস্ত্র থেকে শুরু করে বিশাল বিশাল প্রাসাদ, ভারী যন্ত্রপাতি রেলগাড়ী ও জাহাজের কারখানা পর্যন্ত সবকিছু এই প্রবৃত্তিরই কৃতিত্ব। কিন্তু এই প্রবৃত্তিই যদি ভুল পথ অবলম্বন করে, তবে ভয়ানক ধ্বংসযজ্ঞ করে ছাড়ে।

আ'দ ও সামুদ জাতির ইমারতসমূহ এবং মঙ্গোল ও তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞ সব কিছু এরই পরিণাম ছিল। এই সহজাত প্রকৃত্তির প্রকাশও শুরু হয় শৈশবকাল থেকেই। শিশুরা সামনে যা পায় তাতেই হাত দেয়ার চেষ্টা চালায়। পরিণাম যা-ই হোক, তা ভাবে না। আপনি যখনই লক্ষ্য করবেন, দেখতে পাবেন তারা কিছু না কিছু ভাঙাগড়ার কাজই করছে। শিশুদের জন্যে এই কাজ অতি জরুরী বটে। এভাবে তারা অনেক কিছুই শিখে নিতে পারে। ভাঙ্গা ও গড়া এই সহজাত প্রবৃত্তিরই দু'টো দিক। প্রতিটি গড়ার সাথে কিছু না কিছু ভাংগার কাজও হয়ে থাকে; এ দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্য বোধ শিশুদের থাকে না। কোন জিনিসের আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়াকেই তারা গড়া হলো বলে মনে করে। তাছাড়া গড়ার তুলনায় ভাঙ্গা সহজ। এজন্যে শিশুরা ভাংগা দিয়েই কাজ শুরু করে। অন্যদের খেলনা ও মাটির ঘর ভেংগে ফেলা এবং ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করা শিশুকালের স্বাভাবিক কাজ। যদি তারা শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু

www.nagorikpathagar.org

তৈরী করার সুযোগ পায়, সেটা মাটির খেলনাই হোকনা কেন তাহলেও তারা পরিশ্রমের মূল্য শিখতে পারে এবং জিনিসপত্র ভাঙচুর করার পরিবর্তে সেগুলো হেফাজত করতে থাকে।

শুরু থেকেই শিশুদের এই সহজাত প্রবৃত্তিকে সঠিক পথে প্রবাহিত করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় গড়ার পরিবর্তে তারা ভাঙ্গার কাজেই অধিক মজা পেতে থাকবে। এ প্রসংগে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিতঃ

* বিদ্যালয়ে আর্ট ক্র্যাফ্‌ট, মৃৎকর্ম, বাগান করা ইত্যাদি ব্যবস্থা করতে হবে। এতে শিশুদের উক্ত প্রকৃতি স্বস্তিও পাবে, শিশুরাও শ্রম ও কষ্ট সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত হবে। আর তাদের গঠনমূলক প্রতিভার বিকাশও ঘটবে।

* শিশুরা নিজ হাতে কোন কিছু বানিয়ে বেশ আনন্দ পায়। অন্যদের চোখে তা একেবারেই নগণ্য, অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণই হোকনা কেন। নিজের তৈরী জিনিস খুবই প্রিয় হয়ে থাকে। তারা সেসব জিনিস বেশ হেফাজতে রাখে এবং চায়, যে কোন দর্শক এগুলো দেখে তার প্রশংসা করুক। এজন্যে শিশুদেরকে এই সুযোগ দেয়া উচিত। তাদের তৈরী জিনিসের ত্রুটির প্রতি উপহাস না করে তাদের আরো উৎসাহ দেয়া উচিত। সমালোচনা যদি করতেই হয়, তবে তা উৎসাহ ব্যঞ্জক ও গঠনমূলক হওয়া উচিত- যেন উৎসাহে ভাটা না পড়ে এবং তা আরো উন্নত মানের বানাতে পারে।

* কেউ কেউ শরীর ও পোশাক ময়লা হওয়ার ভয়ে ধূলা, মাটি, কাদা, ও পানিতে খেলতে ও কাঠ-মাটির খেলা ঘর তৈরী করতে শিশুদেরকে বাধা দেয়। এভাবে তারা শিশুদেরকে এমন সব প্রকৃত আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে, যেসব আনন্দ গঠনমূলক খেলাধূলার মাধ্যমে তারা উপভোগ করে এবং শ্রম-মেহনতের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব- এমন উপকারিতা থেকেও তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়। অথচ ওসব তৎপরতা ও কাজের সুযোগ করে দেয়া এবং অবসর হলে পর শরীর ও পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের ব্যবস্থা করাই উচিত ছিল। কেবল পরিচ্ছন্নতার স্বার্থে এসব কর্ম তৎপরতা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। বিছানায় পেশাব করা এবং নিজের পেশাব পায়খানা নিয়ে খেলার অভ্যাসও অনুরূপ উপায়ে ছাড়ানো যেতে পারে। যেসব শিশু কখনও কাদা-মাটি নিয়ে খেলার সুযোগ পায়নি- এ কারণেও পেশাব পায়খানা দিয়ে তাদের খেলার অভ্যাস হয়ে যেতে পারে।

* আজকাল নানা ধরনের শিক্ষামূলক খেলনা পাওয়া যায়। তার মধ্যে কাঠের

www.nagorikpathagar.org

বা প্লাস্টিক ইত্যাদির ছোট ছোট টুকরো থাকে। এসব সুন্দরভাবে সাজালে বা জোড়া দিলে বিভিন্ন ধরনের মডেল তৈরী হয়। এগুলো সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এসব ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে।

* যৌবন উন্মেষ কালে ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্যে বৈধ সীমার মধ্যে উপকারী আকর্ষণীয় ও রঙ্গিন গঠনমূলক কর্ম তৎপরতার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে অবসর সময় তারা কাজে ব্যস্ত থাকবে, তাদের আবেগ উদ্দীপনা প্রশমিতও হবে এবং তারা বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতাও লাভ করবে।

আত্মপ্রকাশ

অর্থাৎ আত্মপ্রচারণা ও প্রদর্শণেচ্ছা এবং অন্যদের চোখে বড় হওয়ার এবং নিজেকে বড় ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করার আকাংখা ও খায়েশ। এটিও একটি মৌলিক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ সহজাত প্রবৃত্তি। দ্বীন ও মিল্লাত, দেশ ও জাতির উন্নতির জন্যে উল্লেখযোগ্য কর্ম সাধনে যেখানে এই প্রবৃত্তির খুব বেশী ক্ষমতা রয়েছে, সেখানে অতি ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট অপকর্মসমূহ গুন্ডামী, ছিনতাই, বখাটেপনা ইত্যাদিও এই প্রকৃতির ভুল পথ অবলম্বন করার পরিণামেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই প্রকৃতির প্রকাশও শিশুকাল থেকেই শুরু হয়ে যায়। নিজেদের দৈহিক ও মানসিক গুনাবলী সম্পর্কে অনুভূতি সৃষ্টি হওয়ার পরেই শিশুরা অন্যদের দৃষ্টিতে বড় ও দীপ্যমান হওয়ার চেষ্টা করে। তারা অন্যদের প্রশংসা ও বাহবা পাওয়ার জন্যে নিজ শক্তি অনুযায়ী আপ্রাণ চেষ্টা সাধনা চালিয়ে থাকে, যদি সাথী ও বড়দের দৃষ্টিতে নিজের গুণাগুনের কারণে প্রশংসাযোগ্য না হয়, তাহলে হয় নৈরাশ্য ও হীনমন্যতা বোধের শিকার হয়। অথবা ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট অপকর্মের কিংবা ভুল কাজের মাধ্যমে বড় ও বিশিষ্ট হতে চায়। যেমনঃ অন্যের উপর জুলুম করা, হৈ চৈ করা, অসুখের ভান করা ইত্যাদি।

এই সহজাত প্রকৃতি সঠিকভাবে বিকাশের জন্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

* শিশুদের ভাল কাজে বাহবা দিতে হবে। মন খুলে প্রশংসা করতে হবে।

* বাড়ীতে ও বিদ্যালয়ে শিশুদের বয়স, যোগ্যতা ও ঝোঁক প্রবণতা অনুযায়ী তাদের উপর এমন কিছু কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত, যাতে তারা দীপ্যমান

www.nagorikpathagar.org

বিশিষ্ট হওয়ার পূর্ণ সুযোগ পায়। যেমনঃ ক্লাসের মনিটর, খেলার ক্যাপ্টেন, ছাত্র সংসদের সভাপতি, সম্পাদক, বিভিন্ন সমাবেশ সম্মেলনের পরিচালক হিসেবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

* বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজের ও তৎপরতার ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে যারা উল্লেখযোগ্য কাজ করবে, তাদেরকে বিভিন্ন শীল্ড, মর্যাদা ও পুরস্কার দেয়ার অথবা তাদের নামের তালিকা প্রকাশ্য জায়গায় টাঙ্গিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

* প্রত্যেক মানুষ নিজের শ্রেণী ও নিজের দলের লোকদের মধ্যে বিশিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। এজন্যে সে সংগী সাথীদের সাহচর্য দ্বারা খুব বেশী প্রভাবিত হয় এবং তাদেরই ধ্যান-ধারণা, আবেগ-উদ্দীপনা ও রায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশিষ্ট হতে চায়। এজন্যে শিশুরা যাতে সৎ সংগ পায় সে চেষ্টা করতে হবে। যেসব শিশু নিজেদের গুণের ভিত্তিতে বড়দের চোখে বিশিষ্ট হয়, তারা প্রায়ই নিজেদের সঙ্গী সাথী ও সহপাঠীদের হিংসা ও অশুভ কামনার শিকার হয়ে যায় এবং নানা প্রকারে তাদেরকে পেরেশান করা হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেক শিশুকে তাদের যোগ্যতা ও ঝোঁক প্রবণতা অনুযায়ী বিশিষ্ট হওয়ার সুযোগ করে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। যেন তারা বিশিষ্ট হওয়ার জন্যে বিপথগামী না হয়। আর ভাল ছেলেদেরকে পীড়ন করার কারণও হয়ে না দাঁড়ায়।

* যৌবনের উন্মেষ পর্বে পদার্পণকারী শিশুদেরকে ক্রমাণ্বয়ে নবীগণ ও নেক মনীষীগণ এবং ইসলামের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের জীবন চরিত্র ও কীর্তিমালার মাধ্যমে একথা মনে বসিয়ে দিতে হবে যে, তারাও যেন আল্লাহ ও রাসূলের নিকট ভাল হওয়ার জন্যেই উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী আন্‌জাম দেয়। এতেই উভয় জাহানের সাফল্য নিহিত রয়েছে। আত্মপ্রচারণা, লোক দেখানো বা প্রদর্শণীমূলক কাজ তাদের পুরস্কার ও নষ্ট করে দেবে এবং তারা অন্যদের হিংসা-বিদ্বেষ ও অশুভ কামনার শিকারও হবে এবং বাহবা না পাওয়ার কারণে নিরাশও হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

হীনমন্যতা বোধ

এটি আত্মপ্রকাশের বিপরীত। অর্থাৎ বড়দের সামনে নিজেকে হীন, নগণ্য ও হেয় মনে করা। এই স্বভাবের সাথে নির্ভরশীলতা, আত্মনিবেদন, সন্তুষ্টি অর্জন ও আনুগত্য প্রবণতা কাজ করে। এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক সহজাত প্রকৃতি। এরি ফলে একজন লোক তার আমিত্ব, ব্যক্তিমত, স্বাধীন চিন্ততা, গোঁয়ার্তুমি বিসর্জন দিয়ে বড়দের সামনে আদব-কায়দা ও সৌজন্যের সাথে থাকে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে দায়িত্বশীলদের আনুগত্য ও ফরমাবরদারী করে, বড়দের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, রাসূলের আনুগত্য, নীতি নিষ্ঠা ও সত্যানুসরণের জন্যে নিজেই নিজেকে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু এই প্রকৃতিটিই যখন ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে বসে, তখন চাটুকারিতা অবহেলা এবং প্রত্যেক জালেম, অত্যাচারী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তির সামনে আত্মসমর্পণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে ব্যক্তিসত্তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে ছাড়ে। এমনকি মানুষকে পশুত্বের চেয়েও নিকৃষ্ট স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়। শিক্ষকমন্ডলী ও মাতাপিতার উচিত, শিশুদের এই সহজাত প্রকৃতিকে বিকশিত করে তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং বড়দের সম্মান করতে শেখানো। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যেন শিশুদের ব্যক্তিত্ব ও আলাদা ব্যক্তি সত্তার উপর কোন আঘাত না পড়ে এবং তা ক্রমান্বয়ে তাদেরকে এমন পর্যায়ে নিয়ে ছাড়ে যে, তারা আদব ও সৌজন্য বোধের প্রতি লক্ষ্য রাখা সত্ত্বেও আল্লাহ্ এবং রাসূলের (দঃ) বিধি-বিধান লংঘন করে কারো আনুগত্য করাকে সঠিক মনে না করে বসে-

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

(স্রষ্টার নাফরমানী ও অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য জায়েজ নেই)। বরং সকল আনুগত্যকে আল্লাহ-রাসূলের (দঃ) নির্দেশের অধীন করে দিতে হবে। শিশুদের এই সহজাত প্রকৃতি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে-

১) বড়দের বেশী বেশী কৃত্রিমতা করা পরিহার করতে হবে।

২) সর্বাবস্থায় মৌলিক নীতিমালা মেনে চলতে হবে এবং ছোটদের সামনে নিজেদেরকে সৎ কাজের দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৩) শিশুদের ধীরে ধীরে বুঝাতে হবে যে, আপনারা তাদের দিয়ে যা কিছু করাতে চাচ্ছেন তাই আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) নির্দেশের দাবী এবং একমাত্র তাতেই আমাদের সকলের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

৪) জবরদস্তি, কঠোরতা ও কড়াকড়ি অথবা নিজের প্রভাবশীল ব্যক্তিত্বের চাপকে আনুগত্য আদায়ের জন্যে অধিক ব্যবহার শিশুদের ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে ছাড়ে, এ থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা উচিত।

যুদ্ধংদেহী বা ঝগড়াটে স্বভাব

এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি ও স্বভাব। সঠিক খাতে পরিচালিত হলে মানুষকে মর্দে মুজাহিদ, মহাবীর, শহীদ, ও গাজীর পর্যায়ে উন্নীত করে। পক্ষান্তরে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হলে জালেম, স্বৈরাচারী, ডাকাত, লুণ্ঠনকারী, ছিনতাইকারী বানিয়ে ছাড়ে। পৌরুষ, বীরত্ব, দৃঢ় সংকল্প, সত্যের সহযোগিতা, অসত্যের মূলোৎপাটন, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের উৎখাত, মযলুমের পৃষ্ঠপোষকতা, জালেমের দমন, জীবন সংগ্রামের সাথে মোকাবেলা করা, আত্মসম্মানের হেফাজত- ইত্যাদির ন্যায় উচ্চ গুনাবলী এই সহজাত প্রকৃতির ফলেই বিকশিত হয়। পক্ষান্তরে উগ্রতা, নিষ্ঠুরতা, বদমেজাজী, জুলুম-পীড়ন, মারামারি, ঝগড়া-ফাসাদ, জোর জবরদস্তি, ধোকাবাজি, প্রতারণা, হত্যা, খুনাখুনি, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, ঈর্ষা-জিঘাংসা ইত্যাদির ন্যায় নিকৃষ্ট কর্মকান্ডও এই প্রকৃতির কারণেই সংঘটিত হয়, প্রকাশ পায়। যেহেতু এই সহজাত প্রকৃতি প্রকাশ পায় অপছন্দনীয় পদ্ধতিতে, তাই মানুষ শিশুদের এই প্রকৃতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার পরিবর্তে একে দমন করার চেষ্টা করে। এর পরিণামে শিশুদের মধ্যে ভীরুতা, কাপুরুষতা, নীচতা, ব্যক্তিত্বহীনতা, অযোগ্যতা, নৈরাশ্য ও দুর্বলতা প্রতিপালিত হতে থাকে। এজন্যে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে এই স্বভাবকে বিকশিত করা ও উৎকৃষ্টতা সাধনের চেষ্টা করা উচিত।

এই প্রকৃতির সাথে গোস্বা, ক্রোধ ও উত্তেজনার আবেগ সক্রিয় থাকে। কোন ব্যক্তির প্রকৃতিগত চরম কামনা ও লোভ-লালসা চরিতার্থ করায় অথবা গুরুত্বপূর্ণ স্বভাবজাত অভিলাষসমূহ প্রশমিত করার পথে যখন কোন বাধা সৃষ্টি হয় অথবা তার জান-মাল বা আত্মসম্মানের উপর আঘাত আসে, সে তখন

www.nagorikpathagar.org

উত্তেজিত ও অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ে এবং সেই বাধা দূর করার ও হামলা প্রতিহত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতি রোধ করার প্রতি প্রবৃত্ত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার প্রতিপক্ষকে পরাভূত করতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ক্রোধ নির্বাপিত হয় না।

এই সহজাত প্রকৃতির প্রশিক্ষন প্রসংগে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

* বাড়ী ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ এমনভাবে তৈরী করতে হবে- যেন পরস্পর স্নেহ মায়া মমতা, প্রেম-প্রীতি, সুধারণা, মিল-মহব্বত, সৌহার্দ্য, সাহায্য-সহযোগিতা, আন্তরিকতা-একাত্মতা ও সহমর্মিতার ভাব বিকশিত হয়। উত্তেজিত হওয়া, উৎপীড়ন করা বকাবকি, উপহাস বিদ্রুপ, কুধারণা, তিক্ততা, ধমক, মারধর নাম বিকৃতি, অনুকরণ করা এবং পরস্পরকে উত্তেজিত করা ও উৎপীড়নের খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক ও অবহিত করে এসব প্রতিহত করা উচিত।

* শিশু সুলভ আচরণের প্রতি বেশী বেশী ক্ষমা করা এড়িয়ে চলা উচিত। শিশুদেরকে অপরাধ স্বীকার এবং ভুল ক্রটি হলে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমা চাওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্তেজনা ও ঝগড়া এজন্যে সৃষ্টি হয় যে, মানুষ অপরাধ করেও ক্ষমা চায় না, অধিকন্তু বাদানুবাদ শুরু করে। শৈশবকাল থেকেই এই অভ্যাস হলে ঝগড়া-ঝাটির সুযোগ খুব কমই আসবে।

* কারো মধ্যে উত্তেজনা, রাগ, ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির ভাব সঞ্চার করলে তখন বুঝানো বা ধমক, বকাবকি ও তিরস্কার সুফল দানের পরিবর্তে সাধারণতঃ ভীষণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণ এবং মারাত্মক পরিণামবহ হয়ে থাকে। রাগ থামা পর্যন্ত এ সব থেকে বিরত থাকা উচিত। অবশ্য উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ও ক্রোধ উদ্রেককারীকে যদি তৎক্ষণাৎ হাতিয়ার ত্যাগে ও ক্ষমা প্রার্থনায় উদ্বুদ্ধ করা যায় অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ও ক্ষতিকর বস্তু সম্মুখ থেকে সরিয়ে ফেলা যায়, তাহলে রাগ ক্রোধ হঠাৎ প্রশমিত হয়ে যায়। রাগ দূর হওয়ার পর বুঝানো ও উপদেশ দান কার্যকর হয়ে থাকে।

* কুস্তি, শরীর চর্চা, প্রতিদ্বন্দ্বীতা, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে এই সহজাত প্রকৃতি স্বস্তি ও শান্তি লাভের সুযোগ পাবে। এতে শিশুরা মারপিট ও ঝগড়া-বিবাদ থেকেও যেমন রক্ষা পায়, তেমনি এই প্রকৃতিরও অপমৃত্যু ঘটে না।

www.nagorikpathagar.org

* যদি দুটি শিশু পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হয়, তবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কে দোষী তা নির্ণয় করতে হবে এবং যার দোষ তাকে মাফ চাওয়ার জন্যে রাজি করাতে হবে।

* ঝগড়াটে, দুষ্ট ও যুদ্ধংদেহী শিশুদেরকে দুর্বলদের বন্ধু বানিয়ে দিতে হবে। এভাবে তাদের শক্তি সত্য ও ন্যায়ের সমর্থনে এবং দুর্বলদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যয়িত হওয়ার সুযোগ পাবে।

* উচ্ছৃংখলতা, মারামারি, অনিয়মতান্ত্রিকতা, জুলুম ও সীমালংঘন, অন্যের হক আত্মসাত, আত্মসম্মানে আঘাত এবং অসৎ ও অন্যায় আচরণের প্রতি নিজেরাও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং তা নিরসনে তৎপরতাও দেখাতে হবে। শিশুরা যদি এতে ক্রোধ প্রকাশ করে, তবে তিরস্কার করা ঠিক হবে না। বরং দৃঢ়তার সাথে তাদের মুকাবেলার ও ধৈর্যের সাথে তা দূর করার নিয়ম তদ্বির বলে দিতে হবে।

* নিজেদের দুর্বলতা ও ক্রটি-বিচ্যুতিগুলোর মুকাবেলা করা ও এসবের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্বলিত জটিল জটিল সমস্যার সাথে মুকাবেলা করার সুযোগ দিতে হবে। দৃঢ়তার সাথে জীবনের কঠিন বাস্তবতার মুকাবেলা করার প্রশিক্ষণ দিয়ে যেতে হবে।

* রাগ ও ক্রোধের সময় পানি পান করলে, দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়লে, বসা থাকলে শুয়ে পড়লে, ক্রোধ উদ্রেকের স্থান ত্যাগ করলে অথবা কোন শ্রমও কষ্ট সহিষ্ণুতার কাজে লেগে গেলে রাগ ও ক্রোধ দ্রুত দমে যায়। এসব চেষ্টা তদ্বির নিজেরাও অবলম্বন করবেন এবং শিশুদের দিয়ে করাবেন।

এগুলো হলো কতিপয় সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগ অনুভূতি। এ ছাড়াও রয়েছে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ স্বাভাবিক কামনা-বাসনা ও বুনিয়াদি ঝোঁক প্রবণতা- যা শিক্ষা-দীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে অশেষ গুরুত্বের দাবিদার এবং শিশুদের অভ্যাস আচরণ এবং চরিত্র ও কর্মের উপর সুদৃঢ় প্রভাব বিস্তারকারী। যেমন তাকলীদ বা অনুকরণ সহমর্মিতা, পুনরাবৃত্তি ও খেলাধূলা ইত্যাদি।

তাকলীদ বা অনুকরণ

এ হচ্ছে অত্যন্ত প্রভাবশীল ও স্বাভাবিক প্রবণতা। ছোট বড় সবাই অনুকরণ

www.nagorikpathagar.org

করে থাকে। চার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত এই প্রবণতা পূর্ণ যৌবনের স্তরে থাকে। শিশুদের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হয় অন্যদের অনুকরণে। তারা নিজেদের আশেপাশে যা কিছু দেখে, সচেতনে বা অবচেতনে তার অনুকরণ করে থাকে। উঠা বসা, চলা ফেরা, খাওয়া দাওয়া, খেলাধূলা, কথা বলা, কথাবার্তা, আচার-আচরণ, আদব-কায়দা বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা, সহজাত প্রকৃতি ও আবেগ প্রকাশের পদ্ধতি, এমনকি রুচি বোধ, ঝোঁক, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ পর্যন্ত আমরা এরই প্রভাবাধীনে শিখে থাকি। শৈশবের সূচনায় জ্ঞান বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা এবং ভালোমন্দ পার্থক্যবোধ না থাকার কারণে শিশুরা লাভ ক্ষতি ও ঠিক বেঠিক পার্থক্য করতে পারে না। যেহেতু তারা অজ্ঞাতে ও অবচেতনভাবে এমন বেশ কথাবার্তা শিখে নেয় যা তাদের অভ্যাস ও আচার আচরণকে ঘৃণিত এবং চরিত্র কর্মকে কলুষিত করে ছাড়ে। এজন্যে পরিবেশকে পাক-পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখতে, শিশুদেরকে অসৎ সংগ থেকে রক্ষা করতে, ভালো লোকদের সংসর্গে বিকশিত করে তুলতে এবং তাদের সামনে অনুকরণযোগ্য আদর্শ ও নমুনা তুলে ধরতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মাতাপিতা ও শিক্ষকদের উচিত যেন তারা শিশুদের সম্মুখে উত্তম আদর্শ পেশ করেন। এতে করে শিশুরা পছন্দনীয় অভ্যাস ও আচার-আচরণের অধিকারী হবে। অন্যথায় তারা নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতাগুলোকে শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবেন। আর এভাবে তাদের মন্দ ও অসৎ কাজের পরিণামের ভাগীও হতে হবে।

তাকলীদ ও অন্যদের অনুকরণকে সাধারণতঃ ঘৃণার চোখে দেখা হয়। অথচ প্রতিটি মানুষ অনুকরণে বাধ্য এবং এর কারণেই মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গুনাবলী বিকশিত হয়ে থাকে। এরি ফলে আমরা ইসলামের উত্তরাধিকারিত্ব পেয়েছি। স্বতন্ত্র আদর্শ ও দৃষ্টান্তমূলক চরিত্রের অনুকরণ করেই মানুষ উচ্চ মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়। আবিষ্কার উদ্ভাবন করাও ঠিক তখনি সম্ভব হয় যখন ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান হাসিল করা যায়। অবশ্য অন্ধ অনুকরণ ঠিক নয়। ধীরে ধীরে বুদ্ধি-জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কল্যাণকর, যুক্তিসঙ্গত ও উপযুক্ত বিষয় নির্বাচনে উদ্বুদ্ধ করা উচিত।

অনুকরণের প্রশিক্ষন প্রসংগে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

* বাড়ী ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ পাক-পবিত্র করা এবং উভয় স্থানে ভদ্র জনোচিত রীতিনীতি চালু করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো উচিত- যেন শিশুরা

www.nagorikpathagar.org

অনুকরণের জন্যে উৎকৃষ্ট নমুনা পায়।

* কচি ও অবুঝ শিশুদেরকে প্রথম থেকেই খেলাস্থলে ও স্নেহ মমতায় ক্রমান্বয়ে পছন্দনীয় আদব-কায়দা, আচার-আচরণ ও রীতিনীতি শেখাতে হবে। উঠা বসায়, খাওয়া-দাওয়ায়, মেলা-মেশায়, কথাবার্তা বলায়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকায়, সময়ানুবর্তিতায় প্রথম থেকেই দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রয়োজনে বাস্তব উদাহরণ পেশ করে শেখাবে।

* শিক্ষকগণ উচ্চস্বরে পাঠ, মধুর স্বরে পাঠ, বক্তৃতা, বাচনভঙ্গি, সুন্দর হস্তাক্ষর ও আর্ট ক্র্যাফ্‌ট প্রভৃতির উত্তম আদর্শ পেশ করে শিশুদেরকে তা অনুকরণে উদ্বুদ্ধ করবেন। তোতলা, যাদের কথায় জড়তা, যারা আটকে আটকে পড়ে ক্লাসে সবার সামনে তাদের দ্বারা পাঠ্য বই পড়ানো উচিত নয় বরং আলাদাভাবে তাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

* অনুকরণে ক্রমবিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সৃজনী শক্তি নষ্ট না হয়ে যায় এবং যুক্তিসংগত সীমার মধ্যে রদ-বদলের অবকাশ দিতে হবে। যেমন- আর্টের মডেলের অনুকরণে রং পরিমাণ বা বিন্যাস কার্যে পার্থক্যের সুযোগ দেয়া উচিত।

* অবচেতনভাবে যা অনুকরণ করা হয়, সেটা অনেক বেশী প্রভাবশীল হয়ে থাকে। বিশেষতঃ সহপাঠী, সংগী ও শিক্ষক মন্ডলীর অনুকরণ। এজন্যে শিশুদেরকে অসৎ সংগ থেকে রক্ষা করা এবং সৎসংগ লাভের সুযোগ করে দিতে হবে। তাদের দায়িত্ব এমন শিক্ষক বা বিদ্যালয়ের নিকট অর্পন করতে হবে যা বিভিন্ন দিক থেকে উপযুক্ত হয়। অন্যথায় শিশুরা হাত ছাড়া হয়ে যাবে ধূমপান, সিনেমা দেখা, অসৎ চাল-চলন ইত্যাদি যাবতীয় ঘৃণ্য অভ্যাস অসৎ সংগের ফলেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

পুনরাবৃত্তি ও পুনরুক্তির ইচ্ছা

এটিও একটি সহজাত প্রকৃতির দাবী। পুনরাবৃত্তি ও পুনরুক্তিতে শিশুরা বেশ মজা পায়, তারা যা কিঁছু দেখে বা শুনে তা নিজের মুখে বা নিজের কাজে বারবার পুনরাবৃত্তি করে। কোন শব্দ বা বাক্য, কোন পদ বা গীত একবার মুখে উঠলেই হলো, এরপর আর যায় কোথায়, অর্থ বুঝুক বা না বুঝুক- তা বারবার

www.nagorikpathagar.org

আওড়াতে থাকবে। ভালোমন্দ যে কোন রকম আচরণই চোখের সামনে সংঘটিত হলেই হলো। নিজের খেলাধূলার সময়ও বার বার তা উল্লেখ করতে থাকবে। একই খেলা বহুবার খেলবে। কখনো বিরক্ত হবে না। প্রতিদিন, প্রতিটি মাস, এমনকি বছরকে বছর খেলতেই থাকবে। কিছু গড়বে ভাঙবে আবার বানাবে। আবার ভাঙবে। এই ধারা সীমাহীন ও বিরতিহীনভাবে চলতেই থাকবে। দাদী, মা থেকে একই গল্পকাহিনী কয়েকবার শুনবে। আর কোন কাহিনী উল্টা-সোজা, ভুল-ভ্রান্তি, যাই হোক- স্মরণ হওয়া মাত্র সকলের কাছে বলে বেড়াবে। কোন কাহিনীতে যদি একই বিস্তৃত বাক্য থেমে থেমে পুনরুক্তি করতে হয়, তখন সেই বাক্য আসা মাত্রই অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে। আর যদি প্রত্যেকবার সেই বাক্য কিছুটা বাড়ে এবং সম্প্রসারিতও হতে থাকে, তবে তো আর কোন কথাই নেই। পুনরুক্তিতে নতুনত্ব ও অভিনবত্বের চাটনী আহ্লাদ, সন্তুষ্টি ও আনন্দকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবে।

পুনরুক্তি ও পুনরাবৃত্তির প্রতি শিশুদের অস্বাভাবিক আগ্রহ তাদের নতুন কথা শেখার এবং তাতে বুৎপত্তি লাভের সহায়ক প্রমাণিত হয়ে থাকে। তারা যে কথা বার বার উচ্চারণ করে, তা সুন্দরভাবে মনে বসে যায় এবং খুব ভালোভাবে মুখস্ত হয়ে যায়। যে কাজ তারা কয়েকবার করে, তাতে তাদের অনুশীলন ও দক্ষতা হয়ে যায়। পুনরুক্তি ও পুনরাবৃত্তির ফলেই অনেক কথাই তাদের অভ্যাসে ও স্বাভাবিক আচরণের অন্তর্গত হয়ে তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। অতঃপর এসব করতে তাদের আর কোন কষ্ট হয় না।

শিশুরা যা কিছু শেখে তা কেবল বার বার পুনরাবৃত্তির ফলেই শিখে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে অনুশীলন ও দক্ষতা এর মাধ্যমেই লাভ হয়ে থাকে। যেহেতু এতে শিশুরা মজাও পায় আর বড়দের মত তাড়াতাড়ি বিরক্তও হয় না। সে জন্যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুনরুক্তি ও বারবার পুনরাবৃত্তির উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। অংক শাস্ত্রের গণনা, গুণের নামতা ও বিভিন্ন ফর্মূলা মুখে মুখে মুখস্থ করানো হয় এবং যে ফর্মূলাই শেখানো হয় তা খুব অনুশীলন করানো হয়- যেন বিভিন্ন প্রশ্ন ঠিক ঠিকভাবে ও দ্রুতগতিতে সমাধান করা সম্ভব হয়। মুখে মুখে যা কিছু পড়ানো হয় তা বার বার মুখে আওড়ানো হয়- যেন পড়ায় গতি আসে। শব্দের উচ্চারণ, পাঠ ও বানান এবং কবিতা সাবলীল গতিতে পড়া ও মুখে মুখে মুখস্থ করা একমাত্র বারবার অনুশীলনের ফলেই সম্ভব হয়ে থাকে। সুন্দর হস্তাক্ষর, আর্ট ক্র্যাফ্‌ট এবং শিল্পে বিশুদ্ধতা ও সৌন্দর্য, বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা ও

www.nagorikpathagar.org

নিপুণতা, ভূগোলে বিভিন্ন স্থানের নাম মুখস্থ করা ও চিত্রাংকনের অনুশীলন, ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের নাম ও বিভিন্ন ঘটনার তারিখ মুখস্থ করা, পাঠ ও হরফের সঠিক উচ্চারণ, পাঠে গতিশীলতা, জিকির, দোয়া ও সূরাসমূহ মুখস্থ করা– এসব কেবল তখনই সম্ভব হয়, যখন পুনরাবৃত্তি করে ও বারবার আওড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এ প্রসংগে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

* ছোট শিশুরা না বুঝে শুনেও বার বার শব্দ আওড়ায় এবং এতে তারা তৃপ্তি পায়, কিন্তু বয়স যতই বাড়তে থাকে পুনরুক্তি ও পুনরাবৃত্তিতে তাদের তৃপ্তিও হ্রাস পেতে থাকে। বয়স্ক শিশুরা কেবল এমন সব বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ও মুখস্ত করতে তৃপ্তি অনুভব করে। যেগুলোর উদ্দেশ্য, মর্ম ও উপকারিতা তাদের বুঝে আসে। এজন্যে মুখস্থ করানোর পূর্বে উদ্দেশ্য ও মর্ম সুন্দর রূপে বুঝিয়ে দিতে হবে।

* দশ বার বছর বয়স পর্যন্ত অনুশীলন, পুনরাবৃত্তি ও মুখস্থ করানোর প্রতি বেশী জোর দিতে হবে। কিন্তু উপরের ক্লাসগুলোতে ক্রমান্বয়ে মুখস্থের কাজ কম এবং চিন্তা গবেষণার কাজ বেশী হওয়া উচিত।

* পুনরুক্তি ও পুনরাবৃত্তিতে যদি কিছুটা নতুনত্বের স্বাদ যোগ করা যায়, তাহলে তৃপ্তিও অনেক বেড়ে যাবে। খুব বেশী গতানুগতিকতায় ও এক ঘেয়েমীতে বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির আশংকা থাকে।

* অভিজ্ঞতার কারণে শিশুরা অনেক পছন্দনীয় আচরণ ও অশোভনীয় কথাবার্তার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। এভাবে তারা কোন কোন বদাভ্যাসের শিকার হয়ে পড়ে। যথাসময়ে তা দূর করার চিন্তা করতে হবে। পরিবেশকেও নানাবিধ দূষণমুক্ত রাখার চেষ্টা করা উচিত।

খেলাধূলা

শিশুরা খেলাধূলার পাগল। এর মজা উপভোগকারী। তারা জান-প্রাণ দিয়ে খেলায় মগ্ন হয়। তাদের কাছে খেলার চেয়ে প্রিয় দুনিয়াতে সম্ভবতঃ আর কিছু নেই। খেলাধূলায় তাদের আগ্রহ দেখুন। এতে তাদের দেহ-মনেরও কোন খবর থাকে না। কায়মনোবাক্যে খেলাধূলায় রত থাকে। পেটে ক্ষুধা লেগেছে, লাগুক;

www.nagorikpathagar.org

পোশাক অপরিষ্কার হয়েছে, হোক; খেলায় ক্লান্তিতে নিঃসাড় হয়ে পড়েছে- কোন পরোয়া নেই। শীত হোক; গরম হোক, কাদা হোক, পানি হোক, ঝড় হোক, তুফান হোক- তাদের খেলা চলতেই থাকে। খেলাধূলার জন্যে কোন সময় বা স্থানের প্রশ্ন নেই। যখন যেখানে সুযোগ হয় খেলার জন্যে প্রস্তুত। ক্লাস থেকে ছুটতেই এবং ঘুম থেকে উঠতেই তারা খেলায় লেগে যাবে। মাতাপিতার রাগ, শিক্ষক মন্ডলীর কঠোরতা, সহপাঠী ও সঙ্গী-সাথীদের বিমর্ষতা- কিছুই তাদেরকে খেলাধূলা থেকে বিরত রাখতে পারে না। তারা যে কোন দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই খেলা ছাড়বে না।

শিশুরা নীরবে বসে থাকতে পারে না। নীরব থাকা অসুস্থতা কিংবা বার্ধক্যের আলামত। দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, ছুটাছুটি, শোরগোল, হৈ-হল্লা- এসবই শৈশবের অপরিহার্য বৈশিষ্ট। সুস্থতা-সবলতা এবং প্রজ্ঞা ও মেধা জীবনের আলামত। যেসব শিশু এসব গুনাবলী থেকে বঞ্চিত, তারা শিশু নয়; বৃদ্ধ (বরং অকালপক্ক) এসমস্ত ক্রিয়াকর্ম তাদের জন্মগত অধিকার। এসব অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা যেতে পারে না।

শিশুরা প্রকৃত আনন্দ পায় খেলাধূলায়। খেলার সাজ-সরঞ্জাম ও খেলার সাথী পাওয়া গেলে আর কি চাই? মনে হবে যেন তাদের উদ্দেশ্যই হাসিল হয়েছে। বেহেশতের এ ফুলগুলো খেলতে শুরু করবে। চেহারায় তৃপ্তির হাসি ও আনন্দ ফুটে উঠবে। তারা তো তৃপ্তি পেয়েই থাকবে। এমন কে আছে হাসি খুশীতে খেলায় রত এ শিশুদেরকে দেখে কে আনন্দে আত্মহারা হয় না? খেলাধূলায় শিশুদের অসাধারণ আসক্তি, নিমগ্নতা ও আন্তরিক অনুরাগ মূলতঃ এ কথারই সাক্ষ্য বহন করছে যে, খেলাধূলা একটা প্রবল আকাংখা ও স্বভাব চাহিদা। বৈধ সীমার মধ্যে যে কোন উপায়ে তা পূরণ করা উচিত। যারা শিশুদেরকে খেলাধূলা থেকে বঞ্চিত রাখে তারা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ, শিশুদের উপর জুলুম করছে। স্রষ্টা শিশুদের মাঝে এই শক্তিশালী দাবিগুলো অকারণে রাখেননি। শিশুদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক শক্তিকে বিকশিত করে তোলার জন্যে খেলাধূলা অত্যন্ত জরুরী।

www.nagorikpathagar.org

শিশুরা কেন খেলে?

এ প্রসংগে একাধিক মতামত রয়েছেঃ

১) খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের শরীরের বাড়তি শক্তি বের করে দেয়। শিশুদের মধ্যে তাদের উচ্চতা অনুপাতে অনেক বেশী শক্তি হয়ে থাকে। এই শক্তিকে তারা কোন গঠনমূলক ও সংগত কাজে ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। কারণ তাদের জীবন ধারণের জন্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেন তাদের অভিভাবকগণ। শিশুরা তো সর্বাবস্থায় উন্মত্ত থাকে। তাদের ভবিষ্যতের কোন চিন্তা থাকে না। এজন্যে তারা নিজেদের বাড়তি শক্তি খেলাধূলায় ব্যয় করে দেয়। যদি তারা এটা না করতো, তবে যেভাবে বাষ্পের ফালতু অংশ ইঞ্জিনের ক্ষতি করার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি তাদের ফালতু ও অতিরিক্ত শক্তিও শরীরের ক্ষতি করতে পারে।

২) খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুরা নিজেদেরকে ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত করে থাকে। মেয়ে শিশুরা বৌ সাজিয়ে, পুতুল খেলার মাধ্যমে ঘর-কন্যা সম্পর্কে সাংসারিক জ্ঞান লাভ করে, আর ছেলে শিশুরা অনুকরণীয় খেলাধূলার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা আয়ত্ব করে থাকে।

৩) শিশুরা খেলার ভেতর দিয়ে উন্নতির সেসব সোপান অতিক্রম করে, যা অতিক্রম করে মানব সমাজ বর্তমান স্তরে উন্নীত হয়েছে। শিশুদের দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, পেছনে পেছনে দৌড়ানো, ভোঁ-দৌড়, গাছে উঠা, গর্তে অবতরণ করা, শিকার করা, মাছ ধরা, খেলাঘর তৈরী করা ইত্যাদি কাজকর্ম প্রাচীনযুগের মানুষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এভাবে তারা বিবিধ অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করে থাকে।

৪) শিশুদের নিজস্ব কিছু উদ্বিগ্নতা ও পেরেশানী থাকে। তাদের অনেক সহজাত চাহিদা ও দাবি দাওয়া এবং মৌলিক বাসনা কামনা পূরণ করা যায় না।

www.nagorikpathagar.org

তাদের আবেগ-অনুভূতিও প্রায় আহত হতে থাকে। এসব মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তি লাভের জন্যে শিশুরা খেলাধূলা করে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের মস্তিষ্কের বোঝা হালকা করে।

৫) প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই ঈর্ষা, বিদ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব ও আবেগ-অনুভূতি বিদ্যমান থাকে। যেহেতু খেলাধূলা তাদের এ ভাবাবেগ প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ করে দেয়, এজন্যে শিশুরা খেলাধূলার মাধ্যমে তাদের এই আবেগ-অনুভূতিকে স্বস্তি ও প্রশান্তি দানের পথ পায়।

৬) শিশুদের খেলাধূলা তাদের সৃষ্টি-উদ্ভাবন ও গঠনমূলক কর্মতৎপরতার নিদর্শন। শিশুরা তাদের মন মেজাজের বশ। তারা নীরব বসে থাকতে পারে না। সর্বদা কিছু না কিছু করতে চায়। খেলাধূলা তাদের এই আকাংখা পূরণ করার সর্বোত্তম মাধ্যম।

৭) পরিপক্কতা লাভ ও বৃদ্ধি পাওয়ার বিভিন্ন স্তরে দেহ ও মন-মানসিকতা বিভিন্ন প্রকারের গতিবিধি ও কর্মকান্ড দাবী করে থাকে। বিভিন্ন প্রকারের খেলাধূলা এসব দাবী পূরণ করে। এজন্যে শিশুরা নানা প্রকারের খেলাধূলায় মত্ত থাকে।

এ হচ্ছে শিশুদের খেলাধূলার নানারূপ ব্যাখ্যা যা বিভিন্ন মনস্তাত্বিক নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও ধারণা অনুযায়ী পেশ করেছেন। তাঁদের ধারণার সাথে পুরোপুরি একমত হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু তাঁদের এ কথার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণের কোন অবকাশ নেই যে, শিশুদের সুসমন্বিত বিকাশের জন্যে খেলাধূলা একান্ত জরুরী ও উপকারী।

খেলাধূলার প্রকার ভেদ

শিশুরা বিভিন্ন রকম খেলাধূলা করে থাকে। একটি শিশু কখন কোন প্রকারের খেলা ও খেলনার প্রতি আগ্রহ দেখাবে তা নির্ভর করে তার বয়স, শ্রেণী, স্বভাব, পরিবেশ, মওসুম এবং উপায়-উপকরণ প্রভৃতির উপর। কচি অবুঝ শিশু একাকী খেলতে ভালবাসে। তাদের চেয়ে বয়সীরা জোট বেঁধে খেলা পছন্দ করে। শিশুরা অনুকরণ যোগ্য খেলায় মজা পায়। আর যুবকরা মজা পায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতামূলক খেলায়। ছেলেরা আগ্রহী বল খেলায়, আর

www.nagorikpathagar.org

মেয়েরা মজা পায় পুতুল খেলায়। দুর্বলেরা আন্তঃকক্ষ (ইনডোর) খেলার প্রতি বেশী আগ্রহী। আর সবলেরা আগ্রহী মাঠে ময়দানের খেলায়। মেধাবী শিশুরা বেশী বেশী খেলে থাকে। তারা মিলেমিশে এবং চিন্তাভাবনা মূলক খেলা খেলতে চায়। পক্ষান্তরে মে হীন নির্বোধ শিশুরা খেলাধূলা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। ঝগড়া করে অথবা কম বয়সী শিশুদের সাথে খেলতে চায়। শহুরে শিশুদের খেলাধূলায় থাকে বৈচিত্র। পক্ষান্তরে গ্রাম্য শিশুদের খেলাধূলা হয় সহজ সরল ও বৈচিত্রহীন। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় আন্তঃকক্ষ খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, আর বৃষ্টি চলে গেলে শুরু হয় পানি কাদা ও সাঁতার কাটার খেলা। শীতকালে পিক্‌নিক করায় আনন্দ পাওয়া যায়, আর বসন্তকালে পায় দৌড়াদৌড়ি, গোল্লাছুট ও কানামাছি খেলায়।

নিম্নে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন খেলাধূলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া যাচ্ছে–

১) নিজের দেহের সাথে খেলাঃ

শিশুদের প্রাথমিক খেলাধূলা তাদের নিজেদের দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট। জন্মের কয়েক দিন পরই তারা হাত–পা নাড়ানো এবং কান্না ও চিৎকার শুরু করে। এসব ক্রিয়াকান্ডে তাদের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ, হাড় গোশ্‌ত বিকশিত হয়। তারপর হামাগুড়ি দিতে, বসতে, দাঁড়াতে এবং হাঁটতে চেষ্টা করে। এসব প্রচেষ্টার ফলে ধীরে ধীরে তারা নিজের শরীর ও বিভিন্ন অঙ্গের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করে কচি শিশুদেরকে নিজেদের হাত–পা নাড়ানো এবং নিজেদের দেহ নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ সুযোগ দেয়া দরকার। যারা অজ্ঞতা ও স্নেহের আতিশয্যে শিশুদের কেবল কোলে থাকায় অভ্যস্ত করে তোলে, তারা মারাত্মক ভুল করেন। এতে শিশুদে বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে পড়ে।

২ বিভিন্ন জিনিস নিয়ে খেলাঃ

নিজেদের দেহের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শিশুরা তাদের আশপাশের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে খেলা এবং খাপ ছাড়া অপ্রাসংগিক আওয়াজ দেয়া শুরু করে দেয়। যা কিছুই হাতে পায়, তা ধরতে, টানতে, ছুঁড়ে মারতে, তুলে নিতে, মুখে দিতে, ভাংচুর করতে, তা থেকে শব্দ বের করতে, ছিদ্রে আঙুল ঢুকাতে, নখ দিয়ে খুঁড়তে, কাটতে প্রয়াস চালায়। এভাবে বহু জিনিসের গঠন, রং, পরিমাণ, স্বাদ, ওজন ইত্যাদি সম্পর্কে অনিচ্ছায়ও অনেক

www.nagorikpathagar.org

জ্ঞান–তথ্য লাভ করে থাকে। এ পর্যায়ে শিশুদেরকে সুন্দর চকচকে রং, বাজতে ও চলাচল সক্ষম কাঠের টুকরো, রাবার ও প্লাস্টিকের এমন সব খেলনা ও খালি কৌটা দেয়া উচিত। এসব জিনিসের রং হতে হবে পাকা, যেন মুখে দিলে বা পানিতে ভিজলে রং উঠে না যায়, যা সহজে না ভাঙ্গে এবং তাড়াতাড়ী ময়লা ও নষ্ট না হয়। যেসব জিনিস ধরলে বা মুখে দিলে শিশুদের ক্ষতি হয়, কিংবা সেগুলো নষ্ট হওয়ার ও ভেঙ্গে চুরে যাওয়ার আশংকা থাকে, সে ধরনের জিনিস শিশুদের নাগালের বাইরে রাখা উচিত, যেমন কাঁচ, চিনা মাটির পাত্র, ঘড়ি, চশমা, কলম ইত্যাদি। এ বয়সেই অনেক শিশুর কয়লা, মাটি, কাদা, ছাই ইত্যাদি খাওয়ার অথবা পেশাব পায়খানা নিয়ে খেলা করার ঘৃণ্য অভ্যাস গড়ে উঠে। সেজন্যে এদিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

অবশ্য শিশুদের ভাংচুরের এসব খেলায় ভয় পাওয়া উচিত নয় এবং বেশী বাধা দেয়া ও তিরস্কার করা সমীচীন নয়। কেননা গঠনমূলক কাজের প্রতি শিশুদের এটাই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। এখান থেকেই তারা ধীরে ধীরে গড়া ও বানানোর দিকে মনোযোগী হয়ে থাকে এবং খেলার ঘর ও মাটির খেলনা বানানোর চেষ্টা করতে থাকে। বিদ্যালয়ে মাটি, কাগজ, মোটা কাগজের কাজ চালু করে এবং শিক্ষামূলক খেলনা যেমন কাঠ ও প্লাস্টিকের ব্লাক মেকনোসিট ইত্যাদি ব্যবস্থা করে খেলায় শিশুদের গঠনমূলক যোগ্যতা ও প্রতিভার বিকাশ সাধন ও সঠিক পথে প্রবাহিত করা যেতে পারে।

৩) মিলেমিশে খেলা করাঃ

চার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা সাধারণত হয়তো নিজে একা একা খেলে অথবা অন্যান্য শিশুদের পাশে বসে স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের খেলনা দিয়ে খেলতে ভালোবাসে। এ বয়সে শিশু ছেলেমেয়েদের খেলায় বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। এরপর থেকেই তারা ক্রমান্বয়ে মিলেমিশে জোট বদ্ধ হয়ে খেলতে থাকে। ছেলেরা ছেলেদের সাথে এবং মেয়েরা মেয়েদের সাথে খেলে। এসময় তারা কয়েকজন একত্রিত হয়ে এক সাথে শোরগোল করবে, অর্থহীন আওয়াজ দেবে, বাহুল্য কথা বলবে, সুরে সুর মিলিয়ে অর্থহীন বাক্য আওড়াবে। বিভিন্ন শব্দের অনুকরণ করবে। বিভিন্ন খেল–তামাশা করবে। বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান করবে, খেলার ছলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে, দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি,

www.nagorikpathagar.org

একে অন্যের পেছনে দৌড়ান, লুকোচুরি করা, খোঁজাখুজি করা, জন্তু-জানোয়ারের পেছনে তাড়া করা, নানাভাবে এদের কষ্ট দেয়া, এদের পিঠে সওয়ার হওয়া, দলে দলে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করা, গাছে উঠা, গর্তে নামা ইত্যাদি আস্তে আস্তে তাদের মনঃপুত খেলায় পরিণত হয়। প্রথম দিকে দল খুব ছোট থাকে- যেন প্রত্যেকেই খেলার এবং নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পায়। প্রথম দিকে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক খেলায়ও শিশুরা ভয় পায়। কারণ, তারা কিছুতেই হারতে চায় না। যদি কখনো প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েই যায় এবং দুর্ভাগ্য ক্রমে তারা পরাজিত হয়, তাহলে হয়তো কাঁদতে ও ঝগড়া করতে থাকবে অথবা অপকৌশল, মিথ্যা ও ভুল বর্ণনার আশ্রয় নেবে। এ পর্যায়ে শিশুদের বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে এবং হার জিতের পরওয়া না করে বিশ্বস্ততার সাথে খেলায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রথম দিকে এমন খেলার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে মিলেমিশে খেলা যায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার সুযোগ কম থাকে। যেমন অভিনয়যুক্ত খেলা, যাতে প্রত্যেক শিশুর স্বতন্ত্র ভূমিকা থাকে। কেউ ডাক্তারের রূপ ধরে, কেউ রোগী, কেউ কম্পাউন্ডার, কেউ সেবা শুশ্রুষাকারী। কিছু সংখ্যক শিশু মেহমানের অভিনয় করে, কেউ কেউ হয় মেজবান। আস্তে আস্তে শিশুরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক খেলায় আগ্রহী হতে থাকে এবং তাড়াতাড়ি নিয়ম-কানুনের অনুসারী ও দলনেতার অনুগত হয়ে যায়। প্রথম দিকে তাদেরকে চেয়ার দৌড়, চামচ দৌড়, জিলাপী দৌড়, বিস্কুট দৌড়, বাঘ-বাঘ, রুমালটানা, কানামাছি, লুকোচুরি, চোখ বেঁধে নানারূপ খেলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আট নয় বছর থেকে বার তের বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প, বলখেলা, কাবাডি খেলা, রশি টানাটানি ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। মাঝে মধ্যে শিক্ষা সফর বা পিক্‌নিক উপলক্ষে বাইরে দূরে নিয়ে যেতে হবে। দুর্বল, অসহায় ও নিঃস্বদের সাথে স্নেহ মমতাপূর্ণ আচরণ এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করার আবেগও স্বভাবজাত। এই আবেগ স্পৃহাকে বিকশিত করে তোলার জন্যে কোন পাখী বা পশু যেমন মোরগ, কবুতর, ছাগল, খরগোশ ইত্যাদি লালন-পালন, ফলের চারা উৎপাদন, ছোট ভাইবোন বা দুর্বল সংগী সাথীদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহের কাজ তাদের উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে। তাহলে শিশুরা খেলতে খেলতে জীব জন্তুকে পীড়ন করা,

www.nagorikpathagar.org

দুর্বলদের দাবিয়ে দেয়া এবং আপোষে ঝগড়া বিবাদ করা থেকে বিরত থাকবে।

যৌবন উন্মেষকালে প্রবেশ করার পর থেকে শিশুদের খেলাধূলা অধিক সুশৃংখল হতে থাকে। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেরণাও বেড়ে যায়। শোরগোল হ্রাস পায় আর দৌড়াদৌড়ি বাড়তে থাকে। আলাদা আলাদা টীম ও ক্লাব জন্ম নিতে থাকে এবং অন্যান্য টীম ও ক্লাব সমূহকে চ্যালেঞ্জ দেয়া ও তাদের সাথে প্রতিযোগিতার চিন্তা হতে থাকে। চলাফেরার আওতাও বেড়ে যায় এবং দলবদ্ধ হয়ে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বহুদূরে যাওয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। মেধা প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বুদ্ধি, হাত সাফাই ও মহারথী খেলায় আগ্রহ হতে থাকে। এ বয়সে ছেলেদের ফুটবল, ভলিবল, রিংবল, ব্যাডমিন্টন, পিংপং, ক্রিকেট, হকি, রশি টানাটানি, কাবাডি, যুদ্ধবিদ্যা, সাঁতার, সাইকেল চালনা, পি. টি–ব্যায়াম, জিমনাস্টিক এবং বিভিন্ন ম্যাচ ও প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে, আর মেয়েদের হাঁড়ি পাতিল ভাঙ্গা, হোম পিকনিক, ইনডোর গেম এবং হালকা ব্যায়াম, ক্রমান্বয়ে মেহনত, শ্রম কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং বিভিন্ন কারিগরি দক্ষতামূলক কাজে ও খেলায় স্পৃহা সৃষ্টি করে ছেলেমেয়েদেরকে এসবে অভ্যস্ত করে তোলা উচিত, যাতে স্বাস্থ্যও ঠিক থাকে এবং তাদের সময়টা উপকারী এবং কল্যাণকর কাজে ব্যয়িত হয়।

খেলাধূলা, কাজকর্ম ও বেগার খাটা

এই তিনটির ধরন ও এসবে পার্থক্য বুঝার জন্যে নিম্নলিখিত উদাহরণগুলো চিন্তা করলে উপকার হবে।

১) একটি ছোট্ট মেয়ে তার পুতুলগুলোর জন্যে জামা–কাপড় তৈরী করছে। সেলাই ও পরানোর কাজে মগ্ন কিংবা সে তার পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে এবং খেলার হাঁড়ি পাতিলে বরযাত্রীদের জন্যে পোলাও–কোরমা রান্না করছে।

২) সেই মেয়েটিই স্কুলে গেল। স্কুলে সেলাই ও রান্নাবান্নার কাজে দক্ষতা অর্জনের জন্যে আলাদা ঘন্টা নির্ধারিত আছে। সেলাইর ঘন্টায় সে সেলাইর কাজে অথবা রান্নাবান্নার ঘন্টায় খাবার পাকানোর কাজে ব্যস্ত।

৩) সেই মেয়েটিই নিজের পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করছিল। তার সাথীরাও তার পাশে বসে তার পুতুলের সাজ–সজ্জা দেখছিল। ইতিমধ্যে তার মা এসে

www.nagorikpathagar.org

তাকে উঠিয়ে নিয়ে খাদ্য পাকানোর কাজে অথবা ছোট ভায়ের পায়জামা সেলাই করার কাজে লাগিয়ে দিলেন। এখন সে খাদ্য পাকানোর কাজে অথবা সেলাই এর কাজে রত হয়ে পড়লো।

উপরের তিনটি অবস্থাতেই কাজও ব্যস্ততা একই ধরনের অর্থাৎ সেলাই করা বা খাদ্য পাকানো। কিন্তু উপরোক্ত তিনটি অবস্থাতে কাজে রত থাকার সময় এই মেয়েটির মন মস্তিষ্কের অবস্থা একই রূপ ছিল না। বরং সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ছিল। মন ও মানসিক অবস্থার বিভিন্নতার কারণেই একই কাজ মেয়েটির জন্যে প্রথম অবস্থায় খেলাধূলা, দ্বিতীয় অবস্থায় কাজ কর্ম এবং তৃতীয় অবস্থায় হলো বেগার খাটা।

এ থেকে পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল যে, খেলা, কাজ বা বেগারের ভিত্তি কাজের ধরনের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং তা মন মস্তিষ্কের সেই অবস্থার উপর নির্ভরশীল, কোন কাজে রত থাকার সময় সাধারণতঃ যে অবস্থা হয়ে থাকে।

খেলাধূলাঃ এমন ক্রিয়াকান্ডকে বলে, যাতে অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ, স্বাভাবিক আগ্রহ, আকর্ষণ, স্বাধীনতা এবং আনন্দ অনুভূত হয়।

কাজকর্মঃ এমন তৎপরতাকে বলে যাতে মনোযোগ ও আগ্রহ থাকে ইচ্ছাকৃত বা পরোক্ষভাবে, সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে। এতে স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে না। স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত হয়ে যায়। একটা বিশেষ অনুমানও পরিমাপ অনুযায়ী তা আনজাম দিতে হয়, আর তা আনজাম দানে আনন্দ থাকাও জরুরী নয়।

বেগার খাটাঃ এ দু'টোর বিপরীত বেগার হলো এমন তৎপরতা, যা কোন ব্যক্তির আগ্রহকে উপেক্ষা করে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে নিয়ে তার উপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া হয় এবং তার মনের বিরুদ্ধে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাকে সে কাজ আনজাম দিতেই হয়।

খেলা এমন একটি কাজ যা স্বয়ং মানুষের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে; কাজ স্বয়ং উদ্দেশ্য নয়; বরং তা কোন একটা সচেতন উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যম, যার প্রতি কর্মরত ব্যক্তির দৃষ্টি সর্বদা নিবদ্ধ থাকে। বেগার খাটার মধ্যে ব্যক্তিকে অন্য কারো উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার হতে হয়। অথবা উদ্দেশ্য তার অগোচরে থাকে এবং অন্যের মনে করে বাধ্য হয়ে তাকে তা আনজাম দিতে হয়।

তৎপরতাসমূহের এসব বৈশিষ্টই অনেক সময় খেলাধূলাকেও কাজ বরং বেগার বানিয়ে দেয়। অথবা কাজকে খেলায় রূপান্তরিত করে ছাড়ে। যেমন

www.nagorikpathagar.org

একটা শিশু বিকেলে স্কুলে অনুষ্ঠিত খেলায় নিজের মনের আগ্রহে অংশ নেয়। এমতাবস্থায় সে খেলাটা তার জন্যে প্রকৃত একটি খেলা। দ্বিতীয় শিশুটি অংশগ্রহণ করে এজন্যে যে, তাতে তার শরীর স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে অথবা বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাত হবে। এই খেলা তার জন্যে হলো একটা কাজ। তৃতীয় একটি শিশু এমন যার আগ্রহ অন্যদিকে। কিন্তু স্কুলের নিয়ম শৃংখলার কারণে সে তা মানতে বাধ্য এবং শাস্তির ভয়ে এসব খেলায় সে অংশ গ্রহণ করে, তখন এই খেলা তার জন্যে বেগার খাটা হবে। এমনিভাবে খেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষকের অত্যধিক কড়াকড়ি আরোপ এবং তার পক্ষ থেকে আরোপিত অস্বাভাবিক বিধিনিষেধ গুলোও সাধারণতঃ খেলাধূলাকে কাজে অথবা বেগারে পরিণত করে দেয়।

এর বিপরীত যদি কাজকর্মে খেলায় মনোভাব সৃষ্টি করে দেয়া যায়। অর্থাৎ যথাসম্ভব শিশুদের আগ্রহ, স্বাধীনতা ও আনন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। বাইরের চাপ ও বিধিনিষেধ সর্বাপেক্ষা কম থাকতে হবে। তাহলে তারা কাজ কর্মকেও খেলাই মনে করবে। পূর্ণ মনোযোগ, একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সাথে অংশগ্রহণ করবে। আর বাধ্যবাধকতা ও জোর জবরদস্তির কারণে তাদের ব্যক্তিত্বে ও কর্মস্পৃহার উপর যেসব খারাপ প্রভাব পড়ে সেসব প্রভাব থেকেও তারা রক্ষা পাবে।

খেলার মাধ্যমে শিক্ষা

ছোট শিশুরা খেলার প্রতি খুব আসক্ত থাকে, তারা কাজকর্মে ভয় পায়, আর বেগার তো তাদের স্বাধীনতা প্রিয় মন মস্তিষ্কের উপর চরম বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। খেলাধূলায় তারা জান-প্রাণ দিয়ে লেগে যায় এবং পূর্ণ-আগ্রহ ও একাগ্রতার সাথে অংশ নেয়। আর অন্য কাজ থেকে দূরে পালিয়ে বেড়ায়। খেলাধূলা কেবল শিশুদের প্রিয়তম কাজই নয় বরং তা তাদের জীবনীশক্তির পরিচায়ক। তাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার গ্যারান্টি, বিকাশের সহায়ক এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবশীল মাধ্যম। পক্ষান্তরে নিয়মবদ্ধ বা প্রথাগত শিক্ষা সাধারণতঃ তাদের জন্যে বেগারতূল্য এবং তাদের স্পর্শকাতর মন-মেজাজের উপর অসম্ভব বোঝা। লেখাপড়ার ন্যায় শুষ্ক কাজ করতে অস্বীকার করে। যেহেতু অনেক মারপিট ও

www.nagorikpathagar.org

ধরা বাঁধার মাধ্যমে তারা লেখাপড়ায় অংশ গ্রহণ করে। এই জন্যেই ছোট শিশুদেরকে খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া এবং স্কুলের বিভিন্ন কাজে খেলার মনোভাব সৃষ্টি করার প্রতি অশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তার অর্থ কখনো এ নয় যে, শিশুদেরকে সারা জীবনের জন্যে খেলাধূলায় অভ্যস্ত করে দিতে হবে। বরং কচি শিশুদেরকে খেলার বেশী সুযোগ দিতে হবে। যথাসাধ্য খেলাধূলাকেও শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যম বানিয়ে দিতে হবে এবং কাজকর্মে খেলার মনোভাব সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে কঠোর শ্রম, মেহনত, কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং পুরো মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে কাজ করায় অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। উদ্দেশ্য থাকবে শিক্ষাদীক্ষা, আর খেলাধূলা হলো তা হাসিলের উপায় মাত্র।

খেলাধূলার উপকারিতা

খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুরা প্রকৃত আনন্দ লাভ করে। চিন্তা ভুলে যায়। তাদের মানসিক উদ্বিগ্নতা ও পেরেশানী দূর হয়। তাদের চেহারা উৎফুল্ল হয়। তাদের আবেগ স্বস্তি পায় এবং সামষ্টিকভাবে তাদের ব্যক্তিত্বকে সুসমন্বিতরূপে বিকশিত করে তোলার ব্যাপারে সহায়তা পাওয়া যায়। খেলাধূলায় শিশুরা নিম্নোক্ত উপকারিতা লাভ করে থাকেঃ

১) দৈহিক উপকারিতাঃ

খেলাধূলায় দেহকে যথেষ্ট আন্দোলিত ও আলোড়িত করতে হয় এবং দৈহিক পরিশ্রম ও কষ্ট সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হয়। এজন্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে, রক্ত চলাচলে, হজম প্রণালীতে, অপ্রয়োজনীয় অংশের নির্গমনে নিয়ম-শৃংখলা বিদ্যমান থাকে, ধমনী ও মাংস পেশীর উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব স্ব স্থানে যথারীতি কাজ করে। শ্রম, মেহনত ও কষ্ট সহিষ্ণুতার জন্যে শরীরে শক্তি আসে, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্যে প্রতিষেধক শক্তি সৃষ্টি হয়। সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য ঠিক থাকে। দেহের বিকাশও পূর্ণতায় বিরাট সাহায্য পাওয়া যায়।

২) মানসিক উপকারিতাঃ

www.nagorikpathagar.org

খেলাধূলায় শিশুরা নানারূপ পরিস্থিতি ও বিভিন্ন ধরনের সংগী-সাথীর সম্মুখীন হয়। এ সবের সাথে মুকাবেলা করার জন্যে তাদের চিন্তা-ভাবনা করার, বুঝার ও সময় মত সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। পরিবেশ ও বিভিন্ন প্রকারের জিনিস সম্পর্কে নানারূপ অভিজ্ঞতা হাসিল হয়। বিভিন্ন জিনিস ভাঙ্গাগড়া, জোড়া লাগানো এবং অভিনয়যুক্ত খেলায় অভিনয় দ্বারা চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটে এবং আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের যোগ্যতা সঞ্চারিত হয়। নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে যথাযথ অনুমান করার সুযোগ হয়। মনোযোগ ও গভীর একাগ্রতার প্রশিক্ষণ হয়। অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। বাস্তব জগতে শিশুদের অধিকাংশ স্বাভাবিক চাহিদা ও দাবী এবং বাসনা-কামনা অপূর্ণ থেকে যায়। যার কারণে তারা উদ্বিগ্ন থাকে ও মানসিক পেরেশানীতে ভোগে। খেলার মাধ্যমে তারা কাল্পনিক জগতে এসব চাহিদা ও কামনা পূরণ করে নেয়। এভাবে তারা নানারূপ উদ্বিগ্নতা থেকে মুক্তি পায় এবং মানসিক স্বস্তি লাভ করে।

৩) সামাজিক উপকারিতাঃ

সামষ্টিক ও দলবদ্ধভাবে খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের সহপাঠী ও সংগী-সাথীদের সাথে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, নিয়ম-শৃংখলা ও আইন-কানুন মেনে চলা, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারসাম্য, আনুগত্য, নেতৃত্ব অন্যের হক নষ্ট করা ও প্রতারণার মোকাবেলা এবং খেলায় নিজের পালা আসার অপেক্ষা করার প্রশিক্ষণ হাসিল করে থাকে। সংগী সাথীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা, উচ্ছৃংখলতা ও নৈরাজ্যের সীমায় পৌঁছে যাওয়া, স্বাধীনতাকে অন্যদের স্বার্থে সীমিত করা এবং নিজেদের বাসনা-কামনা, অভিলাষ ও ব্যক্তিগত আগ্রহ আকর্ষণকে সামষ্টিক স্বার্থে বিসর্জন দেয়া তারা সুশৃংখল খেলাধূলার মাধ্যমে শিখে থাকে।

৪) নৈতিক উপকারিতাঃ

খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে অনেক নৈতিক গুনাবলীও বিকশিত হয়ে উঠে। যেমন দৃঢ়তা, অটল অবিচল থাকা, আত্মসংযমী, আত্মবিশ্বাস, বশ্যতা ও আনুগত্য ভাব ইত্যাদি। মোট কথা খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুদের সুষমামন্ডিত ও সুসমন্বিত বিকাশে বিরাট সাহায্য লাভ হয়। এতে সুস্থ-সবল ব্যক্তিত্ব বিকশিত

www.nagorikpathagar.org

হয়। তবে স্মরণ রাখতে হবে, খেলার জন্যেই খেলা নয়। এসব গুনাবলীর পরিবর্তে কেবল খেলাধূলাকেই যদি মুখ্য উদ্দেশ্য বানিয়ে ফেলা হয়, তবে এসব গুনাবলীর প্রদর্শন কেবল খেলার মাঠেই হবে, দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগে এসব গুনের প্রকাশ নাও হতে পারে। সুতরাং খেলাধূলাকে স্রেফ মাধ্যম মনে করতে হবে এবং বিভিন্ন কাজ কর্মে খেলার স্পিরিট ও মনোভাব সৃষ্টি করে আস্তে আস্তে এসব গুনাবলী বিকশিত করে তোলার চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

এগুলো হলো শিশুদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সহজাত প্রকৃতি এবং স্বাভাবিক চাহিদা ও দাবি দাওয়া। শিশুদের সুষমামন্ডিত ও সুসমন্বিত বিকাশ এবং ভারসাম্য পূর্ণ চরিত্র, আচরণ ও কর্মজীবন গড়ে তোলার জন্যে এগুলোকে সঠিক খাতে প্রবাহিত ও পরিচালিত করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এসব স্বভাব ও চাহিদাকে দমিয়ে রাখা, দাবিয়ে দেয়া বা ভুল পথে প্রবাহিত করার ফলে শিশুদের ব্যক্তি সত্তায় ব্যাঘাত ঘটে এবং তাদের মধ্যে নানা দোষ-ত্রুটি মূল গাড়ে ও জন্ম নেয়। শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সময় এসব দিকে পূর্ণ লক্ষ্য রাখতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

শিশুদের তারবিয়ত

উর্দূ তারবিয়ত শব্দের আভিধানিক অর্থ লালন-পালন করা। পারিভাষিক অর্থে চরিত্র ও নৈতিকতা এবং ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার নাম তারবিয়ত। তারবিয়তের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে শিশুদেরকে আস্তে আস্তে এমন সব গুনাবলীর অধিকারী করে তোলার ব্যাপারে সহায়তা দান করা, যে সব গুন তাদের ইহকাল-পরকালে উন্নতি ও কল্যাণ লাভের জন্য অপরিহার্য।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এ কাজ অত্যন্ত ব্যাপক, শ্রমসাধ্য ও ধৈর্যের দাবীদার। এজন্যে ক্রমান্বয়ে ১) শিশুদের চিন্তাধারা, জীবন দর্শন, সত্যাসত্য যাঁচাই-বাছাই ও নির্বাচনের মানদন্ড এমনভাবে তৈরী করতে হবে, যা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও জীবনের মূল লক্ষ্য ও কর্মসূচীর সাথে সামঞ্জস্যশীল। অর্থাৎ বিভিন্ন কাজ-কারবারে চিন্তার ধরন, জীবন সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা এবং ভাল মন্দের পার্থক্য করার জন্য এমন জিনিসকে মানদন্ড বানাতে হবে যা আল্লাহর একজন নেক ও সত্যনিষ্ঠ বান্দাহর মানদন্ড হওয়া উচিত।

২) তাদের খেয়াল ও আশা-আকাংখাকে উচ্চ, ধ্যান-ধারণাকে সুস্পষ্ট, চিন্তা-ভাবনাকে সুশৃংখল, যুক্তি প্রমাণকে সুসমন্বিত, আকিদা-বিশ্বাসকে সঠিক ও পরিশুদ্ধ, প্রত্যয়কে পরিপক্ক এবং ইচ্ছা ও সংকল্পকে দৃঢ় করে গড়ে তুলতে হবে। কেননা এ গুলোই পাকা পোক্ত চরিত্রের ভিত্তি এবং পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কর্মকান্ডের চালিকাশক্তি।

৩) তাদের সহজাত স্বভাব-প্রবৃত্তি ও আবেগ-অনুভূতি এবং আশা-আকাংখা ও ঝোঁক প্রবণতা সমূহের সমন্বয় সাধন করে এসব শক্তিকে সঠিক খাতে পরিচালিত করতে হবে।

৪) তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দূর্বলতাগুলো যথোপযুক্ত পন্থায় সংশোধন

www.nagorikpathagar.org

করতে হবে এবং এ গুলোকে আয়ত্ব করা ও নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও অনুতাপ সৃষ্টির ভাবকে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে।

৫) চরম ধৈর্য ও পরম সংযমের সাথে পছন্দনীয় অভ্যাস গ্রহণ এবং অপছন্দনীয় অভ্যাসগুলো বর্জন করাতে হবে।

৬) স্নেহ ও মায়া-মমতা দিয়ে বিভিন্ন স্থানের আদব-কায়দা, রীতি নীতি ও আচার-আচরণ শেখাতে হবে।

৭) বাস্তব ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে তাদের যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন কাজকর্ম, তৎপরতা, ক্রিয়াকান্ড এবং তাদের প্রকৃতিগত প্রতিভা ও যোগ্যতা সমূহকে বিকশিত করে তোলার সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

নিম্নে সহজাত প্রকৃতি ও আবেগ স্পৃহাগুলোর প্রশিক্ষণ দান সংক্রান্ত কিছু অতিরিক্ত কথা বলা হচ্ছেঃ

মৌলিক আশা-আকাংখা এবং এসবের প্রশিক্ষণ

প্রত্যেক মানুষেরই স্বাভাবিক কামনা-বাসনা হয়ে থাকে যেন,

* সে সুখে শান্তিতে থাকতে এবং ভাল খেতে ও পরতে পারে,

* তার জান, মাল ও ইজ্জত আব্রু হেফাজতে থাকে,

* সবাই তাকে মায়া ও যত্ন করে, তাকে ভাল চোখে দেখে এবং তার কাজ কর্মের প্রশংসা করে,

* সে বিপরীত লিঙ্গকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে, দাম্পত্য জীবন গড়বে, সন্তান-সন্ততির পিতামাতা হবে,

(যৌবন উন্মেষের পর বয়ঃপ্রাপ্তির নিকট পর্যন্ত)

* পরিবার-পরিজন, দূর্বল ও অক্ষম মানুষদের পরিচর্যা ও সাহায্য করবে, (এই কামনা তুলনামূলকভাবে দূর্বল থাকে)

* অন্যদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য লাভ হয়, ছোট ও দূর্বলরা তার নির্দেশ মানে এবং তার সম্মান ও ইজ্জত করে,

* সে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী লোকদের প্রতি খুব সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শন এবং বিভিন্ন কাজে তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে পারে,

www.nagorikpathagar.org

* সমকক্ষ ও সমবয়সীদের বন্ধুত্ব, সান্নিধ্য ও সহমর্মিতা পেতে পারে,

* সে এমন কিছু জিনিসের মালিক হতে পারে যা নিরংকুশ ও একচ্ছত্রভাবে তার কর্তৃত্বে ও অধিকারে থাকবে,

* নিজেকে কারো কাছে সমর্পণ করে দিতে পারে তার সন্তুষ্টি কামনা করে, বিপদ-আপদে তার আশ্রয় গ্রহণ করে,

* যেহেতু মানুষের মধ্যে এসব কামনা-বাসনা তাদের স্বাভাবিক দাবী ও সহজাত চাহিদার অধীনে বিকশিত ও অতি জোরদার ও শক্তিশালী হয়ে থাকে, তাছাড়া এ সবের দাবী ও চাহিদা পূর্ণ হওয়ার ফলে মনে এক বিশেষ ধরনের তৃপ্তি ও অবস্থা অনুভূত হয়, সেহেতু প্রত্যেক মানুষ তা হাসিলের পেছনে অপরিসীম কর্মতৎপরতা চালিয়ে থাকে। এসব বাসনা-কামনা পূর্ণ করার জন্যে চেষ্টা সাধনা ও শ্রম-মেহনত করে যদি তার এ মৌলিক চাহিদা ও আশা-আকাংখাগুলো পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সে আনন্দ-খুশীতে দিন কাটায়। তার মানসিক প্রশান্তি ও আন্তরিক স্বস্তি লাভ হয় এবং শান্তিময় ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়ে উঠে। এসব বাসনা কামনা পূর্ণতা বিধানে বাধাগ্রস্ত হলে তা দূর করার জন্যে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে। এরপরও পূর্ণ না হলে বিষণ্ন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও উদাসীন হয়ে পড়ে এবং প্রতি মুহূর্তের দুশ্চিন্তায় তার স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এসব কামনা-বাসনা পূরণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কিছু রয়েছে পছন্দনীয়, আনন্দদায়ক ও বৈধ, আর কিছু রয়েছে অপছন্দনীয়, ঘৃণ্য ও অবৈধ। প্রত্যেক মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই পূর্ণতার পছন্দনীয় পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আর অপছন্দনীয়কে প্রত্যেকের বিবেকই ঘৃণা ও অস্বীকার করে। কিন্তু বৈধ ও জায়েয পন্থায় যখন কামনা-বাসনা পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে অবৈধ ও অপছন্দনীয় পন্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করতে থাকে। এমতাবস্থায় সে ভীষণ মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের শিকার হয়। তার কামনা-বাসনা তাকে একদিকে টানতে থাকে, আর বিবেক তাকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে চায়। প্রত্যেকেই প্রতিদিন বারবার এরূপ বিভিন্নমুখী দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সম্মুখীন হয়। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের এসব অবস্থায় প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, সংকল্প, আকিদা-বিশ্বাস, জীবনের লক্ষ্য ও কর্মসূচী বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ এসব গুনাবলী যতটা লাভ করে ঠিক সে পরিমাণ মুকাবিলা ও প্রতিরোধই করতে সক্ষম হয়। যদি চিতপটাং

www.nagorikpathagar.org

খাওয়াতে অর্থাৎ পরাজিত করতে পারে, তখন আত্মরক্ষা করতে পারে এবং সফলতা ও সম্মান লাভ করে। আর যদি পরাজিত হয়ে যায় তখন নিজেও কলংকিত হয়, পাপের জঞ্জালে ফেসে পড়ে এবং ব্যর্থতার গ্লানিতে চেহারা মলিন হয়ে যায়।

ছোট শিশুদের এই কামনা-বাসনা অতিশয় তীব্রতর হয়ে থাকে, তারা তাদের দাবীগুলোর তাৎক্ষণিক পূর্ণতা চায়। যেহেতু তারা অজ্ঞ ও নির্বোধ, ভালমন্দের পার্থক্য থাকে না, এর সাথে রয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির ঘাটতি, তাই সব সময় তাদের মার খেয়ে যাওয়ার এবং ভুল পথ অবলম্বন করে ফেলার সম্ভাবনা থাকে। কোন শিশু তার কোন অভিলাষ পূরণের বৈধ পন্থা না পেলে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। এভাবে সে যে তৃপ্তি ও আনন্দ পায় তা তাকে অনুরূপ কাজ করতে উস্কায়। অনুরূপ অবৈধ ও অন্যায় করতে করতে একদিন সে ওই ঘৃণ্য কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এসব বদ অভ্যাস পরিপক্ক হয়ে তার দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়। অতঃপর তা থেকে রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বরং প্রায় সারা জীবন তা তার স্বভাবে পরিণত হয়ে থাকে।

কামনা বাসনার প্রশিক্ষণ

এ সব কামনা-বাসনা মানুষের প্রকৃতিগত। প্রত্যেকের প্রকৃতিতেই তা বিদ্যমান। প্রত্যেকেই এগুলো পূরণের চেষ্টা করে থাকে। বৈধ পন্থায় পূরণ না হলে অবৈধ পন্থা অবলম্বনের আশংকা সব সময়ই থেকে যায়। অপারগ অবস্থায় তা মানসিক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ হয় এবং ব্যক্তিসত্তার উপর অত্যন্ত খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এজন্যে সুস্থ ও শান্তিময় ব্যক্তিত্ব বিকাশে এবং অবৈধ ও অপছন্দনীয় কর্ম পদ্ধতি থেকে বাঁচানোর জন্যে বৈধ গন্ডির মধ্যে যথাসম্ভব এসব বাসনা পূরণের ব্যবস্থা করা উচিত।

যদি কোন কারণে আশা-আকাংখা পূরণ করা সম্ভব বা সমীচীন না হয়, যেমন শিশুরা যদি এমন কোন জিনিসের জন্যে জিদ ধরে যা খুব দূর্মূল্য অথবা পাওয়াই অসম্ভব, কিংবা এ বয়সে দেয়া কোন মতে ঠিক নয়, তখন অত্যন্ত আন্তরিকতা সহকারে তাকে প্রকৃত অক্ষমতা বুঝিয়ে দিতে হবে। আর যদি

www.nagorikpathagar.org

কোন মতে বিকল্প ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তবে সে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এতে আশা করা যায় শিশু খুশী ও শান্ত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করা ঠিক নয়। অন্যথায় অগোচরে অবৈধ বা অপছন্দনীয় পন্থা অবলম্বনের আশংকা থেকে যাবে এবং সে আপনার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে যাবে। একথা শিশুদের প্রথম থেকেই বোঝাতে থাকতে হবে যে, দুনিয়াতে কারো সকল আশা-আকাংখা পূরণ হয় না, হতে পারে না, আর সব সময় সব আশা পূরণের সম্ভাবনাও থাকে না। সকল আশা একমাত্র বেহেশতেই পূরণ হওয়া সম্ভব। দুনিয়ায় কামনা-বাসনা ও আশা-আকাংখার পথে নানারূপ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসবের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের নিজেদের স্বার্থেই জরুরী। যদি আশা-আকাংখার উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকে তবে মানুষের দুঃখ কষ্টের সীমা থাকে না। তখন অধঃপতন হতে হতে সে পশুর স্তরে নেমে যায়। বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট পশুতে পরিণত হয়। এজন্য আত্মসংযম সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফরয ও নফল ইবাদত সমূহ বিশেষতঃ নামায-রোযা আত্মসংযমের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। যেসব শিশুর বয়স এতটা হয়ে যায় যে তারা কোন কিছুর পাবন্দী করতে ও নিয়মানুবর্তী হতে পারে, তখন প্রতিদিন তাদের কোন সহজলভ্য বৈধ বাসনা পূরণ করার উদ্দেশ্যে এমন একটি বৈধ আশা যা পূরণ করা সহজ তা কিছুক্ষণ দেরী করে পূরণ করা। এজন্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যেমন পিপাসা লেগেছে, পড়া ছেড়ে এখন পানি পান করতে যাবে না। বরং ঘন্টা বাজলে পান করতে যাবে। বিরতির সময় পকেট খরচের টাকা দিয়ে মিষ্টি খেতে মন চায়, এর পরিবর্তে সিংগাড়া খাবে ইত্যাদি। শিশুদের বয়স ও যোগ্যতা অনুযায়ী প্রথম থেকেই আশা-আকাংখা ও বাসনা-কামনার উপর ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্যে অনুশীলন করাতে হবে। এভাবে তারা ধীরে ধীরে আশা-আকাংখা নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে যাবে এবং ব্যক্তির উপর কোন খারাপ প্রভাব পড়বে না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি করেও বিভিন্ন উপায়ে খেলাধূলার আকারেও একাজ করানো যেতে পারে।

* শিশুদের স্বাভাবিক কামনা-বাসনা পূর্ণ করার ব্যাপারে হঠাৎ খুব বেশী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত নয়। বরং ধীরে ধীরে এসবের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যেমন আপনি বাজারে যাচ্ছেন, শিশুও সাথে আছে, নানারূপ

www.nagorikpathagar.org

ফল-ফলারি ও মিষ্টান্ন তার চোখের সামনে আছে। সে কিছু নিতে চাচ্ছে, আপনি সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে কিছু কিনে দিলেন। তার মন চাচ্ছে জিনিসটি হাতে আসা মাত্র মুখে যেন চলে যায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া আপনি পছন্দ করেন না। আপনি শিশুকে বুঝিয়ে দিন এরূপ করা ঠিক নয়। একটু সময় ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দাও। কোথাও নিশ্চিন্তে বসে খাও। প্রাথমিক অবস্থায় অধিক সময় পরীক্ষায় ফেলবেন না। কেননা তার মন ঐ জিনিসের মধ্যে পড়ে থাকবে এবং বেশীক্ষণ সে ধৈর্য ধরতে পারবে না। তাই খুব তাড়াতাড়ি তাকে কোন নির্জন ও নিরাপদ স্থানে পৌছিয়ে দিন যেন সে তার বাসনা পূরণ করে নেয়। আর শিশু বড় হলে ঘরে পৌছা পর্যন্ত সবর করতে বলুন, যাতে নিশ্চিন্তে খেতে পারে। তারপর ধীরে ধীরে ভাই বোনদের নিয়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খেতে উদ্বুদ্ধ করুন। খরিদ করার সময় তাকে বলে দিন এতে সবারই অংশ রয়েছে। তারপর দৈনিক না দিয়ে মাঝে-মধ্যে বিরতি দিয়ে তাদের কাম্য বস্তু দেয়ার ব্যবস্থা করুন এবং বয়সের সাথে সাথে এই বিরতিও বাড়াতে থাকুন। এভাবে ধীরে ধীরে শিশুরা নিজেদের বাসনা-কামনার উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করতে শিখবে।

* মানুষের প্রবৃত্তিরও নিজস্ব অনেক অধিকার রয়েছে। বৈধ সীমার মধ্যে এসব অধিকার আদায় করা জরুরী। প্রবৃত্তি দমনের অর্থ কখনো বৈরাগ্যবাদ অবলম্বন করা নয়। বরং প্রবৃত্তিকে বাসনা-কামনার দাস বানানো এবং বাসনা-কামনা ও লালসাকে খোদার মর্যাদা দেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। বাসনা-কামনাকে সব সময় প্রবৃত্তির অধীন রাখার চেষ্টা করতে হবে যেন জায়েজ ও উপযুক্ত পন্থায় এসব বাসনা-কামনা পূরণ করা যায়। বাসনা-কামনাকে সম্পূর্ণ দমন করলেও প্রবৃত্তি কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকে।

* ক্ষুধা নিবৃত্তি, জীবন রক্ষা, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং জৈবিক ও মালিকানার বাসনা-কামনা খুব জোরদার হয়ে থাকে। এসব পূরণ করার জন্যে মানুষ কত কি না করে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এ সবের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে বিপথগামী হওয়ার খুব সম্ভাবনা ও আশংকা থাকে। এসব বাসনা-কামনা ও লালসার বশীভূত হয়ে পদস্খলনের কারণে বিভিন্ন নৈতিক দোষ-ত্রুটির ভিত্তি মজবুত হয়। মিথ্যা, চুরি, গীবত, লোভ, স্বার্থপরতা, ধোকা-প্রবঞ্চনা, ঘুষ, সুদ, আত্মসাত, কালোবাজারী, গুদামজাতকরণ, চাটুকারিতা, অন্যের কাছে নতজানু থাকা, বিবেক বিক্রি, অপব্যয়, মানুষকে কষ্ট দেয়া, যৌন

www.nagorikpathagar.org

মিলনের বিভিন্ন রূপ প্রভৃতি গর্হিত কাজের পেছনে এসবই ক্রিয়াশীল থাকে। পক্ষান্তরে এ কামনা-বাসনাগুলোই বহু উপকারী কাজ ও গৌরব দীপ্ত কৃতিত্বের জন্যে মানুষ দ্বারা অনেক চেষ্টা সাধনা করিয়ে থাকে। পৃথিবীতে যত স্মরণীয় কৃতিত্ব সাধিত হয় সে সবের পেছনেও এসব বাসনা-কামনাই ক্রিয়াশীল থাকে। এ জন্যে এসব বাসনা-কামনার লালন ও প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত এবং এগুলোকে দমন করার পরিবর্তে এগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা ও এসবকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা উচিত। যেমনঃ

১) নিজের সামর্থানুযায়ী খানা পিনা, কাপড় পরা, গায়ে পরিধান জড়িয়ে দেয়া ও খেলাধূলা করার ব্যাপারে শিশুদের কামনা-বাসনা সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং অপারগতা ও অক্ষমতার সময় আন্তরিকতার সাথে বুঝিয়ে দেয়া উচিত। তাছাড়া তাদেরকে সাধ্যাতিরিক্ত পরীক্ষায় ফেলা এবং বৈধ কামনা-বাসনা সমূহের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বাধা নিষেধ আরোপ করা ঠিক নয়।

২) বড়দের দেখাদেখি শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর ভয় সৃষ্টি হয়। এ প্রসংগে স্বয়ং নিজেরাও ঈমান মজবুত রাখতে হবে এবং শিশুদের সুন্দরভাবে মনে দৃঢ়মূল করে দিতে হবে যে, হায়াত-মওত ও রিযক দান আল্লাহ্ সম্পূর্ণ রূপে নিজ হাতে রেখেছেন। এসব ব্যাপারে আর কারো হাত নেই। একথা বুঝানোর জন্যে বিভিন্ন ঘটনাবলী ও কাহিনীর সাহায্য নেয়া এবং নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে সাক্ষ্য ও উদাহরণ পেশ করা উচিত।

৩) লজ্জা, শরম এবং অভাব-দারিদ্র ও সম্ভ্রম বোধের স্বভাবগত আবেগ অনুভূতিগুলোকে মরে যেতে দেয়া উচিত নয়, বরং এগুলোকে যথাসাধ্য অধিকতর সজাগ রাখতে হবে। এগুলো হলো খুব শক্তিশালী হাতিয়ার যা বীরত্বের সাথে বিভিন্ন পরিস্থিতির মুকাবেলায় এবং নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সফলতা অর্জনের ব্যাপারে সহায়ক ও সাহায্যকারী প্রমাণিত হয়। বেশী বেশী ধমক দিলে, ভয় দেখালে, মারপিট করলে, অন্যদের সামনে অভিযোগ করলে বা অপবাদ দিলে এসব আবেগ অনুভূতি মারা যায়; এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

৪) ঘরের এক অংশে শিশুদের জন্যে সামান্য কিছু জায়গা নির্ধারণ করে একটা বাক্স, ট্রাংক বা আলমারী তাদের ব্যবহারের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিতে

www.nagorikpathagar.org

হবে। এগুলো এক তারাই ব্যবহার করবে। এখানে তারা নিজেদের জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে সুশৃংখলভাবে হেফাজতে রাখবে। সময় সময় তারা যে পয়সা পাবে তা মিতব্যয়িতার সাথে খরচ করা, তা থেকে কিছু বাঁচিয়ে উপকারী জিনিসপত্র ক্রয় করা অথবা কাউকে কিছু হাদীয়া তোহফা প্রভৃতি দেয়ার ব্যাপারে খরচ করার প্রতি উৎসাহ দিতে হবে। কখনো কখনো শিশুদের হাতে নিঃস্ব, পঙ্গু-বিকলাঙ্গ ও অসহায়দের সাহায্য এবং জনসেবার কিছু কাজ করাতে হবে।

৫) বয়স আরেকটু বাড়লে তাদের উপর ছোট ভাই বোন অথবা গৃহপালিত পশু-প্রাণীর দেখাশোনার কিছু দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। যৌবনের উন্মেষ কালে এসব ছাড়াও কিছু ছোটখাট উপকারী ও আকর্ষণীয় কাজে ব্যস্ত ও ব্যাপৃত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। অসৎ সংসর্গ, সিনেমা দেখা ও অশ্লীল সাহিত্য পড়া থেকে বিরত রাখতে হবে এবং উত্তম সংসর্গের উত্তম সঙ্গী-সাথী, অধ্যয়নের জন্যে সংস্কারমূলক সামাজিক নাটক ও গল্প-উপন্যাস, সীরাতুন্নবী, নবীদের জীবনী, বুজুর্গ ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন চরিত ও গৌরব দীপ্ত কৃতিত্ব সম্বলিত বই পুস্তক সরবরাহ করতে হবে। সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরী, আর্ট-ক্রাফ্‌ট, সেলাই বা অন্যান্য হস্ত শিল্পে দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে জৈবিক বাসনা-কামনা ও ইচ্ছা আকাংখাকে স্বস্তি দান ও শান্ত করার একটা বৈধ পন্থা লাভ হবে। বয়ঃপ্রাপ্তির পর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা করতে হবে। যতদিন বিয়ের ব্যবস্থা না হবে ততদিন নফল ইবাদত বিশেষতঃ রোযা রাখা, কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামের মূল মর্ম উপলব্ধির সহায়ক বই-পুস্তক অধ্যয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ সবের ব্যবস্থা জৈবিক বাসনা-কামনার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভে সহায়ক হবে।

www.nagorikpathagar.org

মাতাপিতা ও প্রশিক্ষণ

"قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا " (٦٦ - ٦)

"তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবার পরিজনকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে বাঁচাও।" কুরআন (৬-৬৬)

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - (بخارى)

স্মরণ রেখ, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (বুখারী)

শিশুদের ভাঙ্গাগড়ায় সবচেয়ে অধিক প্রভাব রাখেন তাদের মাতাপিতা। কেননা শিশুদের ব্যক্তিত্বে সৌন্দর্য সৃষ্টির নিয়ামক তারাই। দেহের আকার-আকৃতির ন্যায় তাদের চরিত্র, অভ্যাস, ধ্যান-ধারণা ও আকিদা-বিশ্বাস, আবেগ-উদ্দীপনায় পর্যন্ত মাতাপিতার ছাপ পড়ে। শিশুরা মাতাপিতা বিশেষতঃ মায়ের কোলে যা কিছু শেখে সারা জীবনে এর গভীর ছাপ স্থায়ী থাকে। এজন্যে প্রশিক্ষণের প্রকৃত দায়িত্ব তাদেরই উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সরাসরি এবং সর্বাধিক জিজ্ঞাসাবাদও তাদেরকেই করা হবে।

মা-বাপের দায়িত্ব সমূহঃ

মাতাপিতার উচিত-

* জন্মের পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তার কানে আযান দেয়া।

www.nagorikpathagar.org

* ভালো নাম রাখা।

* ৭ম দিনে আকীকা করা (সামর্থ্য থাকলে)।

* মায়া-মমতা, আদর-যত্ন ও উদার মনে তাকে লালন পালন করা।

* হালাল ও পাক-পবিত্র আয় দিয়ে তার প্রতিপালন করা।

* খেলাধুলা করার ও খুশী থাকার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দান করা।

* স্নেহ্ ভালবাসার সাথে আদব-কায়দা ও সামাজিকতা শিক্ষা দেয়া।

* পাঁচ-ছয় বছর বয়স হলে স্নেহ্-পরায়ন ও চরিত্রবান শিক্ষকগণের কাছে সোপর্দ করে আস্তে আস্তে জ্ঞান-বুদ্ধি শেখানো।

* খাওয়া পরা, খেলাধুলা করা, গোসল করা, কাজকর্ম, আরাম-আয়েশের এমন কর্মসূচী তৈরী করা, যা স্বাস্থ্য ও পূর্ণতা লাভের সহায়ক হয়।

* ধীরে ধীরে এই কর্মসূচীর অনুসারী এবং নিয়মিত কাজকর্মে অভ্যস্ত করে তোলা।

* সাত বছর বয়স হলে নামাযের জন্যে অনুপ্রাণিত করা।

* দশ বছর বয়সে তার বিছানা পৃথক করে দেয়া।

* বার বছর বয়স থেকে তার চাল-চলন, আচার-আচরণ ও গতিবিধির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা।

* ভুল-ত্রুটি ও দূর্বলতা সমূহের সঠিক কারণগুলো উদ্‌ঘাটন করে তা দূরীভূত করণের চিন্তা করা।

* সাধারণভাবে নিজেদের আচরণ ও ভূমিকা নরম ও স্নেহপূর্ণ রাখা।

* যথা সম্ভব ক্ষমা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করা।

* একান্ত প্রয়োজন হলে শাস্তি প্রদানেও কার্পণ্য না করা, কিন্তু অতি সত্তর সুন্দর আচরণ দ্বারা তার প্রতিবিধান করা।

* বড় হলে বীরত্ব, দৃঢ়তা ও নানারূপ প্রতিযোগিতার বিদ্যা শিক্ষা দেয়া।

* ছেলেদেরকে কোন বৈধ ও সম্মানজনক পেশা ও মেয়েদের গার্হস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়াবলীর প্রশিক্ষণ দান করা।

* সাবালক হওয়ার পর বিয়ে শাদী দেয়ার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা।

www.nagorikpathagar.org

লালন ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ

শিশুদের লালন ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে মাতাপিতাকে নিম্নোক্ত নির্দেশনা ও উপদেশগুলো মেনে চলা উচিত।

* ঘরোয়া পরিবেশকে পাক-পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।

* যাথাসাধ্য এ পরিবেশকে দুঃখ-দৈন্য, অশান্তি এবং সংঘাত-সংঘর্ষ থেকে পবিত্র রাখুন।

* শিশুদের সামনে অনুকরণযোগ্য আদর্শ তুলে ধরুন।

* যথাসম্ভব শিশুদের আবদার রক্ষা করুন এবং তাদের বাসনা-কামনা প্রত্যাখ্যান করবেন না।

* কিন্তু তাদেরকে পুতুল বা খেলনা বানিয়ে রাখবেন না, আবার অতি আদর সোহাগে আলালের ঘরের দুলালও হতে দেবেন না।

* বরং আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্যে খানাপিনা, ধোয়া-পরা এবং নিজেদের জিনিসপত্র সাজানো গোছানো ও সংরক্ষণের দায়িত্ব যথাসম্ভব শিশুদের নিজেদেরকেই পালন করতে দিন।

* শিশুদের সোহাগভরা ভাষায় অবশ্যই ডাকুন, কিন্তু আল্লাহর কসম তাদের নাম বিকৃত করবেন না এবং কাউকেও বিকৃত করতে দেবেন না।

* সর্বদা ভালো ভালো শব্দে সম্বোধন করুন এবং সালাম আগে আগে দেয়ার চেষ্টা করুন।

* তাদের সামনে নিজেরা আপোষে তুই তুই, আমি আমি অর্থাৎ ঝগড়া করবেন না এবং তাদের কাছে কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও আনবেন না।

* অবুঝ মনে করে তাদের সামনে কখনো কোন গোপনীয় দাম্পত্য বিষয় প্রকাশ হতে দেবেন না। প্রথমতঃ এটা লজ্জাহীনতার কথা, দ্বিতীয়তঃ এতে আপনার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধ, ভয় ভীতি শেষ হয়ে যাবে। আপনার মান মর্যাদা থাকবে না। তাছাড়া শিশুদের মধ্যে সময় হওয়ার আগে হয়তো যৌন স্পৃহা জাগ্রত হয়ে তাদেরকে বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

* নিজেদের আচরণে শিশুদেরকে এটা অনুভব করতে ও বুঝতে দিন যে আপনারা উভয়েই পরস্পরের এবং শিশুদের সকলের প্রতি খুব বেশী লক্ষ্য ও খেয়াল রাখেন, আন্তরিকতা ও মায়া মমতার সাথে তাদের যত্ন নেন। এবং তাদের আরাম আয়েশের কথা চিন্তা করেন।

* শিশুদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিরোধ সৃষ্টি হতে দেবেন না। সবাইকে সমান চোখে দেখবেন। সকলের সাথে স্নেহ বাৎসল্যের আচরণ করুন। খাওয়া পরা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহে কারো সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করবেন না। একজনের সফলতাকে অন্যজনের অনুতাপবোধের জন্যে কখনো ব্যবহার করবেন না। এতে উপকারের চেয়ে ক্ষতি হয় বেশী এবং শিশুদের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার ভাব জাগ্রত হয়, যা প্রায় সারা জীবনের জন্যে শত্রুতার ভাব জাগাতে পারে।

* শিশুদেরকে পরস্পর মিল-মহব্বতে থাকা, মিলেমিশে খেলাধূলা করা, ভাগ বাঁটোয়ারা করে খাওয়া এবং একে অন্যের প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রশিক্ষণও দিন। এসব জিনিসের জন্যে সব সময় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করুন। কখনো পরস্পরে তিক্ততার সৃষ্টি হলে যথাশীঘ্র সম্ভব আপোশ করে দিন।

* ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করা, জিনিসপত্র অনুমতিক্রমে তুলে নেয়া, ব্যবহারের পর নির্দিষ্ট স্থানে রাখা, অনুমতি নিয়ে কোথাও আসা যাওয়া এবং বিভিন্ন কাজ নির্দিষ্ট সময়ে আনজাম দেয়া প্রভৃতি সংক্রান্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত নীতিমালা প্রণয়ন করে শিশুদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিন। নিজেরাও এসব নীতিমালা মেনে চলুন এবং তাদের মানতে বাধ্য করুন। এতে শিশুদের যোগ্যতা সৃষ্টি হবে এবং পরিবারের কাজও সহজ হবে। শিশুদেরকে সম্পূর্ণ তাদের মন মত চলার স্বাধীনতা দেয়া স্বয়ং তাদের জন্য ধ্বংস ও অন্যদের জন্য মাথা ব্যথার কারণ।

* আপনারা উভয়েই একজন অন্যজনের আদব সম্মান এবং আনুগত্য ও খেদমত করার জন্যে সব সময় আপনাদের সন্তানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকুন। পিতার জন্যে মা এবং মায়ের জন্যে পিতা সন্তানদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন।

* খেলাধূলা ও শিশুসুলভ আচরণের জন্যে অত্যাধিক বাধা দেবেন না। বেশী ধমকাধমকি ও মারপিট করবেন না। অন্যথায় বিদ্রোহ এবং ঘর থেকে পালানোর মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

* শিশুদের সাথে কখনো মিথ্যা কথা বলবেন না এবং মিথ্যা ওয়াদাও করবেন না। এটা একদিকে যেমন গুনাহর কাজ, তেমনি অন্যদিকে আপনাদের উপর থেকে তার আস্থাও উঠে যাবে।

* তাদের ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতার ব্যাপারে যথাসম্ভব সংযম, সহনশীলতা এবং ক্ষমার সাথে কাজ করবেন।

* সংশোধন সম্পর্কে নিজেরাও নিরাশ হবেন না, শিশুদেরকেও নিরাশ হতে দেবেন না।

* ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে শাস্তি প্রদান অপরিহার্য হয়ে পড়লে নির্জনে শাস্তি দিন এবং নির্জনে বুঝাবেন। সবার সামনে বকাবকি করবেন না, শাস্তিও দেবেন না।

* তাদের সংগী-সাথীদের সম্মান করুন, মাঝে মধ্যে তাদেরকে ঘরে নিয়ে আসতে বলবেন। তাদের খাতির যত্ন ও মেহমানদারীর ব্যবস্থা করবেন। সংগী-সাথীদের সামনে কখনো শাস্তি দেবেন না এবং অপমানও করবেন না।

* বন্ধু-বান্ধব অথবা মেহমান আসলে নিজের সন্তানদের দোষ-ত্রুটির জন্য আক্ষেপ করবেন না। বরং ওদের ভাল দিকগুলো তুলে ধরবেন।

* তাদের বয়স ও যোগ্যতা মোতাবেক তাদের উপর কিছু না কিছু ঘরোয়া ছোটখাট দায়িত্ব অবশ্যই অর্পণ করবেন। তা সুচারুরূপে আনজাম দিলে সাবাস ও বাহবা দেবেন। ভাল কাজে মন খুলে প্রশংসা করবেন। এতে সাহস বাড়ে, চতুরতা, আন্তরিকতা ও আত্মবিশ্বাস জন্মে।

* ধীরে ধীরে সরল ও অনাড়ম্বর পরিশ্রম ও কষ্ট সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত করে তুলবেন। কিন্তু শাস্তি স্বরূপ অথবা বিনা মজুরী মনে করে কোন কাজ দেবেন না। বরং আনন্দ ও খেলাচ্ছলে তা আদায় করবেন।

* কোন নির্দেশ দেয়ার সময় তাদের মানসিক অবস্থা অনুমান করবেন যেন আদেশ অমান্য বা লংঘন করার আশংকা না থাকে। বারবার আদেশ দেবেন না। নির্দিষ্ট ভাষায় হুকুম করবেন। যেন আপনাদের ভাষায় দোদুল্যমানতা প্রকাশ না পায়। অন্যথায় আদেশ লংঘনের জন্যে শিশু দোষী হবে না।

* কোন দোষ-ত্রুটি ঘটে গেলে অথবা কখনো শাস্তি দিয়ে থাকলে তা বারবার স্মরণ করিয়ে দেবেন না এবং অপরাপর ভাইবোনদেরকেও ধিক্কার দেয়ার কোন সুযোগ দেবেন না।

www.nagorikpathagar.org

* শিশু সন্তানদেরকে মুক্তমনে ও অবাধে মনোভাব প্রকাশের সুযোগ দেবেন। তাদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তরদানের চেষ্টা করবেন।

* তাদের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করবেন। আর মাঝে মধ্যে পথ নির্দেশ দিয়ে স্বয়ং তাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে দেবেন।

* নিজের সংগী-সাথী, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে সন্তানদেরকে সাথে করে নিয়ে যাবেন।

* মেহমানদের আদর-আপ্যায়ন ও খাতির-যত্নের ব্যাপারে সন্তানদের সহযোগিতা নেবেন। এভাবে তাদের সামাজিকতার প্রশিক্ষণও হবে এবং তারা সেই রীতিনীতিও শিখবে।

* বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানাদিতে শিশু সন্তানদেরকে তাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতানুসারে বাস্তবে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেবেন।

* সামষ্টিক ও সামাজিক বিষয়াদি বিশেষতঃ জনসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেরাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন এবং সন্তানদেরকেও অংশ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করবেন। এ জাতীয় কাজকর্মে স্বয়ং আপনাদের নিজেদের আগ্রহ তাদের অনুপ্রেরণা লাভের নিয়ামক প্রমাণিত হবে।

* তাদের খরচের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং নিজের পরিবারের জন্যে সদাইপত্র ক্রয় করে আনার সুযোগ দেবেন।

* তাদেরকে সব সময় ঐতিহাসিক ও নৈতিক কাহিনী, বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের গৌরব গাঁথা উপদেশমূলক ঘটনাবলী শুনাবেন। শৈশবে এ সবের খুব প্রভাব পড়ে এবং ওয়াজ নসীহতের তুলনায় এ পদ্ধতি চরিত্র-বিকাশের পরিচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা সৃষ্টিতেও উচ্চ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী প্রণয়নে অধিক কার্যকর প্রমাণিত হয়।

* উঠাবসা, চলাফেরা, খানাপিনা, মেলামেশা, কথাবার্তা, অন্যদেরকে কিছু দেয়া বা তাদের থেকে কিছু নেয়ার ব্যাপারে সভ্য ও ভদ্রজনোচিত আচরণ পদ্ধতি শেখাবেন।

* ভুলত্রুটি বা ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনার এবং কারো দয়া ও অনুগ্রহের প্রতি শুকরিয়া আদায়ে অভ্যস্ত করে তুলবেন।

* প্রথম থেকেই বিভিন্ন সময়ের দোয়া কালাম পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন এবং নিজেরাও নিয়মিত তা মেনে চলবেন। যেমন "বিসমিল্লাহ" বলে খাওয়া শুরু করা, খানাপিনার পর, হাঁচি আসলে অথবা কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলে "আলহামদুলিল্লাহ" বলা, মসজিদে ঢুকতে এবং বের হতে নির্দিষ্ট দোআ পড়া

www.nagorikpathagar.org

ইত্যাদি।

* হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের নাম উচ্চারণ করার নিয়ম শিক্ষা দেবেন।

এসব কিছু তখনই সম্ভব হবে যখন মা-বাপ দু'জন নিজেরাও অনুকরণীয় আদর্শের অধিকারী হবেন। শিশুরা মৌখিক উপদেশের চেয়ে বড়দের বাস্তব কাজকর্মে অবচেতনভাবে অধিকতর প্রভাবিত হয়ে থাকে। আর এসব প্রভাবই খুব মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। শেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিজের ও নিজেদের পরিবার পরিজনের মঙ্গল ও কল্যাণ এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে অশ্রুসিক্ত নয়নে দো'আ করতে থাকবেন। কারণ চেষ্টা সাধনার বরকত লাভ সম্পূর্ণরূপে তাঁরই মর্জির উপর নির্ভর করে।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَاوَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে (মনের প্রশান্তি) ও সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে চোখের শীতলতা দান কর। আর আমাদেরকে মুত্তাকী ও সৎলোকদের নেতা বানাও।"

কুরআনঃ ২৫ঃ৭৪

www.nagorikpathagar.org

মুরুব্বী, অভিভাবক এবং লালন ও নৈতিক প্রশিক্ষণ

মাতাপিতা নিজেরা যদি তারবিয়ত ও নৈতিক প্রশিক্ষণ দানে সক্ষম না হন তাহলে সন্তান-সন্ততির তারবিয়তের দায়িত্ব কোন উপযুক্ত শিক্ষক বা মুরুব্বীর হাতে তুলে দিতে হবে। একজন শিক্ষক হিসেবে কোন ব্যক্তি ঠিক তখনি সুচারুরূপে নিজ দায়িত্ব আনজাম দিতে পারেন যখন তিনি মাতাপিতার যোগ্য বিকল্প প্রতীয়মান হন। কারণ, শিশুরা এমন ব্যক্তিরই সংশোধনীমূলক প্রয়াস প্রচেষ্টার প্রভাব গ্রহণ করে থাকেঃ

ক) যাকে তারা নিজেদের সহমর্মী ও কল্যাণকামী মনে করে এবং যার ইহসান, অবদান, ত্যাগ ও অমায়িক এবং সুন্দর ব্যবহার সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা থাকে।

খ) শিশুদের সাথে যার স্বভাবগত আন্তরিকতা থাকে।

গ) যিনি খোশমেজাজের লোক এবং বৈধ গন্ডির মধ্যে শিশুদের আগ্রহ এবং প্রকৃতিগত চাহিদা ও দাবীসমূহের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখেন।

ঘ) যার অভিভাবকত্বে শিশুরা নিজেদেরকে সর্ব রকমে সুরক্ষিত ও নিরাপদ মনে করে এবং যার সাহচর্যে তারা আনন্দবোধ করে।

ঙ) যিনি শিশুদের সুন্দর দিক ও ভাল কাজ গুলোর মন খুলে প্রশংসা করেন এবং দুর্বল দিকগুলোর ব্যাপারে ধর পাকড় ও সমালোচনার ব্যাপারে খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করেন।

চ) যিনি তাদেরকে নিজেদের অবস্থায় আনতে পারেন এবং তাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করেন।

ছ) যিনি তাদের ছোটখাট উদ্বেগ-পেরেশানীগুলো সম্পর্কে পূর্ণ মনোযোগ

www.nagorikpathagar.org

সহকারে শুনেন এবং সহমর্মিতার সাথে এসব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে তা দূরী করণে শিশুদের সাহায্য করতে পারেন।

জ) যিনি সহনশীল ও সংবেদনশীল মেজাজের অধিকারী এবং মাফ ও ক্ষমার মনোভাব নিয়ে কাজ করেন।

ঝ) যিনি শিশুদের আত্মবোধ ও আত্মসম্মানের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখেন।

(ঞ) যিনি নিজে দায়িত্ব সচেতন, কর্তব্যবোধ সম্পন্ন নীতিমালার অনুসারী আবেগ-উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণকারী হবেন।

(ট) যার কথা ও কাজে পূর্ণ মিল থাকে।

একজন মুরুব্বী শিক্ষক অথবা উত্তম শিক্ষকের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত উপরোক্ত গুনাবলী পাওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ভালভাবে লালন এবং তারবিয়ত ও নৈতিক শিক্ষাদানে সক্ষম হবেন না।

অভিভাবকের ভূমিকা ও আচরণ

এসব ছাড়াও তারবিয়ত ও নৈতিক শিক্ষাদানের দায়িত্ব সুচারুরূপে আনজাম দেয়ার জন্যে অভিভাবকের নিজের ভূমিকা ও আচরণ সংশোধন করতে হবে।

* শিশুদের জন্যে নিজের অন্তরে ভালবাসা, মায়া-মমতা, সহমর্মিতা ও মন আকর্ষণের আবেগ-প্রবণতা সৃষ্টি করতে হবে।

* তার দুর্বলতাসমূহের মর্ম অনুধাবন করে তা দূর ও অবসানের চিন্তা-ভাবনাকে নিজের একান্ত দায়িত্ব বলে মনে করতে হবে।

* অন্তরে তা সংশোধনের সঠিক জজবা ও আবেগ সৃষ্টি এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে চেষ্টা সাধনার পাশাপাশি নিজেদের ও শিশুদের হেদায়াতের জন্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকতে হবে।

* সংশোধণ হওয়ার ব্যাপারে নিজেও নৈরাশ্য থেকে বাঁচতে হবে এবং শিশুদেরকেও বাঁচাতে হবে। শিশু তো শিশুই। তার থেকে খুব বেশী কিছু অথবা অতি উচ্চ কোন আশা পোষণ করলেও নৈরাশ্য আসতে পারে। কারণ শিশু সুলভ আচরণ শিশুদের থেকে প্রকাশ পাবেই। অতি উচ্চ আশা পোষণ করলে অনুরূপ আচরণে নৈরাশ্য সৃষ্টি হবেই। এ জন্যে অনুরূপ উচ্চাশা থেকে বিরত থাকা উচিত।

* যথাসম্ভব ভাল ধারণা রেখে কাজ নিতে হবে। কেননা শিশুকে যেরূপ মনে করা হবে সে তদ্রুপই হবে। তবে এর মানে, কখনো সতর্কতা অবলম্বন ও

www.nagorikpathagar.org

লক্ষ্য রাখার ব্যাপারে উদাসীনতা ও অবহেলা প্রদর্শন নয়, বরং কু-ধারণা পোষণ, ছিদ্রান্বেষণ ও দোষ তালাশ করা থেকে বিরত থাকাই হলো এর অর্থ।

* শিশুদের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ এবং অহংবোধের প্রতি লক্ষ্য রেখে উপহাস, ঠাট্টা, বিদ্রুপ, গালমন্দ করা, অভিশাপ দেয়া প্রভৃতি পরিহার করতে হবে।

* আদালতের বিচারকের ভূমিকা পালনের পরিবর্তে চরিত্র সংশোধণকারীর ভূমিকা পালন করতে হবে। অর্থাৎ অতীতের দোষ-ক্রটির শাস্তি দিয়ে স্বস্তি লাভের পরিবর্তে প্রকৃত কারণ উদঘাটন করে এসব দোষ-ক্রটি দূর করার চিন্তা, চেষ্টা ও তদবীর করতে হবে, যেন ভবিষ্যতে এসব দোষ-ক্রটির পুনরাবৃত্তি না ঘটে। যা হওয়ার হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের জন্যে ঐকান্তিকতার সাথে তওবা করিয়ে নিতে হবে।

যতদিন মুরুব্বী বা অভিভাবক নিজের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি না দেবেন এবং নিজের ভূমিকা ও আচরণে উপযুক্ত পরিবর্তন না আনবেন ততদিন শিশুদের সংশোধণ ও তারবিয়ত বা নৈতিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তার চেষ্টাসমূহ কিছুতেই ফলদায়ক হবে না।

তারবিয়ত বা নৈতিক শিক্ষাদানের নিয়ম-পদ্ধতি

১) প্রশিক্ষণার্থী শিশুদের কর্মগত, নৈতিক, চারিত্রিক ও দৈহিক অবস্থা পর্যালোচনা করে উল্লেখযোগ্য সুন্দর দিক ও খারাপ দিকগুলোর একটা তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

২) শিশুদের বয়স, পারিবারিক অবস্থা, লোকজন, পরিবার ও শিশুর সাথে তাদের ব্যবহার, নিকটতম পরিবেশের বিস্তারিত অবস্থা, সহপাঠী ও সংগী-সাথীদের অভ্যাস ও আচার-আচরণ এবং রুচি ও আগ্রহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে হবে।

৩) উপরোক্ত তথ্যাবলী সংগ্রহের পর শিশুর বয়স এবং দৈহিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে কতিপয় মৌলিক দোষ ও গুণ নির্ণয় করতে হবে এবং ধীরে ধীরে গুণগুলোর প্রসার সাধন ও দোষগুলো দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

৪) দোষ-ক্রটিগুলোর পেছনে কিছু কিছু মৌলিক কারণ ও উপাদান কিংবা কিছু প্রকৃত অক্ষমতা ও ওজর বিদ্যমান থাকে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এসব উদঘাটন করে তা দূর করার চিন্তা-ভাবনা করতে হবে যেন সংশোধন স্থায়ী ও মৌলিক হয়।

www.nagorikpathagar.org

৫) একান্তে শিশুদের গুণগুলোর প্রশংসা করে সতর্কতার সাথে দোষ-ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং এগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্যে শিশুদের আত্মবিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে যথোপযুক্ত চেষ্টা তদবীরের কথা বলে দিতে হবে।

৬) দোষ-ত্রুটিগুলোর চিহ্নিতকরণ অন্য কথায় বলা হলে খুব বেশী ভাল হয়, মেধাবী ও সচেতন শিশুরা এভাবে বেশী প্রভাবান্বিত হয় এবং সহজেই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়।

৭) অন্যদের সামনে কখনো শিশুদের হেয় করা, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা বা অন্যায় সমালোচনা করা যাবে না, তাদের দোষ-ত্রুটিগুলো ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা যাবে না। এতে সংশোধনের পরিবর্তে হীনতাবোধ ও দোষ-ত্রুটির উপর অটল থাকার অভ্যাস জন্মায়।

৮) অন্যদের সামনে শিশুদের কেবল ভালদিকগুলোই উল্লেখ করা এবং ভাল কাজের জন্যে উৎসাহ ও সাবাস দেয়া উচিত। এতে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং দুর্বল দিকগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের শক্তি সৃষ্টি হয়।

৯) গঠনমূলক চরিত্রের বিকাশ এবং অপছন্দনীয় আচরণ থেকে রক্ষার জন্যে শিশুদের বয়স ও আগ্রহ অনুযায়ী খেলাধূলা, শখ, পাঠ বহির্ভূত তৎপরতা, ক্লাব গঠন ও সমিতি ইত্যাদির বেশী বেশী সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

১০) শিশুসুলভ আনন্দ উল্লাসের অবকাশ দিতে হবে এবং অজ্ঞতাজনিত কারণে সংঘটিত খারাপ আচরণ কঠোরভাবে পাকড়াও করার পরিবর্তে বুঝিয়ে শুনিয়ে মাফ করে দিতে হবে। একবার যে ভুল হয়ে গেছে বার বার তা স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত নয়।

১১) বার বছরের কম বয়সের ছাত্ররা শুষ্ক উপদেশ বাণীতে ও নৈতিক বক্তৃতায় খুব কমই প্রভাবান্বিত হয়, বরং অনেক সময় বিপরীত প্রতিক্রিয়া ও মারাত্মক ফল হয়, এদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

১২) বক্তৃতা গিলানোর পরিবর্তে পছন্দনীয় অভ্যাস সৃষ্টির চেষ্টা করুন এবং কার্যতঃ নিয়মনীতি ও আদব-কায়দা শেখানোর চেষ্টা করুন। অনুকরণের জন্যে উত্তম আদর্শ পেশ করুন।

১৩) বিভিন্ন উপাদেয় কাহিনী, হাসির গল্প, চুটকি, নবীগণ, বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গ ও বিখ্যাত লোকদের ঘটনাবলী আকর্ষণীয় ভংগীতে পেশ করে নৈতিক শিক্ষা দেয়া উচিত।

www.nagorikpathagar.org

১৪) উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে যেন নৈরাশ্যের ধারেও না ঘেষতে পারে।

১৫) শিশুদের সাথে আচরণে একজন স্নেহপরায়ন শিক্ষক এবং একজন স্বাধীন বিচারকের পার্থক্যকে সব সময় দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে এবং তাদের চাল-চলন ও গতিবিধিকে তাদের মানদন্ডেই পরিমাপ করতে হবে।

অভ্যাস, স্বভাব ও চালচলন পর্যালোচনা

আমরা আমাদের সব অভ্যাস, স্বভাব ও চালচলন পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব, নানা প্রকার অভ্যাসের মধ্যে এক বিরাট স্তূপএর কিছু হবে ভালো ও পছন্দনীয়, আর কিছু হবে মন্দ ও অপছন্দনীয়। আমাদের অভ্যাস ও স্বভাবগুলোই মূলতঃ আমাদের চরিত্র ও কাজকর্মের প্রতিবিম্ব। আর তারই প্রেক্ষিতে আমরা ভাল কি মন্দ তা নির্ণীত হয়ে থাকে। যদি আমাদের অভ্যাস ও স্বভাব সামষ্টিকভাবে ভালো ও পছন্দনীয় হয় তবে আমরা ভাল বলে গণ্য হই, অন্যথায় খারাপ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকি।

অভ্যাস সমূহ কি?

স্বভাবজাত ও জন্মগত বাসনা-কামনা সমূহ এবং প্রকৃতিগত চাহিদা ও দাবীসমূহ পূরণ করার জন্যে আমরা শিশুকাল থেকেই সব সময় কিছু না কিছু করে থাকি। যখন কোন কাজ কোন বিশেষ পন্থায় করে বসি আর তাতে আমাদের মৌলিক কোন বাসনাও পূরণ হয়ে যায় তখন ওই ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে আমরা সে একই কাজ পূর্বের তুলনায় অতি সহজেই করে ফেলি। এভাবে বার বার করার ফলে আমরা সে কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। অর্থাৎ এ কাজটি করার জন্যে আমাদের ভিতর মজবুত ঝোঁক ও আবেগ সৃষ্টি হয়ে যায়।

কোন কাজ বিশেষ ধরনে বার বার করার এই আবেগ প্রবণতাকেই অভ্যাস বলে। অভ্যাস সমূহ স্বয়ং প্রকৃতিগত ও সহজাত, তবে প্রত্যেক অভ্যাসের ভিত্তি কোন না কোন সহজাত প্রবৃত্তি, মৌলিক কামনা-বাসনা অথবা স্বভাবগত চাহিদা বা দাবীই হয়ে থাকে। এ জন্যে একবার বদ্ধমূল হয়ে গেলে এসব অভ্যাস দূর করা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সহজাত প্রবৃত্তি বা স্বভাবজাত দাবীসমূহ হলোঃ জাতিগত এবং প্রত্যেক

www.nagorikpathagar.org

মানুষের মধ্যেই জন্মগতভাবে সমানভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু এসবের প্রকাশ পদ্ধতি অনুকরণ, অভিজ্ঞতা লালন ও জ্ঞান বুদ্ধির তারতম্যের কারণে বিভিন্ন রূপ হয়ে যায় এবং পদ্ধতিগুলোই যেহেতু ধীরে ধীরে দৃঢ়মূল হয়ে অভ্যাসে ও স্বভাবে পরিণত হয়, সে কারণেই বিভিন্ন মানুষের স্বভাব, অভ্যাস, কাজকর্ম, আচরণ, চরিত্রের অভিন্নতাও ঐক্যের পরিবর্তে ভীষণ অনৈক্য ও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

অভ্যাস সমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিতঃ

* এসব আল্লাহ্ প্রদত্ত বা স্বভাবগত নয় বরং অর্জিত। জন্মগতভাবে পাওয়া যায় না বরং পরিবেশের প্রভাবে জন্ম নেয়। অন্যদের মাধ্যমে সৃষ্টি করা যায়। কিংবা নিজ ইচ্ছায় অর্জন করা যায়।

* স্বভাবগত না হলেও বার বার অনুশীলনের মাধ্যমে মজবুত হয়ে গেলে সহজে বর্জন করা যায় না। স্বভাবগত বাসনা-কামনার ন্যায় এ সবের মধ্যেও অশেষ আকর্ষণ থাকে। ফলে আমরা এসব অভ্যাসের অধীন হয়ে কোন কাজ করতে প্রায় তেমনিভাবে বাধ্য হয়ে যাই যেমনিভাবে বাধ্য হই কোন স্বভাবগত বাসনা বা জন্মগত দাবী ও চাহিদা পূরণে। এ জন্যে অভ্যাস সমূহকে "দ্বিতীয় সহজাত প্রকৃতি"ও বলা হয়।

বিভিন্ন অভ্যাস গড়ার বা বর্জন করার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট সময় হলো শৈশবকাল। বিশেষতঃ বার তের বছর বয়স পর্যন্ত হলো উত্তম সময়।

পরবর্তী স্তর সমূহে কাজ বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং অত্যন্ত দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন হয়।

* কোন কাজ অভ্যাসে পরিণত হলে অতি সহজেই তা সম্পন্ন হতে থাকে। তখন মানসিকতার উপর কোন চাপ প্রয়োগ করতে হয় না। ইচ্ছা ও কামনা করার কোন প্রয়োজন পড়ে না। মন মেজাজের উপর জবরদস্তিও করতে হয় না। বরং পূর্ণ আগ্রহ, তেজ ও ক্ষমতার সাথে সম্পন্ন হতে থাকে।

* কোন কাজ বার বার করলেই তা অভ্যাসে পরিণত হয় না, বরং প্রতিটি অভ্যাসের জন্যে নিম্নোক্ত জিনিসগুলো নিতান্ত প্রয়োজন।

১) আন্দোলন- অর্থাৎ কোন কাজ সম্পন্ন করার জন্যে আগ্রহ থাকা চাই। কেননা আগ্রহ না থাকলে ও কাজটি প্রথম বারেও সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না- অভ্যস্ত হওয়া তো দূরের কথা।

www.nagorikpathagar.org

২) ভালো প্রভাব- অর্থাৎ কাজটি সম্পন্ন হলে আনন্দবোধ হতে হবে যেন সেই আনন্দ লাভের জন্যে কাজটি পুনরায় করার ইচ্ছা জাগে।

৩) পুনঃপৌনিকতা- অর্থাৎ সেই কাজটি বার বার করা, কেননা কোন কাজ বার বার না করলে অনুশীলন ও দক্ষতা হয় না।

উপরোক্ত জিনিসগুলোর কোন একটির অভাবেও কখনো অভ্যাস গড়ে উঠবে না। কেননা কোন কাজের জন্যে যদি আন্দোলনই না হয়, অথবা তা করার কারণে সন্তোষজনক ও আনন্দদায়ক কোন ফলই যদি প্রকাশ না পায়, কিংবা কাজটি করলে যদি কষ্ট ভোগ করতে হয়, অথবা কাজটি বার বার করার সুযোগই যদি না পাওয়া যায়, তাহলে তা কখনো অভ্যাসে পরিণত হয় না। মুক্ত ও স্বাধীন হওয়া মাত্র এর বিপরীত কাজকর্ম সংঘটিত হতে থাকে। আমরা সবাই জানি কয়েক বছর পর্যন্ত নিয়মিত নামায আদায়কারী ছেলেরাও অনেক সময় স্বাধীন হওয়া মাত্র নামায ছেড়ে দেয়।

অভ্যাসের উপকারিতা সমূহঃ

অভ্যাস যদি ভালো হয় তা থেকে অনেক উপকারিতা পাওয়া যায়।

* মানুষ মানসিক যাতনা ও উদ্বিগ্নতা থেকে নিরাপদ থাকে। ভালো কাজ করার জন্যে প্রবৃত্তির সাথে সর্বদা সংগ্রাম করতে হয় না। প্রত্যেক মানুষকে নিত্যদিন এমন সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যখন তার প্রবৃত্তির দাবী হয় একটা, আর তার ঈমান, চরিত্র, ভদ্রতা ও মানবতার দাবী হয় অন্যটা। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাওয়া অতি কঠিন। বেশীর ভাগ মানুষই এখানে মার খেয়ে যায়। ভাল কাজের অভ্যাস গড়ে উঠলে এরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার খুব কমই হয়। আর হলেও সহজেই তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

* পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকলেও যে ব্যক্তি ভালো কাজে অভ্যস্ত সে তা করেই ফেলে। যেমন, সফরের কষ্ট, অসুস্থতা, অথবা মৌসুমের তীব্রতা সত্ত্বেও সময় মতো নামায আদায় করা, চরম আর্থিক অনটনেও অন্যের সাহায্য ও খেদমত করা, নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে এবং নিজের জীবন বিপন্ন করেও অন্যের উপকার সাধন করা ইত্যাদি। মোট কথা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধতা কিংবা পরিস্থিতির চাপকে এরূপ লোক তেমন একটা গুরুত্ব দেয় না।

www.nagorikpathagar.org

* যে সব কাজকর্মে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেছে সেসব কাজ অতি দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন হয়। এতে করে অন্যান্য উপকারী কাজের জন্যে সময়ও বাঁচে, কাজও ভাল হয় এবং শক্তিও ক্ষয় করতে হয় না এবং দৃষ্টিও তেমন বেশী দিতে হয় না।

* অভ্যাসের কারণে কর্মক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। কেননা অভ্যাসগত কাজে খুব কমই অবসন্নতা অনুভূত হয় এবং সাধ্য সাধনা কম করতে হয়। অভ্যাস ভিন্ন কোন কাজ করতে গেলে অনেক বেশী সাধ্য সাধনা করতে হয় এবং মানুষ অতিশীঘ্র অবসন্ন হয়ে পড়ে। যেমন অধ্যয়নের জন্যে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলে অথবা অন্য কোন শ্রমসাধ্য কাজ আনজাম দিতে হলে অভ্যাস থাকলে একাধারে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করলেও অবসাদ অনুভূত হবে না। আর অভ্যাস না থাকলে অল্প সময়ের মধ্যে অসন্তুষ্টি ও বিরক্তির ভাব ফুটে উঠবে।

* অভ্যাসগত কাজ আনজাম দেয়ার সময় মন-মস্তিষ্ককে অন্য কোন কাজেও লাগানো যেতে পারে। কারণ ঐ কাজে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে না এবং কাজ যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ঐক্যবদ্ধতার সাথে চলতে থাকে। যেমন সোয়েটার বোনার কিংবা মেশিনে কোন কাজ করার সময় একই সাথে হাতও চলতে থাকে এবং মনে মনে কোন ভাল কথা চিন্তা-ভাবনা করা, কারো কথা শোনা বা অন্যদেরকে মুখে কিছু বলার কাজেও রত থাকে। বিড়ি শ্রমিকেরা বিড়ি তৈরীর কাজ করা কালে একই সময় মুখে অনেক কথা বলে যেতে পারে। এভাবে অভ্যাসের কারণে একই সময়ে দু'টো কাজ আনজাম দেয়া যেতে পারে।

শিক্ষাদীক্ষায় অভ্যাসের গুরুত্ব

অভ্যাসের উপরোক্ত উপকারিতাসমূহ থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, জীবনে ভাল অভ্যাসগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। শিশুকাল থেকেই যদি পছন্দনীয় অভ্যাস গড়ে তোলার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় তাহলে মানুষের পক্ষে উন্নতির বিভিন্ন ধারা অতিক্রম করা অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়ে। যে শিশু সময় মত খাওয়া-দাওয়া, খেলাধূলা করা, শোয়া, ঘুম থেকে উঠায় অভ্যস্ত হয়, পড়ালেখা এবং মেহনত

www.nagorikpathagar.org

ও কষ্ট সহিষ্ণুতার কাজে নিয়মানুবর্তিতার সাথে সময় ব্যয়ে সক্ষম হয়, পছন্দনীয় আচার-আচরণ এবং বিভিন্ন স্থানের আদব-কায়দার অনুগামী হয়, তার স্বাস্থ্য, চরিত্র এবং চাল-চলনও ঠিক হয়ে যাবে। উন্নতি ও অগ্রগতির পথে সে উত্তরোত্তর অধিক সুযোগ-সুবিধাও পেতে থাকবে। সময় সুযোগ ও অবকাশ কম হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে সে কখনো দুঃখ প্রকাশ করবে না। নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার সাথে দিনের কাজ দিনে সমাধা করার জন্যে মন-মস্তিষ্কের উপর তাকে জবরদস্তি করতে হবে না। এ জন্যে ভাল ও পছন্দনীয় অভ্যাস গড়ে তোলার প্রতি সবিশেষ নজর দেয়া হয়।

পছন্দনীয় অভ্যাস সৃষ্টির পদ্ধতি

কোন বিষয়ে অভ্যস্ত হলেঃ

* সর্ব প্রথম শিশুদের মধ্যে সহজ-সরলভাবে সর্বজনবোধ্য পদ্ধতিতে নানারূপ কিস্সা-কাহিনী, পোষ্টার, ছবি, চিত্র, গল্প, বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনালেখ্য ইত্যাদির সাহায্যে এসব অভ্যাসের উপকারিতা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে, যতক্ষণ না তারা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে এর জন্যে আগ্রহী হয়ে যায়।

* অতঃপর সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট কথায় তাকে বুঝাতে হবে যে এ অভ্যাস সৃষ্টির প্রেক্ষিতে কি কি জিনিস দরকার এবং সে পর্যন্ত পৌছায় সহজতর পন্থা কি? অভিষ্ট জিনিস সহজে কিভাবে অর্জন করা যেতে পারে।

* তারপর শিশুদের থেকে অঙ্গীকার নিতে হবে। এই অঙ্গীকার যদি সামষ্টিক হয় এবং কয়েকজন শিশু থেকে এক সাথে নেয়া হয় তবে খুব ভাল হয়। আন্দোলন খুব জোরদার হওয়া উচিত যেন শিশুরা কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়।

* অতঃপর এ ব্যাপারে কর্মতৎপর হওয়া, বার বার অনুশীলন ও পুনরাবৃত্তির সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

* একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ মনোযোগের সংগে ক্রমাগতভাবে অনুশীলন করাতে হবে, তবে অনুশীলনীতে মনের আগ্রহ ও আনন্দ দানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। পছন্দনীয় অভ্যাস সৃষ্টির জন্যে সপ্তাহ উদ্‌যাপন

www.nagorikpathagar.org

কর্মসূচী গ্রহণ করা শ্রেয়। অভ্যাস গড়ে তোলার পর্যায়ে অভ্যাসের ব্যতিক্রম কিছু করার কোন অবকাশই দেয়া যাবে না। এ জন্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা ও তাৎক্ষণিক বাধা দেয়া প্রয়োজন।

* অনুশীলন ও পুনরাবৃত্তি এবং বার বার কর্মসূচী গ্রহণ আলাদা আলাদা না করে সমষ্টিগতভাবে হলে বহুগুণ বেশী পরিমাণে প্রভাবশীল হয়ে থাকে। কেননা এভাবে আন্দোলন, আনন্দ ও সহজতর হওয়া তিনটি সমস্যারই সমাধান এক সাথে হয়ে যায়, একজন থেকে অন্যজন শক্তি সঞ্চয় করে। ইসলামী ইবাদতসমূহ আত্মশুদ্ধির জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা হওয়ার এটাও একটা কারণ যে এতে সময়ের সদ্ব্যবহারের সাথে সাথে সমষ্টিগতভাবে আনজাম দেয়া অবশ্য করণীয় (ফরজ) করে দেয়া হয়েছে।

* এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন কাজ করতে সহজ হয় ও আনন্দবোধ হয়। আর বিপরীত কথাটা হয় কঠিন ও কষ্টকর।

* নিকটতম পরিবেশে যেন বিপরীত ধর্মী কোন নমুনা ও দৃষ্টান্ত না থাকে।

* মুরুব্বী ও অভিভাবকগণ ওসব অভ্যাস ও রীতিনীতি কঠোরভাবে মেনে চলবেন এবং নিজেদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বে ওটা অনুকরণীয় ও প্রভাব বিস্তারকারী আদর্শ সৃষ্টি করে শিশুদের তা অনুসরণের সুযোগ করে দেবেন।

* অভ্যাস গড়ে তোলা এবং ক্রিয়াকর্মে নিয়মানুবর্তী বানানোর উদ্দেশ্যে এমন পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে যেন একজন থেকে অন্যজনের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হয়। যেমন ফজরের পর একই অযুর সাথে কুরআন তেলাওয়াত করার ব্যবস্থা করা, অযু করার সাথে দাঁত মাজার অভ্যাস সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

* ভাল ও পছন্দনীয় অভ্যাস ও চালচলন এবং নেক কাজকর্মের ব্যাপারে স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, এসবের জন্যে কোন ছুটির দিন নেই, বরং নিয়মিত এসব দেখাশোনা করতে হবে। এসব ব্যাপারে একটু অবহেলা করলেই অবক্ষয় শুরু হয়ে যাবে এবং এ যাবত অর্জিত সবই আস্তে আস্তে স্রোতের তোড়ে ভেসে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

পছন্দনীয় অভ্যাস ও আচরণসমূহ

উপরোক্ত মূলনীতিগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে শিশুদেরও ধীরে ধীরে নিম্নোক্ত অভ্যাস ও আচরণগুলোর পাবন্দ বানাতে হবে।

* পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার পাবন্দ বিশেষত, দেহ ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের পরিচ্ছন্নতা, (গোসল করা, দাঁত পরিষ্কার করা, হাত ধোয়া, চুল ও নখ কাটা ইত্যাদি) পোশাক-পরিচ্ছদ, বিছানা, সাধারণ ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, শিক্ষা সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি, শ্রেণীকক্ষ, মেঝে, ড্রেন ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা এবং আসবাবপত্র সাজিয়ে রাখা।

* পেশাব, পায়খানা থেকে পবিত্রতা হাসিল করার নিয়ম এবং গোসলখানা ও পায়খানার উপযুক্ত ব্যবহার।

* রাত্রে তাড়াতাড়ি শোয়া, ভোরে ঘুম থেকে উঠা।

* যথা নিয়মে ওযু করা, তা'দীলে আরকানের প্রতি লক্ষ্য রেখে একান্ত মনে সালাত আদায় করা।

* সময়ের সদ্ব্যবহার করা, বিশেষতঃ নামায, তিলাওয়াত, খেলা, খাওয়া, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও ব্যায়াম ইত্যাদিতে।

* সালাম দেয়া, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করা এবং যথাসম্ভব আগে সালাম দেয়া।

* সঠিক নিয়মে উঠাবসা, চলাফেরা, দাঁড়ানো, কথাবার্তা বলা, খাওয়া-দাওয়া, পোষাক পরা, টুপী মাথায় দেয়া ইত্যাদি।

* সদা সত্য কথা বলা এবং বিভিন্ন কাজ কারবারে বিশেষতঃ খেলাধূলা, পরীক্ষা এবং টাকা-পয়সার ব্যাপারে ঈমানদারী ও সততা অবলম্বন করা।

* হাসি মুখে ভুল স্বীকার করা এবং ভুল-ত্রুটি হলে মাফ চেয়ে নেয়া।

* কথা বলতে, প্রশ্ন করতে, উত্তর দিতে অথবা কোন কিছু নেয়ার সময় নিজের পালা আসার অপেক্ষায় থাকা।

* অর্পিত দায়িত্ব বা কর্তব্য কর্মসমূহ নিয়মানুসারে ও গভীর মনোযোগের সাথে সমাধা করা।

* শ্রেণীসমূহে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মিল মহব্বতের ভিতর কাজ

www.nagorikpathagar.org

করা।

* ওয়াদা পূরণ করা বা পূরণ করা সম্ভব না হলে অথবা কোন ওজর ও অসুবিধা দেখা দিলে যথাসম্ভব পূর্বাহ্নে অবহিত করা কিংবা অন্ততঃ যথাসময়ে অক্ষমতা প্রকাশ করা।

* ব্যবহার করার পর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যথাযথভাবে যথাস্থানে সংরক্ষণ করা।

* জনসেবা করা, দুঃস্থ ও অসহায়দের প্রতি সদয় হওয়া।

* অনুমতি নিয়ে আসা যাওয়া করা।

* কৃতজ্ঞতা ও শোকরিয়া আদায় করা, কেউ সামান্য দয়া ও উপকার করলেও।

* ভদ্র ও সুন্দর ভাষায় সম্বোধন করা এবং আদরের সাথে নাম নেয়া।

* প্রতিটি স্থানের রীতিনীতি ও আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

* বিভিন্ন সময় ও স্থানের যিকর ও দু'আ সমূহ নিয়মিত আদায় করা।

প্রকাশ থাকে যে পছন্দনীয় অভ্যাস ও আচরণ এবং অনুকূল চরিত্রের অনুসারী বানানোর জন্যে চেষ্টা না করা হলে শিশুরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও অন্যের অনুকরণে কোন না কোন অভ্যাস সৃষ্টি করে নেবেই। এমতাবস্থায় পছন্দনীয় অভ্যাসের অনুপস্থিতিতে তাদের অপছন্দনীয় অভ্যাস গড়ে তোলার প্রবল আশংকা বিদ্যমান। এটা শিশুদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে সবার চোখে ঘৃণিত বানিয়ে ছাড়বে এবং পরবর্তীতে তা সংশোধন করাও কঠিন হয়ে পড়বে।

শিশুরা কেন বিগড়ে যায়?

বিগড়ে যাওয়া শিশুদের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে বিকৃতির সূচনা সাধারণতঃ নিম্নের যে কোন একটি বা একাধিক কারণে ঘটে। যতদিন সঠিক কারণ নির্ণয় করে তা নিরসনের চিন্তা না করা হবে, ততদিন সংশোধন করা সম্ভব হবে না।

১) মাতাপিতা বা বড়দের পারস্পরিক সুসম্পর্কের অভাব, মাতাপিতা বা পরিবারে অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ও শিশুদের বিকৃতির কারণ হয়ে থাকে। দৈনন্দিন ঝগড়া-বিবাদ, তর্ক বিতর্ক, অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ, ভাল ও ভদ্রঘরকে জাহান্নামে পরিণত করে ছাড়ে।

২) যেসব শিশু এমন গৃহে প্রতিপালিত হয় তারা নানা প্রকার নৈতিক ও মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের

www.nagorikpathagar.org

পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ থাকে, সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিশুদের বিগড়ে যাওয়ার আড্ডাখানায় পরিণত হয়।

৩) অশোভন আচরণঃ শিশুদের বিগড়ে যাওয়ার এটিও একটি বড় কারণ। এই অশোভনীয় আচরণ চাই মাতাপিতার পক্ষ থেকে হোক অথবা শিক্ষকদের পক্ষ থেকে, ভাইবোন বা ক্লাসের সহপাঠীদের পক্ষ থেকে হোক কিংবা সংগী-সাথীদের পক্ষ থেকে, যেমন ঘৃণা-বিদ্বেষ, হেয় মনে করা, উপহাস করা, বার বার মারপিট বা ধমক প্রদান, সন্দেহ পোষণ বা কু-ধারণা, সংশোধন সম্পর্কে নৈরাশ্য এবং অন্যদের কাছে অভিযোগ করে বেড়ানো ইত্যাদি।

৪) হীনমন্যতাঃ দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা বা ত্রুটির কারণেই হোক অথবা হোক নৈতিক অধঃপতনের কারণে। কোন অক্ষমতা, দুর্বলতা, দৈহিক ত্রুটির কারণে যখন কোন শিশুকে সাধারণভাবে হীন ও নীচু বলে মনে করা হতে থাকে, অথবা তা আরোপ করা হতে থাকে, তখন সে হীনমন্যতার শিকার হয়ে বিগড়ে যেতে থাকে।

৫) কু-সংসর্গঃ খারাপ ও বিগড়ে যাওয়া অসৎ শিশুদের সংস্পর্শে এসে প্রায়ই সুসভ্য, ভদ্র পিতার সন্তানরাও বিগড়ে যায়।

৬) সহপাঠী ও সংগী-সাথীদের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হওয়াঃ কু-সংসর্গ যেখানে শিশুদের বিগড়ে দেয় সেখানে সমবয়স্কদের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হওয়া, তাদের বিগড়ে যাওয়া ও খারাপ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিশুরা অনেক কথাই খেলার সময় সাথীদের থেকে শিখে থাকে। ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকশিত করে তোলার জন্যে ভাল ও সৎ সংশ্রব নিতান্ত জরুরী।

৭) গঠনমূলক কর্মকান্ড এবং আকর্ষণীয় কর্মতৎপরতার সুযোগ না পাওয়াঃ শিশুরা সর্বদা কিছু না কিছু ভাঙ্গা গড়ার কাজে ব্যস্ত থাকে। অবসর সময়ের জন্যে যদি তখন উপযুক্ত কাজের কোন ব্যবস্থা না করা হয় তবে এই বেকারত্বের কারণেও তাদের বিগড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

৮) মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্বভাবগত প্রয়োজনে ও চাহিদাসমূহের অপূর্ণতা যেমন খাওয়া-পরা ও খেলাধূলার ব্যাপারে তাদের স্বভাবগত বাসনা ও ইচ্ছা-আকাংখাগুলো পূরণে বার বার খুব বেশী বাধা দান করা। এসব বাসনা-কামনা বৈধ পন্থায় পূরণ না হলে শিশুরা অবৈধ পন্থায় পূরণের চেষ্টা করে।

৯) অনুসন্ধিৎসার প্রাবল্য এবং নিজেই যাচাই পরীক্ষা করার আগ্রহ। শিশুদের থেকে কোন কোন দোষত্রুটি এজন্যও প্রকাশ পায় যে তারা কিছু অশোভনীয়

www.nagorikpathagar.org

কাজ করে জানতে ও দেখতে চায়, এরূপ করলে কি হয়? এই পরীক্ষাটাই অজ্ঞতার কারণে বিগড়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১০) আত্মনির্ভরতা ও ইচ্ছা শক্তির অভাবঃ এটা শিশু বয়সের অপরিহার্য ব্যাপার।

১১) বড় বা উল্লেখযোগ্য ও অগ্রগণ্য হওয়ার অভিলাষঃ শিশুরা এমন অনেক অসংগত ও অশোভনীয় কাজ এ জন্যে করে বসে যে তারা বড় হতে চায়। সংগী–সাথীদের মধ্যে অগ্রগণ্যও হতে চায়। এই আবেগ যখন স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভের উপযুক্ত পথ না পায় তখন তা ভুল পথ অবলম্বন করে।

১২) স্নেহ–মমতা এবং বৈধ আদর–আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত হওয়াও বিগড়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৩) অস্বাভাবিক আদর যত্ন এটিও বিগড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

১৪) অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা, অদূরদর্শিতা ও অপরিণামদর্শিতা।

১৫) উচ্চ ধারণা, পরিচ্ছন্ন চিন্তা–ভাবনা ও ধ্যান–ধারণা এবং ভারসাম্যপূর্ণ লক্ষ্য ও কর্মসূচীর অভাব।

১৬) অলসতা, দূর্বলতা, অকর্মণ্যতাঃ চাই তা স্বার্থপরতা, বেপরোয়া ভাব ও নিঃসংগতা, সম্পর্কহীনতা অথবা দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা যে কোন কারণেই হোক।

১৭) দিন দিন অশ্লীলতা, কদর্যতা, বেহায়াপনা ও ফ্যাশন প্রীতির প্রাদুর্ভাব, এসবও অনেক শিশুকে বিগড়ে দিচ্ছে।

১৮) রোমাঞ্চমূলক ও বিভীষিকাপূর্ণ চলচ্চিত্র, গোয়েন্দা বৃত্তির নভেল, উলঙ্গ ও নগ্ন ছবি ও অশ্লীল সাহিত্য।

১৯) নাস্তিকতা, খোদাদ্রোহিতা ও বস্তুবাদের দাপটে সাধারণের মধ্যে বিকৃতি দেখা দিয়েছে। এর দ্বারা নতুন প্রজন্মও দ্রুত প্রভাবিত হচ্ছে।

২০) অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদিঃ এ হচ্ছে শিশুদের বিকৃতির সাধারণ কারণ।

এসব কারণে আমাদের কচি কাঁচা, সবুজমনা একান্ত প্রিয় শিশুরা যাদেরকে নিষ্পাপ নামেই ডাকা হয় এবং কোলে নিষ্পাপ রূপেই যাদেরকে তুলে নেয়া হয়, বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বেই তারা এমন কিছু অপছন্দনীয় অভ্যাস আচরণ বা অপরাধের শিকার হয়ে পড়ে যা শুনলে লজ্জায় মাথা আমাদের হেট হয়ে পড়ে। বর্তমানে এমন কোন্ অপরাধ আছে যা আমাদের মধ্যে পাওয়া যায় না?

www.nagorikpathagar.org

মাতাপিতার আদেশ পালন, শিক্ষকদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ তো প্রায় উঠেই গেছে এবং সূক্ষ্ম ও সুন্দর আবেগগুলোর বিকাশ ও প্রস্ফুটিত হওয়া কঠিন হয়ে চলেছে। ফুল ফোটা কঠিন হয়ে গেছে। দয়াদ্রতা ও সহমর্মিতার ভাব থেকে তাদের মন মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ খালি হয়ে যাচ্ছে। মনের উদারতা, আত্মসংযম এবং সম্ভ্রমবোধ শত যোজন দূরে সরে গেছে। পাশ্চাত্যের কথা আর কি বলব? সেখানে যুব সমাজের মধ্যে অপরাধ প্রবনতা তুঙ্গে ও চূড়ান্তে পৌছে যাচ্ছে। নয় দশ থেকে তের চৌদ্দ বছর বয়সের শিশুরা পর্যন্ত অপহরণ, ধর্ষণ, খুন, যখম, রাহাযানি, ছিনতাই, পকেটমারী, ডাকাতি ইত্যাদিতে লিপ্ত পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেশেও এসব অপরাধের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রতিকার

মানুষ সাধারণভাবে শাস্তি দিয়ে কিংবা কড়াকড়ি আরোপে অন্যায় আচরণ পরিহার করিয়ে বিকৃতির প্রতিকার করে থাকে। নিঃসন্দেহে এ দু'টি পদক্ষেপও অনেক সময় কার্যকর প্রমাণিত হয়ে থাকে। শিশু কোন অন্যায় ও অশোভন আচরণের ফলে মর্মান্তিক ও কঠোর শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হয়, তখন সে ব্যথা ও কষ্টের তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করার কারণে সেকাজ করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে যখন দীর্ঘদিন পর্যন্ত পুনরায় কোন অযথা কাজ করার সুযোগ না পায়, তখন সে কাজের প্রতি ঝোঁক প্রবনতা দুর্বল হয়ে যায়। তবে অধিকাংশ সময় এমনও ঘটতে দেখা যায় যে, শাস্তি ভোগের কারণে শিশু আরো বেশী দুঃসাহসী ও বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং মন্দ ও খারাপ অভ্যাসসমূহ ভিত্তি গেড়ে বসে। এরূপভাবে ভিতরের আগ্রহ ছাড়া যখন একটি অন্যায় আচরণ থেকে বিরত রাখা হয় তখন সুযোগ পাওয়া মাত্র সে কাজ করার সাহস আরও বেড়ে যায়। এ জন্যে উপরোক্ত দুটো প্রতিকারের উপর খুব বেশী ভরসা করা ঠিক নয়। এক এক শিশুর বিগড়ে যাওয়া ও নষ্ট হওয়ার ধরন ও কারণ এক এক রকম। এ জন্যে সকলের প্রতিকার একই ব্যবস্থা পত্র দ্বারা করা সম্ভব নয়। সর্ব প্রথম বিগড়ে যাওয়ার বা নষ্ট হওয়ার মূল কারণসমূহ নির্ণয় করতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে– যেন সে মূল কারণগুলো দূর করা যায়। যতদিন জড় ও মূল বিদ্যমান থাকবে, হতে পারে বিকৃতির ধরন বদলে যাবে, কিন্তু পুর্নরূপে সংশোধন সম্ভব হবে না। নিম্নে আরও কতিপয় অতিরিক্ত চেষ্টা তদ্বির চিহ্নিত করা হচ্ছে। প্রত্যেক রকমের বিকৃতিতে এসব চেষ্টা তদ্বির কাজ দিতে পারে। প্রথমে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখুনঃ

www.nagorikpathagar.org

* শিশুদের দোষ-ত্রুটির কারণে আপনার ভূমিকা ও মনোভাবে যে পরিবর্তন এসেছে তার সংশোধন করুন, সে আপনার স্নেহ ভালোবাসার ভিখারী। তাকে শর্তহীন ভালোবাসুন। অর্থাৎ তার ব্যক্তিসত্তাকে ভালোবাসুন, গুণাবলীকে নয় এবং আপনার কথা, কাজ ও আচার আচরণ দ্বারা তার মধ্যে আপনার স্নেহ ভালোবাসার বিশ্বাস জন্মান। শত শত দোষত্রুটির এটাই হচ্ছে একমাত্র পরীক্ষিত প্রতিবিধান। ইনশায়াল্লাহ্ সে আপনাকে নিরাশ করবে না।

* আগ্রহ, বয়স ও যোগ্যতা মুতাবেক গঠনমূলক ক্রিয়াকর্ম ও বিভিন্ন দায়িত্বে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিন।

* দোষ-ত্রুটির জন্যে নির্জনে আন্তরিকতার সাথে বুঝান, অন্য লোকদের সামনে জিজ্ঞাসাবাদ করা ও শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকুন। আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও স্নেহ-মমতার সাথে দোষ-ত্রুটিগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিকার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ ও চেষ্টা তদ্বিরের পন্থা বাতলে দিন।

* অতি বেশী আশা পোষণ করবেন না। যথা সম্ভব বয়স অভিজ্ঞতা ও বুঝ বুদ্ধি বিবেকের স্বল্পতার ছাড়ও কিছুটা দিন। শিশু তো শিশু, এরা অজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ হয়েই থাকে। এবং অনেক কাজই মৌলিক কামনা বাসনা ও প্রকৃতিগত দাবি ও চাহিদার কারণে বাধ্য হয়েই করে বসে।

* নিয়মিত খেলাধূলায় এবং সহপাঠী ও সংগী সাথীদের সাথে মেলামেশার সুযোগ দিন।

* নিজেদের আচরণে স্থিরতা, দৃঢ়তা ও অনড় ভাব সৃষ্টি করুন- যেন শিশুরা আপনার মেজাজের অবস্থা সুন্দরভাবে বুঝতে পারে এবং আপনার খুশী অখুশীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারে।

* শিশুকে নিজের আস্থায় বিশ্বস্ততায় নিয়ে আসুন এবং তার উপরও আস্থা প্রকাশ করুন।

* তার অনুভূতি ও দৃষ্টি ভংগীর প্রতিও গুরুত্ব দিন। তার আলাদা ব্যক্তিসত্তা

www.nagorikpathagar.org

ও অস্তিত্ব স্বীকার করুন এবং তার ব্যক্তিসত্তার অবশ্য প্রাপ্য সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

* আকর্ষণীয় ও শিক্ষামূলক কাহিনী ও ঘটনাবলীর সাহায্যে ভালোর সাথে অন্তরঙ্গতা এবং মন্দের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করুন।

* একান্ত বাধ্যগত অবস্থায় পরিবেশ ও অবস্থান পরিবর্তন করে তাকে এমন স্থানে রাখুন যেখানে লোকজন তার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত নয় এবং তার ব্যক্তিত্বের সম্মান করে। আশা করা যায়, এভাবে সে নতুন পরিবেশে তার হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে নেবে এবং তা স্থায়ীভাবে রক্ষা করার ব্যাপারে কোনরূপ ত্রুটি ও দুর্বলতা প্রদর্শন করবে না।

অপছন্দনীয় অভ্যাস ও আচরণ

শিশুরা সাধারণত নিম্নের অপছন্দনীয় অভ্যাস ও আচরণের শিকার হয়ে যায়। প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধীরে ধীরে এসব পরিহার করানো উচিত।

* মিথ্যা বলা
* চোগলখুরী করা
* বিছানায় পেশাব করা
* অন্ধকারে ভয় পাওয়া
* জেদ করা ও খিটখিটে হওয়া
* গালাগালি করা
* মাস্তানী করা
* ছোট শিশুদের মারপিট করা
* সংগী সাথীদের পীড়ন করা
* জীবজন্তুর সাথে নির্দয় ব্যবহার করা
* বাড়ী বা স্কুল থেকে পালানো
* ভবঘুরে হওয়া
* নাম বিকৃত করা
* চুরি করা
* মুখ ভেংচানো
* টালবাহানা করা
* মুখের উপর জবাব দেয়া
* ধুমপান করা
* সিনেমা দেখা
* গোয়েন্দাবৃত্তির নভেল পড়া (ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়া)
* অমিত ব্যয়িতা
* অসভ্যতা
* ঝগড়া বিবাদ করা
* কাজে ফাঁকি দেয়া
* অবাধ্যতা
* হট্টগোল করা

www.nagorikpathagar.org

* প্রতারণা করা * নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা।

পরিত্যাগ করানোর পদ্ধতি

* সর্ব প্রথম শিশুদের অপছন্দনীয় অভ্যাস ও আচরণের মধ্য হতে কতিপয় মৌলিক ও উল্লেখযোগ্য বদভ্যাসকে নোট করে নিন।

* অতঃপর পালাক্রমে এক একটা বদভ্যাসের প্রতি দৃষ্টি দিন। প্রথমে গভীর দৃষ্টিতে সেই বদভ্যাসের মূল উৎস ও প্রকৃত চালিকা শক্তি পর্যালোচনা করে দেখুন এবং তা দূর করার চিন্তা করুন, যেন সংশোধন স্থায়ী হয়।

* উপযুক্ত সুযোগ খুঁজে সাধারণ বোধগম্য ভাষায় শিক্ষামূলক কিসসা কাহিনী ইত্যাদির সাহায্যে এই বদভ্যাসের ক্ষতি ও কুফল মর্মমূলে পৌঁছে দিন।

* এরপর নির্দিষ্টভাবে বলে দিন কি কি ত্যাগ করতে হবে এবং সেগুলো ত্যাগ করার সহজ পন্থা বা তদ্বির কি?

* শিশুদেরকে ভালোভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে কুঅভ্যাস ত্যাগের অঙ্গীকার নিন। যদি তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ওয়াদা লংঘন ও অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে প্রায়শ্চিত্ত সরূপ দান, ছদকা, জরিমানা অথবা কোন শাস্তি নির্দিষ্ট করে নেয়, তবে তা সবচেয়ে ভাল।

* সংশোধন সম্পর্কে কখনো নৈরাশ্যকে নিকটেও পৌঁছতে দিবেন না। বরং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যাপারে আস্থা জন্মান।

* শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের এতটা জযবা ও মনোবৃত্তি সৃষ্টি করুন, যেন তা ত্যাগ করতে পারবে বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায়।

* এটা পরিষ্কার যে, এটা কঠোরতা করলে অথবা প্রকাশ করার সুযোগ না দিলে কুঅভ্যাসসমূহ চলে যায় না। বরং কঠোরতা ও জবরদস্তির কারণে নতুন নতুন আরো অনেক কুঅভ্যাস সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন– চুরির সাথে মিথ্যা ও প্রতারণা ইত্যাদি কুঅভ্যাস সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে ভিতরের প্রেরণা ও আগ্রহ না থাকার কারণে প্রকাশের সুযোগ না পাওয়ায় কোন কোন কুঅভ্যাস সাময়িকভাবে

www.nagorikpathagar.org

হয়তো দমে থাকে, কিন্তু সুযোগ পাওয়া মাত্র দ্বিগুণ তেজে বেরিয়ে আসে। কুঅভ্যাসের মূলোৎপাটনের জন্যে প্রকৃত কারণসমূহের নিরসন এবং শিশুদের আগ্রহ ও ইচ্ছা শক্তি অতীব জরুরী।

* আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্যে শিশুর কোন উল্লেখযোগ্য গুণের আশ্রয় নিন এবং তাকে বুঝিয়ে দিন, "তুমি যখন অমুক ব্যাপারে এত সুন্দর আচরণ প্রদর্শন করতে পার, তখন এই মামুলী ও সাধারণ বিষয়টি কেন ছাড়তে পারবে না?"

* তাদের নিকটস্থ পারিপার্শ্বিকতায় এমন পরিবেশ সৃষ্টি করুন যাতে বদ্যভাস ত্যাগ সহজ হয়, মনে আনন্দ বোধ হয় এবং তাতে টিকে থাকা কঠিন ও কষ্টকর হয়।

* জরুরী মনে করলে শিশুদের আবাসস্থল, কক্ষ অথবা স্থান পরিবর্তন করে দিন।

* বদভ্যাসগুলো ত্যাগ করার ব্যাপারে সামষ্টিক পদক্ষেপের চেয়ে ব্যক্তিগত পদক্ষেপ অধিকতর ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। এ জন্যে প্রত্যেক শিশুর প্রতি আলাদা আলাদা দৃষ্টি দিন।

* শিশুরা যতটা সফল হয়েছে, সে জন্যে তাদেরকে বাহবা দিয়ে আরো অধিক শক্তি বাড়ান।

* অবাধ্য হওয়ার সুযোগ কখনো দিবেন না।

* অধিকাংশ কুঅভ্যাস ও খারাপ আচরণ সৃষ্টির মুল কারণ, ভাল অভ্যাস ও আচরণ সৃষ্টির সুব্যবস্থা না থাকা। ইতিবাচক চরিত্র ও পছন্দনীয় অভ্যাস-আচরণ সৃষ্টির চেষ্টা করুন। তবেই অপছন্দনীয় অভ্যাস-আচরণ এবং নেতিবাচক চরিত্র ও গুণাবলীর জন্যে কোন অবকাশই থাকবে না।

* কুঅভ্যাস ও আচরণ, এসবের ক্ষয়-ক্ষতি এবং নেতিবাচকতার দিক থেকে এসব ত্যাগ ইত্যাদি সম্পর্কে খুব বেশী আলোচনা করবেন না। বিশেষ করে ভাল ছেলেদের সামনে। নতুবা এতে কেবল লোভ দেখা দেবে এবং খারাপ ও মন্দের প্রতি ঘৃণা হ্রাস পাবে। মিথ্যা বর্জনের পরিবর্তে ইতিবাচক পন্থায় সত্য

www.nagorikpathagar.org

বলার উপকারিতা ও ভাল ফলাফল মর্মমূলে বসিয়ে দিবেন। দুর্বল অসহায়দের পীড়ন করার ন্যায় বদভ্যাস পরিহারের জন্যে তাদের খোঁজ খবর নেয়া এবং সাহায্য সহায়তা করার প্রতি অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করুন।

* যথাসাধ্য নিজের প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা প্রয়োগ করে চেষ্টা চালিয়ে যান, আশা করা যায় সফল হবেন। অন্যথায় কর্তব্য পালন থেকে তো দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবেন এবং শিশুরা আজীবন আপনার উপকার ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখবে। আশা করা যায়, জীবনের কোন এক মোড়ে এসে নিজে নিজেই সংশোধন হয়ে যাবে। অন্তত এতটুকু তো হবে যে শিশু তার সংশোধনের জন্যে আপনার প্রচেষ্টাসমূহ ভাল দেখবে এবং ভালোভাবে উল্লেখ করবে। দৃঢ় আশা এটাই যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনার এসব চেষ্টা প্রচেষ্টায় বরকত দান করবেন।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাফল্যের শর্তাবলী

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে দ্বীনি মাদরাসাসমূহের সাথে অনেক আশা-আকাংখা জড়িত থাকে। এটা যুক্তিসংগত কথা যে আজকে আমরা যেসব কারণে উদ্বিগ্ন এবং আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের ভাগ্যাকাশ যে ঘনঘটায় ছেয়ে গেছে, তন্মধ্যে মূলত এসব মিট্ মিট্ কারী বাতি থেকেই কিছুটা আশার আলো পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ জন্যেই আল্লাহ্ তা'য়ালা যাদের কিছু দূরদৃষ্টি প্রদান করেছেন তারা এসব বাতি নির্বাপিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে এবং নতুন বাতি জ্বালানোর জন্যে নিজস্ব পদ্ধতিতে সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। অবশ্য উপায় উপকরণের সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁদের বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

তাছাড়া সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তো কেবল শিক্ষারই আশা করা যায়; কিন্তু দ্বীনি মাদরাসাগুলোর দায়িত্ব তিনগুনঃ

১) বিভিন্ন প্রবন্ধ ও পাঠের মান হবে সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

২) 'দ্বীন'-এর প্রয়োজনীয় জ্ঞানদান, মাতৃভাষার মাধ্যমে একে অপরকে পৌঁছাতে হবে।

৩) দ্বীনি চরিত্র ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিশুদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যা তাদেরকে দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা, আল্লার যোগ্য বান্দা হওয়া, সমাজের নিঃস্বার্থ সেবক এবং রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক সৃষ্টিতে সহায়ক হতে পারে। আর তাদেরকে নাস্তিকতা, বস্তু পুঁজা এবং অসৎ চরিত্রের বর্তমান সয়লাবে ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে।

আজকের পরিবেশে অসাধারণ আশা-আকাংখা সম্পৃক্ত করে নেয়া অযৌক্তিক নয়। তবে আশা-আকাংখা পূরণ হওয়ার জন্যে কতিপয় শর্তাবলী পূর্ন হওয়া আবশ্যক। শর্তাবলী যে পরিমাণে পাওয়া যাবে সে পরিমাণ সুফল পাওয়া

www.nagorikpathagar.org

যাবে। এ জন্যে প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তি এসব শর্তাবলী পূরণের জন্যে ক্রমাগতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

শর্তাবলী নিম্নরূপঃ

ক) নিবেদিত কর্মী

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে এটা। প্রতিষ্ঠান যদি প্রয়োজন মাফিক নিবেদিত কর্মী পেয়ে যায় তবে অন্যান্য শর্তাবলী সহজেই পূরণ হয়ে যায় এবং প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে পরিচালিত হতে পারে।

কর্মীদের নিম্নোক্ত গুণাবলী থাকা চাইঃ

* প্রতিষ্ঠান ও এর উদ্দেশ্যের সাথে গভীর সম্পর্ক এবং এর গঠন ও উন্নতির জন্যে নতুন পন্থা উদ্ভাবন ও বাধা বিপত্তি দূরীকরণে দৃঢ় সংকল্প থাকা।

* শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ দানের যোগ্যতা।

* নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাদান কলাকৌশল বৃদ্ধির চিন্তা থাকা।

* ছাত্রদের পুরো উপকার করার বাসনা।

* শিশুদের সাথে স্বভাবগত সম্পর্ক ও স্নেহ-মমতার অভিলাস।

* প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও সময় মেনে চলা।

* ছাত্রদের সম্মুখে উন্নত চরিত্র ও অনুকরণীয় কার্যাবলী প্রদর্শন করা।

* সহকর্মীদের দায়িত্ব আনজামদানে সহযোগিতার হাত বাড়ানো এবং টীম ওয়ার্কের যোগ্যতা।

* দায়িত্বানুভূতি ও গভীর মনোযোগ সহকারে নিজের দায়িত্ব পালনের প্রচেষ্টা।

* ছাত্রদের পড়ালেখার উন্নতি এবং পরিবেশ সংশোধনে অভিভাবকদের সহযোগিতা অর্জন করার পরিকল্পনা।

* মাদরাসার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা জনসমক্ষে তুলে ধরার যোগ্যতা।

* অন্যকে অগ্রাধিকার দান, অল্পে তুষ্টি- যা ছাড়া বর্তমান যুগে দ্বীনি শিক্ষার প্রচলন ও প্রসার অসম্ভব না হলেও কঠিন।

www.nagorikpathagar.org

খ) সুস্পষ্ট ও নির্দিশ উদ্দেশ্য

প্রতিষ্ঠানের মৌলিক উদ্দেশ্য কেবল নির্দিষ্ট হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক এবং জনসাধারণের নিকট তা অত্যন্ত পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন। তবেই সমস্ত ব্যবস্থাপনা তারই ভিত্তিতে বিরচিত হবে এবং কর্মীবৃন্দ তা অনুসরণ করেই কাজ করবেন। পর্যবেক্ষকরা সেই একই মাপকাঠিতে তা বিচার করে দেখতে পারবে। আর সকলের সামগ্রিক প্রচেষ্টা একই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে ব্যয়িত হতে পারবে। উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট না থাকলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করবেন। প্রচেষ্টা বহুমুখী হয়ে থাকে অনেক সময় তা বিপরীত মুখীও হয়ে থাকে। এমনি টানাহেঁচড়ায় প্রকৃত উদ্দেশ্যই চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে থাকে। প্রকাশ থাকে যে উদ্দেশ্য বিহীন প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সময় ও শক্তি দুটোই নিষ্ফল অহেতুক ব্যয় করা ছাড়া আর কি পাওয়া যায়।

গ) জনসাধারণের সহযোগিতা

প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যে এটা হচ্ছে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এটা ছাড়া একটা দ্বীনি মাদরাসা তো দূরের কথা একটা সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও চলতে পারে না। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পেছনে তো স্বয়ং রাষ্ট্রের উপায়-উপকরণ নিয়োজিত থাকে, বাধ্যবাধকতা ও উৎসাহের হাতিয়ারও থাকে, সর্বোপরি ছাত্রদের ভবিষ্যত উন্নতি এর সাথে জড়িত থাকে। পক্ষান্তরে দ্বীনি মাদরাসাসমূহ কেবল এসব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিতই নয় বরং বিভিন্ন বাধাবিপত্তিতে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে থাকে। এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে এসব প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের আর্থিক আনুকূল্য ছাড়া চলতেও পারে না। কারণ জনসাধারণই প্রতিষ্ঠানে ছাত্র দেবে, তাদেরই প্রচেষ্টায় চাঁদা সংগৃহীত হবে, তাদেরই প্রভাবে বাধাবিপত্তি কেটে উঠবে, তাদের সহযোগিতা ছাড়া প্রাতিষ্ঠান কিভাবে চলতে পারে?

www.nagorikpathagar.org

জনসধারণ তো কেবল সেসব প্রতিষ্ঠানের দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকে এবং সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে থাকে, যেগুলোতে তাদের কোন স্বার্থ থাকে আর তারা অশেষ পরিশ্রম করে নিজের প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণকামীতা প্রমাণিত করে।

জনসাধারণের সমর্থন আদায়ের জন্যে প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের নিম্নোক্ত গুণাবলী থাকা আবশ্যকঃ

তারা চরিত্রবান ও মিশুক হবে।

* জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অধিকতর সুযোগ বের করবে।

* প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচীতে তাদের আমন্ত্রণ জানাবে।

* এলাকার উন্নতি ও কল্যাণ, দ্বীনি, সামাজিক ও নৈতিক সংশোধন এবং সামাজিক সেবামুলক কাজে পূর্ণ আন্তরিকতা প্রদর্শন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের পথ প্রদর্শন ও সাহায্য করা।

* দলাদলির যে অভিশাপ আমাদের সমাজে শিকড় গেড়ে বসেছে, তা থেকে কেবল দূরে থাকাই যথেষ্ট নয় বরং এই অভিশাপ থেকে মুক্তির পুরো চেষ্টা করবে।

* জনসাধারণকে সর্বদা পরস্পরকে ভাল ও সৎ কাজে সহযোগিতা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকবে এবং মন্দ কাজ বা খারাপ কথায় পরস্পরকে যেন সহযোগিতা না করে।

* দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব এবং এ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা ক্রমাগতভাবে জনসাধারণকে বুঝাতে হবে।

* দ্বীনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মতভেদ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কেবল মৌলিক ও বুনিয়াদী বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবে এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান প্রিয় ব্যক্তির সহযোগিতা হাসিলের চেষ্টা করবে।

* প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রটানো বা রটিত ভুল বুঝাবুঝি ও খারাপ ধারণা বিদূরিত করার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে যথা সময়ে মিলিত হয়ে সবিনয়ভাবে বুঝিয়ে দেবে। অভিযোগসমূহ হাসি মুখে শ্রবন করবে এবং তা দূরীকরণের চিন্তা ভাবনা করবে।

www.nagorikpathagar.org

ঘ) উপযুক্ত ভবন নির্মাণ

বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন থাকা একটা বিশেষ শর্ত। ঘর পাকা হওয়া বা সুউচ্চ হওয়া আবশ্যকীয় নয়। সাধারণ একটা ঘরও অনেক সময় অনেক কাজে আসে। যদিঃ

* স্থান, অবস্থান যথোপযুক্ত হয় এবং পরিবেশ হয় পূর্ণ নিরবতাময়।
* স্থান নির্বাচন এবং ঘর নির্মাণের সময় মৌসুমের প্রতি লক্ষ্য রাখা যায়।
* আলো বাতাস যথেষ্ট পরিমাণে চলাচল করে।
* প্রতিটি দরজা জানালার জন্যে আবশ্যকীয় পরিসর থাকে।
* পানি ও পেশাব পায়খানার যথাযথ ব্যবস্থা থাকে।
* পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা হয়।

ঙ) প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি

প্রতিষ্ঠানের সফলতার জন্যে নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি বিশেষ প্রয়োজন।

* যথোপযুক্ত পাঠ্য বই, এগুলো নির্বাচনে সাবধানতা ও যথা সময়ে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা।

* লেখার কাজ অথবা গঠনমূলক কর্মসূচীর জন্যে ছাত্রদের কাছে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যেমন- কলম, দোয়াত, পেন্সিল, বোর্ড, শ্লেট, খাতাপত্র, জ্যামিতি বক্স, রঙতুলি ইত্যাদি।

* ছাত্র শিক্ষকদের বসার জন্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কার্পেট, চট, সতরঞ্জী, বেঞ্চ, ডেস্ক, চেয়ার ইত্যাদি।

* ব্লাকবোর্ড, চক, মানচিত্র, গ্লোব, ছবি, তালিকা, মডেল ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয় আসবাব ইত্যাদি।

* ছাত্র শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় লাইব্রেরী, বইপত্র, পাঠাগারের বই ও পত্র পত্রিকা।

* নেছাব বহির্ভূত কার্যাবলী, সখ ও গঠনমূলক যোগ্যতা সৃষ্টির জন্যে দরকারী উপাদান।

www.nagorikpathagar.org

চ) খেলার মাঠ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বা নিকটে

* এসেম্বলী সভা এবং খেলাধূলার জন্যে সমতল মাঠ থাকবে।

* ফুল, তরুলতা ও তরকারী ইত্যাদির ব্যবস্থা।

* ছোট শিশুদের খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার কোন পরিকল্পনা গ্রহণের জন্যে নির্ধারিত স্থান।

ছ) নিয়ম শৃংখলা

বিদ্যালয়ের নিয়ম-নীতি হবে উত্তম

* আভ্যন্তরীণ পরিবেশ শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার উপযোগী হবে।

* শিক্ষকদের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে মধুর। তারা একে অপরকে বিশেষ করে প্রধান শিক্ষকের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবে।

* ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক হবে মধুর।

* বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে সবাই অংশ গ্রহণ করবে।

* ছাত্রদের শাস্তিদানের অথবা কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার অবস্থা যেন কমই সৃষ্টি হয়।

* ছাত্র শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের নিয়ম-নীতি এবং প্রধান শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে।

* হাজিরা ও সময়ের অনুসরণ করবে কঠোরভাবে।

* ক্লাস, খেলার মাঠ অথবা বোর্ডিং-এ ছাত্ররা বিভিন্ন খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং নৈতিক অবক্ষয় থেকে হেফাজত থাকবে।

* বিভিন্ন স্থানের আদব পুরো মেনে চলবে।

* নিয়ম শৃংখলায় মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়ার জন্যে তাদের পরামর্শের প্রতি যথাসম্ভব গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি না করে মানুষের সাথে সহজ সরল ব্যবহার প্রদর্শনের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখবে।

www.nagorikpathagar.org

* ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে সহনশীলতা সৃষ্টির ও সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করবে, যেন বাইরের প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজন দেখা না দেয়।

এসব হচ্ছে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সফলতার অপরিহার্য শর্তাবলী। অবশ্য এর মানে এ নয় যে এসব শর্তাবলী পুরোপুরি না পাওয়া গেলে কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। অথবা প্রথম থেকে প্রতিষ্ঠিত থাকলে তার সফলতা সম্পর্কে নিরাশ হতে হবে; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দ ও অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ওসব শর্তাবলী পূরণের প্রচেষ্টা চালাবেন এবং অবাস্তব আশা পোষণ করে তা বাস্তবায়িত হতে না দেখে হতাশার শিকার হয়ে না পড়ে। কর্মী যদি যোগ্যতা সম্পন্ন হয় এবং কাজের পূর্ণ নকশা পরিকল্পনা সামনে রেখে কাজ করে তাহলে ক্রমাগত সমস্যাবলীর সমাধান করতে পারবে এবং প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যজনকভাবে চালানোর জরুরী শর্তাবলীও পূর্ণ হতে পারে। উপকরণের স্বল্পতার কারণে উদ্যোগ থেমে যায় না। স্বীয় চেষ্টা সাধনা ও ঐকান্তিকতার সাহায্যে যোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারলে আল্লাহ্ তা'য়ালা নিরাশ করেন না, তার ভান্ডার অফুরন্ত।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষকের গুণাবলী

শিক্ষকের মর্যাদা অতি উচ্চে। তিনি ছাত্রদের আত্মীক পিতা ও জাতি গঠনের কারিগর। ভবিষ্যত বংশধরদের চরিত্র গঠন তাঁরই দায়িত্ব। ভবিষ্যতের নাগরিকের ভাঙাগড়া অনেকাংশেই তার প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। সুতরাং উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বানুযায়ী তাকে উচ্চ গুণাবলীর অধিকারী হওয়া চাই।

একজন শিক্ষককে যেমন ছাত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয় তেমনি রাখতে হয় ছাত্রের অভিভাকের সাথেও। তাকে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলদের সাথে যেমন যোগাযোগ রাখতে হয়, তেমনি রাখতে হয় জনসাধারণের সাথে। এদের সবাই একজন শিক্ষকের মধ্যে অপরিহার্য কিছু গুণাবলী খোঁজ করেন। শিক্ষক নিজের মধ্যে উক্ত গুণাবলী সৃষ্টির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। তাতে তিনি নিজের দায়িত্ব যথাযথ আনজাম দিতে সক্ষম হবেন এবং ওসব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন।

ক) ছাত্রদের দৃষ্টিতে

শিক্ষককে কেমন হতে হবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন যোগ্যতা ও অনুরাগ সম্পন্ন ছাত্রদের মতামতের সার সংক্ষেপ নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো। এথেকে ধারণা করুন যে একজন ভাল শিক্ষক নির্বাচনে স্বয়ং ছাত্র সমাজ কেমন উৎকৃষ্ট কষ্টি সংগ্রহ করেছে।

* জাতির নির্মাতা হিসেবে একজন শিক্ষককে সর্বোচ্চ চরিত্র ও কর্মের অধিকারী হতে হবে যেন ছাত্রদের উপর তাঁর ব্যক্তিত্বের ভাল প্রভাব পড়ে।

* তাঁর পোষাক পরিচ্ছদের ধরণ প্রকৃতি সাদাসিদে হওয়ার সাথে সাথে পবিত্র ও রুচীশীল হওয়া চাই। ফ্যাশন, অনুকরণ, দার্শনিক বেপরোয়া ভাব একজন শিক্ষকের জন্যে শোভা পায় না।

* ছাত্রদের সাথে আচার আচরণ ও ব্যবহারে ন্যায় ও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কারো সাথে বাড়াবাড়ি অথবা কাকেও অগ্রাধিকার প্রদান করবেন

www.nagorikpathagar.org

না। সবাইকে সমান চোখে দেখবেন।

* শাস্তি প্রদানে সতর্ক হতে হবে। ক্রোধ ও কঠোরতা, ধমক ও চেচামেচি এবং বকাবকি করে কাজ আদায় করার পরিবর্তে ছাত্রদের আগ্রহ ও আত্মসম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন এবং শান্ত মনে তাদের সমস্যা বুঝে নিয়ে তার সমাধান দেয়ার চেষ্টা করবেন।

* পরিশ্রম করে শিক্ষা দেবেন এবং ছাত্রদের থেকেও পরিশ্রমের মাধ্যমে পাঠ আদায় করবেন। তবে পাশাপাশি খেলাধূলারও সুযোগ দেবেন এবং তার ব্যবস্থা করবেন।

* বাড়ীর কাজ দেবেন তবে অনেক বেশী বোঝা চাপাবেন না।

* বাড়ীর কাজ এবং অন্যান্য লেখার কাজগুলো যথা সময়ে পরীক্ষা করে দেখবেন। সংশোধন করে কপিগুলো সত্বর ফেরত দেবেন। অন্যথা ছাত্রদের মাঝে অলসতা জন্ম নেবে।

* শিক্ষাদানের সময় ছাত্রদের রুচী ও মানসিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন, এক ঘেঁয়েমী সৃষ্টি হতে দেবেন না।

* ক্লাশের প্রত্যেক শিশুর অভ্যাস ও আচরণের পরিচয় জানবেন এবং পুরো ক্লাসের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

* খুব পড়ালেখাকারী ও যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। পাঠ ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হতে হবে।

* ছাত্রদের প্রশ্নোথাপনে ও জিজ্ঞাসাবাদে রাগান্বিত হওয়ার অথবা বিরক্তি প্রকাশের পরিবর্তে হাসি মুখে উত্তর দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবেন।

* আন্তরিকতার সাথে শিক্ষা দেবেন, কেবল ডিউটি পালন করবেন না।

* চরিত্রবান, মিশুক, ভাল স্বভাব ও নম্র তবিয়তের হবেন।

* সরল-সহজ ভাষায় চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে কথা বুঝিয়ে বলার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।

* পূর্ব পাঠ পুনরালোচনা করে ভালভাবে মুখস্থ করিয়ে দেবেন।

* কঠোরতার সাথে শিক্ষা দেবেন সত্য, তবে মাঝে মাঝে মন হাল্কা করে কথাবার্তা বলারও সুযোগ দেবেন।

* বলার ধরণ হবে মধুর। তিক্ত কথাবার্তা সহ্য করবেন। কিছুতেই ঝগড়া প্রিয় হবেন না।

* নম্বর দানে হবেন উদার।

www.nagorikpathagar.org

* নিজের শ্রেণীর সুনাম বৃদ্ধির চেষ্টা করবেন।

* ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তা বুঝবেন এবং তা পূরণের চেষ্টা করবেন। নিঃস্ব ছাত্রদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন।

* মাঝে মধ্যে ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষা সফরে বের হবেন এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখাবেন।

* ছাত্রদের এমন ধরণের উপদেশ দেবেন যাতে তাদের মাঝে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

* ছাত্রদেরকে বিপদাপদে ধৈর্য্য ধারণের শিক্ষা দেবেন এবং বিপদে তাদের সাহায্য করবেন।

* ছাত্রদের সাধারণ মতামত নিজের অনুকূলে সৃষ্টি করবেন। কখনো নিজের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির অবকাশ দেবেন না।

এ হচ্ছে এমন সব গুণাবলী যা একজন শিক্ষকের মধ্যে থাকা ছাত্রদের কাম্য। ঐসব নিস্পাপ শিশুদের কোন দাবী ইনসাফ পরিপন্থী? এ সবের কোন একটিকে বাদ দিয়ে আমরা কি সফল শিক্ষক হতে পারব?

খ) অভিভাবকদের দৃষ্টিতে

শিশুদের অভিভাবকগণ শিক্ষকদের মধ্যে নিম্নের গুণাবলী দেখতে পায়ঃ

* চরিত্রবান ও মিশুক হবেন, তাদের সাথে খোলা মনে মেলামেশা করবে।

* তাঁদের শিশুদের প্রতি যতটুকু সম্ভব ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টি দেবেন।

* শিশুদের শিক্ষাগত ও নৈতিক উন্নতি সম্পর্কে অভিভাবকদের অবহিত করবেন।

* তাঁদের (অভিভাবকদের) সাথে সুসম্পর্ক রাখবেন এবং তাঁদের শিশুদের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

* তাঁদের প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁদের সমালোচনা হাসি মুখে শুনবেন।

* তাঁদের সন্তানাদির সাথে স্নেহ-মমতা প্রদর্শন ও তাঁদের মাতাপিতার খেদমত ও আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন।

* তাঁদের সন্তানাদির সামনে তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের দোষ ত্রুটি বর্ণনা করবেন না।

www.nagorikpathagar.org

* তাঁদের (সন্তানদের) শিক্ষা ও আচার আচরণের উপর নিজেদের চেষ্টা সাধনার ফলাফল তাঁদেরকে বুঝিয়ে দেবেন।

* তাঁদের কাছে তাঁদের সন্তানাদির দোষত্রুটি বর্ণনা করার ব্যাপারে বুদ্ধিমত্তা ও সাবধানতা অবলম্বন করবেন।

* তাঁদের সন্তানাদির শিক্ষাদীক্ষা ও সংশোধন করবেন এবং তাদের ভবিষ্যত উন্নতির ব্যাপারে নিজেও পুরো আশ্বস্ত থাকবেন এবং তাঁদেরকেও নিরাশ হতে দেবেন না।

গ) দায়িত্বশীলদের দৃষ্টিতে

প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণ শিক্ষকদের মাঝে নিম্নের গুণাবলী কামনা করেন।

* নিজ নিজ পদ ও দায়িত্বের উপযুক্ত হওয়া।

* দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। নিজের দায়িত্বাবলী ভালভাবে বুঝে নিয়ে কৌশলে ও যথাযথভাবে তা আনজাম দেয়া।

* প্রতিষ্ঠানের শুভাকাংখী হওয়া এবং এর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা বা বহাল রাখার জন্যে দায়িত্ব পালনে অধিক পরিমাণে তৎপর হওয়া।

* তিনি ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা বোধ সম্পন্ন হবেন। অল্পে তুষ্ট হবেন। অধিকার আদায়ে কঠোর অথবা লোভী হবেন না।

* মিলেমিশে কাজ করার যোগ্যতা থাকতে হবে এবং সহকর্মী ও দায়িত্বশীলদের পুরো সহযোগিতা করবেন।

* নির্দেশনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় ও স্বাগ্রহে কাজ করবেন।

* সমালোচনা হাসি মুখে বরণ করবেন এবং নিজ নিজ অবস্থা সংশোধনের প্রতি মনোনিবেশ করবেন।

* প্রতিষ্ঠানের বিধিবিধান ও সময়ের প্রতি নিজেও অনুগত হবেন এবং ছাত্রদেরও অনুগত করাবেন।

* যথাযথ মনোনিবেশ সহকারে নিজের কাজ সমাধা করবেন এবং দায়িত্বকে বোঝা মনে করবেন না।

* নিজের যোগ্যতা ও কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধিতে তৎপর হবেন এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্যে নূন্যতম যোগ্যতা অর্জন করার জন্যে চিন্তা ভাবনা করবেন।

www.nagorikpathagar.org

ঘ) জনসাধারণের দৃষ্টিতে

* চরিত্রবান ও মিশুক হবেন।

* তাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যে আন্তরিকতা পোষণ করেন।

* সমাজ গঠনে সচেষ্ট থাকেন এবং এ প্রসংগে তাদের সহযোগিতা ও পথ প্রদর্শন করেন।

* তাদের পারস্পরিক কলহ নিরসনের জন্যে পক্ষপাত শূন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে মীমাংসায় পৌছার চিন্তা করেন।

* প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁদের অংশ গ্রহণের জন্যে আহবান জানান।

* মাঝে মাঝে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের দিয়ে সাধারণ সভার আয়োজন করেন এবং জনসাধারণকে তাঁদের সাথে মিলেমিশে থাকার সুযোগ করে দেন।

* তাঁদের অভিযোগ ও সমালোচনা হাসি মুখে শ্রবণ করেন এবং ঠান্ডা মনে তাঁদের পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা চালান।

ঙ) শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে

উপরোক্ত কারণে বিশেষজ্ঞরা একজন শিক্ষকের মাঝে নিম্নোক্ত গুনাবলী থাকা আবশ্যকীয় মনে করে থাকেঃ

* উন্নত চরিত্র ও কার্যাবলী এবং উন্নত মানের শিক্ষাদান।

* শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষন উপযুক্ততা।

* শিশুদের মানসিকতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা।

* স্বাস্থ্য ও সবলতা।

* ধৈর্য ও গাম্ভীর্য, অবস্থা অনুধাবন করা এবং মীমাংসা জ্ঞান।

www.nagorikpathagar.org

* শিশুদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক।
* শিক্ষকতার পেশায় স্বভাবগত সম্পর্ক।
* শিক্ষাদান সুলভ অধ্যয়ন রুচী।
* বিধি-বিধান ও শৃংখলা বিধানের যোগ্যতা
* সদালাপ ও প্রভাবশালী বক্তব্য দান ক্ষমতা।
* ইখ্লাস ও ভালবাসা।
* সহমর্মিতা ও সমবেদনা এবং সংশোধন স্পৃহা।
* আনন্দময় স্বভাব ও মিশুক মনোভাব।

এ হচ্ছে এমন সব গুনাবলী যেগুলো প্রত্যেক শিক্ষকের মধ্যে সৃষ্টির চেষ্টা থাকা চাই। কেননা, এগুলো ছাড়া শিক্ষাদানের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ কখনো ফলপ্রসূ হতে পারে না।

বাকী দ্বীনি মাদ্রাসা সমূহের শিক্ষকদের মধ্যে এগুলো ছাড়াও কতিপয় অতিরিক্ত গুণাবলী আবশ্যকীয়। যেমনঃ

* আকীদা-বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনে সৎ হওয়া।
* ইসলামী জ্ঞানে যোগ্য হওয়ার সাথে সাথে আকীদা-বিশ্বাসে সঠিক মুসলমান হওয়া।
* ইসলামী আহ্কামের অনুসারী এবং চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হওয়া।
* বাতিল মতবাদে ভীত, সন্ত্রস্ত ও পরাজিত মনোভাবের না হওয়া।
* শিক্ষার ও কাজের জালে আট্কে না পড়া।
* অল্পে তুষ্ট ও অন্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। মর্যাদা ও সম্পদের লোভী না হওয়া।
* নিজের পরিবার-পরিজনকে শরীয়তের অনুগামী করে তৈরী করা।

উপরোক্ত গুনাবলী অর্জন ব্যতিরেকে দ্বীনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হবে না।

www.nagorikpathagar.org

প্রধান শিক্ষক ও তাঁর দায়িত্ব

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের উদাহরণ হলো দেহের জন্যে মস্তিষ্ক এবং গাড়ীর চালকের মত। প্রতিষ্ঠান পরিচালনার যুক্তিসংগত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরাসরি তাঁর উপর ন্যস্ত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য, ব্যর্থতা এবং উন্নতি-অবনতি অনেকাংশে তাঁরই উপর নির্ভর করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণ, শিক্ষকমন্ডলী, ছাত্রবৃন্দ, ছাত্রদের অভিভাবকবৃন্দ এবং জন সাধারণকে প্রশান্ত রাখা, তাদের সহযোগিতা নেয়া তাঁরই দায়িত্বে অর্পিত। বিদ্যালয়ের মান, পরিস্থিতি, ব্যবস্থাপনা তাঁরই উপর নির্ভরশীল। প্রকাশ থাকে যে, এত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বাবলী আদায়ে এবং সেই পদের যথাযোগ্য হওয়ার জন্যে প্রধান শিক্ষকের নিম্নলিখিত গুনাবলী থাকা চাইঃ

গুনাবলী

* উন্নত চরিত্র ও কার্যাবলী।
* অসাধারণ দায়িত্বানুভূতি।
* দায়িত্ব জ্ঞান, ধারাবাহিকতা, নিমগ্নতা ও মনোনিবেশ সহকারে নিজে কাজ করা ও অন্যের মধ্যে সেই স্পৃহা সৃষ্টির চিন্তা করা।
* লোক চেনা।
* পরিস্থিতি অনুধাবন ও সমাধান যোগ্যতা।
* ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা।
* সদাচরণ ও মিশুকতা।
* ধৈর্য ও স্থিরতা।
* প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেয়ার ধারণা।
* পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি।

www.nagorikpathagar.org

* হাসি মুখে সমালোচনা বরদাশত করা, অভিযোগকারীদের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান এবং জনসাধারণের পরামর্শ ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখার যোগ্যতা।

* শিক্ষাগত দক্ষতা, প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতা এবং ব্যাপক অধ্যয়ন ও ভ্রমণ কার্যে আগ্রহী।

* সহযোগিতা করা ও সহযোগিতা পাওয়ার কৌশল জানা।

* আত্মবিশ্বাস, অন্যদের মাঝে বিশ্বাস সৃষ্টি এবং সকলের বিশ্বাস কুড়ানোর যোগ্যতা।

* পক্ষপাতশূন্যতা, গোঁড়ামিহীনতা এবং দলাদলী ত্যাগ। আর হক ও ইনসাফের প্রতি গুরুত্ব প্রদান।

* বিধি-বিধানের কঠোর অনুসরণ এবং অন্যান্যদের অনুসারী করার প্রচেষ্টা।

দায়িত্বাবলী

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যাবলী অত্যন্ত ব্যাপক ও বিভিন্ন ধরনের। বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকার কাজের তত্বাবধান এবং সে জন্যে তাঁকেই জবাবদিহি করতে হয়। তাঁর দায়িত্ব থাকে প্রচুর। নিম্নে বিভিন্ন শিরোনামে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বাবলীর উল্লেখ করা হলোঃ

ক) নিয়ম শৃংখলা

বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজে বিস্তৃতি সাধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, মেরামত ও সৌন্দর্যকরণ নিজের দায়িত্বে আন্জাম দেয়া অথবা সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

* আসবাবপত্র, ব্লাকবোর্ড, বসার উপকরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা, মেরামত, সৌন্দর্যকরণ এবং রং করানো।

* সাধ্যমত প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণ। যেমন- মানচিত্র, গ্লোব, তালিকা, বিজ্ঞান ও কারিগরি উপকরণ, শিক্ষক মন্ডলীর জন্যে সহায়ক গ্রন্থাবলী ইত্যাদি যথাসময়ে সরবরাহ করা।

* বিভিন্ন খেলাধূলার সরঞ্জামাদি যোগাড় করা।

* সহকর্মীদের এবং তাঁদের কাজে প্রয়োজনীয় অবকাশের ব্যবস্থা, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ইত্যাদি। এসব কাজ যথাসাধ্য বড় বড় বন্ধের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে আনজাম দেয়া চাই, যেন শিক্ষাদান কাজে ব্যঘাত সৃষ্টি না হয়।

* বার্ষিক কার্যাবলীর তালিকা তৈরী এবং ভবিষ্যৎ কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

* বয়স ও মেধানুসারে শিশুদের ভর্তি ও শ্রেণী বিন্যাস করা।

* ষ্টাফের বিভিন্ন ব্যক্তির যোগ্যতার আলোকে দায়িত্ব বন্টন এবং তা আনজাম দানের আবশ্যকীয় বিবরণ ও নির্দেশিকা প্রদান।

* কোর্সভূক্ত বিষয় ও কোর্স বর্হিভূত বিষয় ও কাজ এবং দৈহিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ এবং সময় তালিকা বা ক্লাস রুটিন তৈরী করা এবং প্রয়োজনে তাতে পরিবর্তন সাধন করা।

* ক্লাস সমূহের মনিটর, খেলার ক্যাপ্টেন, ছাত্র সংসদ ও অন্যান্য বহির্মূখী কার্যাবলীর জন্যে বিভিন্ন দায়িত্বশীল নির্বাচন বা মনোনয়নের ব্যবস্থা করা।

* স্কুল রেকর্ড (ভর্তি রেজিস্টার, টি, সি রেজিস্টার, ছাত্র হাজিরা খাতা, শিক্ষক হাজিরা খাতা, ষ্টক রেজিস্টার, পরিদর্শন খাতা, শিক্ষক মন্ডলীর ডায়েরী, ছাত্রদের প্রগ্রেস রিপোর্ট, হিসাব সংরক্ষণ খাতা ইত্যাদি) নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংরক্ষণ করানো।

খ) তত্বাবধান

বিদ্যালয়ে সংঘটিত বড় ছোট শিক্ষা সম্পর্কিত বা শিক্ষা বহির্ভূত প্রতিটি কাজের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের উপর ন্যস্ত। তাঁর কর্তব্য হলো প্রত্যেকটি কাজ যথাযথভাবে আনজাম পাচ্ছে কিনা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা। কোন ক্ষেত্রে কোন প্রকার দুর্বলতা দেখা দিলে তা যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাঁর দায়িত্ব। বিশেষ করেঃ

* উপস্থিতি ও সময়ানুবর্তিতার তত্বাবধান করাঃ প্রধান শিক্ষক সর্বদা লক্ষ্য রাখবেন যে যথাসময়ে ঘন্টা বাজানো হচ্ছে কিনা, ছাত্র-শিক্ষক যথারীতি উপস্থিত হচ্ছেন কিনা। যুক্তি সংগত কারণ ছাড়া অনুপস্থিতি ও বিলম্বে উপস্থিতি অবশ্যই সহ্য করা ঠিক নয়। আর অনুমতি ছাড়া শ্রেণী অথবা বিদ্যালয় থেকে বাইরে যেতে দেয়া উচিত নয়। হাজিরা খাতা রাখা চাই। যথাসময়ে উপস্থিত হতে হবে। ছুটির জন্যে যথাসাধ্য লিখিত অনুমতি গ্রহণের নিয়ম করা চাই।

* শিক্ষাদান তত্বাবধানঃ দৈনিক অন্ততঃ একবার হলেও ঘুরেফিরে দেখতে

www.nagorikpathagar.org

হবে যে লেখাপড়া যথাযথভাবে আন্তরিকতা সহকারে হচ্ছে কিনা। শ্রেণীর নিয়ম-নীতি সুচারুরূপে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা। ব্লাকবোর্ড ও শিক্ষা-উপকরণ যথারীতি ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা। ছাত্রদের বসার নিয়ম ঠিক আছে তো? মাঝে মাঝে ছাত্রদের খাতাপত্র নিয়ে দেখবে যে লেখায় সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় কিনা এবং খাতাগুলো ছাত্রদের যথাসময়ে ফেরতদান করা হয় কি? এমনিভাবে আর্ট ক্রাফটে শিশুদের কৃত কাজের হিসাব নিয়ে দেখবে। নতুন ও অনভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাজের অধিকতর তত্ত্বাবধান হওয়া চাই। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এসব কাজ শিক্ষকদের দোষত্রুটি ধরার মনোভাব নিয়ে যেন না হয়, বরং তা হবে শিক্ষকদের সমস্যার সমাধানের জন্যে, কাজকে অত্যধিক সুচারুরূপে আন্জাম দেয়ার পদ্ধতি শেখানোর জন্যে এবং গঠনমূলক ও আন্তরিকতা পূর্ণ সমালোচনা হওয়া চাই। ছাত্রদের সামনে শিক্ষকদের দোষত্রুটি অবশ্যই ধরা যাবে না। বরং নিজের চেম্বারে ডেকে এনে ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারে যথারীতি সুকৌশলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা চাই।

* প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানঃ ছাত্রদের অভ্যাস ও আচরণের উপর কড়া নজর রাখতে হবে এবং তাদের দ্বীনি, নৈতিক ও বাস্তব প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উপর যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পুরো তত্ত্বাবধান করতে হবে। ত্রুটি-বিচ্যুতি ও শৃংখলাহীন কাজের যথাসময়ে দেখাশুনা করা এবং তার সমাধানের সঠিক ব্যবস্থা নেয়া উচিত। শিক্ষক মন্ডলী ও অভিভাবকবৃন্দেরও এদিকে সরাসরি দৃষ্টি আকর্ষণ করা চাই। আর নিজেও সেদিকে সবিশেষ দৃষ্টি প্রদান করবেন। শিক্ষার সর্বোচ্চ মান প্রশিক্ষণের ত্রুটি-বিচ্যুতির নিরসন করতে পারে না। এজন্যে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কোন প্রকার দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়।

* অফিসিয়াল কার্যাবলীর তত্ত্বাবধানঃ রেজিস্টার পুরোপুরি সংরক্ষণ, আবেদনসমূহ বিবেচনা, পত্রাবলীর যথাসময়ে উত্তরদান, যথারীতি হিসাব রাখা, শিক্ষক মন্ডলী সম্পর্কিত মাসিক রিপোর্ট, ডায়েরী, হাজিরা খাতা, ছাত্রদের প্রগ্রেস রিপোর্ট পূরণ ইত্যাদির প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা।

* স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার তত্ত্বাবধানঃ ছাত্রদের শরীর ও পোষাক, মসজিদ, বিদ্যালয়ের কক্ষ, বারান্দা ও পার্শ্ব দেয়াল, পায়খানা, পেশাবখানা এবং নর্দমার পরিচ্ছন্নতার প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে।

* খেলাধূলার তত্ত্বাবধানঃ শিশুদের জন্যে খেলাধূলা অত্যন্ত জরুরী। শিশুদের বয়স ও দৈহিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের গ্রুপ করা হবে। বিভিন্ন প্রকারের

www.nagorikpathagar.org

খেলাধূলা, ড্রিল, পি, টি- ইত্যাদির যথারীতি ব্যবস্থা করা দরকার। খেলাধূলার প্রতি অনুরক্ত শিক্ষক মন্ডলীকে ঐসব গ্রুপের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে দেয়া যায়। প্রধান শিক্ষক নিজে দেখবেন যে খেলাধূলা যথারীতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিনা। প্রত্যেক গ্রুপ খেলার সুযোগ পাচ্ছে তো? আর তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত শিক্ষকও আন্তরিকতা সহকারে তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন কিনা? খেলাধূলায় মাঝে মাঝে নিজেও অংশ গ্রহণ করলে আগ্রহ্ বৃদ্ধি পায়। আরো লক্ষ্য রাখতে হবে যে খেলাধূলায় মিথ্যার আশ্রয় ও প্রতিযোগিতায় বিবাদ-বিসংবাদ দেখা না দেয়। শিশুদের বুঝিয়ে দিতে হবে ঈমানদারী হার-জিতের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আর হারজিত কোনটিকেই পারস্পরিক সম্পর্কের উর্ধে স্থান দেয়া ঠিক নয়। খেলাধূলা করতে হবে খেলোয়াড়দের দৃষ্টিভংগী নিয়ে।

* বোডিং-এর তত্ত্বাবধানঃ ছাত্রাবাসসমূহে ছাত্র দেয়ার উদ্দেশ্য হলো তাদের উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ ও লালন পালন করা। প্রধান শিক্ষককে দেখতে হবে যে শিশুদের নৈতিক ও বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদানের যুক্তিসংগত ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা। খাওয়ার সন্তোষজনক ব্যবস্থা আছে কিনা, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে কিনা। ছাত্রাবাস জীবনে সবচেয়ে বেশী অভিযোগ থাকে খাওয়ার ব্যাপারে। এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। খাওয়ার ব্যবস্থাপনায় যথাসম্ভব ছাত্রদের রুচী ও পরামর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার, যাতে তাদের মাঝে অসন্তোষ দেখা না দেয়। ছাত্রাবাসে প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোন কোন বিপথগামী ছেলের কারণে নৈতিক ত্রুটি সৃষ্টির আশংকা থাকে। এদিকে সবিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আবশ্যক। আরও লক্ষ্য রাখতে হবে যে ছাত্ররা ছাত্রাবাসের পরিচ্ছন্নতা, রান্না ঘরের ব্যবস্থা, রুগ্ন ছাত্রদের সেবা শুশ্রুষা, পানাহারের ব্যবস্থা, নামায কায়েমের ব্যবস্থা, পাঠকক্ষ ও শিশুদের জন্যে দোকান- ইত্যাদির ব্যবস্থা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আন্জাম দেবে। সরল জীবন যাপন ও পরিশ্রম এবং যাবতীয় কাজকর্ম স্বহস্তে করায় অভ্যস্ত হতে হবে। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাবলী ও সামাজিক নিয়মের অনুসারী হতে হবে। অবকাশের সময়ে তাদের সময় ব্যয়ের ও রুচীশীল ক্রিয়া কর্ম আন্জাম দানের ব্যবস্থা করবে।

* বিভিন্ন কার্যক্রম ও পরিকল্পনার তত্ত্বাবধানঃ শিশুদের প্রশিক্ষণমূলক ও বক্তৃতার অনুষ্ঠানমালা, কবিতার আসর, বিতর্কানুষ্ঠান, আলোচনা সভা, জনসেবা, শখের কার্যাবলী, পিকনিক, শিক্ষা সফর, বিখ্যাত লোকদের মারফত

www.nagorikpathagar.org

বক্তব্য পেশ, শিক্ষা সপ্তাহ এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি, প্রাথমিক চিকিৎসা সুযোগ, বিদ্যালয়ের দোকান, চিড়িয়াখানা, প্রদর্শনী ইত্যাদির যথাযোগ্য তত্বাবধান হওয়া আবশ্যক। তাহলে সমস্ত কাজ ভারসাম্য পূর্ণভাবে আনজাম পাবে।

* পাঠাগার ও গ্রন্থাগারের তত্বাবধানঃ পাঠাগারে প্রয়োজনীয় ও উপকারী সংবাদপত্র ও সাময়িকী রাখা চাই। এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ছাত্র-শিক্ষক তা হতে পুরোপুরি উপকৃত হতে পারেন। তেমনিভাবে গ্রন্থাগারকে বিভিন্ন বিষয়ের অতীব প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী দিয়ে সাজাতে হবে এবং ছাত্র-শিক্ষককে ফায়দা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত কার্যাবলীর দায়িত্বশীল তো বিভিন্ন শিক্ষক, মনিটর অথবা ছাত্রদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকবে, যারা স্বীয় দৃষ্টি ভংগীতে কাজ সম্পাদন করবে। কিন্তু তত্বাবধান সামগ্রিকভাবে প্রধান শিক্ষকের উপরই ন্যস্ত থাকবে। আবার তত্বাবধান মানে কেবল তাদের দোষত্রুটি ধরাই নয় বরং উপযুক্ত পরামর্শ দেয়া, সমাধান পেশ করা এবং নির্ভুল পথ প্রদর্শন করা।

গ) শিক্ষামূলক কার্যাবলী

প্রধান শিক্ষককে স্বাভাবিকভাবে কিছু কিছু শিক্ষাদান কাজের দায়িত্বও নিতে হবে। তবে শিক্ষাদানের একাজ কোন বিশেষ শ্রেণী পর্যন্ত নির্দিষ্ট থাকবে না, বরং বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকবে তাহলে অধিক সংখ্যক ছাত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন হবে। এভাবেই তিনি ছাত্রদের নৈতিক ও বাস্তব উন্নতি সরাসরি বুঝতে সক্ষম হবেন এবং বিভিন্ন সবক দেয়ার সময় বাস্তব নমুনা ও পেশ করতে পারবেন। তবে তাঁর এই শিক্ষাদান সপ্তাহে অনধিক আঠার/বিশ ঘন্টা হওয়া চাই, যেন তিনি অন্যান্য জরুরী দায়িত্ব পালনের এবং তা যথাযথভাবে দক্ষতার সাথে আনজাম দেয়ার সময় বের করতে পারেন।

ঘ) পরীক্ষাসমূহ, বিবেচনা, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা

ছাত্রদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক প্রচেষ্টার মূল্যায়নের জন্যে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্যে সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষা; ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা; ধর্মীয়,

www.nagorikpathagar.org

নৈতিক, সামাজিক ও বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সময়ের পর্যবেক্ষণ, বক্তৃতা অনুশীলনী, প্রবন্ধ পেশ, কবিতা আবৃত্তি, হস্তলেখা, আর্ট ক্রাফ্‌ট, খেলাধূলায় প্রতিযোগিতা, মানসিক পরীক্ষা এবং মাঝে মাঝে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলদের এবং অন্যান্য শিক্ষা বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। ঐসব পর্যবেক্ষণে নিম্নের বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখা চাইঃ

১) সর্বাবস্থায় ঈমানদারী ও বিশ্বস্ততাকে কার্যকর করতে হবে এবং ঈমানদারীকে বাহ্যিক সাফল্য বা ব্যর্থতার উর্ধে স্থান দিতে হবে।

২) নির্ভুল পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করতে হবে, নেক ধারণা পোষণ করা এবং খারাপ ধারণা করা ও পর্যবেক্ষকদের ব্যক্তিগত মতামত যথাসম্ভব কম কার্যকর করবে।

৩) তাঁদের জন্যে কপট ব্যবস্থাপনা করবে না, বরং এ ধরনের পর্যবেক্ষণ বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের স্বাভাবিক অংশ বলে মনে করতে হবে। অডিট পার্টি অথবা পর্যবেক্ষকদের ভুল ধারণা দান অথবা পরস্পরকে ভুল বুঝাবুঝিতে নিক্ষেপ করার জন্যে এ জাতীয় ব্যাপারে অনেকে যে বিশেষ ব্যবস্থা করে থাকে, তা এক ধরনের প্রতারণা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বয়ং প্রধান শিক্ষকের এবং স্টাফদের মর্যাদাহানীকর। এ জাতীয় কাজ থেকে সর্বদা বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

৪) পরীক্ষা ও যাচাই করার ফলাফল সম্পর্কে ছাত্রদের অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের দায়িত্বশীলদের সর্বদা অবহিত করতে হবে এবং অবস্থার প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্যে যথাযোগ্য সমাধান, ব্যবস্থা ও পরামর্শ দিতে হবে।

৫) ফলাফলের আলোকে স্টাফগণ নিজেদের প্রচেষ্টা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পদ্ধতিতে যুক্তিসংগত সংশোধন করবে এবং দুর্বলতা অপনোদনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করবে।

ঙ) সম্পর্ক স্থাপন ও সংরক্ষণ

নিজের দায়িত্ব পালনে প্রধান শিক্ষককে বিভিন্ন লোকের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়। আর সত্য কথা এই যে এটা কেবল তখনি সম্ভব যখন ঐসব লোকের সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করা যায়, যাদের সহযোগিতা গ্রহণ তাঁর জন্যে আবশ্যকীয় হয়। যেমনঃ

* শিক্ষকদের সাথে সম্পর্কঃ শিক্ষক মন্ডলীর সাথে সহানুভূতি ও

www.nagorikpathagar.org

ভালবাসার সম্পর্ক একান্ত প্রয়োজনীয়। এঁরাই প্রধান শিক্ষকের হাত-পা এবং এঁদেরই সহযোগিতায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের যাবতীয় কাজ আন্জাম দেয়া হয়। তাঁদের সন্তুষ্ট রাখা, তাঁদের পরামর্শ অনুসারে উপকৃত হওয়া, তাঁদের সমস্যাদির সমাধান করা এবং তাঁদের সাথে সদাচারণ ও ভালবাসা প্রদর্শন করা আবশ্যক। এ প্রসংগে তাঁদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ষ্টাফের বৈঠকের আয়োজন করা, অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাঁদের পরিকল্পনা তৈরী করানো এবং সর্ব প্রকার সম্ভাব্য সাহায্য ও পথ প্রদর্শন করা আবশ্যক। অবশ্য সদ্ব্যবহারের মানে এ নয় যে বিধি-বিধানে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হবে অথবা কাজে ফাঁকি, বেপরোয়া ভাব, আইনের অভাব, আপত্তিজনক কাজকর্মের সুযোগ দেয়া হবে। এসব কাজের জন্যে কঠোরতা আরোপ করা চাই এবং অবস্থার পূর্ণ সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে।

* ছাত্রদের সাথে সম্পর্কঃ. প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক ছাত্রের সাথে প্রধান শিক্ষকের সরাসরি সম্পর্ক রাখার চেষ্টা থাকা উচিত। কিন্তু সংখ্যা অত্যাধিক হয়ে থাকলে অন্ততঃ প্রত্যেক শ্রেণীর মনিটর, বিভিন্ন দলের নেতৃস্থানীয়, খেলার ক্যাপ্টেন, ছাত্র সংসদের সদস্যবৃন্দ প্রমুখের সাথে অবশ্যই সম্পর্ক রাখা চাই। এভাবে ছাত্রদের তৃপ্ত রাখতে এবং তাদের সাহায্য হাসিল করতে এবং তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দানের সুযোগ পাওয়া যাবে।

ছাত্রদের অভিভাবকবৃন্দের সাথে সম্পর্ক

সাক্ষাত, চিঠিপত্র আদান প্রদান, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে ছাত্রদের অভিভাবকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। এতে শিশুদের শিক্ষাদীক্ষায় তাদের সহযোগিতা পাওয়া যেতে পার।

সাক্ষাত হলে তাদের সাথে উত্তম স্বভাব প্রদর্শন করবে। তাদের সমালোচনাসমূহ হাস্যমুখে শ্রবণ করবে। তাদের সন্তানাদির শিক্ষাদীক্ষা এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্যে তাদের পরামর্শ চাইবে আর হৃদ্যতাসহকারে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবে।

অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলদের সাথে সম্পর্ক

আশপাশের অথবা নিকটবর্তী অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথেও সম্পর্ক সৃষ্টি করা উচিত। মাঝে মাঝে তাদের সেখানে গিয়ে তাদের কার্যাবলীর খতিয়ান

www.nagorikpathagar.org

নেয়া উচিত। তাদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ থেকে উপকৃত হওয়া চাই। তাদেরকে নিজ প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানাদিতে দাওয়াত করা চাই।

জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক

দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (মাদরাসার) জন্যে জনসাধারণের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। জননেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং মাদরাসার উন্নতির জন্যে তাদের সহযোগিতা গ্রহণের চেষ্টা করা চাই। জনসাধারণের সহযোগিতা তখনই পাওয়া যেতে পারে যখন প্রধান শিক্ষক স্থানীয় দলাদলির উর্ধে থাকবে এবং জনসাধারণের কল্যাণ ও সংশোধনের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বাবলী অত্যন্ত ব্যাপক ও বহুমুখী। আর তিনি নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে তখনই পালন করতে সক্ষম হবেন, যখন তিনি অত্যন্ত দায়িত্ব সচেতনতা, চটপটে ভাব, খোদাভীতি, উত্তম স্বভাব, ধৈর্য ও আত্মসচেতনতা সহকারে কাজ করবেন।

শ্রেণী শিক্ষক (ক্লাশ টিসার) ও তার দায়িত্ব

ছাত্রদের বয়স, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা অনুসারে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রায় ২৫/৩০ জন ছাত্র থাকে। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে একটি শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয় ও কার্যাবলীর দায়িত্ব বিভিন্ন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত থাকে। তবে প্রাথমিক শ্রেণীসমূহের জন্যে একই শিক্ষককে একাধিক বিষয়ে দায়িত্ব অর্পন করাই সমীচীন হয়ে থাকে। আর যে শিক্ষকের যে শ্রেণীতে অধিক ঘন্টা নিতে হয় তাঁকে ঐ শ্রেণীর শ্রেণী শিক্ষক (Class teacher) নির্ধারণ করা প্রয়োজন হয়। শ্রেণী শিক্ষকের অধিক বিষয়ের দায়িত্ব থাকায় তাঁর উপর শ্রেণী সংক্রান্ত নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ অর্পিত হয়ঃ

* নিয়মিতভাবে যথাসময়ে নিজের শ্রেণীর হাজিরা নেয়া।

* হাজিরা নেয়ার পর ছাত্রদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে আবশ্যকীয় হেদায়াত দেয়া এবং হেদায়াত অনুযায়ী কাজের খতিয়ান নেয়া।

* নিয়মিত যথাসময়ে হাজিরা দেয়ার জন্যে ছাত্রদের উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনে তাদের অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আনুগত্য করানো।

* অনুপস্থিতির যুক্তিসংগত কারণ অনুসন্ধানের জন্যে প্রয়োজনে

www.nagorikpathagar.org

অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।

* ছাত্র রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে সময় বের করে তাকে দেখতে যাওয়া এবং যথাসম্ভব তার জন্যে কিছু করা।

* ছাত্রদের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করা যে তারা যেন কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া অনুপস্থিত না থাকে। আর যদি অনুপস্থিত থাকার কোন যুক্তিসংগত কারণ দেখা দেয়, তাহলে পূর্বাহ্নেই আবেদন পেশ করবে। নিজে সরাসরি না পারলে কোন অভিভাবক অথবা অন্য কোন দায়িত্বশীলের মাধ্যমে অনুমতি গ্রহণ করবে।

* যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া অথবা অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে কঠোরতা সহকারে জিজ্ঞেস করে নেয়া এবং ভবিষ্যতে লক্ষ্য রাখার জন্যে তাদের অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

* ছাত্রদের দিয়ে শ্রেণীর আদব রক্ষা করানো, যেমনঃ

ক) সালাম করে প্রবেশ করা বা প্রস্থান করা।

খ) অনুমতি নিয়ে ক্লাস থেকে বের হওয়া।

গ) বিছানায় বসলে জুতা একদিকে সাজিয়ে রাখা।

ঘ) ক্লাসে হৈ চৈ করা, মারামারি করা বা গন্ডগোল করা থেকে বিরত থাকা।

ঙ) সালাম করে অনুমতি নিয়ে অন্যান্য ক্লাসে প্রবেশ করা।

চ) বিলম্বে আসলে অনুমতি নিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করা।

ছ) কথাবার্তায় আদব-কায়দা বজায় রাখা, সৌজন্যবোধ সহকারে জিজ্ঞাসা করা বা উত্তর দেয়া।

(মুচকি হেঁসে, চুলকানো অবস্থায়, মুখে বা নাকে আঙুল রেখে অথবা অশালীনভাবে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে বা উত্তর দিলে তার সংশোধন করে দেয়া)

জ) প্রশ্নোত্তর, কথোপকথন, আসবাব ভাগ করা এবং সাধারণ সামগ্রিক কাজে নিজের পালার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

ঝ) নিজের স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং নিজের আসবাবপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা।

ঞ) পরিষ্কার করার পর ময়লা আবর্জনা একটা টিনে অথবা টুকরীতে একত্র করে ডাস্টবিনে ফেলা।

ট) কাগজের টুকরো, ফলের খোসা, বীজ ইত্যাদি যেখানে সেখানে না

www.nagorikpathagar.org

ফেলে ডাস্টবিনে ফেলা।

ঠ) ক্লাসের মনিটর, খেলার ক্যাপ্টেন, পাড়ার পাহারাদার, সংগঠনের পদস্থ ব্যক্তিবর্গকে ভালকাজে ও কর্তব্য কর্মে পুরো সহযোগিতা করবে।

ড) ক্লাসের সুযোগ–সুবিধে, পরিচ্ছন্নতা, কল্যাণ ও উন্নতির জন্যে পরস্পর সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করা।

মাসে অন্ততঃ একবার

ক) ছাত্রদের শিক্ষার উপকরণ, বইপত্র, খাতা, জ্যামিতি বক্স, রং তুলির বাক্স, ক্রাফটের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির খতিয়ান নেয়া এবং এসবের সংরক্ষন করা, সাজানো ও পরিচ্ছন্নতা বিধানের আবশ্যকীয় হেদায়াত দেয়া।

খ) মওসুম অনুকূল হলে শিক্ষা সফর অথবা পিকনিকে নিয়ে যাওয়া। (পিকনিক অথবা শিক্ষা সফরে বাইরে যাওয়ার পূর্বে সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করা চাই। তাছাড়া প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের পর ছাত্রদের পৃথকভাবে অথবা গ্রুপ ভাগ করে দিয়ে যাবতীয় কাজ বন্টন করে দেবে। যথাসম্ভব সমস্ত কাজ নিজের তত্বাবধানে ছাত্রদের দায়িত্বে করিয়ে নেবে। এতে শিক্ষা সফর ও পিকনিক পুরোপুরি ফলপ্রসূ হতে পারে।)

গ) সাধারণ স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার খতিয়ান নেয়া এবং দেহ ও পোষাকের পরিচ্ছন্নতা, গোসল, ক্ষৌরকর্ম, নখ কাটানো ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় হেদায়াত দেয়া।

ঘ) ছাত্রদের সাপ্তাহিক সম্মেলনে প্রত্যোক শিশুকে মাসে অন্তত একবার প্রাকটিক্যালে অংশগ্রহণে অর্থাৎ বক্তৃতা দানে, গল্প কবিতা আবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ করা।

ঙ) প্রত্যোক শিশুর সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করে লেখাপড়া অথবা অভ্যাস আচরণ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

চ) উন্নতির খতিয়ান নিয়ে ফলাফল সম্পর্কে অভিভাবককে অবহিত করা।

* নিজের শ্রেণীর ছাত্রদের অভিভাবকদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা। মাঝে মাঝে অভিভাবকদের সাথে সাক্ষাত করে অথবা চিঠিপত্র দিয়ে শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে আবশ্যকীয় পরামর্শ দেয়া এবং তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা।

* ক্লাসের পরিচ্ছন্নতা, সম্মেলন, পিকনিক, শিক্ষা সফর, রচনা

www.nagorikpathagar.org

প্রতিযোগিতা, ক্লাসের প্রশান্তি, শিক্ষা সপ্তাহ, অথবা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উপলক্ষে সিলেবাস বহির্ভূত কাজের ব্যবস্থাপনায় ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্রের দক্ষতা অনুযায়ী দায়িত্ব বন্টন করে তাদের মধ্যে বহুমুখী যোগ্যতার সমন্বয় সাধন করা।

* ছাত্রদের সাপ্তাহিক সম্মেলন আবশ্যিক করে দেয়া এবং বিদ্যালয়ের মাসিক সম্মেলন অথবা বিদ্যালয়ের অন্যান্য অনুষ্ঠানে নিজের শ্রেণীর উপযোগী প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে শিশুদের প্রস্তুত করা। মাঝে মাঝে ক্লাসের সকল ছেলের সামষ্টিকভাবে খাওয়ার ব্যবস্থা করা।

* নিজের ক্লাসের সকল ছাত্রের দ্বীনি শিক্ষা সম্পর্কিত নৈতিক ও দৈহিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা, এ প্রসংগে প্রয়োজনীয় রেকর্ড রাখা এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দৃষ্টি আকর্ষণ করানো। তাছাড়া অবস্থার সংশোধনের জন্যে পুরোপুরি চেষ্টা করা।

* অপারগতা ও দুর্বলতা অপনোদনে সক্ষম হওয়ার ব্যাপারে ছাত্রদের মাঝে আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা ও অনুতাপ ইত্যাদি ভাবের উদ্রেক করা। (এটা ঠিক তখনি সম্ভব হতে পারে, যখন ছাত্রদের সাথে স্নেহ মমতা প্রদর্শন করা যাবে। তাদের আত্মমর্যাদার প্রতি পুরো লক্ষ্য রাখবে। শিক্ষা দীক্ষার কাজে, ধিক্কার দেয়া, ধমক দেয়া, কঠোরতা আরোপ করা অথবা দৈহিক শাস্তি প্রদান থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকবে এবং ভালবাসা, সহমর্মিতা এবং আন্তরিকতার অভ্যাস গড়ে তুলবে।)

* ক্লাসে অনুকরণীয় আদর্শ পেশ করা উচিত। (ছাত্রদের চরিত্র ও কাজের উপর সবচাইতে কার্যকর প্রভাব পড়ে শিক্ষকের নৈতিক ও আমলী জীবনের। শিক্ষকদের মধ্যেও বিশেষ করে শ্রেণী শিক্ষক ছাত্রদের নিজস্ব বলে অনুভব করে এবং তাদের কাজকর্মে তিনিও প্রভাবিত হন। তাদের সামনে যেসব দোষ-গুনের প্রদর্শনী করা হয় তারা চেতনে অচেতনে তারই অনুকরণ করে। যদি শিক্ষকের কথা ও কাজে মিল না থাকে, তাহলে ছাত্রদের চরিত্রে তা বেশ সংক্রামিত হয়ে থাকে। এ জন্যে শিক্ষকের উচিত সর্বোত্তম আদর্শ পেশ করা। বিশেষতঃ মূলনীতি, বিধি-বিধান অনুসরণ, সময়ের অনুকরণ, ভদ্রজনোচিত আলাপ, ইসলামী চালচলন, ভাল স্বভাব, সহানুভূতি, অগ্রাধিকার প্রদান, সহযোগিতা দান এবং কর্তব্য পালনে ভালবাসা ও আন্তরিকতা ইত্যাদির ব্যাপারে।)

* হাজিরা খাতা, ডায়েরী, অগ্রগতি তালিকা এবং শ্রেণীর অন্যান্য রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

www.nagorikpathagar.org

বিষয় শিক্ষক (Subject Teacher) ও তাঁর দায়িত্বসমূহ

প্রত্যেক শিক্ষককে একটা নির্দিষ্ট বিষয় বা কয়েকটি বিষয় পড়াতে হয়। বিষয় শিক্ষক হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষককে নিম্নোক্ত কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

* ঘন্টা আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে ক্লাসে প্রবেশ করা এবং ঘন্টা শেষ হওয়া মাত্রই অন্য শিক্ষকের জন্যে সিট খালি করে দেয়া।

* সালাম দিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করা এবং সালাম দিয়ে ক্লাস থেকে প্রস্থান করা।

* ক্লাসে প্রবেশ করার সাথে সাথে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর হালকা দৃষ্টি প্রদান করা এবং শিক্ষাদান শুরু করার পূর্বে যথাসাধ্য উপযোগী শোভনীয় কাজকর্ম করা।

ক) শিশুদের জুতা একপাশে চিহ্ন দিয়ে রেখে দেবে। (অবশ্য এ নিয়ম তখন প্রযোজ্য হবে যখন শিশুরা কার্পেটে বসে)

খ) ক্লাস থাকবে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন এবং সমস্ত জিনিসপত্র রাখবে সাজিয়ে গুছিয়ে।

গ) সকল ছাত্র উপস্থিত আছে কিনা? না থাকলে তার কারণ?

ঘ) ব্লাকবোর্ড পরিষ্কার আছে কি?

ঙ) ছাত্রদের শিক্ষা উপকরণ (সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাইরে) এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে কি?

চ) ছাত্ররা অপ্রয়োজনীয় কাজে রত আছে কি?

ছ) চক, ডাস্টার, ব্যাখ্যার উপকরণাদি (তালিকা, ম্যাপ, গ্লোব ইত্যাদি) মওজুদ আছে কি?

www.nagorikpathagar.org

* সংক্ষিপ্ত উপযোগী ভূমিকা দিয়ে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষাদান আরম্ভ করবেন।

* নতুন পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে সংক্ষেপে পুরানো পাঠের পুনরালোচনা করবেন।

* শিক্ষাদান কাজ সর্বদা মধ্যম মেধার ছাত্রদের উপযোগী করে আন্‌জাম দেবেন। (ক্লাসে এদের সংখ্যা প্রায় অর্ধেকেরও বেশী থাকে। অবশ্য অসাধারণ ধী-শক্তির ছাত্র অথবা একেবারেই মেধাহীন ছাত্রদের প্রতিও লক্ষ্য রাখা চাই। বরং তাদেরকে নিজ নিজ গতির উর্ধে পৌঁছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবেন এবং প্রয়োজনমত অগ্রগতির সুযোগ দেবেন। দুর্বল ছাত্ররা অধিক যত্নের অধিকারী। তাদেরকে সাথে নিয়ে চলতে হবে।

* শিক্ষাদান করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

ক) বর্ণনা ভংগী সাধারণের বোধগম্য ও আকর্ষণীয় হওয়া।

খ) শিক্ষাদান কাজে শিক্ষকের নিজের আকর্ষণ থাকবে অধিক। তিনি বেশ আগ্রহ্ ও তৃপ্তি প্রদর্শন করবেন।

গ) মাঝে মাঝে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নেবেন ছাত্ররা ভালভাবে বুঝছে কিনা?

ঘ) ছাত্রদের বসার নিয়ম, দাঁড়ানোর অবস্থা, বই ধরার পদ্ধতি, বই ও চোখের মধ্যকার দূরত্ব যুক্তিসংগত কিনা?

ঙ) পাঠ অগ্রসরে ছাত্রদের মাঝে বাস্তব আগ্রহ্ আছে কি?

চ) পুরো ক্লাস কি মনোযোগী? কোন ছাত্র অন্যমনষ্ক নেই তো?

ছ) ব্লাকবোর্ডের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কি? পাঠ বিশ্লেষণের জন্যে উদাহরণ পেশ, তালিকা পেশ- ইত্যাদির সাহায্য নেয়া হচ্ছে তো?

জ) প্রশ্নোত্তর বা কথাবার্তায় ছাত্ররা নিজের পালার প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং ভদ্রতা সহকারে আচরণ করে?

ঝ) ছাত্রদের প্রশ্ন বা প্রতিবাদের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করা হচ্ছে কি?

ঞ) দৈনন্দিন জীবনের সাথে পাঠের সামঞ্জস্য বিধান করা হচ্ছে কি?

ট) "বিসমিল্লাহ্" পড়ে পাঠ আরম্ভ করা হয় কি?

* হাতে কলমে কাজ ও লেখার প্রাক্কালে নিম্নের দিক গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা চাইঃ

ক) ছাত্রদের বসা ঠিকমত হবে, কোমর সোজা হবে, খাতা ও চোখের

www.nagorikpathagar.org

দূরত্ব যুক্তিসংগত পরিমাণের হবে।

খ) কলম, যন্ত্রপাতি বা ব্রাসের ধারণ ঠিক হয় এবং কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচ্ছন্নতা সহকারে আনজাম দেয়া হয়।

গ) ক্লাসে ঘুরে ফিরে প্রয়োজন মাফিক ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবে।

ঘ) টীকা, তারিখ, শিরোনাম, অনুচ্ছেদ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

ঙ) ছাত্ররা কালি, রং এখানে সেখানে ফেলবে না, নিক্ষেপ করবে না, আঙুলে লাগাবে না।

চ) খাতা, কলম, ব্রাস, পেন্সিল বা অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবহার যথাযথভাবে করা উচিত।

* হাতের লেখা বা বাড়ীর কাজ সত্তর দেখে ফেরৎ দেবে।

* সপ্তাহে পাঁচ দিন পড়াবে, একদিন পুনরালোচনার জন্যে নির্ধারণ করবে। পড়ার অগ্রগতির লোভে পুনরালোচনার ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন খুবই ক্ষতিকর।

* নিয়মিত সাপ্তাহিক অথবা মাসিক পরীক্ষা (Test) করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবে।

* বছরের কাজকে নির্ধারিত সময় মতে, মাসিক ও সাপ্তাহিক পর্যায় ভাগ করে যথাসাধ্য পরিকল্পনা মাফিক সমাধা করবে। তবে পুনরালোচনার অবকাশ অবশ্যই রাখতে হবে।

* ছাত্রদের বয়স, রুচী, স্বাস্থ্য ও কাজের সুযোগ অনুপাতে বাড়ীর কাজ (Home work) দেবে।

* প্রাথমিক শ্রেণী সমূহে যথাসম্ভব ক্লাসের কাজকেই যথেষ্ট মনে করে আনজাম দেবে।

* বাড়ীর কাজের উপর যথাসম্ভব নির্ভর করবে না।

* নিজের প্রবন্ধ বা বিষয়কে সহজ, রুচিশীল করার জন্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তালিকা ইত্যাদি তৈরী অথবা সংস্থান করবে।

* পাঠদান প্রাক্কালে যদি ছাত্রদের থেকে কোন প্রকার নৈতিক দুর্বলতা, অথবা আদবের খেলাপ কোন আচরণ প্রকাশ পায়, তবে তা যথাসময়ে সংশোধন করে দেবে অথবা পরিস্থিতি অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে নিরালায় ডেকে বুঝিয়ে দেবে।

* সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা প্রবন্ধে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে এবং শিক্ষকতার দায়িত্ব যথাযথ আনজাম দেয়ার জন্যে শিক্ষককে নিয়মিত কিছু পড়াশুনা করতে

www.nagorikpathagar.org

হবে।

* বিষয় শিক্ষকের সবচাইতে সাফল্য এখানেই যে ছাত্ররা সেই বিষয়ে অনুরক্ত হবে। সেজন্যে প্রয়োজন– শিক্ষক নিজেই ঐ বিষয়ে অনুরক্ত থাকবেন। আর তিনি শিক্ষাদান কাজে ছাত্রদের রুচি ও সহজবোধ্য করার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

* ছাত্রদের সামনে উত্তম চরিত্র ও ভাল কাজের প্রদর্শনী করবেন।

দ্বীনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অতিরিক্ত দায়িত্ব

উপরে সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দায়িত্ব আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের থেকে আরো কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব আশা করা যায়। যেমনঃ

* অন্যের তুলনায় নিজে অধিকতর পরিশ্রম ও ইখলাসের সাথে শিক্ষাদান দায়িত্ব আনজাম দেয়া।

* বস্তু পূজার এই যুগে যখন প্রতিটি মানুষ দুনিয়াবী শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ছে এবং স্কুল, কলেজের দিকে ধাবিত হচ্ছে তখন ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্যে দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি সৃষ্টি করা।

* সীমিত উপকরণ ও স্বল্প সংখ্যক স্টাফ দিয়ে কাজ চালানো।

* দ্বীনি শিক্ষা ও মাতৃভাষার সাথে অন্যান্য বিষয়েও মান উন্নত করা।

* স্বল্প বেতনে তুষ্ট থাকা এবং অধিক কাজের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

* শিক্ষাদানের সাথে সাথে স্নেহ মমতা সহকারে শিশুদের প্রশিক্ষণ দান ও সংশোধন করা।

* নিজের সদ্ব্যবহার ও উত্তম আদর্শের দ্বারা দ্বীন ও জাতির সাথে এবং দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ও সম্প্রীতি স্থাপন করা।

* মাদরাসাকে জনসাধারণের লক্ষ্য স্থল ও চিন্তাকর্ষণের কেন্দ্ররূপে দাঁড় করানো এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্যে সকলের সহযোগিতা হাসিল করা।

* মাদরাসাকে জনবসতির জন্যে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা আর সেই উদ্দেশ্যে শিশুদের অভিভাবকদের দ্বীনি প্রশিক্ষণ দান করা।

* দলীয় কোন্দল থেকে হাত গুটিয়ে প্রত্যেক বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির আন্তরিকতা হাসিল করা।

* সাধারণতঃ নিজেই ফান্ড সংস্থান করে মাদরাসাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার

www.nagorikpathagar.org

চেষ্টা করা।

* মাদরাসার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি আনয়ন করা এবং অভিযোগ উত্থাপনকারীদের অভিযোগের জবাব দান করা।

* শিক্ষা বিভাগের স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা।

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁদের অত্যধিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের তাওফিক দিন, আমীন!

দৈহিক প্রশিক্ষণ

আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে নিজের খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি বা মনিটর করে পাঠিয়েছেন। এই দায়িত্বের উপযোগী তাকে একটা সুঠাম দেহ দান করেছেন। দেহে অসংখ্য আবশ্যকীয় ও পরিমিত পরিমাণের অংগ প্রত্যঙ্গ রেখেছেন। বিভিন্ন প্রকারের শক্তি ও যোগ্যতা সংস্থাপন করেছেন। মানুষের শক্তি ও যোগ্যতা ঠিক তখনি যথাযথ কাজ করতে পারে যখন তার দেহ সুস্থ ও সবল থাকে। এজন্যে শিশুদের দৈহিক প্রবৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য ও সুস্থতার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। আর একাজ পরিবার ও বিদ্যালয় উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়।

দেহের প্রবৃদ্ধির জন্যে আবশ্যকীয় সামগ্রী

স্বাস্থ্য ও সবলতার জন্যে নিম্নের সামগ্রীসমূহ আবশ্যকঃ

১) সুষম খাদ্য, ২) পরিষ্কার পানি, ৩) বিশুদ্ধ বায়ু, ৪) যথেষ্ট আলো, ৫) দৈহিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম এবং খেলাধূলা। ৬) মানানসই পোষাক, ৭) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ৮) গভীর নিদ্রা, ৯) আনন্দ ও প্রশান্তি ও ১০) নির্মল চরিত্র

১) আহার (খাদ্য)

দেহের উপযুক্ত প্রবৃদ্ধির জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু পরিমিত আহার। জন্মের পর শিশুর সবচাইতে উপযুক্ত খাদ্য মায়ের দুধ। যে শিশু কোন কারণে মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে সে নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এজন্যে চরম বাধ্যবাধকতা ছাড়া মায়ের দুধ থেকে তাকে বঞ্চিত করা ঠিক নয়। দুধ ছাড়ানোর পরেও শিশুকে পরিমিত দুধ দেয়ার চেষ্টা করা কর্তব্য। অন্যান্য খাদ্য তরল এবং সহজপাচ্য হতে হবে। তারপর সে ক্রমান্বয়ে সমস্ত হালাল ও

www.nagorikpathagar.org

উত্তম খাদ্যাবলী খেতে পারবে বা তাকে খাওয়ানো যাবে, যেসব খাদ্য সসম্মানে বৈধ পন্থায় উপার্জন করা সম্ভব। অবশ্য খাদ্যে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

* খাদ্য যথাসাধ্য পরিমিত (অর্থাৎ খাদ্যে শিশুর উপযুক্ত প্রবৃদ্ধির জন্যে আবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী) থাকতে হবে।

* খাদ্য যেন সরল ও সহজপাচ্য হয় অর্থাৎ অধিক কড়া, মোসল্লাদার, তৈলাক্ত অথবা মিষ্টি না হয় এবং দেহে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বা নেশাদার না হয়।

* পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় অর্থাৎ তরিতরকারী রান্না করার পূর্বে ভালভাবে পরিষ্কার করে নেবে, পরিষ্কার পাত্রে রান্না করে পরিষ্কার পাত্রে রাখবে। খাদ্যদ্রব্যকে মাছি ও ধূলোবালি থেকে রক্ষা করবে।

* যথারীতি রান্না করবে যেন মজাদার ও সহজপাচ্য হয়। আগ্রহ সহকারে খেয়ে নেবে আর দেহের অংশে পরিণত করবে।

* মওসুমী ফল ও তরকারী, দুধ, ঘী, গোশত, মাছ, ডিম ইত্যাদির যাই সামর্থে কুলায় খাদ্যের সাথে মিশ্রিত করবে। আশপাশের মওসুমী ফল ও তরকারী সংস্থান করে নেবে।

* খাদ্য যথাসম্ভব তাজা হতে হবে। পচা বাসী অথবা কৌটাবদ্ধ খাদ্য দ্রব্য খাওয়া থেকে বিরত থাকবে।

* ভালভাবে ক্ষুধা পেলে খানা খাবে আর কিছু ক্ষুধা বাকী থাকতে খাওয়া শেষ করবে।

* খাদ্য খুব ধীর স্থির ভাবে খাবে।

* দু'বেলা খাওয়ার মাঝখানে অন্ততঃ তিন ঘন্টার বিরতি দেবে, যেন খাদ্য ভাল করে হজম হতে পারে।

* খুশীচিত্তে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' বলে খাদ্য আরম্ভ করবে এবং খানা শেষে আল্লার শুকরিয়া আদায় করবে।

সুষম খাদ্য

সুষম খাদ্য বলতে এমন খাদ্য সামগ্রীকে বুঝায় যাতে খাদ্যের সেসব যাবতীয় অংশ পাওয়া যায়, যা দেহের জন্যে আবশ্যকীয় এবং যাতে খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য সফল হয়। খাদ্য গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

* কাজকর্মের জন্যে দেহে শক্তি ও তাপের সঞ্চার করা।

www.nagorikpathagar.org

* কাজকারবারে দেহের যে অঙ্গ বিনষ্ট হয়েছে অথবা ভেংগে গেছে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হবে।

* দেহের প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

* রোগ জীবাণুর সাথে সংগ্রাম করে বিজয়ী হওয়ার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়।

এসব উদ্দেশ্য তখনি হাসিল হতে পারে যখন খাদ্যে নিম্নের অংশসমূহ পাওয়া যাবেঃ

১) শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেট), ২) তৈল, ৩) প্রোটিন (দেহকে বৃদ্ধিকারক অংশ), ৪) লবণ (খনিজ পদার্থ), ৫) পানি, ৬) ভিটামিন।

১) শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেট)

খাদ্যের এই অংশ অক্সিজেনের সাথে দেহকে তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে। গম, যব, চাউল, আলু, গাজর, সাগুদানা, ভূট্টা, গুড়, চিনি, বীটচিনি ও আংগুর ইত্যাদি থেকে পাওয়া যায়।

২) তৈল

এটাও অক্সিজেনের সাথে মিশে জ্বলে এবং দেহকে শক্তি ও তাপ সরবরাহ করে। চুল, নখ ও চামড়াকে ভাল অবস্থায় রাখে। অন্যান্য খাদ্যাংশকে হজম করার কাজেও সহায়তা করে। তেল ঘি মাখন ও চর্বি থেকে পাওয়া যায়। তেল জাতীয় খাদ্যে সাধারণতঃ ভিটামিন এ ও ডি পাওয়া যায়।

৩) প্রোটিন

খাদ্যের এই অংশ হজম হয়ে দেহের প্রবৃদ্ধি এবং টুটা ফাটা অংগকে জোড়া লাগানোর কাজ করে থাকে। যেমন মটর, বিভিন্ন রকমের ডাল, গোশত, ডিম, মাছ, দুধ, দধি এবং তরকারীর উপরের অংশ (যা সাধারণতঃ ফেলে দেয়া হয়) ইত্যাদির মধ্যে খাদ্যের এই অংশ পাওয়া যায়।

৪) লবণ (খনিজ পদার্থ)

এই অংশ শরীরের হাড়, দাঁত, লালা, রগ-পাট্টা ইত্যাদি তৈরীর কাজ করে থাকে। রক্ত অনুযায়ী প্রজনন ও দেহের সুষম বৃদ্ধির কাজে সাহায্য করে।

www.nagorikpathagar.org

এতে ফওলাদ লবণ, চুনা, ফস্‌ফরাস ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়। খাওয়ার লবণ, মওসুমী ফল, তরকারী, তাজা শাকসব্জি, গোশত, ডিম, মাছ ইত্যাদি থেকে এই অংশ পাওয়া যায়।

৫) পানি

এটাও খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রধান অংশ। এরই সাহায্যে খাদ্য দ্রব্য হজম হয় এবং তরলাকার ধারণ করে দেহের বিভিন্ন অংগে প্রসারিত হয়। রক্তপ্রবাহ এরই বদৌলতে হয়ে থাকে। দেহের গন্ধ বের হয়ে পড়ে। দেহের বিভিন্ন অংগ থেকে যে উপকারী ঘর্ম নির্গত হয় এর পেছনে রয়েছে পানির সাহায্য। এজন্যে খাদ্য গ্রহণের সময় স্বল্প পরিমাণে এবং দেড় দুই ঘন্টা পরে যথেষ্ট পরিমাণে পানি পান করা চাই।

৬) খাদ্য প্রাণ (ভিটামিন)

নামেই প্রকাশ পায় যে এটা খাদ্যের সেই আবশ্যকীয় অংশ যা জীবিত ও সুস্থ থাকার জন্যে অপরিহার্য। এটা ছাড়া–

* স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে।
* দেহের যথোপযুক্ত প্রবৃদ্ধি হতে পারে না।
* রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা দেহে থাকে না।
* দেহ নানা প্রকার রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

ভিটামিন বহু প্রকারের আছে তন্মধ্যে বিশেষ প্রকার হলো

ক) ভিটামিন–এঃ দেহের বৃদ্ধির জন্যে, সংক্রামক রোগ থেকে বাঁচার জন্যে এবং রোগ প্রতিরোধের জন্যে 'ভিটামিন–এ' অত্যন্ত জরুরী। এতে দেহের ফুস্‌ফুস্‌ ও দাঁত দৃঢ় হয়। চোখ ও ত্বককে সুস্থ রাখার জন্যেও এথেকে সাহায্য গ্রহণ করা যায়। কলিজা, গুর্দা, শাকসব্জী, দুধ, মাখন ও ডিম ইত্যাদি থেকে পাওয়া যায়। তীব্র উত্তাপে পাকালে অথবা তেলে ভাজি করলে ভিটামিন বিনষ্ট হয়। এদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। ফল, তরকারী, সালাদ ইত্যাদি যথাসাধ্য কাঁচা খাওয়া ভাল। এর অভাবে স্থূলকায় হয় ও শিশুদের বৃদ্ধি রোধ হয়।

খ) ভিটামিন–বিঃ ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্যে, হজমশক্তি ঠিক রাখার জন্যে এবং রক্তের কণিকা তৈরীর জন্যে আবশ্যকীয়।

www.nagorikpathagar.org

বিরক্তি, মাথা ব্যথা ইত্যাদি বিদূরিত হয়। এটা দুধ, ডিম, ক্ষীর, না ছাঁকা মোটা আটা ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। চাউলের উপরের পাতলা চামড়ায়ও থাকে, যা বেশী পরিষ্কার করলে নষ্ট হয়ে যায়। এর অভাবে দেহ ফুলে যায়, হাত পা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শিরা উপশিরায় নানা প্রকার রোগের আশংকা থাকে।

গ) ভিটামিন-সিঃ দাঁতের জন্যে আবশ্যক। এর অভাবে মাড়ী ফুলে যায় আর রক্ত বের হয়। সন্তর রোগাক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে। কাল কিসমিস, লেবু, সন্তারা, টমাটো, গাজর, আলু, তাজা ফল এবং তরিতরকারীর মধ্যে পাওয়া যায়। ফল ও তরকারী শুকিয়ে গেলে নষ্ট হয়ে যায়।

ঘ) ভিটামিন-ডিঃ দুধ, মাখন, ডিম, কলিজা, মাছের তেল এবং সূর্যের আলো। এটা হাড় তৈরীতে, দেহ বৃদ্ধিতে ও শক্তিশালী করার কাজে সাহায্য করে। এর অভাবে শিশুদের শুকতার রোগে আক্রান্ত করে অথবা হাড়ের গঠনে ত্রুটি এসে যায়।

ঙ) ভিটামিন-ইঃ প্রজনন ক্ষমতার জন্যে আবশ্যকীয়। শাক, উদ্ভিদ-তৈল, মটর, বাদাম, পেস্তা, খেজুর, খরবুজার বীজ ইত্যাদির মধ্যে হয়ে থাকে। এর অভাবে মরদানী শক্তি হ্রাস পাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়।

প্রকাশ থাকে যে সুষম খাদ্য তালিকায় এসব উপাদান (অংশ) আনুপাতিক হারে হওয়া দরকার।

দৈনিক খাদ্যে অন্ততঃ

* কার্বো হাইড্রেট আধা সের।
* প্রোটিন আধা পোয়া।
* তৈল দেড় ছটাক।
* লবণ পৌনে এক ছটাক।

দুধ এমন একটি খাদ্য যাতে প্রায় সমস্ত উপাদান পাওয়া যায়। মওসুমী ফল, তরকারী, শাকসব্জী, গোশত, মাছ, ডিম ইত্যাদিতেও বিভিন্ন উপাদান পাওয়া যায়। এজন্যে শিশুদের এসব খাওয়ানো চাই। দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ে সাত-আট বছর থেকে চৌদ্দ পনের বছর বয়সের শিশুদের জন্যে সুষম খাদ্যের সর্বমোট পরিমাণ অন্ততঃ এই পরিমাণে হতে হবেঃ

* আটা, চাউল ইত্যাদি ৭ সাত ছটাক।
* শাকসব্জী, আলু, গোশত, মাছ, ডিম, ডাল ইত্যাদির সমষ্টি এক পোয়া।
* দুধ ১ এক পোয়া।

www.nagorikpathagar.org

* ঘি, মাখন, তৈল বা চর্বি এক ছটাক।
* ফল, গাজর, টমেটো ইত্যাদি আধ পোয়া।
* গুড় অথবা চিনি দেড় ছটাক।

পরিষ্কার পানি

স্বাস্থ্যের জন্যে দ্বিতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্য হচ্ছে পানি। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি রাতে অন্ততঃ দেড় সের পানি পান করতে হয়। পানির সাহায্যেঃ

* রক্তপ্রবাহ চালু থাকে এবং রক্ত দেহের সর্বাঙ্গে অতি সহজেই পৌছে যায়।

* খাদ্য সহজেই হজম হয় এবং দেহের অংগে পরিণত হয়।

* দেহের উষ্ণতা পরিমিত থাকে।

* দেহের ভেতর থেকে আবর্জনা ও নিষ্প্রয়োজনীয় উপাদান পেশাব, থুথু, কফ ইত্যাদির সাথে বেরিয়ে আসে।

* পাকস্থলী, আঁত ও শিরা উপশিরা ইত্যাদি ধৌত হয়ে পরিচ্ছন্ন হয়।

* পানি পরিচ্ছন্ন ও তাজা হওয়া চাই। পরিচ্ছন্ন পানির পরিচয় হলো তাতে কোন প্রকারের রং, ঘ্রাণ ও স্বাদ হবে না। অপরিচ্ছন্ন পানি স্বাস্থ্যের জন্যে চরম ক্ষতিকর। বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক রোগ পানি থেকেই সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। এজন্যে পরিষ্কার ও তাজা পানি পাওয়ার পূর্ণ ব্যবস্থা করতে হবে। মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটলে পানি সিদ্ধ করে পান করবে।

পরিচ্ছন্ন বায়ু

স্বাস্থ্যের জন্যে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিচ্ছন্ন বায়ু। জীবন ধারণের জন্যে বায়ুর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পরিষ্কার পানির মত বায়ুতেও কোন রং, ঘ্রাণ অথবা স্বাদ থাকে না। বায়ুতে সাধারণত বিভিন্ন প্রকারের গ্যাস বিদ্যমান থাকে। তবে তাতে দুটো উল্লেখযোগ্যঃ

১) অক্সিজেন ২১% শতকরা একুশভাগ অর্থাৎ অন্যূন পঞ্চমাংশ।

২) নাইট্রোজেন ৭৮% শতকরা আটাত্তর ভাগ $\frac{৪}{৫}$ চার পঞ্চমাংশ। বাকী ১% শতকরা একভাগ নামে মাত্র কার্বনডাই অক্সাইড, পানির বাষ্প ও মৃত্তিকা কণা ইত্যাদি। অক্সিজেনের ধর্ম হচ্ছে কোন জিনিসের চলার কাজে সাহায্য করা, আর

www.nagorikpathagar.org

নাইট্রোজেনের কাজ হলো অক্সিজেনের কঠোরতাকে ভারসাম্য করা ও সহনশীল করে রাখা। অক্সিজেন দেহের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। এর সাহায্যে –

* দেহের তাপ, রক্ত, উত্তেজনা, আনন্দ ও কর্মক্ষমতার সৃষ্টি হয়।

* দেহের অভ্যন্তরের বিষাক্ত পদার্থ গ্যাসে পরিণত হয়ে বেরিয়ে আসে। দেহে পরিমিত অক্সিজেন না থাকলে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বায়ু দূষিত হয় কেন?

বায়ু সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণে দূষিত হয়ে পড়েঃ

* নিশ্বাস ত্যাগ করলে দেহের অভ্যন্তর থেকে বিষাক্ত গ্যাস বায়ুর সাথে মিশ্রিত হয়ে বায়ুকে দূষিত করে দেয়।

* অগ্নি জ্বলনের ফলে অক্সিজেন খরচ হয় এবং কার্বনডাই অক্সাইড বায়ুর সাথে মিশে বায়ুকে দূষিত করে ফেলে।

* দ্রব্যাদি পচে গলে দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত গ্যাস বায়ুর সাথে মিশে বায়ুকে দূষিত করে দেয়।

* বায়ুতে ধূলিকণা মিশ্রিত হলেও বায়ু স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর হয়ে পড়ে।

এসব কারণে মুখ ঢেকে অথবা রুম বন্ধ করে শোয়া, বন্ধ কক্ষে জ্বলন্ত অগ্নি অথবা অঙ্গার জ্বালিয়ে শোয়া, দুর্গন্ধ বায়ুতে শ্বাস গ্রহণ করা, অথবা ধূলোবালির মধ্যে নাকের উপর রুমাল না রাখা, স্বাস্থ্যের পক্ষে চরম ক্ষতিকর। এমনকি অনেক সময় ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়ে থাকে।

বায়ু বিশুদ্ধ করণের স্বাভাবিক উপায়সমূহ

* গাছপালাঃ বায়ু বিশুদ্ধ করণে গাছপালা বেশ সাহায্য করে থাকে। জীবজন্তুর প্রশ্বাসের সাথে যে দূষিত বায়ু বেরিয়ে আসে, গাছপালা তা চুষে নিয়ে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এই প্রক্রিয়ায় বায়ু বিশুদ্ধ হতে থাকে।

* সূর্যঃ সূর্যের রশ্মি বায়ুতে প্রবাহিত রোগজীবাণু ধ্বংস করে বায়ু বিশুদ্ধ করে দেয়।

* বৃষ্টিঃ বৃষ্টির ফলে বায়ুর ধূলাবালি নিচে পড়ে যায় এবং স্বাস্থ্য বিনষ্টকারী গ্যাসসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায়।

* বায়ু-প্রবাহঃ বায়ু প্রবাহের ফলে ও বায়ু আবর্জনা মুক্ত হয়।

* অক্সিজেনঃ বায়ুর অক্সিজেন স্বয়ং বায়ুর আবর্জনাকে বিক্ষিপ্ত করে ধ্বংস

www.nagorikpathagar.org

করে দেয় এবং বায়ুকে বিশুদ্ধ করে।

বিশুদ্ধ বায়ু পেতে হলে বাসস্থান বায়ুময় হওয়া চাই। খোলা মাঠে খেলাধূলা করার ও পার্কে বা বাগানে ঘোরাফেরা করার সুযোগ থাকতে হবে। মুখ না ঢেকে বায়ুময় ঘরে শোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সম্ভব হলে ঘরের আঙ্গিনায় কিছু কিছু ফুলের চারা লাগানোর অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে।

আলো

স্বাস্থ্যের জন্যে চতুর্থ আবশ্যকীয় বস্তু হলো 'আলো'। যে চারাগাছ আলো পায়না তা বসে পড়ে ও তার বৃদ্ধি ব্যহত হয়। শহরের সংকীর্ণ ও অন্ধকার গলিতে বসবাসকারী এবং শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে শ্বাস গ্রহণকারীদের মোকাবেলায় গ্রামের আলোতে খোলামেলা পরিবেশে লালিত পালিত ব্যক্তির স্বাস্থ্যের তুলনা করলে আলোর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা খুব সুন্দরভাবে অনুমান করা যায়।

আলো পাওয়ার উপায় দু' টোঃ

* প্রাকৃতিকঃ যেমন চন্দ্র ও সূর্য থেকে।
* কৃত্রিমঃ অর্থাৎ কুপি, বাতি ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি থেকে।

সূর্যের আলো স্বাস্থ্যের জন্যে অশেষ প্রয়োজনীয়। ঘরে রোদ প্রবেশের পূর্ণ অবকাশ থাকা চাই। এতে ঘর স্যাঁৎস্যাঁতে থাকে না এবং রোগজীবাণু বিনষ্ট হয়ে যায়। আসবাবপত্র মাঝে মাঝে রোদে ফেলবে। যেসব ঘরে রোদ প্রবেশ করতে পারে না সেসব ঘর আর্দ্র ও শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে থাকে। তাতে বহু প্রকারের জীবাণু প্রতিপালিত হয় এবং স্বাস্থ্যের উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। যদি কক্ষসমূহে রোদ প্রবেশ করতে না পারে অথবা তা যদি স্যাঁৎস্যাঁতে হয় তাহলে মাঝে মধ্যে হোয়াইট ওয়াস করানোর বা ধূপ-আগরবাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করবে। লেখাপড়া বা অন্য কোন সুক্ষ্ম কাজের জন্যে যথেষ্ট আলোর প্রয়োজন। তবে আলো যেন সম্মুখ থেকে অথবা ডান দিক থেকে না লাগে। বরং বাঁ দিক থেকে অথবা উপর থেকে অথবা পেছন থেকে আসলে চোখের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। লেখাপড়ার কাজ অথবা কোন সুক্ষ্ম কাজে আত্মনিয়োগ কারীদের আলোর ব্যবহারে সবিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা চাই। পরিমিত আলোতে কাজ করবে এবং চোখের উপর সরাসরি যেন আলো না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

www.nagorikpathagar.org

মেহনত শ্রম অথবা ব্যায়াম ও খেলাধূলা

আল্লাহ্তা'য়ালা আমাদেরকে এই দেহদান করেছেন শ্রম, মেহনত, কামকাজ ও পরিশ্রম করার জন্যে। দৈহিক শ্রমের ফলে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুদৃঢ় হয়। এতে কর্মক্ষমতা ও সবলতা আসে, যথেষ্ট ক্ষুধা লাগে, গভীর নিদ্রা আসে, খাদ্য ভালভাবে হজম হয় এবং যা কিছু খাবে, তা দেহের অঙ্গে পরিণত হবে দেহের অভ্যন্তর থেকে দুর্গন্ধ ও ঘর্ম সহজেই বেরিয়ে আসে এবং মন মেজায প্রফুল্ল থাকে। যে অঙ্গ কাজে লাগানো হয় না তা ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে বেকার হয়ে পড়ে। তাই শ্রম ও মেহনতে অভ্যস্ত হওয়া চাই। শিশুরা খেলাধূলায় অভ্যস্ত হয়ে থাকে। তারা কেবল খেলাধূলায় যথেষ্ট সময় ব্যয় করে থাকে। অবশ্য খেলাধূলার সুযোগ থাকলেই করে থাকে। লেখাপড়ায় রত, মানসিক শ্রম দানে ব্যস্ত অথবা দোকানদারীর কাজে ব্যাপৃত ব্যক্তিদের দৈহিক শ্রমদানে খুব কমই সময় থাকে। তাদের জন্যে উচিত তারা যেন কিছু সময় খেলাধূলা বা দৈহিক ব্যায়ামের জন্যে বের করে নেয়। অধিক বয়সের লোকেরা সকাল–সন্ধ্যা ভ্রমণের ব্যবস্থা করবে। যদি শ্রম মেহনতের কাজে খেলাধূলার স্পৃহা সৃষ্টি করা যায়, তাহলে শিশুরা খেলাচ্ছলে অনেক আবশ্যকীয় কাজকর্মে আনজাম দিতে সক্ষম হয়। আর তাতে ওদের প্রয়োজনীয় দৈহিক শ্রমের কাজ (ব্যায়াম) ও সম্পন্ন হয়। যারা দৈহিক শ্রম দানে পলায়নী মনোভাব রাখে, তাদের স্বাস্থ্য সর্বদা খারাপ থাকে। তারা অলস, দুর্বল ও অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকে। (শিশুদের খেলাধূলা সম্পর্কে ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।)

উপযোগী পোষাক

স্বাস্থ্যের উপযোগী পোষাক থাকা আবশ্যক। সেই পোষাকই উপযোগী হয়ে থাকে, যাতেঃ

* ছতর ভালভাবে আবৃত হয় এবং বেপর্দা না হয়।
* শীত, গরম ও মওসুমী প্রভাব থেকে দেহ নিরাপদ থাকে।
* দেহে কোন প্রকার আঘাত বা ক্ষতি না হয়।
* দেহে উপযুক্ত আরাম ও সৌন্দর্য আসবে।

www.nagorikpathagar.org

* যথাযথ, সম্মানজনক, মান-সম্ভ্রমের এবং জাতীয় সৌন্দর্য ও স্বকীয়তা প্রকাশক হয়।

পোষাক বিভিন্ন উপাদানে তৈরী হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের বেশীর ভাগ অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্যে সব চাইতে উপযোগী কাপড় বিভিন্ন দিক বিচার করলে সূতী কাপড়ই প্রতীয়মান হয়। কারণ-

* এই কাপড় তুলনামূলকভাবে সস্তা ও মজবুত হয়ে থাকে।

* সহজে ধোলাই করা যায়।

* ভালভাবে ঘাম শোষণ করে নেয়।

* প্রত্যেক মওসূমের উপযোগী। শীত ও গরম উভয় অবস্থা থেকে দেহকে সংরক্ষিত রাখে।

গ্রীষ্মকালে হালকা-পাতলা এবং যথাসাধ্য সাদা বা হালকা রঙের পোষাকই উপযোগী। আর শীতকালে মোটা ও গাঢ় রঙের কাপড় দরকার। কারণ সাদা অথবা হালকা রঙের কাপড়ের তুলনায় গাঢ় রঙের কাপড় সূর্যের তাপ শোষণ করে অতিসত্তর গরম হয়ে যায়। অর্থশালী ব্যক্তি যদি শীতকালে পশমী কাপড় ব্যবহার করে তবে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভাল। তেমনি অর্থশালী মহিলারা রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে পারলে আরাম ছাড়া স্বাস্থ্যের জন্যেও উপকারী প্রমাণিত হয়ে থাকে।

আঁট শাঁট পোষাক স্বাস্থ্যের জন্যে খুবই ক্ষতিকর। এই পোষাকে রক্ত প্রবাহ প্রভাবিত হয়ে থাকে। দেহকে প্রয়োজনীয় পরিমাণের তাজা বায়ূ পৌছায় না এবং দেহের ভিতর বাইরের তাপমাত্রা সমান থাকে।

পোষাকে ছতরের প্রতি অবহেলা, বিজাতীয় অনুকরণ, অহেতুক লৌকিকতা ও বাহ্যিকতা অথবা নোংরামী ও বেপরোয়াভাব ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের নৈতিক রোগের শিকার বানিয়ে দেয়। এগুলো পরোক্ষভাবে দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্যেও ক্ষতিকর। এ থেকে বাঁচা উচিত।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলাম পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অঙ্গ বলে ঘোষণা করেছে। স্বাস্থ্যের জন্যে দেহ, পোষাক, বাসস্থান, ব্যবহার্য আসবাবপত্র, ড্রেন ও চারপাশের পরিচ্ছন্নতার পুরো নিশ্চয়তা বিধান করা

www.nagorikpathagar.org

আবশ্যকীয়। এ সবের যে কোনটির ব্যাপারে পরিচ্ছন্নতার প্রতি অবহেলা স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে থাকে।

দেহের পরিচ্ছন্নতা

দেহের মধ্যে নানা প্রকার পরিত্যক্ত বস্তু, আবর্জনা এবং বিষাক্ত পদার্থ জমা হতে থাকে। এগুলো বের হওয়া একান্ত দরকার। কেননা যে কোন প্রকার বিনষ্ট পদার্থ দেহে আটকে গেলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এসব আবর্জনা ময়লা, পায়খানা, পেশাব, ঘাম, কফ ইত্যাদির আকারে বিভিন্ন নির্গমণ পথে বেরিয়ে আসে। যেখানে এসব আবর্জনা বের করে দেয়ার পুরো ব্যবস্থা থাকা দরকার সেখানে ঐসব পথকে খুব পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত যে পথে ওসব ময়লা বের হয়ে ঐ পথকে অপরিষ্কার করে দেয়। পেশাব পায়খানার পরে নিয়ম মত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে, নিয়মিত মিছওয়াক করা, নাকে পানি দিয়ে খুব পরিষ্কার করা, চোখ ও কানকে নিয়মিত পরিষ্কার করা, চুল ও নখ কাটার ব্যবস্থা করা উচিত। তাছাড়া নিয়মিত গোছল করে দেহের চামড়ার সেসব গর্ত পরিষ্কার করবে যা ঘাম বের হয়ে ময়লায় বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম থেকেই শিশুদেরকে দেহ নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস বানানোর চেষ্টা থাকা চাই।

পোষাকের পরিচ্ছন্নতা

ময়লাযুক্ত অপরিচ্ছন্ন পোষাক চামড়াকে ময়লাযুক্ত করে বিভিন্ন চর্মরোগে আক্রান্ত করে দেয়। এজন্যে পোষাকের পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা থাকা উচিত। নিয়মিত পোষাক পরিবর্তন করার ও পরিষ্কার করার প্রতি লক্ষ্য থাকা উচিত।

বাসস্থানের পরিচ্ছন্নতা

কামরা, করিডোর, বারান্দা নিয়মিত ঝাড়ু দেয়া জিনিসপত্র,ধূলাবালি থেকে পরিষ্কার রাখা, আসবাবপত্র ঝেড়ে মুছে বিন্যস্ত রাখা, রান্নাঘর, নর্দমা, পেশাবখানা, পায়খানা ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ঘরের আশপাশ ময়লা মুক্ত হওয়া চাই। অন্যথায়, জীবাণু জন্ম নেবে এবং ঘরের সবার স্বাস্থ্য প্রভাবিত হবে।

www.nagorikpathagar.org

গভীর নিদ্রা

স্বাস্থ্যের জন্যে গভীর নিদ্রাও একান্ত আবশ্যক। দৈহিক ও মানসিক কাজ কর্ম, খেলাধূলা এবং দেহের অভ্যন্তরে সংঘটিত নড়াচড়ার কারণে দেহ থেমে অবসন্ন হয়ে পড়ে। অবসাদ দূর করার জন্যে এবং প্রসন্ন মনে পুনরায় কর্মক্ষম হয়ে উঠার জন্যে বিশ্রাম ও গভীর নিদ্রা আবশ্যক।

নিদ্রা প্রসঙ্গে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়ঃ

* আল্লাহ্‌তা'য়ালা শয়নের জন্যে রাত সৃষ্টি করেছেন। গ্রীষ্মকাল ছাড়া দিনের বেলা শয়ন থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা উচিত।

* অর্ধ রাতের পূর্বভাগের এক ঘন্টার নিদ্রা পরবর্তী ভাগের দু'ঘন্টার নিদ্রার সমান হয়ে থাকে। এজন্যে যথাসম্ভব এশার নামাযের পর পরই শোয়ার অভ্যাস করবে। এতে করে নিদ্রা ভালভাবে আসবে এবং প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠাও সম্ভব হবে।

* খাদ্য গ্রহণ ও নিদ্রা গমনের মাঝে দু'ঘন্টার ব্যবধান হওয়া চাই। এ জন্যে মাগরিবের পরে খাদ্য গ্রহণ করা উত্তম।

* শোয়ার সময় সমস্ত কাজ–কারবারের দায়িত্ব আল্লার উপর ছেড়ে দিয়ে নিজে মুক্তমনে ঘুমিয়ে পড়বে। এতে গভীর নিদ্রা হয়ে থাকে।

* চিৎ হয়ে অথবা পেটের উপর (উপুড় হয়ে) কখনো শয়ন করবে না। আর শোয়ার সময় বুকের উপর হাত রেখেও শয়ন করবে না। কারণ এমনটি করলে দুঃস্বপ্ন ও কুস্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা থাকে এবং গভীর নিদ্রা ব্যাহত হয়। দু'পাশে কাত হয়ে শয়নের অভ্যাস করবে।

* শয়নের পূর্বে শিশুদের অবশ্যাই ভয়–ভীতিজনক কিস্‌সা–কাহিনী শোনাবে না।অন্যথায়তারা ভয়ংকর খাব দেখতে পাবে।

* মুখ ঢেকে অথবা কক্ষের দরজা জানালা সব বন্ধ করে ঘুমাবে না। তাহলেই নির্মল বায়ুতে শ্বাস গ্রহণ সম্ভব হবে।

* শয়নের পূর্বে বাতি নির্বাপিত করবে আর শিশুদের পেশাব করিয়ে নেবে।

* শিশুদের শয়নের যথেষ্ট সুযোগ থাকা চাই। ভাল স্বাস্থ্যের জন্যে অন্তত আট ঘন্টা, পুরুষদের ছয় ঘন্টা এবং মহিলাদের সাত ঘন্টা নিদ্রা যাওয়া যথেষ্ট হতে পারে।

* শিশুদের মাতাপিতা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে শয়ন করায় অভ্যস্ত করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

দশ বছর বয়স হলে অবশ্যই বিছানা পৃথক করে দেবে।

* যথাসম্ভব খাট-চৌকিতে শোয়া চাই। তাহলে বিষাক্ত পোকা-মাকড়, জীবাণু, ধূলাবালি, মাটি এবং স্বাস্থ্যহানিকর গ্যাস ইত্যাদি থেকে শরীর সংরক্ষিত থাকতে পারে।

* অত্যধিক খাদ্য গ্রহণ করে অথবা খালি পেটে শয়ন করলেও গভীর নিদ্রা ব্যাহত হয়।

* মশা-মাছি ও ছারপোকা থেকে বেঁচে থাকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাহলে নিদ্রা ব্যাহত হবে না এবং রোগ থেকেও মুক্ত থাকতে পারবে।

আনন্দ ও প্রশান্তি

দুঃখ চিন্তা দেহকে ঘুণের মত অন্তসার শূন্য করে ফেলে এবং অনেক সময় জ্বর-তাপের শিকার বানিয়ে ছাড়ে। উন্মাদনা, আত্মহত্যা, হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়া, সময়ের পূর্বে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া, -এ সবই অস্বাভাবিক দুঃখ চিন্তার পরিণতি। আনন্দ-খুশীতে থাকলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং রোগ প্রতিহত করার জন্যে প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে। নিজেও খুশী থাকবে এবং সন্তানাদিদেরও খুশী রাখার পুরো চেষ্টা চালাবে। দুঃখ চিন্তা যদি এসেই যায় তবে অতি সত্তর তা ভুলিয়ে দেয়ার অথবা তা দূরীভূত করার চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই দেহকে ঐ ঘুণে ধরা থেকে নাজাত দিতে পারবে। আল্লার উপর ভরসা ও তাওয়াককুল মানুষকে সর্ব প্রকার দুঃখ চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে পারে। সর্বাবস্থায় কেবল তারই উপর ভরসা করা চাই।

নির্মল চরিত্র

সর্বশেষ, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্যে সর্বপ্রথম শর্ত, নির্মল চরিত্র। যতকিছুই থাকুক না কেন চরিত্র কলংকিত হলে মানুষের স্বাস্থ্য ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস, সৎকর্ম, নেক চালচলন, পছন্দনীয় অভ্যাস, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, সদাচারণ, কল্যাণকামিতা, জনসেবা ইত্যাদিতে আল্লাহ ও সৃষ্ট জীব উভয়ই খুশী হয়ে থাকে। ফলে অন্তরে প্রশান্তি পাওয়া যায়। সাধারণ খাওয়া পরা করেও মানুষ আনন্দ খুশী অনুভব করতে পারে, তার স্বাস্থ্য সুগঠিত হয় এবং আয়ু বেড়ে যায়। আমাদের আজকের অভিজ্ঞতা হলো অসদাচরণ ও বদভ্যাস মানুষকে নানা প্রকার রোগের শিকার বানিয়ে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

আখিরাতে সাফল্যের সাথে সাথে স্বাস্থ্যও পার্থিব কল্যাণের জন্যেও নির্মল চরিত্রের ও পছন্দনীয় অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক ভবিষ্যৎ বংশধরদের কল্যাণকামী ব্যক্তির কর্তব্য এ বিষয়টির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা।

শিশুদের স্বাস্থ্য ও বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ের কাজ কেবল লেখাপড়া শিক্ষাদানই নয়। সাধারণ মানুষ তাই মনে করে থাকে। বরং ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও দৈহিক প্রশিক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখাও বিদ্যালয়ের মৌলিক দায়িত্ব। কারণ-

* দৈহিক দিক থেকে শিশুদের বৃদ্ধির উত্তম ও দীর্ঘতর মেয়াদ তারা বিদ্যালয়েই কাটিয়ে দেয়।

* মাতাপিতার অশিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতা, বাসস্থানের দুরাবস্থা এবং পরিবেশের করুণ অবস্থার এই যুগে কেবল বিদ্যালয় থেকেই এই বিষয়ে শিশুরা আশানুরূপ সাহায্য ও নির্দেশিকা পেতে পারে।

* শিশুদের স্বাস্থ্যই যদি ভাল না থাকলো, তাহলে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ হবে কি করে? সুতরাং লেখাপড়ার জন্যে স্বাস্থ্য বিলীন করে দেয়ার যে বিভ্রান্তকর চিন্তাধারা বিস্তার লাভ করেছে, তা কতই না ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক! বিদ্যালয় থেকে কেবল হাড় চামড়া নিয়ে বের হওয়া উচিত নয়। বরং ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব আনজাম দেয়ার জন্যে সবল সুস্থ দেহ থাকাও আবশ্যক।

বিদ্যালয়ের দায়িত্ব

স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিদ্যালয়ের নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা চাইঃ

* বিদ্যালয়ের অবস্থানঃ বিদ্যালয় যথাসম্ভব জনবসতি থেকে বাইরে খোলা জায়গায় এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশে হওয়া চাই। বিদ্যালয়ের চারপাশে গাছ-গাছড়া লাগানো উচিত।

* ঘর কাঁচা-পাকা অথবা সাধারণ বা উচ্চ পর্যায়ের যেমনই হোক না কেন, তা প্রশস্ত ও বায়ুগমন উপযোগী হতে হবে।

* কক্ষসমূহে বায়ু প্রবেশকারী ও আলোকময় হতে হবে। উঁচু দেয়াল, আলোকময় জানালা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক দরজা থাকতে হবে; আর ছাত্রদের সংখ্যানুপাতে স্থানের প্রশস্ততা থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

* 'ব্লাকবোর্ড' এমন স্থানে স্থাপন করতে হবে যেন পুরো শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তা দেখতে পায় এবং তাতে আলো এ পরিমাণ পড়তে হবে যে ছাত্র-ছাত্রীদের চোখ ঝলসিয়ে না যায়। ব্লাকবোর্ডের লেখা মোটা ও পরিষ্কার হতে হবে যেন পাঠকবৃন্দের চক্ষুর উপর চাপ না পড়ে। শিশুদের বসার স্থান এমনভাবে করতে হবে যেন আলো বাঁ দিক অথবা পেছন দিক থেকে আসে। সম্মুখ অথবা ডান দিক থেকে আলো চোখের জন্যে ক্ষতিকর। লেখাপড়ার সময় বই অথবা খাতার দূরত্ব হবে এক ফুট আর বসতে হবে এমনভাবে যেন মেরুদন্ড সোজা থাকে। শিশুদের বসার নিয়মের প্রতি এমনিভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যথায় চোখ নষ্ট হয়ে যায় এবং মেরুদন্ড বাঁকা হয়ে পড়ে।

* শ্রেণী, বারান্দা, মেজে, পায়খানা, পেশাবখানা, নর্দমা ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করবে এবং ময়লা আবর্জনা দূরে নিক্ষেপ করবে। পানীয় পানির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবে যেন শিশুরা তা দূষিত করতে না পারে। অধিকাংশ মহামারী রোগ দূষিত পানির কারণেই বিস্তার লাভ করে থাকে।

* সময় নির্দেশিকা বা ক্লাস রুটিন এমনভাবে তৈরী করবে যে কঠিন ও শক্ত বিষয় যেন একাধারে না পড়ে। বরং সহজ ও কঠিন, মৌলিক ও লিখিত এবং মানসিক ও দৈহিক এভাবে একটার পর আরেকটা আসে। কর্মক্ষমতা পূনঃপ্রাপ্তির (energy regain) করার জন্যে বিরতি দেয়া দরকার। বিরতি এমন হতে হবে যেন খাদ্য, নাস্তা, নামায ও খেলার জন্যে পরিমিত সময় পাওয়া যায়।

* যথারীতি শিক্ষাদানের পূর্বে বিশ/পঁচিশ মিনিট সামষ্টিক উপস্থিতির জন্যে রাখবে যখন দেহের উচ্চতা ও শ্রেণী অনুপাতে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়াতে পারে। কখনো কখনো তাদের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা চেক করে দেখবে। বিশেষ করে দেহ ও পোষাকের পরিচ্ছন্নতা, নখ, দাঁত, চোখ, কান, নাক ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা করে দেখবে এবং প্রয়োজন মাফিক সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক উপদেশ নির্দেশিকা প্রদান করবে। সামষ্টিকভাবে ড্রিল ও পি,টি (দৈহিক প্রশিক্ষণ) এর হালকা প্রোগ্রাম রাখবে এবং কয়েক মিনিট উচ্চ স্বরে একত্রে মুনাজাত করার অথবা জাতীয় সংগীত গাওয়ার ব্যবস্থা করবে।

* প্রাথমিক শ্রেণীসমূহের শিশুদের খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষাদান করবে। তাদের দীর্ঘ সময় শান্ত হয়ে বসে থাকতে বাধ্য করা যাবে না। শিক্ষাদানের সময় থেকে কিছু সময় বের করে খেলাধূলা ও পি,টি করাবে।

* ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রমাগত স্বাস্থ্য রক্ষার আবশ্যকীয় নিয়ম-নীতি শেখাবে

www.nagorikpathagar.org

এবং তা বাস্তবায়নের বিষয় পরিষ্কার করে বলে দেবে। বড় শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য ও চিকিৎসা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি জানিয়ে দেবে। এবং ব্যান্ডেজ করা, জ্বর পরীক্ষা করা, ঔষধ ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ সরবরাহ করার জন্যে তা মওজুদ রাখবে। যেন খেলাধূলা ও দৌড়াদৌড়ি করার প্রাক্কালে কোন ছেলে আঘাত পেলে অথবা কোন দুর্ঘটনা ঘটলে যথাসময়ে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়।

* প্রাথমিক শ্রেণীসমূহের শিশুদের বাড়ীর কাজ (বাড়ীতে পড়ার ও লেখার কাজ) এর বোঝা দেয়া ঠিক নয়। তাহলে তারা অবকাশের সময় নিশ্চিন্তে খেলাধূলা অথবা ইচ্ছামত কিছুটা ভাঙাগড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবে। পরবর্তী শ্রেণীসমূহেও যথাসাধ্য স্বাধীন অধ্যয়ন বা শখ জাতীয় বাড়ীর কাজ দেয়া চাই যেন শিশুরা বোঝা মনে না করে। বরং অবকাশ সময়কেও হাসি খুশীতে উপকারী কাজে ব্যয় করতে অভ্যস্ত হবে।

* বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় খেলাধূলা, ব্যায়াম (পি,টি) দৈহিক শ্রম এবং সিলেবাস বহির্ভূত কর্মকান্ডের (বাগান করা, শিক্ষা সফর, পিকনিক, জনসেবা ইত্যাদির) ব্যবস্থা করবে। আর সে জন্যে আবশ্যকীয় আসবাব যোগাড় করবে। খেলায় প্রতিযোগিতা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে ম্যাচ করে খেলার সুযোগ প্রদান করবে।

* খাওয়া পরা, শয়ন জাগ্রত হওয়া, ধোয়া গোছল, খেলাধূলা করার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলবে। সম্মানিত শ্রেণী শিক্ষকগণ এ প্রসংগে শিশুদের নিয়মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

* ক্রমাগত প্রতিরোধ ব্যবস্থা শিক্ষা দিবে। যেমন অসুস্থ হয়ে পড়লে বড়দের অবহিত করা, অসুস্থতার মধ্যে ঔষধ সেবন করা, পথ্য ও নিষিদ্ধ খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা, রাস্তায় চলার নিয়মনীতি এবং মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কিত আবশ্যকীয় সতর্কতা ইত্যাদি।

* সম্ভাবনাময় শিশুদের ব্যাপারে তাদের অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করবে।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা গ্রহণ (জ্ঞান বিজ্ঞান হাসিল)

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পুরো ব্যবস্থা মূলতঃ শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কায়েম করা হয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অজ্ঞ অশিক্ষিত শিশুদের ক্রমাগতভাবে তাদের অজানা বিষয় অথবা জানা আবশ্যক বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের নিমিত্ত খোলা হয়ে থাকে। যেমন, লেখাপড়া, বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতা, পছন্দনীয় অভ্যাস, বিভিন্ন স্থানের আদব এবং মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনার যথাযথ পদ্ধতি ইত্যাদি। শিক্ষা গ্রহণের এই কাজ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একাধারে চালু থাকে।

শিক্ষা গ্রহণের কাজ সাধারণত নিম্নের পদ্ধতিতে আনজাম পেয়ে থাকে।

নিজের করে শেখা

শিশুরা স্বভাবত চটপটে হয়ে থাকে। তাদের হাত পা অবিরত চলতে থাকে। যখনই তাকাবে দেখবে সে কোন না কোন কাজে রত আছে, মত্ত আছে কোন কিছু গড়ার কাজে বা কোন কিছু ভাঙার কাজে। নিজের এসব কাজের মাধ্যমে সে বিভিন্ন কাজের অভিজ্ঞতা হাসিল করে থাকে। আর এ অভিজ্ঞতা কিছু তিক্ত আর কিছু স্বাদযুক্ত। কখনো লক্ষ্যস্থল ঠিক থাকে আর কখনো তা বিচ্যুত হয়। এভাবে সে নিজের অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

প্রশিক্ষণ পেয়ে শেখা

মাতাপিতা, শিক্ষক ও অপরাপর আত্মীয়গণ শিশুদের প্রশিক্ষণ দানকে নিজেদের আবশ্যকীয় কর্তব্য বলে মনে করে। তারা নিজেরা তাকে স্নেহ-মমতা অথবা কঠোরতা কোমলতা প্রদর্শন করে কিছু না কিছু শিখিয়ে থাকে। কোন ত্রুটিপূর্ণ কাজ করতে দেখলে বাধা-বিপত্তি পেশ করে সংশোধন করে ও বিশুদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

পদ্ধতি বলে দেয়। এভাবে বিবিধ বিষয়ে শিশু প্রশিক্ষণের ফলে শিখে থাকে।

পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণ করে শেখা

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে জ্ঞান হাসিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে তার চোখ। সে যা কিছু জানে তার $\frac{৪}{৫}$ অংশ সাধারণত চোখের মাধ্যমেই অর্জন করে। তার চোখ সর্বদা তাকে অসংখ্য জিনিস দেখিয়ে থাকে এবং সে সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করে থাকে। শিশুরা অনেক কথা অন্যদের থেকে শুনে ও তাদের অনুকরণ করে শুরু করতে থাকে। কাজেই পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণ শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

চিন্তা ভাবনা করে শেখা

প্রত্যেক শিশুকে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কখনো বল সটকে গিয়ে নর্দমায় ঢুকে পড়ে। তখন তা বের করার সমস্যা দেখা দেয়। ঘুড়ির রশি কোন কিছুতে আটকে গেলে তা খুলে আনার সমস্যা দেখা দেয়। কখনো খাওয়া-দাওয়ার বস্তু নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন তা অর্জন করার চিন্তা করতে হয়। কখনো শিক্ষকের রাগ থেকে বাঁচার আবার কখনো মাতাপিতার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রশ্ন দেখা দেয়। এভাবে নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এগুলো থেকে বাঁচার জন্যে ও এ ব্যাপারে কর্তব্য সম্পাদনে শিশুদের চিন্তা ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা এবং অসাধারণ চেষ্টা সাধনার প্রয়োজন হয়। এসব বিষয়ে বিভিন্ন সমাধান সামনে আসে, তারা তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আর এ ব্যাপারে নিজেদের প্রচেষ্টায় অধিকাংশ সময় সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়ে থাকে। এ ধরনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা অনেক বিষয় চিন্তা ভাবনা করে শিখে নেয়।

অবধারিত বাধ্যবাধকতা থেকে শেখা

নিজের প্রাকৃতিক চাহিদা ও স্বভাবজাত দাবির পূর্ণতা বিধান কালে শিশুরা নানা অভিজ্ঞতা হাসিল করে থাকে। এই সব অভিজ্ঞতা শিশুদের কোন বিষয়ে নিজের দৃষ্টিভংগি নির্ধারণ করার কাজে সহায়তা করে। যেমনঃ মাতাপিতা ও ভাইবোনদের ভালবাসা, শিক্ষকমন্ডলীর মর্যাদা প্রদান, প্রবন্ধাদির প্রতি আগ্রহ,

www.nagorikpathagar.org

কার্যক্রমের প্রতি আন্তরিকতা, অন্ধকারে চলার ও কষ্টদায়ক জন্তু-জানোয়ারদের ভয় করা ইত্যাদি।

এসব বিভিন্ন প্রকারের পদ্ধতি ও মাধ্যম শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে সহযোগি বলে প্রমাণিত হতে পারে।

শেখার নীতি পদ্ধতি

শেখার তিনটি বুনিয়াদী নীতি আছেঃ

১) প্রবণতা নীতি ২) প্রভাব নীতি ৩) অনুশীলনী নীতি।

এসব রীতিনীতি অনুসরণের মাধ্যমে শিশুদের কিছু শেখানো যেতে পারে।

১) প্রবণতা নীতিঃ

শেখার কাজ তখনি সম্ভব হয় যখন শিক্ষার্থীর সে জন্যে প্রস্তুতি ও প্রবণতা থাকে। মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া কোন কিছু শেখানো সম্ভব নয়। কারণ, সেই অবস্থায় সে ঐ কাজের জন্যে কোন চেষ্টাই করবে না। এজন্যে পাঠদানে বা কোন কিছু শেখানোর পূর্বে শিশুদের সে জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শাস্তির ভয় অথবা বাইরের চাপ বা কঠোরতা আরোপ করে শিশুদের থেকে যে কাজ আদায় করা হয় তাতে শিশুর পূর্ণ প্রবণতা বা প্রস্তুতি থাকে না। ফলে সে কাজে তেমন সাফল্য পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, যদি শিশুর স্বভাব প্রকৃতি ও রুচি প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করিয়ে কাজ আদায় করা যায়, তাহলে তারা পুরো প্রস্তুতি সহকারে কাজ করে থাকে এবং উক্ত কাজে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত রাখে। এর ফলে কাজটি ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়।

২) প্রভাব নীতি

আনন্দ দায়ক ফলাফল প্রাপ্তির আশা থাকলেই কোন কাজ আন্তরিকতা ও মনোনিবেশ সহকারে করা যায়। যদি কোন কাজ করার ফলে শান্তির পরিবর্তে দুঃখ পাওয়া যায় অথবা বিরূপ ফলাফলের সম্মুখীন হতে হয়; তাহলে কোন লোক সে কাজের ধারেও যাবে না। আনন্দ সহকারে তা আনজাম দেয়া তো দূরের কথা। শিশুরা অজ্ঞতার কারণে প্রথম দিকে এমন সব কাজ করে বসে, যার ফলাফল হয় কষ্টদায়ক। তবে এই অভিজ্ঞতাই তাকে ভবিষ্যতে ঐ কাজ

www.nagorikpathagar.org

থেকে বিরত রাখবে। পক্ষান্তরে, যেসব কাজ করলে সে প্রশান্তি, আনন্দ ও খুশী অনুভব করে, সে সমস্ত কাজ সে বার বার আনজাম দিয়ে থাকে। এই নীতির ভিত্তিতে অপছন্দনীয় আচরণের সাথে তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং পছন্দনীয় অভ্যাসের সাথে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার সংযোগ করার জন্যে ত্রুটি ও অন্যায়ের কারণে শাস্তি দেওয়া হয় আর ভাল কাজের জন্যে দেওয়া হয় ধন্যবাদ ও পুরস্কার।

৩) অনুশীলনী নীতি

কোন কাজ বার বার করার ফলে সে কাজে দক্ষতা অর্জিত হয় এবং তা সহজেই সমাধা হয়ে থাকে। কিছু সময় উক্ত কাজ থেকে বিরত থাকলে দক্ষতা হ্রাস পেয়ে থাকে। কোন কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্যে বা কোন বিষয়ে দক্ষতা হাসিলের জন্যে উক্ত কাজ অনুশীলন করার যথেষ্ট সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। এই নীতির আলোকেই কোন পদ্ধতি শেখানোর ও উত্তম রূপে মনে গেঁথে দেয়ার জন্যে, কোন রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া অথবা পছন্দনীয় আচার আচরণে অভ্যস্ত করানোর জন্যে বার বার তা অনুশীলন করানো হয় এবং বিরূপ অভ্যাস ও আচরণ থেকে বিরত রাখার জন্যে তা সম্মুখে আসার সম্ভাবনা রহিত করে দেয়া হয়। আর অত্যন্ত সচেতন দৃষ্টি রাখা হয় যেন সেই মন্দ কাজটির কোন সুযোগ না আসে। ধূমপান অথবা চুরির অভ্যাস দূর করার জন্যে সাধারণত তা ব্যবহার ছেড়ে দেয়ার প্রতি কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়।

শিক্ষা গ্রহণে অগ্রগতি হাসিল

কোন কিছুর শিক্ষা গ্রহণ প্রাক্কালে অগ্রগতির হার সমান থাকে না। যদি পুরো মনোনিবেশ সহকারে কাজ আরম্ভ করা যায়, পরিশ্রম ও একাগ্রতা থাকে, পরিস্থিতি অনুকূল থাকে, দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতার সম্ভাবনা না থাকে, কাজের প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে বুঝে আসে, অবসাদ ও অসন্তোষের আশংকাও না থাকে, অনুশীলনীর যথেষ্ট সুযোগ থাকে, ফলাফলও আনন্দদায়ক প্রকাশ পায়, তাহলে শিক্ষা গ্রহণের গতি তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। অন্যথায় তা মন্থর গতি সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই উক্ত শর্তাবলী পূরণ করার পূর্ণ চেষ্টা থাকা চাই।

* যদি উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণ হয় তবে প্রাথমিক পর্যায়ে উন্নতির গতি

www.nagorikpathagar.org

দ্রুত হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু সময় অতিবাহিত হলে উন্নতি সম্পূর্ণ রূপে ব্যাহত হয়। এ হচ্ছে স্বাভাবিক কথা। এমনি ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে মন খারাপ করা বা নিরাশ হওয়া উচিত নয়। শেখা বিষয় ভাল রূপে বদ্ধমূল করার বা দৃঢ় করার জন্যে প্রয়োজন সময়ের। অবশ্য অগ্রগতির হার হ্রাস পাওয়ার অন্য কোন কারণ থাকলে তা বিদূরিত করা চাই।

* পূর্ণ দক্ষতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত অগ্রগতিতে এমনি ধরনের বিভিন্ন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কখনো গতি একেবারে দ্রুততর হয়, কখনো তাতে ভাটা আসে বা সম্পূর্ণরূপে থেমে যায়।

* দক্ষতা ও পারদর্শিতারও একটা সীমা আছে। এর চূড়ায় পৌছলে অগ্রগতি চিরদিনের জন্যে থেমে যায়। এ পর্যায়ে যতই প্রচেষ্টা চালানো হয় অধিক অগ্রগতি সম্ভব হয় না। সুতরাং যখন কোন কাজের অগ্রগতি চূড়ায় উপনীত হয়েছে বলে অনুমিত হয়, তখন অধিক প্রচেষ্টায় সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য অনুশীলনী ও পুনরাবৃত্তি ক্রমাগত চালু রাখা দরকার যেন অর্জিত স্তর থেকে নিম্নে যেতে না হয়।

শিক্ষা গ্রহণে নিপুণতা ও দক্ষতা

শিক্ষা গ্রহণে দক্ষতা ও নিপুণতা অর্জন করা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীলঃ

১) শিক্ষা গ্রহণের সুদৃঢ় ইচ্ছাঃ নৈপূণ্য বা দক্ষতা হাসিলের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো শিক্ষার্থীর নিজের দৃঢ় ইচ্ছা। যতক্ষন পর্যন্ত শিক্ষার্থী কোন কাজ শেখার জন্যে সে নিজে দৃঢ় সংকল্প না রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে অবশ্যই কোন কাজ করতে সক্ষম হবে না। শিক্ষক যতই সুনিপুণ ও অভিজ্ঞ হোক না কেন এবং শিক্ষাদানের জন্যে সে যতই জানপ্রাণ চেষ্টা সাধনা করুক না কেন, শিক্ষার্থীর ঝোঁক প্রবণতা ও সংকল্প ছাড়া সে কখনো সফল হতে পারবে না। সুদৃঢ় সংকল্প অর্জনের জন্যে চাই কঠোর সংগ্রাম। আর চাই কাজের উপকারিতা ও গুরুত্বের সার্থকভাবে মনে গেঁথে যাওয়া। তাছাড়া বিশ্বাস থাকতে হবে যে সে ঐ কাজ শিখতে পারবে।

২) শিক্ষা গ্রহণের জন্যে পদক্ষেপ নেয়াঃ কেবল ইচ্ছা দ্বারা কোন কিছু হয় না। শিক্ষা গ্রহণের জন্যে আবশ্যক বাস্তব উদ্যোগ ও পদক্ষেপ। হাত পা নাড়াচাড়া

www.nagorikpathagar.org

ছাড়া শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব নয়। নিজে করলেই শিক্ষা করা যায়। যেমন সন্তরণ বিদ্যা। শিক্ষক যতই বিখ্যাত সাঁতারু হোন না কেন এবং পুরো আন্তরিকতা ও নিপুণতা সহকারে সন্তরণ শিক্ষাদান করুক না কেন এবং তিনি নিজে বাস্তবে করে দেখান না কেন, তাছাড়া শিক্ষার্থী নিজে পুরো আন্তরিকতা নিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনুক না কেন এবং গভীরভাবে তাঁর সাঁতার প্রত্যক্ষ করুক না কেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার্থী নিজে নদীতে নেমে হাত পা না নাড়বে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কিছুতেই সাঁতার শিখতে পারবে না। এ জন্যেই বিদ্যালয় গুলোতে শিক্ষা হাতে কলমে দেয়ার এবং শিক্ষার্থী নিজে নিজে অভ্যাস করার উপর অনেক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কারণ অপরিচিত শ্রোতা সেজে কোন বিষয়ে কিছুতেই দক্ষতা অর্জন করতে পারবে না।

৩) কাজের উপযুক্ত সময়ঃ শিক্ষা গ্রহণের জন্যে অবস্থা ও পরিবেশ যত অনুকূলে ও সুবিধামত হবে শিক্ষা গ্রহণ ততই সহজ ও সুবিধাজনক হবে। যদি আশপাশের অবস্থা পুরো শান্ত হয়, পরিবেশ হয় অনুকূলে, আর মৌসুমও হয় সুবিধাজনক এবং মনোযোগ দেয়ার ও মনোনিবেশ সহকারে কাজ করার পথে কোন বিশেষ বাধা না থাকে, তাহলে শিক্ষা গ্রহণ অতি সহজেই সম্ভবপর হয়ে উঠে। কিন্তু যদি মনযোগ বিক্ষিপ্ত করার, অসন্তোষ সৃষ্টি করার এবং কাজে বাধা প্রদানের উপাদান পাওয়া যায়, তাহলে শিক্ষা গ্রহণে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অনেক কষ্টে হয়ত কিছু শেখা সম্ভব হতে পারে। এ কারণে পুরো শান্ত ও অনুকূল পরিবেশে শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং মনযোগ বিনষ্টকারী জিনিসগুলো শিশুদের থেকে দূরে রাখা হয়।

৪) কঠোর সংগ্রাম সাধনাঃ দক্ষতা অর্জনের জন্যে প্রয়োজন পূর্ণ মনোনিবেশ ও আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো। পুরো চেষ্টা, কঠোর শ্রম এবং অসাধারণ চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম ছাড়া দক্ষতা অর্জন সম্ভব নয়। দক্ষতার সাথে সাথে কাজের দ্রুতগতি ও সত্তর আনজাম পাওয়ার প্রতি গুরুত্বসহকারে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রশান্ত মনে তো কাজ করা সর্বাবস্থায়ই জরুরী। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে অলসতা ও ধীর গতিতে কাজ করবে। বিষয়ের অভিজ্ঞরা সাধারণতঃ ধীর স্থির গতি প্রদর্শন করে থাকে। প্রথম থেকেই যদি লক্ষ্য রাখা যায়, তাহলে নৈপুণ্য

www.nagorikpathagar.org

হাসিলের সাথে সাথে দ্রুততা অর্জনও সহজ হয়ে উঠে।

৫) কর্মসাধনের মেয়াদঃ কার্য সম্পাদনের জন্যে মেয়াদ এত বেশী লম্বা হওয়া ঠিক নয়, যাতে শিশু থেমে গিয়ে স্থবির হয়ে পড়ে; আবার না এত সংক্ষিপ্ত হবে যে এর মধ্যে কোন বিশেষ ফলাফল লাভ করাই অসম্ভব হয়ে উঠে। বরং বয়স ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তা নির্ধারণ করা চাই। যদি ক্লান্তি এসে যায় তবে কাজ রেখে কিছুটা বিশ্রাম গ্রহণের অবকাশ থাকা চাই। অসাধারণ ক্লান্তি ও অবসাদের সময় কাজ করা যেমন স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর, তেমনি কাজের বেলায়ও নিষ্ফল। এ কারণে রুটিনে শ্রান্তি ও অবসাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ কার্যে প্রভাবশালী উপাদানসমূহ

অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ কার্যে নিম্নের উপাদান সমূহ অত্যধিক প্রভাব বিস্তারকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১) মেধাঃ যে শিশু যত বেশী মেধাবী হয় সে তত সহজেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং শিখে নেয়া বিষয়কে নতুন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে অথবা নতুন পরিস্থিতিতে তা কাজে লাগাতে সক্ষম হয়।

২) বয়সঃ পনের ষোল বছর বয়স পর্যন্ত সাধারণ বয়সের সাথে সাথে শিশুদের মানসিক বয়সও সমভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ জন্যে শেখার কাজও দ্রুত এবং সহজভাবে ক্রমাগত চালু থাকে। এই স্তর পর্যন্ত শিশুদের অনেক কিছু শেখানো যেতে পারে। তারপর থেকে তাদের মানসিক বয়সে কমই সংযোজন হয়ে থাকে এবং শেখার গতিও শিথিল হতে থাকে। তখন কেবল কোন বিশেষ বিষয় বা কতিপয় বিদ্যায় পারদর্শিতা হাসিল করা সম্ভব হয়। এ কারণে স্পৃহা সৃষ্টি করার ও বিভিন্ন বিষয় ও বিভিন্ন বিদ্যার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার সবচে উত্তম কাল হলো পনের ষোল বছর বয়স পর্যন্ত। এই স্তরেই বিভিন্ন বিষয় ও বিদ্যার পরিচয় করিয়ে দেয়া আবশ্যক। যেন নিজে পরবর্তী স্তরসমূহের জন্যে উপযুক্ত বিষয় ও কর্ম নির্বাচন করতে সক্ষম হয়।

৩) অভিজ্ঞতাঃ কোন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করার জন্যে

www.nagorikpathagar.org

যত বেশী সুযোগ পাওয়া যাবে ততই উক্ত বিষয়ে দক্ষতা অর্জিত হবে। আর সে বিষয়ে তা সে সম্পর্কিত বিষয়ে নতুন কিছু শেখাও সহজ হয়ে যাবে। সুতরাং অভিজ্ঞতা হাসিলের জন্যে অধিকতর সুযোগ দেয়া উচিত।

৪) জোর প্রচেষ্টাঃ শেখার জন্যে যত শক্তিশালী প্রচেষ্টা ও শিশুর পক্ষ থেকে যত অধিক ঝোঁক প্রবণতা দেখা যাবে সে তত বেশী শক্তি তাতে ব্যয় করতে উদ্যত হবে এবং তেমনি কঠোর শ্রম ও অসাধারণ চেষ্টা সাধনা করবে। ফলে তত বেশী সফলতা অর্জিত হবে। সুতরাং কোন কিছু শেখানোর আগে শিশুদের সে বিষয়ে পুরোপুরি প্রস্তুত করে নিতে হবে।

৫) সন্তোষজনক ফলাফলঃ শিক্ষা গ্রহণের সময় যদি চেষ্টা সাধনার একটা সন্তোষজনক ফলাফল চোখে দেখতে পায়, তাহলে চেষ্টা সাধনায় অধিকতর সংযোজন হয়। সাফল্যটাই একটা শক্তিশালী উদ্দীপক উপাদান। সুতরাং শিশুদের চেষ্টা সাধনার ফলাফল স্বচক্ষে দেখার সুযোগ থাকা দরকার।

৬) অধিকতর শক্তি বৃদ্ধিঃ শিক্ষা গ্রহণের সময় পুরস্কার প্রদান বা উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে ক্রমাগত অধিকতর শক্তি যোগান দেয়া চাই। এতে করে শেখার কাজ সহজ হয় এবং উন্নতি ও অগ্রগতির হার বৃদ্ধি লাভ করে। শিশুরা নিজের প্রচেষ্টায় যতটুকু উন্নতিই লাভ করুক না কেন, তাতে তাদের উৎসাহ পাওয়া চাই এবং তাদের চেষ্টা সাধনাকে ইহসানের দৃষ্টিতে দেখা উচিত, আর বিভিন্ন উপায়ে তাদের সাহস বৃদ্ধি করা চাই। এতে কর্ম স্পৃহা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায় এবং কর্ম ক্ষমতা বেড়ে যায়। পুরস্কার, পজিশন, নম্বর, সনদ ইত্যাদি এসব ব্যাপারে বেশ উপকারী ব্যবস্থা।

৭) পুনরাবৃত্তিঃ পুনরাবৃত্তি ও বার বার করার সুযোগ যত বেশী পাওয়া যাবে শেখার কাজও তত দ্রুত ও সহজতর হতে থাকবে। আর এতে নতুন নতুন বিষয় শেখার উৎসাহ পাওয়া যাবে।

৮) আন্তরিকতাঃ শিশুদের মধ্যে নতুন কথা জানার অথবা নতুন কিছু শেখার প্রতি যত বেশী মনের আগ্রহ ও অস্থিরতা সৃষ্টি হবে তারা তত অধিক মনযোগ ও গুরুত্ব সহকারে সেই কাজে আত্মনিয়োগ করবে। মনযোগ ও সম্পর্কের পিপাসা সৃষ্টি বা অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির ফলে শেখানোর কাজ সহজ হয়। আন্তরিকতা সৃষ্টি ব্যতিরেকে কোন কিছু শেখা বা শেখানো খুবই কঠিন।

www.nagorikpathagar.org

মনোনিবেশ ও চিত্তাকর্ষণ

মনোনিবেশ বলতে মনের সেই বিশেষ অবস্থাকে বুঝানো হয় যখন অন্যান্য সমস্ত বস্তু থেকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে কেবল একটি বস্তুর উপর নিবদ্ধ করা হয়, যেন সেই বিশেষ বস্তু সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান হাসিল করা যায়।

শিক্ষকমন্ডলী নিজেদের ছাত্রদের থেকে সাধারণভাবে মনোনিবেশ বা একাগ্রতা কামনা করে থাকেন। তাঁদের এই কামনা যুক্তিসংগত। কারণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অগ্রগতির আশা কেবল তখনি করা যেতে পারে, যখন ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার প্রতি, শিক্ষক বৃন্দের কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবন করা ও অর্পিত কার্যাবলী সমাপন করার প্রতি সর্বান্তকরণে মনোযোগী হয়।

* জাগরণে ও সচেতনে মানব মন কোন না কোন বস্তুর প্রতি নিবদ্ধ থাকে। কখনো থাকে আশপাশের জিনিসপত্রের প্রতি, কখনো কারো কথা বা কাজের প্রতি, কখনো নিজেরই কাজকর্ম বা চিন্তা-কল্পনার প্রতি। যখন আমরা এমনি কোন কাজ ছাড়া বসে থাকি, তখনো আমাদের চিন্তা-কল্পনার ধারা চালু থাকে; কখনো এ কথা মনে আসে, কখনো আসে অন্য কথা।

* মনকে যখন কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করা হয় তখন স্বল্প সময়ের জন্যে ঐ বস্তু মনের গন্ডীতে এসে যায়। আর অন্যান্য বস্তু তখন চলে যায় মনের এক প্রান্তে। এক সময় কেবল একই বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। আরেকটি বস্তু যখন মনের গন্ডীতে প্রবেশ করে তখন প্রথম বস্তুটি অমনি সরে গিয়ে দাঁড়ায় মনোরাজ্যের এক প্রান্তে। সচেতন বা জাগ্রত অবস্থায় এমনি চলতে থাকে।

* একই বস্তুর প্রতি দীর্ঘক্ষণব্যাপী মনযোগ নিবদ্ধ রাখা যায় না। প্রতি মিনিটে মন চার পাঁচ দিকে চলে যায়। ছোট শিশুরা তো কোন একটি জিনিসের প্রতি পাঁচ সাত সেকেন্ডের বেশী মন নিবদ্ধ রাখতেই পারে না। অবশ্য

www.nagorikpathagar.org

একই জিনিসের বিভিন্ন দিক যদি বার বার পেশ করা হয় তা স্বতন্ত্র কথা, তখন তো কিছু সময় মনকে নিবদ্ধ রাখা যায়। তা না হলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মনের একাগ্রতা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। নামাযে একাধারে মন নিবিষ্ট রাখার জন্যে আবশ্যক নামাযে যা কিছু পড়া হয় তার অর্থ ও উদ্দেশ্যের প্রতি চিন্তা করা। অন্যথায় মনে যে কত কথা উঁকি মারবে তা কে বলতে পারে?

* এক ব্যক্তি একবার কেবল একটি বস্তুর প্রতি মন নিবদ্ধ করতে পারে। যারা একই সময়ে একাধিক কথার প্রতি মনযোগ দেয়ার চেষ্টা করে তারা মারাত্মক ভুল করে থাকে। এমনটি করলে তারা একাগ্রতা সহকারে একটি মাত্র বস্তুর দিকেও মনযোগ দিতে পারে না। একাধিক বস্তুর প্রতি একই সময়ে কেবল তখনি মনযোগ দেয়া সম্ভব হয়, যখন ঐসব বস্তু মিলে একটি সামগ্রিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং তৎপ্রতি সামষ্টিকভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ সম্ভব হয়। যেমন- তারকারাজি, সপ্তর্ষি মন্ডলস্থ নক্ষত্ররাজি, দুটো নক্ষত্রপুঞ্জ ইত্যাদি, অথবা বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগ নিয়ে গঠিত মানব দেহ, অথবা বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত দৃশ্য। সামগ্রিক দৃষ্টিতে এসব বস্তু মনযোগ নিবদ্ধের কেন্দ্র হতে পারে। কিন্তু যখনি এগুলোর কোন একটির প্রতি মনযোগ দেয়া হবে, তখন অন্যান্য অংশ থেকে দৃষ্টি সরে যাবে।

* কোন কোন শিশু লেখাপড়া করার সময় অথবা মুখস্ত করার সময় কিছু খেতে থাকবে অথবা এদিক সেদিক দেখতে থাকবে অথবা শিক্ষা উপকরণকে বিনা প্রয়োজনে স্পর্শ করতে থাকবে বা তা নিয়ে খেলতে থাকবে। এটা মোটেই ঠিক নয়, এতে করে দৃষ্টি বা মনযোগ নিবদ্ধ থাকে না বরং বিক্ষিপ্ত হয়ে অন্যদিকে চলে যায়। এসব আচার আচরণ থেকে শিশুদের রুখতে হবে। এক সময়ে কেবল একটি মাত্র কাজ করাই সম্ভব।

মনোনিবেশের শর্তাবলী

শিক্ষক ও মাতাপিতার অভিযোগ থাকে যে, শিশু লেখাপড়া অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করার জন্যে মনোনিবেশ করে না। সাধারণত খেলাধূলায়, অপ্রয়োজনে ঘুরে বেড়ানো, খেলার সাথীদের সাথে খোশ-গল্প করা অথবা কিছু ভাঙাগড়ার জন্যে নিজের সময় বিনষ্ট করতে থাকে। শিক্ষার পরিবর্তে অন্য কোন অর্থহীন, বেহুদা জিনিসের প্রতি থাকে অনুরক্ত। তাঁদের অভিযোগ তো মূলত

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। তবে এতে কেবল শিশুদের অপরাধ নেই। বরং তারাও এতে অংশীদার। কারণ তাদের পক্ষ থেকে মূলত ঐসব শর্ত পুরণ করা যায় না, যা শিশুদের লেখাপড়া করা অথবা তাদের উপযোগী কোন কাজে মনোনিবেশ করার জন্যে আবশ্যক।

কোন কিছুর দিকে মনোনিবেশ হওয়ার জন্যে কতিপয় শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু আছে- ১) বাহ্যিক আর কিছু আছে ২) আভ্যন্তরীণ।

বাহ্যিক শর্তাবলী

বাহ্যিক শর্তাবলী নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

প্রচন্ডতাঃ যে বস্তু প্রচন্ডতায় যত অধিক এবং সাইজে যত বৃহৎ সে বস্তু তত অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। যেমন- চমকা রং, তীব্র আলো, উচ্চ শব্দ, সুন্দর চেহারা, বড় পোস্টার ইত্যাদি। পক্ষান্তরে সাইজে ক্ষুদ্রাকার অথবা তীব্রতায় সাধারণ বস্তু দৃষ্টির অগোচরে পড়ে থাকে। এ জন্যে ব্লাকবোর্ডের অংকন বৃহৎ ও স্পষ্ট হওয়া চাই। ছোট শিশুদের জন্যে তৈরী করা ছবির রং চমকা হওয়া চাই আর চাকাটাও রংগীন ব্যবহার করা চাই। ছাত্রদের সামনে ক্ষীণ শব্দে কথা বলা উচিত নয়। আওয়াজ এ পরিমাণ উচ্চ হওয়া চাই যেন শ্রেণীর সবাই স্পষ্টভাবে শুনতে পায়। অবশ্য চিৎকার করা বা অতি উচ্চস্বরে কথা বিভিন্ন কারণে অনুচিত।

* পুনরাবৃত্তি বা পুনরুক্তিঃ কোন শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্যের পুনরুক্তি করা। যেমন- দৌড়! দৌড়!! সাপ! সাপ!! চোর! চোর!! সে ধ্বংস হলো! সে ধ্বংস হলো!! ইত্যাদি অত্যন্ত সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। শিশুরা এমন সব কাহিনী অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শ্রবন করে যাতে একটা ভগ্ন বাক্য স্বল্প বিরতির পর দ্বিতীয় বার উক্তি করা হয়। এমনিভাবে কোন বিজ্ঞপ্তি বার বার চোখের সামনে এলেও দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ থাকে এবং অনেক্ষণ পর্যন্ত একাগ্রচিত্ত থাকে।

* পরিবর্তন বা স্থানান্তরঃ নড়াচড়া করা, প্রসারিত হওয়া, বৃদ্ধি হওয়া, অথবা ক্রমাগত রূপ পরিবর্তনকারী জিনিসও সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে এবং দীর্ঘক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। সাইন বোর্ডের লেখা, বাল্ব যা জ্বলে-নিবে অবস্থায় থাকে ইত্যাদি লাগানোর উদ্দেশ্য মানুষের দৃষ্টিকে এদিকে আকর্ষিত করা, শব্দের উঠানামা দ্বারাও মানুষের মনোনিবেশ আকর্ষণ করে

www.nagorikpathagar.org

রাখা যায়। চলতে চলতে কারো হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া, জ্বলন্ত বাতি হঠাৎ করে নিভে যাওয়া, আলো ক্ষীণ হয়ে আসা, অথবা চলন্ত পাখা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদির প্রতি সাধারণত দৃষ্টি আকর্ষিত হয় না। কিন্তু যখনি এগুলোর কোন প্রকার পরিবর্তন সাধিত হয় তখন হঠাৎ সেদিকে দৃষ্টি চলে যায়।

* নতুনত্ব বা অভিনবত্বঃ কোন নতুন জিনিস সম্মুখে আসা মাত্রই সেদিকে দৃষ্টি পড়ে। কোন পরিচিত বস্তুও যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে আকৃতি পরিবর্তন অথবা কোন অসাধারণ অবস্থায় সম্মুখে আবির্ভূত হয় তবে তা দৃষ্টি আকর্ষণকারী হয়ে থাকে। যেমন কোন সাথীর আশ্চর্য পোষাক পরে সামনে আসা। অবশ্য কোন নতুন জিনিসের ব্যাপারে একেবারেই অপরিচিতি থাকা ঠিক নয়। পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রত্যেক নতুন বস্তুর সাথেও সম্পর্ক থাকা চাই। এই সম্পর্ক অনুকূল না হয়ে যদি প্রতিকূলও হয়ে থাকে তথাপিও। অন্যথায় তা দৃষ্টি গোচরের বাইরে পড়ে থাকবে অথবা শিশুরা তাকে অপরিচিত অনুভব করবে।

* স্পষ্ট ও বোধগম্য হওয়াঃ যে সব বস্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও স্বচ্ছ হয় সেগুলো তুলনামূলকভাবে অধিকতর মনযোগ আকর্ষণকারী হয়ে থাকে, ও বুঝে এসে যায়, সে সব জিনিস সুন্দর হয়, সহজেই বুঝা যায়। অস্পষ্ট বা অপরিষ্কার বস্তুর প্রতি কদাচিতই দৃষ্টি গিয়ে থাকে।

* তুলনা ও মোকাবিলাঃ দুটো বিপরীত বস্তুকে পরস্পরের সম্মুখে পেশ করা হলে মনযোগ আকর্ষণকারী হয়ে যায়। দুই বিপরীত রঙের ছবি অথবা তালিকা, দুই স্থানের উৎপন্ন, দু'জনের আয়, দুটো দেশের মৃতের হার ইত্যাদির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য যদি পাশাপাশি রাখা হয়, তাহলে অতি সহজে মনযোগ আকর্ষণ করা যায়।

আভ্যন্তরীণ শর্তাবলী

উপরে বাহ্যিক শর্তাবলী আলোচনা করা হয়েছে, মনযোগ আকর্ষণের কতিপয় আভ্যন্তরীণ শর্তাবলীও রয়েছে। যেমন-

* চিত্তাকর্ষণঃ আমরা সাধারণত এমন সব বস্তুর প্রতি মনযোগ দিয়ে থাকি যে গুলোর সাথে আমাদের জন্মগত চিত্তাকর্ষণ বা স্বভাবজাত সম্পর্ক থাকে। একটা শিশু খাওয়ার বা খেলার বস্তুর প্রতি সহজেই আকর্ষিত হবে। অথচ একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি আকর্ষিত হবে পান্ডিত্যপূর্ণ লেখা ও আন্তরিকতাময়

www.nagorikpathagar.org

পত্রাবলীর প্রতি।

* অভ্যাসঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে সব বস্তুর প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করার অভ্যাস গড়ে তোলা হবে, ধীরে ধীরে সেগুলোর প্রতি মনযোগ আকর্ষিত হতে থাকবে। এমন কি ঐ সব বস্তু স্বয়ং তেমন মনযোগ আকর্ষণকারী না হলেও। একজন প্রকৌশলী ইঞ্জিনের প্রতি, একজন বেতার যান্ত্রিক বেতার যন্ত্রের শব্দের প্রতি, একজন কারী কারো কিরাআতের প্রতি এবং ডাক্তার ব্যবস্থা-পত্রের প্রতি সহজেই আকর্ষিত হয়। কারণ এগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার অভ্যাস তাদের গড়ে উঠেছে। এ কারণেই বিভিন্ন অফিসে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ নিজেদের পরিবারের সদস্যদের সাথে মিশলেও নিজ নিজ অফিস সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। অথচ অফিস সংক্রান্ত আলোচনা সাধারণত শুষ্কই হয়ে থাকে।

* স্বভাবজাত চাহিদা ও জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয়তাঃ যেসব বস্তুর প্রতি শিশুদের স্বভাবজাত চাহিদা থাকে অথবা জীবন ধারণের জন্যে আবশ্যকীয় হয়, সেগুলোর প্রতি তাদের মনযোগ অতি সহজেই আকর্ষিত হয়। যেমন-খাওয়া-দাওয়া ও খেলাধূলার সামগ্রি ইত্যাদি।

* মন-মানসিকতাঃ মনযোগের প্রতি মন মানসিকতার প্রভাবও পড়ে থাকে। কোন কোন লোক নিজের মন মানসিকতার কারণে নিজের চিন্তায় বিভোর ও নিজের ধারণার ভিতর নিমজ্জিত থাকে। আর কেউ কেউ বহির্জগত সম্পর্কে ও পারিপার্শ্বিকতার প্রতি অধিক মনযোগী হয়। এমনিভাবে যখন ক্রোধের মানসিকতার উদ্রেক হয় তখন আশপাশের সাধারণ দোষ ত্রুটি আকর্ষিত হয় এবং অধিক ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে পুলকিত মনের অবস্থায় এ ধরনের সাধারণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়লেও তার প্রতি কোন লক্ষ্য করা হয় না।

* মস্তিষ্কের ক্ষমতাঃ সুস্থ ও হাসি খুশী অবস্থায় কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি ও মনযোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখ কষ্টের সময় বাইরের বস্তুর পরিবর্তে আভ্যন্তরীণ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকে। অবসাদের সময় মনযোগ বার বার ভ্রষ্ট হয় এবং মন কোন একটি বিষয়ের প্রতি নিবিষ্ট থাকে না।

মনযোগের শ্রেণী বিভাগ

মনযোগ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্তঃ

www.nagorikpathagar.org

১) ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক মনযোগ

* যখন কোন বিষয়ের প্রতি এ জন্যে মনোনিবেশ করা হয় যে এতে করে অন্য একটি উদ্দেশ্য হাসিল করা হবে, তখন তাকে ঐচ্ছিক মনযোগ বলে। যেমন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে, শ্রেণীতে নাম করার জন্যে, শিক্ষকমন্ডলীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে অথবা মাতাপিতার প্রিয় হওয়ার জন্যে লেখাপড়া বা অন্য কোন কাজের প্রতি মনযোগ দেওয়া।

* যখন কোন জিনিস স্বয়ং মনযোগ আকর্ষণকারী হয় এবং তৎপ্রতি মনযোগ আকর্ষণের জন্যে ইচ্ছা করার দরকার না হয়, তখন তাকে বলে অনৈচ্ছিক মনযোগ। যেমন- প্রচন্ড শব্দ, কড়া রং, হৈ চৈ, ডুগডুগির শব্দ, চলন্ত ট্রেন, উড়ন্ত জাহাজ, চলমান সভা ইত্যাদির প্রতি মনযোগী হওয়া। ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক মনযোগও দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। নিম্নের চিত্র দেখা যাক-

মনযোগ (মনোনিবেশ)

ঐচ্ছিক — **বিশেষ**, **সাধারণ**

অনৈচ্ছিক — **স্বভাবগত**, **বাধ্যগত**

* বিশেষ ঐচ্ছিক মনযোগঃ যখন কোন কারণে মনযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং কোন বিষয়ের প্রতি মনযোগ নিবদ্ধ রাখার জন্যে বার বার চেষ্টা করতে হয়, তাকে "বিশেষ ঐচ্ছিক মনযোগ" বলা হয়। যেমন- লেখাপড়ার সময় আশপাশের কতিপয় বস্তু মনযোগ সেদিকে টেনে নেয় অথবা কোন কল্পনা মনের ভিতর উদ্রেক হয়ে বার বার মনযোগ ভ্রষ্ট করে দেয়। আর সেদিক থেকে মনকে ফিরিয়ে কাজে নিবদ্ধ রাখার জন্যে বার বার চেষ্টা করতে হয়।

* সাধারণ ঐচ্ছিক মনযোগঃ যখন কোন কিছুর প্রতি মনোনিবেশ করার জন্যে কেবল একবার ইচ্ছা করে নেয়াই যথেষ্ট হয়, তখন তাকে বলা হয় সাধারণ ঐচ্ছিক মনযোগ।

* স্বভাবগত অনৈচ্ছিক মনযোগঃ যখন স্বভাবগত চিত্তাকর্ষণ বা আন্তরিকতার কারণে মন কোন কিছুর প্রতি হঠাৎ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তখন তাকে বলা হয় "স্বভাবগত অনৈচ্ছিক মনযোগ"। যেমন- লেখাপড়ায় মত্ত থাকা অবস্থায় হঠাৎ কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর আগমন ঘটে অথবা খেলার সাথীরা কোন আকর্ষণীয় খেলায় রত হয়ে পড়ে ইত্যাদি। এমতাবস্থায় শিশুরা খুশীর আতিশয্যে অথবা স্বভাবজাত চিত্তাকর্ষণের কারণে মূল কাজ ভুলে গিয়ে অন্যদিকে মনযোগী

www.nagorikpathagar.org

হয়ে পড়ে।

২) বদ্ধ মনযোগ ও খোলা মনযোগ

কোন কোন লোক প্রকৃতিগতভাবে গভীর মনযোগের অধিকারী হয়ে থাকে এবং কোন একটি বস্তুর প্রতি মনযোগ নিবদ্ধ রাখতে পারে। পক্ষান্তরে কারো কারো মনযোগ হয় ভগ্ন; তারা কিছুক্ষণ পর পর মনযোগ বার বার পাল্টিয়ে বিভিন্ন বস্তুর প্রতি একত্রে মনযোগ দিতে পারে। শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যাবলীতে গভীর মনযোগের প্রয়োজন, পক্ষান্তরে কাজকর্ম বা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কাজের জন্যে ভগ্ন মনযোগ দরকার। বালিকারা স্বাধারণত ভগ্ন মনযোগ সম্পন্ন হয়ে থাকে এজন্যে তারা অংকে দূর্বল থাকে। কারণ এ বিষয়ে গভীর মনোনিবেশের প্রয়োজন হয়।

৩) উড়ন্ত ও স্থায়ী মনযোগ

ছোট শিশুদের মনযোগ বার বার বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। তারা দীর্ঘক্ষণ কোন কিছুর প্রতি মনযোগ নিবদ্ধ রাখতে পারে না। পক্ষান্তরে বয়স্কদের মনযোগা তুলনামূলকভাবে স্থায়ী হয়ে থাকে। তারা দীর্ঘক্ষণ একই বস্তুর প্রতি মনযোগ নিবদ্ধ রাখতে পারে। রোগ বা অবসন্নতার কারণেও মনযোগ অতিসত্বর বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে।

মনোনিবেশ ও চিত্তাকর্ষণ

মনযোগ ও চিত্তাকর্ষণের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিরাজিত রয়েছে। প্রত্যেক মানুষ সাধারণত সে সব জিনিসের প্রতি মনযোগ দিয়ে থাকে যা তার চিত্তাকর্ষণীয় হয়।

শিশুদের সম্পর্কে আমাদের জানা আছে যে, তারা–

* শ্রম মেহনত মুখী হয়ে থাকে তবে সুদৃঢ় মনে কোন কাজ করতে চায় না।

* ছুটি পাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে এবং ভ্রমণ ও বেড়ানো এবং খেলাধূলার পরিকল্পনা করে থাকে।

* স্বাধীনচেতা হয়ে থাকে, কারো চাপ বা শাসন মানতে রাজী হয় না; কোন প্রকার আনুগত্য পছন্দ করে না।

www.nagorikpathagar.org

* মনযোগ ও নিমগ্নতাকে ভয় করে এবং কয়েক ক্রোশ দূরে ভাগে।

* ভাঙা ছেঁড়া, হৈ চৈ, কোলাহল ও খেলাধূলার প্রতি আসক্ত থাকে।

এমনি ধরনের কোন সৃষ্টিকে লেখাপড়া বা কোন গঠনমূলক কাজে লাগানো এত সহজ নয়। শিশুরা এসব কাজে তখনি মনযোগ দিবে যখন এ কাজ তাদের জন্যে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়।

পাঠকে আকর্ষণীয় করার জন্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে–

* সর্ব প্রথম শিশুদের মনে পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভালভাবে বসিয়ে দেয়া, যেন তারা নিজেরাই পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতা অনুভব করতে পারে।

* পাঠ এমনভাবে পেশ করতে হবে যা দিয়ে শিশুদের কোন বুনিয়াদী ইচ্ছা, স্বভাবজাত চাহিদা, প্রাকৃতিক দাবী বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য পুরণ হয়ে থাকে। যেমন– খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষাদান, বা অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করে তা দিয়ে প্রশান্তির উপকরণ যোগাড় করা হয়; কিছু গঠনমূলক কাজ বা ভাঙাগড়ার সুযোগ দেয়া হয়। সাথীদের মূল্যায়ন, বড়দের সাহস প্রদান, শিক্ষক মন্ডলীর সন্তুষ্টি ইত্যাদি হাসিলের মাধ্যম রূপে সৃষ্টি করতে হবে।

* সম্ভব হলে পাঠের মূল বিষয় বস্তু বা কেন্দ্রীয় ধারণা (Central idea) কাহিনী বা কথোপকথনের আকারে পেশ করা।

* মৌলিক আলোচনা ও বিশেষ চিন্তাধারাসমূহ বস্তুনির্ভর চিত্তাকর্ষক উদাহরণ, চিত্র ও তালিকার সাহায্যে বুঝিয়ে দেয়া।

* ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উপকরণ, গ্লোব, তালিকা, চিত্র, আদর্শ ছবি, রঙিন ছক ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠ স্পষ্ট করা শিশুদের ব্যক্তিত্ব ও তাদের প্রচেষ্টার গুরুত্ব প্রদান করবে। পাঠ আগানোর ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করবে। তাদের পরামর্শ নেবে। অবশ্য ব্যর্থতার মুখ যেন দেখা না যায়।

* একটা সীমা রেখা পর্যন্ত প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দিতে হবে।

* শিশুদের নিজ নিজ প্রচেষ্টার অনুকূল ফলাফল স্বচক্ষে অবলোকন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

* পাঠকে তার দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে দেবে এবং এতদসম্পর্কিত পরিবারের এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করবে যাতে তার কোন স্বভাব–প্রকৃতির তৃপ্তি মেলে। যেমন– টিকেট সংগ্রহ, ব্যাজ সংগ্রহ, কোন মডেল

www.nagorikpathagar.org

তৈরী করা ইত্যাদি।

* সকাল বেলায় শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে হাজির হয়, তখন তাদের মানসিকতা বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। এ জন্যে প্রথম ঘন্টায় কোন সহজ বিষয় বা প্রকৃতিগত চিত্তাকর্ষণীয় কোন বিষয় রাখবে।

* কিছুক্ষণ পরে শিশুদের মনযোগ অত্যন্ত দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পায় এবং দ্বিতীয় তৃতীয় ঘন্টায় তা যৌবনে পদার্পণ করে। ও সব ঘন্টায় মনযোগ আকর্ষণ আবশ্যক- এমন বিষয়সমূহ রাখবে। যেমন- অংক, আরবী ও মাতৃভাষা ইত্যাদি।

* ছোট শিশুদের মনযোগ ঘন ঘন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা কোন একটি বিষয়ে অনেকক্ষণ মনযোগ নিবদ্ধ রাখতে পারে না। তাই তাদের ঘন্টা সংক্ষিপ্ত রাখতে হবে এবং অনেক্ষণ পর্যন্ত মনযোগ নিবদ্ধ রাখার অভ্যস্ত করার জন্যে বার বার বিষয় পরিবর্তন করে এবং নতুন কিছু সংযোগ করে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু পেশ করতে হবে। এভাবে তারা কিছুক্ষণ পর্যন্ত মনযোগ নিবদ্ধ রাখতে সক্ষম হতে পারে।

* শিশুদের মনযোগ আকর্ষণ করার এবং তাদের আকর্ষণ স্থায়ী রাখার জন্যে শিক্ষকেরা নিজেই উক্ত কাজের প্রতি গভীর মনযোগ নিবদ্ধ রাখবেন এবং পাঠে অধিকতর মনযোগ ও আকর্ষণের প্রদর্শনি করাবেন।

* পাঠের বিভিন্ন দিক এমনভাবে পেশ করবেন যেন মনে হয় যে একটা অংশ অন্য অংশের পরিশিষ্ট এবং স্বাভাবিক ভাবে মনযোগ পরবর্তী অংশের প্রতি নিবদ্ধ হয়। এমনটি যেন না হয় যে একটা অংশের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে মনযোগও সমাপ্ত হয়ে পড়ে।

এমনিভাবে বিভিন্ন প্রবন্ধও এমনভাবে সুসামঞ্জস্য করে পড়াবে যে মনযোগ স্বাভাবিকভাবেই একটা থেকে অপরটার প্রতি ধাবিত হয়। যেন একটা প্রবন্ধ শেষ হলেই মনযোগ অন্যদিকে না যায়।

* প্রত্যেক নতুন কথা পূর্বের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত করে পেশ করবে যেন নতুন পাঠ শিশুদের কাছে একেবারেই নতুন বা বোধগম্যের বাইরে মনে না হয়।

* ইবতেদায়ী শ্রেণীর শিশুরা কেবল এমন বিষয়ের প্রতিই মনযোগী হয়ে থাকে যাতে স্বভাবজাত আকর্ষণ থাকে, অথবা যা অজ্ঞাতসারে মনযোগ আকর্ষণ করে। যেমন- খেলা, আর্ট ক্রাফটের কাজ, উজ্জ্বল রঙ, তীব্র শব্দ, নড়াচড়াকারী

www.nagorikpathagar.org

ও প্রসারিত হওয়ার বস্তু ইত্যাদি।

এসব দিয়ে শিক্ষা দিলে মনযোগ আকর্ষণ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। যেমন- খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া, পাঠদানে রঙিন ছবি ব্যবহার করা ইত্যাদি। কিন্তু ক্রমান্বয়ে শিশুদের ঐচ্ছিক মনযোগের অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা চাই। কারণ জীবনে মানুষকে এমনি ধরনের কাজের অধিক সম্মুখীন হতে হয় যা মূলত চিত্তাকর্ষণকারী নয়। ফলে শিশুরা সেসব কাজেও মনযোগী হতে পারবে যেসব কাজ প্রকৃতিগতভাবে চিত্তাকর্ষণকারী না হলেও তাদের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী।

* শিক্ষাদান কার্য পুরো শান্ত পরিবেশে আনজাম দিবে। তাহলে শিশুরা সহজেই মনযোগী হতে পারবে এবং তাদের মনযোগ বিক্ষিপ্তকারী কোন কিছুকে নিকটে ঘেঁষতে দেবে না। অপ্রাসঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ চোখের আড়ালে রেখে দেবে। ব্লাক বোর্ড থেকে অপ্রাসংগিক লেখা মুছে ফেলবে। অপ্রাসংগিক ছবি ও তালিকা সম্মুখ থেকে সরিয়ে দেবে।

* শিশুদের মনযোগ আকর্ষণ করার জন্যে বার বার ভয় দেখানো, ধমক দেয়া, টেবিলে হাত মারা, ছড়ি রাখা, উচ্চস্বরে চিৎকার করা সমীচীন নয়। এমনটি করলে শিশুরা সাময়িকভাবে মনযোগী হলেও এই মনযোগ স্থায়ী হয় না। তাছাড়া এসব বস্তু অধিক ব্যবহারের ফলে এমন কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, যা মূল বিষয়ে মনযোগ দেয়ার পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। কিছু দিন পরে এ ধরনের প্রচেষ্টা প্রভাব শূন্য ও নিষ্ফল প্রমাণিত হয়ে পড়ে।

* শ্রেণীর প্রতি ক্রমাগত লক্ষ্য রাখা উচিত। ব্লাকবোর্ডে লেখার সময়ও শ্রেণীর দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা উচিত নয়। বরং একদিক থেকে লেখা এবং শ্রেণীর প্রতি বার বার তাকানো উচিত। অমনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীকে হঠাৎ করে প্রশ্ন করবে। এভাবে পাঠের প্রতি শ্রেণীর মনযোগ লেগে থাকবে।

* শিশুদের মনযোগের সীমানা অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে থাকে। একই সময়ে মাত্র কতিপয় বস্তুতেই সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং পড়ানোর সময় সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহার করা উচিত। বেশ থেমে থেমে বলা চাই। বানান লেখানোর সময় একেবারে অত্যন্ত ছোট বাক্যাংশ বলা উচিত।

www.nagorikpathagar.org

স্মৃতি (মনে রাখা)

স্মৃতি আমাদের মস্তিষ্কের সেই শক্তির নাম যা দ্বারা আমরা সম্মুখে আগত কথা, ঘটনাপঞ্জী, অভিজ্ঞতা ও সমস্যাবলী ইত্যাদিকে মনে ধরে রাখি, পুনরায় মনে জাগ্রত করি এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে তার পরিচয় করি।

স্মৃতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। এটা ছাড়া আমরা এক কদমও এগুতে পারি না। চিন্তা করে দেখুন! আমরা যদি আমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতা ভুলে যাই, নিজের ওয়াদা অঙ্গীকার, করজ, লেন-দেন বা কাজ কারবার মনেই না থাকে, বিভিন্ন স্থান ও সেখানে যাওয়া আসার পথ, পরিচিত চেহারা, মানুষের সাথে আত্মীয়তা, তাদের কথা ও চেহারা যদি আমাদের স্মৃতিপট থেকে উধাও হয়ে যায় অথবা যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের হেদায়াত যদি আমাদের মনে না থাকে, তাহলে দেখুন জীবনটাই তো বোঝা হয়ে পড়বে। স্মৃতি না থাকলে আমাদের যে সব লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়, যে কেউ তা অনুভব করতে পারে।

স্মৃতি একটা স্বভাবগত শক্তি। এর সম্পর্ক হচ্ছে মস্তিষ্কের গঠন প্রকৃতির সাথে। তাই এতে কোন প্রকার হ্রাস বৃদ্ধির প্রশ্ন নেই। মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই বহাল থাকে। অবশ্য যদি এদিয়ে কাজ আদায় করার পদ্ধতি ও রীতিনীতি অনুসরণ করা যায়, তাহলে সামান্য স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিও ইনশাআল্লাহ্ সুচারুরূপেও নিজের কাজ আনজাম দিতে সক্ষম হয়। সুতরাং এই শক্তি ব্যবহার করে যথাযথ কাজ করার পদ্ধতি সবাইকে জেনে নেয়া উচিত।

যে স্মৃতিতে নিম্নের বৈশিষ্টসমূহ পাওয়া যাবে তাকে উত্তম স্মৃতি বলা যায়।

* সত্বর স্মরণ করা * প্রয়োজনে মনে হওয়া

* অনেক দিন স্মরণ রাখা * অপ্রয়োজনীয় কথা বিস্মৃত হওয়া।

www.nagorikpathagar.org

আমরা যদি যথাযথ নীতি পদ্ধতি অনুযায়ী এই শক্তিকে কাজে লাগানো শিখি, তাহলে স্মৃতিতে এই গুণাবলীর সৃষ্টি হতে পারে। এ প্রসংগে পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে চিন্তা করার পূর্বে স্মৃতি সম্পর্কিত কাজ সম্বন্ধে আরও কিছু আবশ্যকীয় কথা জেনে নেয়া দরকার।

স্মৃতির উপাদানসমূহঃ

সর্বাবস্থায় স্মৃতির নিম্নোক্ত উপাদান পাওয়া যায়ঃ

১) স্মরণ রাখা

অর্থাৎ কোন ঘটনা, কথা বা বস্তু ইত্যাদি মনের স্মৃতিপটে অংকিত হওয়া। এগুলো অন্তরে যত সুস্পষ্ট হয়ে প্রবেশ করে এবং যত অধিক মনোনিবেশ সহকারে শোনা হয় তত গভীর ও দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয় এবং অনেক দিন পর্যন্ত জাগরূক থাকে। এ ব্যাপারে কোন গুরুত্ব না দিলে অথবা এসব বিষয়ে ভাসা ভাসা শুনলে বা বলা হলে স্মৃতির নক্সা অংকিত হবে অস্পষ্ট হয়ে আর সত্বর তা মুছে যাবে স্মৃতিপট থেকে। মুখস্ত করিয়ে দেয়ার পূর্বে যদি বিষয়টির তাৎপর্য, আবশ্যকতা ও গুরুত্ব যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়, তবে তা আরও অধিক গুরুত্বসহকারে মনে রাখা হবে আর অনেক দিন পর্যন্ত স্মরণ থাকবে। প্রথম অবস্থায় শিশুরা অনেক কথা না বুঝে বার বার উল্লেখ করে অনুকরণে পাকা হয়ে যায়। এভাবেও তাদের অনেক কথাও মুখস্ত করানো যেতে পারে। এ ধরনের মুখস্ত বিষয় অনেক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বহন করে থাকে। যেমন– দোয়াসমূহ, যিকর, কবিতা, প্রবাদবাক্য, নামতা ইত্যাদি। কিন্তু যদি মুখস্ত করার পূর্বে শিশুদেরকে অর্থ বুঝিযে দেয়া হয় এবং পাঠের গুরুত্ব ও উপকারিতা সংক্ষিপ্তভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয় অথবা খেলাধূলার মাধ্যমে মুখস্ত করানো হয়, তা মুখস্ত করতে বেশ সহজ হয়ে থাকে। কোন কথা মনোনিবেশ সহকারে ও আন্তরিকতা নিয়ে শোনা হলে, তা দীর্ঘদিন মনে থাকে। এমনিই তো মানব স্বভাবই এমন যে তারা সে সব কথাই দীর্ঘদিন স্মরণ রাখে যে সব কথায় তারা আগ্রহী হয়ে থাকে।

২) পূনঃস্মরণ করা

অর্থাৎ সংরক্ষিত কথা প্রয়োজনে দ্বিতীয় বারের মত স্মরণ করা। এটিও

www.nagorikpathagar.org

স্মরণ শক্তির আবশ্যকীয় উপাদান আমাদের স্মৃতিপটে শত কথা অংকিত থাকতে পারে কিন্তু তা সময় মত মনে না এলে কি লাভ? পক্ষান্তরে সামান্য কিছু স্মরণ থাকার পর তা যদি প্রয়োজনের সময় মনে পড়ে তবে তা উপকারে আসবে।

কোন কথা যতই যথাযথ মুখস্ত করা যাবে তত সহজেই তা প্রয়োজনে মনে আসবে। কোন কিছু মুখস্ত করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখলে স্মরণ রাখা সহজ হবে।

* একটা কথা আরেকটা কথা প্রসংগে সহজেই মনে আসে। এর বিপরীত যদি প্রতিটি কথা স্বতন্ত্র ভাবে মনে রাখা হয়, তাহলে প্রয়োজনের সময় তা মনে আসতে কঠিন হয়। তাই যে নতুন কথা মুখস্ত করানো আবশ্যক তাকে কোন অতীত কথার সাথে অবশ্যই সম্পৃক্ত করিয়ে দেবে। যেমন- আল্লামা শিবলির জন্ম (১৮৫৭ ইং) তারিখে সিপাহী বিপ্লব হয়েছিল এবং মৃত্যু (১৯১৪ ইং) তারিখে বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল। মাওলানা আযাদের জন্ম তারিখে (১৮৮৮ ইং) তিনটি আট রয়েছে। তিনি পন্ডিত নেহেরুর (১৮৮৯ ইং) এক বছর বড় ছিলেন।

* বিভিন্ন বস্তুর সাথে এই সম্পর্ক ও চেইন তিন পদ্ধতিতে স্থাপন করা যেতে পারে।

১) সম্পর্ক স্থাপন করেঃ দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে পরস্পরের যত নৈকট্য, সান্নিধ্য ও সম্পৃক্ততা হবে ততই একটা অপরটার সাথে গ্রথিত হবে এবং একটা উল্লেখ করে অপরটি স্মরণ করানো যাবে। যেমন- দু'জন বন্ধুকে কয়েকবার একত্রে দেখলে একজনের সাক্ষাত অপর জনকে স্মরণ করিয়ে দেবে। আযান শুনলেই নামাযের কথা মনে হওয়া আবশ্যকীয়। কেননা উভয় পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এভাবে কোন দুটো বিষয়কে পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত করে দিলে মনে রাখা ও স্মরণ হওয়া সহজ হয়ে থাকে।

২) উদাহরণ তুলনার সাহায্যেঃ একটা অজানা বস্তুকে যদি কোন জানা বস্তুর সাথে তুলনা করে উভয়ের মধ্যকার সামঞ্জস্য ও তুলনা ভালভাবে স্মৃতিপটে বসিয়ে দেয়া যায়, তাহলে একটি বস্তুর স্মরণ হতেই অপরটি মনে পড়ে যাবে। যেমন- জেব্রা গাধার সাথে এবং জিরাপকে উটের সাথে তুলনা করা, কিন্তু এ প্রসংগে স্মরণ রাখবে যে সামঞ্জস্য যদি অনেক বেশী থেকে থাকে, তবে পরিচিতির ব্যাপারে কখনো কখনো ধোকায় পড়ে

www.nagorikpathagar.org

যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একই চেহারার দুই ভাইকে চিনতে প্রায়ই ধোকায় পড়তে হয়। এজন্যে সামঞ্জস্য ও তুলনা করার সময় এতদোভয়ের মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলোও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে, তবেই এরূপ ধোকায় পড়বে না। জেবরা ও গাধা এবং জিরাপ ও উটের প্রকাশ্য পার্থক্য এই যে জেবরার দেহে কাল-সাদা রেখা হয়ে থাকে আর জিরাপের সমস্ত দেহে কাল দাগ থাকে ইত্যাদি। কুরআন মজীদের যে সব আয়াত সম্পর্কে হাফেজগণ ভ্রান্তিতে পড়ে যায় সে সব আয়াতের শব্দ অথবা বিষয়বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে অথবা সম্পূর্ণ একই ধরনের হয়। পূর্বাপর আয়াতের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে স্মৃতিপটে বসিয়ে দিতে হবে যেন ঐ ভ্রান্তির অবকাশ না থাকে।

৩) পাশাপাশি রেখেঃ কোন জানা বস্তুর পাশাপাশি একটা নতুন বস্তু রেখে যদি উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য দেখিয়ে দেয়া হয় তাহলেও একটার সাহায্যে অপরটা স্মরণ রাখতে এবং একটির জন্যে অন্যটি মনে আসা অতি সহজ হয়।

অনেক জিনিস বিপরীত জিনিস দিয়ে সহজেই জানা যায়। ত্যাগের কোন ঘটনার সাথে স্বার্থপরতার কোন ঘটনা, ধর্মীয় ব্যাপারে আওরঙ্গজেব ও আকবরের পাশাপাশি পেশ করা। মোট কথা, বিভিন্ন পদ্ধতিতে পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে নতুন অভিজ্ঞতার সম্পর্ক স্থাপনের ফলে বিষয়টি সহজেই বুঝে আসে এবং তা স্মরণ রাখতে ও প্রয়োজনে মনে করতে সহজ হয়। ঐ পদ্ধতি সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে হোক অথবা সামনাসামনি রেখে বা তুলনা করেই হোক। এ জন্যে শিশুদের শিক্ষাদানের সময় তৎপ্রতি পুরো লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিটি বিষয় পূর্ববর্তী বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে এবং তুলনা করে বা পাশাপাশি রেখে খুব ভালভাবে স্মৃতিপটে আবদ্ধ করিয়ে দেবে।

* কোন বক্তৃতা অথবা কোন পাঠ্য বিষয় স্মরণ রাখতে হলে সহজ পন্থা হলো প্রথমে বিষয়টির একটা শিরোণাম নির্ধারণ করবে এবং অন্তর্ভূক্ত উপশিরোণামও বিষয়বস্তুর অধীনে নোট আকারে উক্ত বিষয়ের একটা সংক্ষিপ্ত কাঠামো দাঁড় করাবে। শিরোণামের কারণে সেই বক্তৃতা বা বিষয় মনে আসবে এবং অন্তর্ভূক্ত উপশিরোণামের সাহায্যে পূর্বাপর সম্পর্ক বা ধারাবাহিকতা সহকারে পুরো প্রবন্ধ বা বক্তৃতার বিষয়বস্তু স্মরণ থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

* মুখস্থ করার সময় পূর্ণ নির্ভরশীলতা ও ভরসা সহকারে মুখস্ত করবে। সন্দেহের কোন অবকাশই যেন না থাকে। এতে করে মনে রাখতে ভুলত্রুটি কম হবে। অন্যথা ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

* কোন স্থান, বস্তু, বা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হলেও বিভিন্ন কথা স্মরণ থাকবে।

* শিশুদের বোধশক্তি খুবই সীমাবদ্ধ। তারা একই সময়ে মাত্র দু'তিন কথা মনে রাখতে পারে। এজন্যে তাদের পাঠ্য বই গুলোতে বাক্য সংক্ষিপ্ত ও শব্দাবলী ছোট হওয়া চাই। বিষয় ভিত্তিক প্রশ্নেও যথাসম্ভব স্বল্প জটিলতা হওয়া চাই। এক সাথে একাধিক বিষয়ের নির্দেশ দান করা উচিত নয়। অন্যথা কোন কোন কথা ভুলে যাবে। বাজার থেকে কোন সওদা ক্রয় করতে দিলে এক সাথে আট দশটি জিনিসের জন্য নির্দেশ দেয়া উচিত হবে না। একান্ত প্রয়োজন হলে তালিকা লিখে দেবে অন্যথা স্মরণ রাখতে পারবে না।

৩) পরিচিতি ও ব্যক্তিত্ব

অর্থাৎ সামনে এলেই অথবা স্মরণ করলেই পূর্বের কথা মনে পড়া এবং বস্তুকে পূর্ব পরিচিতি অনুসারে ভাল করে চিনতে পারা। এটাও স্মৃতির বিশেষ উপাদান। আমরা যদি মনে রাখা বস্তুসমূহকে পূর্বের জানা অনুসারে চিনতেই না পারি তাহলে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। এমনটি হয়ে থাকলে আমরা সেগুলোর সাথে সমীচীন আচরণ করতে সক্ষম হবো না। এমতাবস্থায় চরম লজ্জায় পড়তে হয়। যখন একজন পুরানো দেখা পরিচিত লোকের সাথে অনেক দিন পরে সাক্ষাত হয়, তখন আমাদের এতটুকু যদি মনে থাকে যে লোকটাকে যেন কোথায় দেখেছি কিন্তু তার নাম ঠিকানা স্মরণ না থাকে এবং ভাল করে তাকে চিনতে না পারি, তখন সে তো পূর্ব পরিচিতি অনুযায়ী নির্দ্বিধায় কথা বলতে থাকে এবং কোন কোন বস্তুর বরাত পেশ করে থাকে, অথচ তখন আমরা অন্ধকারে থাকি এবং তাকে যথাযথ সম্বর্ধনা দিতে পারি না। এ জন্যে ব্যক্তি ও বস্তুর ছবির সাথে সাথে নাম, মর্যাদা এবং বিবরণ বা ঘটনাসহ এগুলোর দৃশ্যাবলীও মনে থাকা আবশ্যক; তাহলেই চিনতে সহজ হবে।

শিশুদের পাঠ বার বার বলে শুনিয়ে দেবে। কিন্তু অক্ষর ও বাক্য চিনতে না পারা কত ক্ষতিকর তা আমাদের সবারই জানা আছে। স্মরণ রাখা ও মনে করার

www.nagorikpathagar.org

অনুশীলনীর সাথে সাথে পরিচিতির ও অনুশীলন করা চাই।

শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নাম স্মরণ রাখা এবং নাম ধরে তাদের ডাকা তাদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক ও আত্মীয়তার প্রমাণ বহন করে। এতে ছাত্রদের মনে নিজের গুরুত্ব ও ব্যক্তিত্বের অনুভূতি জাগ্রত হয়। শিক্ষকের উচিত তিনি যেন শ্রেণীর সকল ছাত্রদের কেবল চেহারা পরিচিতিকে যথেষ্ট মনে না করেন। বরং তিনি যেন তাদের নাম স্মরণ রাখেন। ছাত্রদের আঙুলের ইঙ্গিতে কিছু বলার পরিবর্তে নাম ধরে কোন হুকুম দিলে অথবা কোন কাজ থেকে বিরত রাখলে অধিক প্রভাব পড়ে থাকে। এই পদ্ধতি ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ করাও সহজসাধ্য হয়ে থাকে।

স্মরণ রাখার পদ্ধতি ও ব্যবস্থা (মুখস্ত করানোর নিয়ম পদ্ধতি)

স্মরণ রাখানোর নিম্নোক্ত পদ্ধতি ও ব্যবস্থা অভিজ্ঞতা থেকে বেশ ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে সত্ত্বর মনে হয়, দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্মরণ থাকে এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে স্মরণ হয়।

১) হাসি-খুশী ও প্রফুল্ল অবস্থায় মুখস্ত করানো উচিত। অবসাদ, বিষণ্নতা ও ব্যথ্যানুভূতির সময় কোন কথা মুখস্ত করানো যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তেমনি যথেষ্ট সময় ও শ্রম ব্যয় করা সত্ত্বেও আশানুরূপ সফলতা অর্জন সম্ভব হয় না। সুতরাং সর্বদা এমন সময় মুখস্ত করানো উচিত যখন মন মানসিকতা সতেজ থাকে।

২) অংশ বিশেষ মুখস্ত না করিয়ে পূর্ণ বিষয় করানো। অর্থাৎ একটা পূর্ণ বিষয়কে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে মুখস্ত করানোর চাইতে পুরো বিষয়টাকে একত্রে স্মরণ রাখানোর চেষ্টা করা উচিত। যদি কোন ছোট সূরা, ছোট রুকু, সংক্ষিপ্ত দোয়া, কতিপয় কবিতাংশ অথবা সংক্ষিপ্ত পাঠ্যাংশ মুখস্ত করানোর প্রয়োজন হয় তা সম্পূর্ণটা একত্রে মুখস্ত করানোই উত্তম। পুরো সূরা, রুকু বা কবিতা বার বার পড়ানো উচিত। যে অংশ মুখস্ত হয় তা না দেখে এবং বাকী অংশ দেখে দেখে পুনঃ পুনঃ পড়াতে থাকবে। অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো পাঠ মুখস্ত হয়ে যাবে। একটা পৃথক কবিতাংশ বা পংক্তি পৃথক পৃথক মুখস্ত করিয়ে জোড়া লাগানোর মধ্যে কোন গতিশীলতাও থাকে না, আর সময়ও লাগে অনেক।

www.nagorikpathagar.org

৩) পূর্ণ বিষয়কে যুক্তিযুক্ত অংশে বিভক্ত করে মুখস্ত করানো। যদি, সূরা, পদ্যাংশ, বক্তৃতা বা বিবরণ লম্বা হয় তবে দু'একবার পড়িয়ে অর্থটা ভালভাবে বুঝিয়ে দেবে, তারপর তাকে যুক্তিযুক্ত অংশে বিভক্ত করে উপরোক্ত পদ্ধতিতে তা মুখস্ত করাবে। অংশগুলো এমন হওয়া চাই যে প্রত্যেক অংশে যেন একটা বাক্য পূর্ণ হয়। যেমন– পাঁচ লাইনের স্তবক বিশিষ্ট পদ্যের প্রত্যেক লাইনকে একটা অংশ ধরে নিবে। অবশ্য প্রত্যেক অংশের শেষ শব্দের সাথে পরবর্তী অংশের প্রথম শব্দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দিতে হবে। এতেকরে গতিশীলতা ও ধারাবাহিকতা বহাল থাকবে।

৪) বিরতি দিয়ে মুখস্ত করাবে। একই বৈঠকে সম্পূর্ণ অংশ মুখস্ত করানোর পরিবর্তে যদি বিরতি দিয়ে মুখস্ত করানো হয়, তাহলে খুব বেশী মজবুতভাবে মুখস্ত হয়ে থাকে এবং দীর্ঘদিন তা ভুলে না। এতেকরে সময়ও কম লাগে, কারণ প্রত্যেক বৈঠকে দেমাগ তাজা হয় এবং দ্রুত ও ভালভাবে মুখস্ত করতে পারে। তাছাড়া বিরতি দেয়ার ফলে মুখস্ত করা বিষয় অন্তরে গভীর শিকড় গজানোর সুযোগ পায় আর কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পুনঃস্মরণ করাও সহজ হয়ে থাকে।

৫) মুখস্তের পর কিছু সময় বিরত থাকা চাই। স্মৃতিকে একাধারে কাজে লাগিয়ে রাখলে তা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এ জন্যে কোন কিছু মুখস্ত করানোর পর স্মৃতিতে মুখস্ত বিষয়টিকে যথার্থরূপে বসিয়ে দেয়ার জন্যে কিছু সময় বিরাম দেয়া আবশ্যক।

৬) বিভিন্ন বিষয় সম্পর্ক স্থাপন করে মুখস্ত করাবে। প্রথম থেকে যে বিষয়টি মুখস্ত ছিল তার সাথে নতুন বিষয়কে সংযোগ করে মুখস্ত করালে সত্বর মুখস্ত হয় এবং প্রয়োজনে সহজেই মনে হয়। বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন বিষয় স্মরণ রাখা ও মুখস্ত করা কঠিন হয়ে থাকে। অথচ বিন্যস্ত ও সংগতিপূর্ণ বিষয় সহজেই মুখস্ত হয় ও মনে আসে। শব্দের বর্ণমালা, কবিতা ও বাক্যের শব্দাবলী এবং প্রবন্ধের বাক্যসমূহ, ঐতিহাসিক ঘটনা ও দিনকাল ইত্যাদির মাঝে একটা সম্পর্ক ও ধারাবাহিকতা থাকে। এই সম্পর্ক ও ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখলে মনে রাখা বা মুখস্ত করা সহজ হয়।

৭) মুখস্ত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ, হওয়া বাঞ্ছনীয়। মুখস্ত করার পর কিছু

www.nagorikpathagar.org

তো সেই দিনেই ভুলে যায় আর কিছু ভুলে যায় তিন চার দিনের মধ্যে। এজন্যে মুখস্ত করিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া ঠিক নয়। বরং তিন চার দিন পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা উচিত। তাহলে ভালভাবে মুখস্ত হয়ে যাবে আর ভুলে যাওয়ার আশংকা থাকবে না।

৮) মুখস্ত করানোর পূর্বে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করানো উচিত। যা কিছু মুখস্ত করাতে হবে তার গুরুত্ব ও উপকারিতা স্মৃতিপটে অংকিত করিয়ে এবং মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়ে মুখস্ত করাবে। মানসিক প্রস্তুতি যত গভীর হবে মুখস্ত করাতে তত সহজ হবে।

স্মৃতির প্রকারভেদ

স্মৃতি কয়েক প্রকার হয়ে থাকেঃ

* সাময়িক স্মৃতিঃ অর্থাৎ এমন ধরনের মনে রাখা যা সাময়িকভাবে কাজে আসে এবং বিশেষ কাজটি শেষ হওয়ার পর স্মৃতি থেকে তা মিটিয়ে দেয়া হয়। যেমন- কথোপকথনে নিজের অংশ বা এমন কোন বক্তব্য যা বিশেষ কোন স্থানের জন্যে তৈরী করা হয়েছে।

* স্থায়ী স্মৃতিঃ এমন স্মৃতি যা স্বতন্ত্রভাবে কাজে আসে। যেমন- শব্দের অর্থ, ঐতিহাসিক ঘটনা ও দিনকাল ইত্যাদি।

* টাটকা স্মৃতিঃ যাতে শব্দে শব্দে হুবহু প্রয়োজনে পুনঃ বলা হয়। এ ধরনের মুখস্ত করার পেছনে অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করা আবশ্যকীয় নয়। শিশুরা প্রধানতঃ না বুঝে শুনে মুখস্ত করে নেয়।

* বাচনিক স্মৃতিঃ যাতে শব্দের পরিবর্তে তাৎপর্য স্মরণ রাখা হয় আর প্রয়োজনে নিজ ভাষায় সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা হয়।

* তীক্ষ্ণ স্মৃতিঃ মুহূর্তের মধ্যে মনে রাখার যোগ্যতা।

* ধীর স্মৃতিঃ যথেষ্ট সময় ব্যয় করলে স্মরণ রাখতে পারার ক্ষমতা।

* বিশেষ স্মৃতিঃ কেউ কেউ দেখা সাদৃশ্য (ছবি) জিনিস সহজে মনে রাখতে পারে। কেউ মনে ধরে রাখতে পারে শোনা কথাকে। যেসব লোক চোখে দেখা জিনিস মনে রাখার যোগ্যতা সম্পন্ন, তারা কোন লেখা বিষয় স্বচক্ষে না দেখে মুখস্ত করতে পারে না। এ জাতীয় লোকে কোন কথা পুনঃ স্মরণ করার সময় বইএর পৃষ্ঠা ও পংক্তি অথবা ব্লাকবোর্ডের পূর্ণ ছবি এবং তাতে লেখা শব্দ বা বাক্যের ছবি স্মৃতিপটে অংকিত করে নেয়। কোন

www.nagorikpathagar.org

কোন কোরআনে হাফেজের কোরআন শোনাবার সময় মনে হয় যে তারা কোরআন শরীফ দেখে দেখে তিলাওয়াত করছে। এমন কি তাদের চোখে পাতার দু'পিঠ দেখা যায়। এ জাতীয় মুখস্তকারীদের ছবি মনে রাখা খুবই সহজ। কাজেই যাকে একবার দেখে তার চেহারা দীর্ঘদিন স্মরণ থাকে। পক্ষান্তরে শ্রবন করে মনে রাখার অভ্যস্থরা কোন কথা শুনে সহজেই স্মরণ রাখতে পারে এবং ঠিক ঠিক পুনরায় বলে দিতে পারে। এ জাতীয় লোকেরা কিরআত, কবিতা, সূরা, গান ও গজলের অনুকরণ অতি সহজেই করতে পারে।

* অসংলগ্ন স্মৃতিঃ ছোট শিশুদের স্মৃতিতে কোন সংযোগ থাকে না। তারা অসংখ্য অসংলগ্ন শব্দাবলী ও বাক্যাবলী মুখস্ত করে নেয়। প্রথম দিকে তারা এ ধরনের অসংলগ্ন স্মৃতি দিয়ে কাজ চালায়। তারপর অভিজ্ঞতা, চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে ওসব অসংলগ্ন শব্দ ও বাক্যের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করা শিখে।

লক্ষণীয় বিষয়ঃ

* শিশুদের যখন হিফজ বা মুখস্থ করাবে তখন, তারা যেন হাসি-খুশী ও সতেজ মনের অধিকারী থাকে।

* যা কিছু মুখস্ত করাতে হবে তৎপ্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তার অর্থ ও তাৎপর্য এবং তার গুরুত্ব ও উপকারিতা ভালভাবে বুঝিয়ে মুখস্ত করার জন্যে শক্তিশালী পদক্ষেপ নিতে হবে, সে জন্যে সর্ব প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে বাঁচাতে হবে।

* শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাতে হবে, আর তাদের মনে এও বিশ্বাস জাগাতে হবে যে তারা সহজেই মুখস্ত করতে পারে।

* মুখস্ত করার বিষয়বস্তু পুনঃ পুনঃ পড়ার সুযোগ দিতে হবে। যতবার সে তা পড়বে তত পাকা হয়ে তা মুখস্ত হবে।

* মুখস্ত করার কিছুক্ষণ পর শিশুরা একে অন্যকে শুনানোর চেষ্টা করতে পারলে ভাল হয়। তারা পরস্পরকে শুনিয়ে মুখস্ত করবে।

* মুখস্ত করা বিষয়কে সময় সময় পুনরাবৃত্তি করাবে, তাহলে বিষয়টি স্মৃতি থেকে মুছে যাবে না।

* একই বৈঠকে পাকাপাকি মুখস্ত করিয়ে না দিয়ে একাধিক বৈঠকে বিরতি

www.nagorikpathagar.org

দিয়ে মুখস্ত করাবে। এভাবে মুখস্ত করালে অধিক মজবুতভাবে স্মৃতিপটে অংকিত হয়ে থাকে।

* নতুন বিষয়বস্তু পূর্বাপর সম্পর্ক রেখে সুবিন্যস্ত করে পেশ করবে এবং পূর্বের পাঠের সাথে সম্পর্কের গভীরতা আলোচনা করে দেবে।

* অত্যাধিক সতর্কতা সহকারে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ যা কিছু মুখস্ত করাতে হবে তাকে খুব সাজিয়ে মৌখিক আলোচনা করে শুনিয়ে দেবে। ব্লাক বোর্ডে লিখে অথবা কপিবুক দেখিয়ে দেবে আর সম্ভব হলে তাদের খাতায় লিখিয়ে দেবে। অনুভূতি দিয়ে যত অধিক কাজ আদায় করানো যাবে তত বেশী মজবুতভাবে মুখস্ত হবে।

* কিছু কিছু মুখস্ত করে কিছু সময় পর বই না দেখে পরীক্ষা করবে যে কি পরিমাণ মুখস্ত হলো আর কতটুকু বাকী থাকলো। যে পরিমাণ ঠিকমত মুখস্ত হলো না তৎপ্রতি অধিক মনোনিবেশ করবে।

* শৈশবকালের মুখস্ত শক্তি কাজে লাগাবে। আর নিত্য প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয় (কালামে পাক, দোয়াসমূহ, অযিফা, আযকার, কবিতা, প্রবাদ, উক্তিসমূহ ইত্যাদি) খুব ভাল করে মুখস্ত করাবে। যদি সাত আট বছরের শিশুকে স্নেহ সহকারে, মহব্বত দেখিয়ে যথারীতি মুখস্ত করানো হয়ে থাকে আর পাশাপাশি দৈনিক মাতৃভাষায় লেখাপড়া ও সাধারণ হিসাব নিকাশ অনুশীলন করানো হয় তাহলে সে দশ এগার বছর বয়সে কুরআনে হাফেজও হতে পারে এবং সেসব শিশুদের সাথে সমান তালে চলতে পারে যারা প্রথম থেকে সমস্ত বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেছে আর কুরআন হিফজ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষাদান (লেখাপড়া করানো)

'শিক্ষাদান' বলতে কি বুঝায়?

'শিক্ষাদান' মানে কাউকে শিক্ষা দেওয়া, শিশুদের লেখাপড়া শেখানো অথবা বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিষয়ে যোগ্যতা সৃষ্টি করা। শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষকগণ একটা ধারাবাহিক পদ্ধতিতে শিশুদের নানা ধরনের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা প্রদান করেন। তাদের বিভিন্ন কথা জানার, শেখার বা করার সুযোগ দিয়ে থাকেন এবং তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে তৈরী করেন।

শিক্ষাদান তখনি সম্ভব যখন নিম্নের তিনটি উপাদান পাওয়া যায়ঃ

১) কেউ থাকবে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত (শিশুরা) আর

২) কেউ শিক্ষাদানের জন্যে থাকবে (শিক্ষক) এবং

৩) কিছু বিষয় থাকবে শিক্ষা দেয়ার জন্যে (রচনার বিষয়বস্তু)

শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষক, শিশু এবং বিষয়বস্তুর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়।

শিক্ষাদান কাজ ও অন্যান্য কাজের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। স্বর্ণকার, কর্মকার, কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদি পেশাজীবীগণ নিজ নিজ পেশায় জড় বস্তু ব্যবহার করে থাকে, যেগুলোর নিজস্ব কোন ইচ্ছা শক্তি নেই। এসব জড় পদার্থ পুরাপুরিভাবে তাদেরই কর্তৃত্বাধীন। তারা যেমন ইচ্ছা এ সবের উপর নিজের কর্মকৌশল প্রয়োগ করে থাকে। তাতে এসব বস্তু কোন প্রতিবাদ করতে পারে না। তাই তো তারা এগুলো নিয়ে খট্ খট্ করে কোন না কোন বস্তুতে পরিণত করে। কিন্তু একজন শিক্ষকের কাজ হলো একটা জীবন্ত, বোধশক্তি বিশিষ্ট (শিশু) অস্তিত্বকে নিয়ে, যার ইচ্ছা শক্তি রয়েছে। যার নিজস্ব প্রবনতা ও বাসনা রয়েছে। যদি তার উদ্যম ও প্রবণতা অথবা তার ইচ্ছা প্রবনতা ও মনোনিবেশ না থাকে অথবা তার বয়স ও পূর্ব

www.nagorikpathagar.org

অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য রাখা না হয়, তাহলে শিক্ষকের হাজারো চেষ্টা বিফলে যাবে, তিনি ঘন্টা কে ঘন্টা মাথা পানি করলেও সফলতা আসবে না।

সুতরাং একজন সফল শিক্ষকের উচিত তিনি যেন ছাত্র, রচনার বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতি– এ তিনটি বিষয়ে যথাযথ সচেতন থাকেন আর তার এমন সব গুণাবলী থাকে যা শিশুদের সাথে সুন্দর সুষ্ঠু আচরণ ও তাদের গড়ে তোলার জন্যে আবশ্যকীয় হয়।

* শিশু সম্পর্কে তাঁর জানা আছে, শিশুর স্বভাব কেমন? বুদ্ধির বিভিন্ন স্তর কি কি? প্রত্যেক স্তরে তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট কি কি হয়ে থাকে? শিশুর চাহিদা, ঝোঁক প্রবনতা ও রুচি কি? সে কিভাবে মনযোগী হয়, আন্তরিক ও আগ্রহী হয়, মুখস্ত করে অথবা কোন কিছুর অভ্যস্ত হয়। সে কোন গতিতে অগ্রসর হয় এবং কিভাবে নতুন কথা শেখে, তার কাজ করার পরিমাণ কি? কি ধরনের গতিবিধিতে সে আনন্দ পায়। বড়দের সাথে কোন কথায় সে মতপার্থক্য পোষণ করে– ইত্যাদি।

* সে নিজ নিজ বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত এবং বিষয়ের মূল বক্তব্য সম্পর্কে জ্ঞাত হবে। নিজের জ্ঞাত বিষয়ের পরিধি ক্রমাগত বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে।

* তার জানা থাকা চাই যে শিশুদের কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষাদান করা চাই– কিভাবে মূল বক্তব্য তুলে ধরতে হবে? এবং শিক্ষাদানের জন্যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

এসব বিষয়ে জানা না থাকলে শিক্ষাদান কার্য কখনো ফলপ্রসূ হতে পারে না।

সফল শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট

সফল শিক্ষাদান বলতে বুঝায়–

* যা শিশুদের মাঝে বিদ্যার্জনের আগ্রহ ও পিপাসা সৃষ্টি করে।

* যে জন্যে প্রথম থেকেই অতি উত্তম রূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় এবং রুটীন অনুযায়ী সুবিন্যস্তভাবে শিক্ষাদানের অগ্রিম প্রস্তুতি গ্রহণ করানো হয়।

www.nagorikpathagar.org

* যে সময়কালে শ্রেণীতে স্নেহ্-মমতার পরিবেশ বিরাজমান থাকে এবং ধমক-রাগ ও মারপিটের প্রয়োজন না পড়ে।

* যা ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সহ্যোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে এবং ছাত্রদের মন-মানসিকতা ও মনোনিবেশ আকর্ষণ করতে সক্ষম।

* যা নতুন বিষয়, বিগত অভিজ্ঞতা এবং দৈনন্দিন জীবন যাপন পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত করে অথবা তার সাথে তুলনা করে শেখানো হয়।

* যা ছাত্রদের মাঝে সৃজনী ক্ষমতা, স্বাধীনতা, চিন্তা গবেষণা, আত্মবিশ্বাস এবং নিজের জ্ঞানের প্রতি আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

* যা জ্ঞান ও বিদ্যাকে কাজে লাগানো এবং জানা বিষয় বাস্তবায়িত করতে পদ্ধতি শেখায় এবং অভিজ্ঞতা হাসিলের জন্যে তার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

কুরআনের আলোকে শিক্ষাদান পদ্ধতি

উত্তম আদর্শের (উস্ওয়ায়ে হাসানা) আলোকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এবার আমরা দেখবো কুরআন হাকীমের আলোকে শিক্ষা পদ্ধতি কেমন হওয়া চাই।

ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসা ও চাহিদা

কুরআন হাকীম খুলতেই যে কথা সুস্পষ্টভাবে চোখে ধরা পড়ে তা হচ্ছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে প্রশিক্ষণার্থীকে সত্যিকারের অনুসন্ধিৎসা থাকতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে আগ্রহী না হবে আর তার মন মানসিকতা পুরোপুরি একাগ্রচিত্তে নিমগ্ন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হতে পারে না। পাঠদানের বিষয় যতই উপকারী হোক প্রশিক্ষক যত বড় প্রভাবশালী ব্যক্তি হোক না কেন। সূরা ফাতিহায় বর্ণিত... ... ...

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

"আমাদের সরল পথ দেখাও"–এর আন্তরিক দোয়া এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ। একজন শিক্ষকের উচিত সর্ব প্রথম ছাত্রের মধ্যে ইলমের পিপাসা ও প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করা, তাদেরকে ইলম হাসিলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়া তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষক মহোদয় পুরো আন্তরিকতা সহকারে ছাত্রদের আলেম ও জাহেলের পার্থক্য, ইলম ওয়ালাদের উপর আল্লার বিশেষ করুণা এবং ইলমের আবশ্যকতা ও গুরুত্ব মর্মস্পর্শীভাবে প্রমাণসহ এবং ঘটনাপঞ্জীর উদ্ধৃতি সহকারে ক্রমাগত বুঝাতে থাকবে। যেন ইলমের প্রতি তাদের আগ্রহ উৎসাহ সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু ইলম হাসিলের জন্যে তাদেরকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকবে।

কুরআন হাকীম নিজেই নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ইলম হাসিলের প্রতি

www.nagorikpathagar.org

উদ্বুদ্ধ করেছেঃ

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

যাদের ইলম আছে আর যাদের নেই– তারা উভয় কি সমান?

مَنْ يُّوْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

যাকে হিকমত দান করা হয়েছে তাকে মূলতঃ অসংখ্য কল্যাণ দান করা হয়েছে।

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ঈমানদারদের এবং যাদের ইলম দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

আল্লাকে তারাই ভয় করে যারা ইলম প্রাপ্ত।

শিক্ষকের নিজের ইলমের প্রতি বিশ্বাস

ইলম থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে দ্বিতীয় অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে শিক্ষকের নিজের ইলমের উপর অসাধারণ নির্ভরশীলতা। শিক্ষকের কাজ হলো ছাত্রকে এমন বিষয়ে জ্ঞান দান করা যা তারা জানে না। এখন যদি এমন হয় যে শিক্ষকের অযোগ্যতা অথবা কোন প্রকার দুর্বলতার কারণে ছাত্রদের বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে পড়ে এবং যদি শিক্ষকের শেখানো বিষয়ে তাদের এ বিশ্বাস না থাকে যে এতেই তাদের কল্যাণ এবং এটাই যথার্থ, তবে তারা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে কিভাবে উপকৃত হতে পারবে?

www.nagorikpathagar.org

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

ঐসব মুত্তাকীদের জন্যে নির্দেশিকা যারা না দেখে ঈমান আনে।

(অর্থাৎ কেবল কুরআন হাকীমের বলে দেয়ার কারণে সে সব প্রকৃত সত্যের উপর ঈমান আনে যা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং কখনো সাধারণভাবে মানুষ অভিজ্ঞতার আলোকে ও প্রত্যক্ষভাবে দেখে না। যেমন– আল্লার সত্তা ও গুণাবলী, ফেরেশতাকুল, ওহী, বেহেশত-দোযখ ইত্যাদি)।

এই আয়াত থেকে উপরোক্ত শর্ত পাওয়া যায়। তাই শিক্ষকের উচিত তাঁরা যেন ছাত্রদের বিশ্বাস সুদৃঢ় রাখেন। আর এটা তো কেবল তখনই সম্ভব, যখন তাঁরা ইলমের দিক থেকে আবশ্যকীয় গুণাবলীর আধার হবেন। বেশ লেখাপড়া জানা যোগ্য ব্যক্তি হবেন।

আল্লাকেই ইলমের উৎস ও উৎপত্তি স্থল মানা

কোন ব্যক্তির ইলম স্বয়ং তার বা সমাজ ও মানবতার জন্যে তখনি উপকারী সাব্যস্ত হতে পারে, যখন তা আল্লার নামে আরম্ভ করা হবে এবং আল্লার সত্তা ও গুণাবলীকে উপস্থিত জেনে তারই আশ্রয়ে এসে সেই ইলম হাসিল করা হবে, তাকেই ইলমের মূল উৎস হিসেবে মেনে নেয়া হবে এবং এই বিশ্বাস রাখা হবে যে ইলম কেবল তারই কাছ থেকে পাওয়া যায়। আর ইলমের যে পরিমাণ অংশই কেউ পেয়ে থাকে তা কেবল আল্লারই দান বিশেষ। কেবল এমতাবস্থায়ই সেই ব্যক্তি বিদ্যার ফাঁদে পা দেয়া, ইলম ভুল উৎস থেকে হাসিল করা এবং ভুল কাজে লাগানো থেকে আর ইলমের পথে শয়তানের প্রতিবন্ধকতা থেকে রক্ষিত থাকতে পারে। আর ইলম বৃদ্ধির জন্যে আল্লার দরবারে দোয়া করতে থাকবে। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ (৪৯ ঃ ১৩)

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও হিকমতময় (২৪ ঃ ১৮)

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত (২৪ ঃ ৩০)

www.nagorikpathagar.org

আমার রবের ইলম সবকিছুকেই ঘিরে আছে (৬ ঃ ৮০) وَسِعَ رَبِّیْ کُلَّ شَیْئٍ عِلْمًا

তোমার প্রভুর নামে পড় যিনি সৃষ্টি করেছেন (৯৬ ঃ ১) اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

যখন কোরআন পড়তে চাও, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লার কাছে পানাহ (আশ্রয়) চাও (১৬ ঃ ৯৮)

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ .

শয়তান কখনো তোমাকে বিভ্রান্ত করতে চাইলে তুমি আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা কর (৭ ঃ ২০০, ৪১ ঃ ৩৬)

শিক্ষকের উচিত ছাত্রছাত্রীদের অন্তরে এ কথাটা যেন খুব ভালভাবে অংকিত করে দেয় যে ইলমের মূল উৎস আল্লাহ তা'য়ালার সত্তা। তার ইলম সব কিছুকেই বেষ্টন করে রেখেছে। ইলমের যতটুকু যে কেউ পেয়ে থাকে তা একমাত্র আল্লারই দান।

(লেখাপড়া আরম্ভ করার সময় শিক্ষকের উচিত তিনি নিজেও বলবেন-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

এবং

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আর ছাত্রদেরও তা পড়িয়ে দেবেন। তাছাড়া নিজেও এই দোয়া করবেনঃ

হে আমার রব, আমার ইলম বৃদ্ধি কর (২০ ঃ ১১৪) رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

আর ছাত্রদেরও এই দোয়া শিক্ষা দেবেন। এভাবে শিক্ষক নিজে এবং তাঁর ছাত্ররা বিদ্যা ফাঁদে আটকে পড়া, অবৈধ পন্থায় ইলম হাসিল এবং অবৈধ কাজে

www.nagorikpathagar.org

ইলমের ব্যবহার করা এবং ইলমের পথে শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে।

শিক্ষাদানের পূর্বে দৃষ্টি আকর্ষণ করা

কোন কথা কেবল তখনি মনযোগ সহকারে শোনা হয় এবং ঠান্ডা মাথায় সে বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করা হয়, যখন ঐ বিষয়ের প্রতি খুব ভালভাবে মনযোগ আকর্ষণ করা হয় এবং সে বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগে। কুরআন হাকীম মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করার জন্যে এবং লোকদের পুরোপুরি মনোনিবেশ করানোর জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। যেমন-

(হরফে মোকাত্তায়াত দিয়ে বাক্য আরম্ভ করে।

ইত্যাদি الم ، الر ، كهيعص ، طه، حم

* কখনো প্রশ্ন করা হয়, যেমন-

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি আমি এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা তোমাদের কঠোর শাস্তি থেকে নাজাত দেবে? (৬১ ঃ ১০)

هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً

আমি কি তোমাদের এমন সব লোকের সংবাদ দেব, যারা আমলের দিক থেকে মহাক্ষতিতে লিপ্ত? (১৮ ঃ ১০৩)

* কোন দৃশ্য পেশ করে, যেমন- اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا

যখন পৃথিবী وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا . وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا

প্রকম্পিত হবে, জমি তার ভেতর থেকে বোঝা বের করে দেবে আর

www.nagorikpathagar.org

মানুষের বলে উঠবে পৃথিবীর কি হলো? (৯৯ ঃ ১-৩)

اذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ- وَاذَا الكواكِبُ انْتَثَرَتْ وَاذَا البِحَارُ فُجِّرَتْ وَاذَا القُبُورُ بُعْثِرَتْ

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন তারকারাজি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, যখন নদী বয়ে পরস্পরের সাথে মিলে যাবে, যখন কবরসমূহ থেকে মানুষ উত্থিত হবে।

أُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ فِى جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ......لأَصْحَابِ اليَمِيْنِ :

তাছাড়া সূরা আররাহমানে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দৃশ্যাবলী পেশ করা হয়েছে।

* অন্যদের প্রশ্ন বা অভিযোগসমূহ সামনে রেখে সেগুলোর উত্তরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যেমন- سَئَالَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ

অবশ্যই সংঘটিতব্য আযাব সম্পর্কে প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছে (৭০ ঃ ১)

এমনি ধরনের পনেরটি সম্বোধন ... ... يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ

وَقَالُوْا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَ رُفَاتًا ءَانَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا

তারা বললো, আমরা যখন হাড় ও মাটি হয়ে যাব তখন কি আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? (১৭ ঃ ৯৮)

قَالُوا اَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَّسُوْلاً

তারা বললো, আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন? (১৭ ঃ ৯৮)

* হঠাৎ কোন ঘটনা বিবৃত করে মানুষকে বক্তব্য শোনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। যেমন- الم غُلِبَتِ الرُّوْمُ. فِى اَدْنَى الاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِى بِضْعِ سِنِيْنَ

www.nagorikpathagar.org

আলিফ-লাম-মীম। রোমবাসী পরাজিত হলো। নিকটবর্তী ভূমিতে। তারা পরাজিত হওয়ার অব্যবহিত পরে বিজয় লাভে সমর্থ হবে। অল্প কয় বছরের মধ্যেই। (৩০ ঃ ১-৪)

এসব আয়াতে রোমানদের বিজয় লাভের ভবিষ্যত বাণী করা হলো তখন, যখন ইরানীরা তাদের পরাজিত করেছিল। আর যখন বাহ্যতঃ তাদের বিজয়ী হওয়া ছিল সুদূর পরাহত। আমি তোমাদের প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি (৪৭ ঃ ১) اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا

এই আয়াতে মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যত বাণী করা হয়েছিল এমন এক সময়, যখন হোদায়বিয়ার স্থানে মুসলমানেরা বাহ্যতঃ নিরুপায় হয়ে কাফিরদের সাথে সন্ধি করেছিল।

* খুব বেশী সাবধান ও সচেতন করার জন্যে সম্বোধন করতে হলে অনেক সময় নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে একই সময়ে একাধিক বার একই দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়ে থাকে। যেমন-

اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةَ. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ - يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْث . وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ

মহা আঘাতকারী, মহা আঘাতকারী কি? তুমি কি জান, কি সেই মহা আঘাতকারী ? সেদিন (মহা প্রলয়ের দিন) মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত আর পাহাড় হবে ধুনা রংগীন পশমের মত।

এসব আয়াতে সংবাদ, প্রশ্ন ও দৃশ্য সবকিছুকে এক সঙ্গে পেশ করে দৃষ্টিকে সেদিকে নিবদ্ধ করা হয়েছে। একজন শিক্ষককেও স্থান পরিবেশের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে পাঠদানের পূর্বে ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিতে হবে।অতঃপর কোন একটি বিষয় শিক্ষা দেয়া উচিত।

www.nagorikpathagar.org

উপস্থাপনা

যথার্থ অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি ও নিজের দিকে পুরোপুরি আকর্ষণ সৃষ্টি করার পর কুরআন হাকীম নিজের বক্তব্য পেশ করে থাকে। উপস্থাপনার জন্যে কুরআন এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছে আর নিঃসন্দেহে এটাই সর্বাধিক প্রভাবশালী পদ্ধতি। পুরো কুরআন শরীফ ছোট বড় খুতবার আকারে অবতীর্ণ হচ্ছিল। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবার আকারেই সেগুলোকে অন্যদের সামনে পেশ করেছেন। কুরআন হাকীমের সম্বোধন ভংগী এত অধিকতর তেজস্বী আর বাচনভঙ্গী এমন রাজকীয় ধরনের যে শ্রবনকারী শুনতেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এমন কোন অপরাধ প্রবন ব্যক্তি খুব কমই আছে যে কুরআনের আওয়াজ শুনে প্রভাবিত হবে না। উতবার মত একজন ঘোর ইসলাম বিরোধী স্বল্প ক'টি আয়াত শোনা মাত্রই অস্ত্র ফেলে দিল আর মিথ্যা লম্ফ ঝম্ফ ভুলে গেল। এর একটা টুকরা হযরত ওমর (রাঃ) এর মত কট্টর বিরোধী ব্যক্তির জীবনে বিপ্লব এনে দেয়। এ ব্যাপারে অসংখ্য নজীর পাওয়া যায় যে কুরআন হাকীম স্বীয় পবিত্র হেদায়াত, প্রাঞ্জল ও অলংকারময় ভাষা, রাজকীয় সম্বোধন পদ্ধতি, অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি, আকর্ষণীয় স্বর ও গতিশীলতা এবং শক্তিশালী বর্ণনা দিয়ে মোটামুটি সকলের অন্তরে স্থান করে নেয়। কুরআনে হাকীম তো আল্লার বাণী। এর প্রভাব সম্পর্কে আর কি বলা যায়। যারা নিজেদের সম্বোধন পদ্ধতি বা বাচনভঙ্গীতে এর কিছুটা ঝলক বা দ্যুতি সৃষ্টি করতে পেরেছে, তারাও অনেকের জীবনে বিরাট পরিবর্তন সাধন করতে পারে। মাওলানা রুমী (রঃ) তাঁর মছনভী শরীফে, আল্লামা ইকবাল (রঃ) নিজের কতিপয় পদ্যাংশে, ভ্রাতৃসংঘ তাদের কতিপয় প্রকাশনায়, মাওলানা আযাদ ও মাওলানা মওদূদী (রঃ) প্রমুখ নিজেদের বিভিন্ন বক্তৃতা ও প্রবন্ধে কুরআন হাকীমের সাহায্যে কিছুটা দ্যুতি সৃষ্টি করতে পেরেছেন। ফলে এগুলোর পাঠকবৃন্দের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয় আর তারা একটা অভিনব আশ্চর্য চিন্তার জগতে উপনীত হয়ে পড়ে।

শিক্ষককেও তার বাচন ভঙ্গীতে তেজদ্বীপ্তি সৃষ্টি করতে হবে। আর তা সম্ভব হবে যখন তিনি নিজের ইলম সম্পর্কে নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাসী হবেন। ছাত্রদের কাছে পেশ করার মত কোন কিছু এলেই যদি তাঁর কাছে থেকে থাকে এবং তাঁর কথা বের হয় তাঁর অন্তর থেকে।

www.nagorikpathagar.org

ব্যাখ্যা বিবরণ

কুরআন হাকীম কেবল বাচনিক দৃঢ়তাকেই যথেষ্ট মনে করে না, বরং স্বীয় বক্তব্য যথাযথভাবে পরিষ্কার ও স্মৃতিপটে অংকিত করার জন্যেঃ

* নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল বা ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে উদাহরণ পেশ করে।

* দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষ বিবরণকে দলীল হিসেবে সম্মুখে পেশ করে।

* নানা প্রকারের উদাহরণ দিয়ে ও উপমার মাধ্যমে কাজের বাস্তবায়ন করে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বিধ্বস্ত জনপদের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে প্রমাণ দিয়ে থাকে।

* বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দিয়ে উদ্দিষ্ট ফলাফল গ্রহণ করে।

* নবী রাসূলের কাহিনী ও জাতীয় কিস্‌সা-কাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করে।

* একটি প্রকৃত বিষয় বিভিন্নভাবে বর্ণনা করে থাকে, যেন সকল প্রকার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি সহজেই বুঝতে সক্ষম হয়।

* অবস্থার বিবরণ শব্দের আবরণে এমনভাবে পরিচিত করা হয় যেন স্বচক্ষে অবলোকন করছে।

* মানুষের ভুল বুঝাবুঝি ও সন্দেহ-সংশয় প্রমাণ দিয়ে নিরসন করে থাকে।

একজন শিক্ষকও ব্যাখ্যা বিবরণ প্রসংগে প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধানুপাতে এসব তদবীর কার্যকর করার চেষ্টা করা চাই।

প্রশ্নাবলীঃ

মনোনিবেশ নিবদ্ধ রাখার এবং চিন্তা-গবেষণা করার জন্যে মাঝে মাঝে প্রশ্ন পেশ করে থাকেঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

তুমি কি দেখনি তোমার রব আদ সম্প্রদায়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিল। (৮৯ ঃ ৬)

اَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ اِلَى الاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

www.nagorikpathagar.org

এরা কি উটের প্রতি তাকায় না যে তা কি আশ্চর্যভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? আর আকাশের প্রতি; তা কত উচু করে তৈরী করা হয়েছে? (৮৮ ঃ ১৭)

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى

হে মূসা, তোমার ডান হাতে কি? (২ঃ ৭)

* প্রশ্নাবলীর উত্তর শুনে, আর যদি তা প্রকাশ্য হয়ে থাকে তবে তাদের পক্ষ থেকে নিজেই জবাব দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়।

قَالَ هِيَ عَصَايَ - اَتَوَكَّؤُ عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى

তিনি উত্তর দিলেন এটা আমার লাঠি। আমি এতে ঠেস লাগাই। এটা দিয়ে আমি আমার ছাগলের জন্যে পাতা পাড়ি, তাছাড়া এতে আমার আরও অনেক কাজ রয়েছে। (২০ ঃ ১৮)

وَلَئِنْ سَئَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

আর তুমি যদি এদের জিজ্ঞেস কর যে আকাশ মন্ডল ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা জবাবে বলবে, আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। (৩১ ঃ ২৫, ৩৯ ঃ ৩৮)

শিক্ষকেরও উচিত, শিক্ষাদান ব্যাপারে ছাত্রদের প্রশ্ন করা, আর তাদেরও প্রশ্ন করার অবকাশ দেওয়া। ছাত্রদের পক্ষ থেকে যে সব প্রশ্ন, পাল্টা প্রশ্ন অথবা শোবা-সন্দেহের উদ্রেক হয়, সেগুলোর সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া। শিক্ষার্থীদের উত্তর শান্ত মনে শ্রবন করা আর তাদের অন্তরের কথা বলার সুযোগ দেওয়া। তবেই তাদের মেধা বিকশিত হয়ে অগ্রগতি লাভে সক্ষম হতে পারবে।

সারসংক্ষেপ

কুরআন হাকীম কিছুক্ষণ পর পর কতিপয় শব্দে মূল বক্তব্যের সার সংক্ষেপ পেশ করে থাকে।

প্রাথমিক বক্তব্য, সূরাসমূহ ও রুকুতে যেসব কথা বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত

www.nagorikpathagar.org

করেছে পরবর্তী সূরা সমূহে সেসব কথাকেই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে কতিপয় শব্দে বিবৃত করেছে। অথবা কেবল ইশারা-ইংগিতে পুরো কথা বলে দেয়া হয়েছে, যে সহজেই তা মুখস্ত হয়ে যায় আর সর্বক্ষণ তা স্মরণ থাকে।

আমপারার শেষ সূরাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন, যেন পেয়ালায় সাগর ভরে দেয়া হয়েছে। যেমন-

وَالْعَصْرِ اِنَّ الاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَا صَوْا بِالصَّبْرِ

কালের শপথ, (সময় সাক্ষী) নিঃসন্দেহে মানুষ মহা ক্ষতির মধ্যে লিপ্ত। তবে যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের প্রতি আহবান ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে তাঁরা নয়।

এই সংক্ষিপ্ত সূরায় কুরআন হাকীম তো তার পুরো সারসংক্ষেপ সুপ্ত রেখেছে।

শিক্ষকেরও উচিত, পাঠের এক একটা অংশ পেশ করে এটার সারসংক্ষেপ বিবৃত করা এবং সবশেষে নিজের পূর্ণ বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার পেশ করা। এভাবে শিক্ষার্থীদের জন্যে পূর্ণ কথা মুখস্ত করা ও স্মরণ রাখা সহজ হয়ে থাকে।

পুনরাবৃত্তি ও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ

কুরআনে হাকীম পুনরাবৃত্তি ও পুনরুল্লেখের প্রতি বেশ গুরুত্ব দিয়েছে। একই কথাকে বার বার বিভিন্ন ভংগিতে পেশ করেছে যেন তা ভালভাবে স্মৃতিপটে অংকিত হয়ে যায়। এমন কোন পৃষ্ঠা কমই আছে যাতে কোন মৌলিক কথা বা মূল দাওয়াত বা তার অংশ বিশেষের বার বার উল্লেখ হয়নি। তবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করলেও প্রতিবারই নতুন ভাবধারায় উত্থাপন করা হয়েছে।

একজন শিক্ষককেও পুনঃ পুনঃ উল্লেখের প্রতি মনযোগ দেওয়া চাই। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এতে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিমর্ষতা ও একঘেঁয়েমী সৃষ্টি না হয়।

অর্পণ করা

নিজ বক্তব্য পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়ে, প্রমাণাদি পেশ করে সন্তুষ্ট করা

www.nagorikpathagar.org

এবং কথার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়েই যথেষ্ট মনে করা হয় না। বরং কিছু প্রশ্ন উথাপন করে স্বীয় পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট হওয়ার প্রতি আহবান জানায়। তাছাড়া মনের প্রশান্তি লাভের জন্যে, অভিজ্ঞতা ও বাস্তব জ্ঞান লাভের জন্যে অর্পণ করে থাকে এবং অভিজ্ঞ লোকদের থেকে অভিজ্ঞতা হাসিলের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

(কিছুটা ভ্রমণে বের হও)... ... ... سِيْرُوْا فِى الاَرْضِ

ছয় স্থানে বলে এবং ... ... اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الاَرْضِ

এবং اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الاَرْضِ

(তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি?)

সাত স্থানে এ ধরনের নির্দেশ দিয়ে স্বচক্ষে দেখে সন্তোষ লাভের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

তেমনিভাবে, فَسْئَلْ وَسْئَلْ فَسْئَلُوْا

এ রকম (জিজ্ঞেস কর) নয় জায়গায় উল্লেখ করে কুরআনে হাকীম জ্ঞানীদের নিকট হতে সত্যায়ন করিয়ে প্রশান্তি হাসিল করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

শিক্ষকেরও উচিত যা কিছু ছাত্রদের শিক্ষা দেবে সে সম্পর্কিত কোন কাজের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করে অভিজ্ঞতা ও বাস্তব জ্ঞান হাসিলের অতিরিক্ত সুযোগ দেওয়া যেন তারা পুরো সন্তুষ্টি অর্জন করতে ও জ্ঞানকে কাজে লাগাতে ও শিখতে পারে।

এ হচ্ছে কুরআনে হাকীমের হিকমতময় শিক্ষা ব্যবস্থার মোটামুটি চিত্র। এভাবে বুরআন নিজের শিক্ষা মানুষের জন্যে অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছে।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

আমরা কুরআনকে বুঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি, তোমাদের কেউ তা বুঝার আগ্রহী আছ কি? (৫৪ ঃ ১৭, ২২ ঃ ১৩২-৪)

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষাদানের সাধারণ মূলনীতি

নিম্নে শিক্ষাদানের কিছু সাধারণ মূলনীতি আলোচনা করা হলো। এই বিস্তারিত শিক্ষাদান নীতি অভিজ্ঞতা ও শিশুদের স্বভাব প্রকৃতির আলোকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সমস্ত বিষয় ও সকল প্রকার পাঠে এগুলোর প্রতি যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, যেন শিক্ষাদান উপকারী ও কার্যকর হতে পারে।

উদ্বুদ্ধকরণ নীতি

অর্থাৎ ছাত্রদের ভালভাবে উদ্বুদ্ধ করে পাঠ আরম্ভ করা চাই। কারণ, যে কাজের প্রতি মন-মানসিকতাকে যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ করা যাবে সে কাজ প্রস্তুতিসহকারে মনোযোগসহ করা যায়। আর যে কাজ কোন প্রকার চাপের মুখে পড়ে বাধ্য হয়ে করতে হয়, সে কাজ অনর্থক হয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আমরা জানি শিশুরা মনযোগ ও মনোনিবেশকে ভয় করে। তারা কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা ও চাপ প্রয়োগকে পছন্দ করে না। লেখাপড়ার ন্যায় শুষ্ক কাজে তাদের মন বসে না। ফলে তাদের লেখাপড়া করানোর জন্যে শিক্ষকবৃন্দ সাধারণত ভয় দেখায় এবং বাধ্যবাধকতা ও চাপ প্রয়োগ করে থাকে। এর ফলাফল দাঁড়ায় এই যে শিশুরা এই শুষ্ক কাজকে আরো ভয় করে এবং শিক্ষা থেকে দূরে সরে পড়ে। তারপরেও যারা ধরাবাঁধায় পড়ে থেকে যায়, তারা কাজে পুরো মনোনিবেশ করে না। সুতরাং পাঠদানের পূর্বে শিশুদের সে জন্যে মন-মানসিকতা সৃষ্টি করে নিতে হবে, তাদের ভাল করে উদ্বুদ্ধ করে নেয়া একান্ত আবশ্যক। সে জন্যে সুযোগ মতো নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

* যথাযথ প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত আলাপ, আকর্ষণীয় রঙের ছবি, চিত্তাকর্ষক মডেল ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করা আবশ্যক।

www.nagorikpathagar.org

* অতপর পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পাঠ্য বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা ভালভাবে স্মৃতিপটে অংকিত করিয়ে দিতে হবে।

* কাজে, খেলাধূলা অথবা প্রতিযোগিতার স্পীরিট সৃষ্টি করতে অথবা পাঠ্য মূল বিষয়কে কাহিনীর আকারে পেশ করবে।

* শিশুদের কিছু তৈরী করতে অথবা বাস্তব কাজ করার সুযোগ দেবে।

* পাঠ অগ্রগতিতে তাদের পরামর্শকে গুরুত্ব দেবে।

উদ্বুদ্ধ করার পর মনোযোগ ও চিত্তাকর্ষণ সমস্যারও অনেকাংশে সমাধান হয়ে যাবে। কারণ শিশুরা যে কাজ করতে আনন্দ চিত্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ে সে কাজে তারা পুরো মনোনিবেশও করে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেও তারা পুরো মনোনিবেশ ও আনন্দ সহকারে কাজ করবে।

নির্বাচনের মূলনীতি

অর্থাৎ শিশুদের কেবল সে বিষয়েই পাঠদান করা হবে যা তাদের জন্যে অত্যন্ত আবশ্যকীয়, উপকারী, উপযুক্ত এবং তাদের স্বভাব, যোগ্যতা ও উদ্দেশ্যের একান্ত অনুকূল হয়। আর যে বিষয়টা শিক্ষক তাকে সীমিত উপায়-উপকরণ দিয়ে ভালভাবে আনজাম দিতে পারেন।

আমরা জানি 'ইলম' এক সীমাহীন সম্পদ-সাগর। অথচ শিক্ষাকাল একান্ত কম, জীবনের অবকাশ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আজীবন প্রচেষ্টা চালালেও যে তীর থেকে শুরু করা হয়েছে সেখান থেকে সামান্যই এগুতে পারা যায়। আর কেবল কতিপয় কংকর ছাড়া হাতে আর কিছু আসে না। তাছাড়া অনেক বিষয় তো এমন থাকে যা তাদের বয়স অনুপাতে উপযোগী নয়। সুতরাং শিক্ষকের উচিত পাঠ্য বিষয় অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে যেন নির্বাচন করে, আর কেবল এমন বিষয়ই শিশুদের শিক্ষা দেবে যা তাদের জন্যে বাস্তবে আবশ্যকীয় ও উপকারী প্রমাণিত হয়। নিষ্প্রয়োজনীয় ও নিরর্থক বিষয়ে যেন সময় নষ্ট না হতে পারে। অবশ্য পাঠকে আকর্ষণীয় ও প্রভাবশীল করার জন্যে এমনটি করা আবশ্যক হয়ে পড়লে স্বতন্ত্র কথা।

www.nagorikpathagar.org

জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করার মূল নীতি

অর্থাৎ নতুন শিক্ষণীয় বিষয়াদিকে যথাসম্ভব দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাপঞ্জী, তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা, তাদের লব্ধ জ্ঞান উপলব্ধী ও চাক্ষুষ জ্ঞান এবং সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে পেশ করতে হবে। এভাবে কথা সহজেই বুঝে আসে এবং সুষ্ঠুভাবে স্মৃতিপটে অংকিত হয়ে পড়ে। তার সাথে শিশুদের সম্মুখে নতুন জ্ঞান হাসিলের আবশ্যকতা ও উপকারিতা ব্যাখ্যা করার এবং দৈনন্দিন জীবনে তার ব্যবহার শেখানোর কাজেও সহযোগিতা পাওয়া যাবে। যে বিষয়ের কোন সম্পর্ক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত না থাকে অথবা যার আবশ্যকতা বা উপকারিতা জানা না থাকে তা লিখতে স্বভাব প্রকৃতি প্রস্তুত থাকে না বা উদ্বুদ্ধ হয় না। আর তা অনেক দিন স্মৃতিপটেও সংরক্ষিত থাকে না। যেমন- "পবিত্রতা" বা এ জাতীয় শরীয়তের মাসআলাসমূহ। এ সবের প্রয়োজন হয় বালেগ হওয়ার পরে। এসব বিষয়, প্রথমতঃ বয়স্ক হওয়ার পূর্বে কচি শিশুদের বুঝেই আসে না। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন না পড়ায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা স্মরণও থাকে না।

নিজে করে শেখার মূল নীতি

অর্থাৎ সমস্ত বিষয় শিশুদের বলে শিক্ষাদানের পরিবর্তে তাদেরকে নিজেরা করে শেখার অবকাশ দেয়া উচিত। যেসব পাঠ নিজেরা করে শেখার মত নয়, সেগুলোকেও অন্ততঃ কোন একটা বাস্তব কাজের মাধ্যমে সমাপ্ত করবে। যেমন- মৌখিক বাতলিয়ে দেয়ার আগে সে সম্পর্কে লিখিত কাজ নেয়া। পূর্বের জানা পাঠ সম্পর্কে এমন কাজের দায়িত্ব দেয়া যাতে শিশুদের নিজেদের কিছু একটা করতে হয়। যেমন- ডাক টিকেট সংগ্রহ, ছবি সংগ্রহ। কোন মডেল বা দৃশ্য আঁকা, ফুল, পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করা।

শিশুরা যেহেতু সর্বদা কিছুনা কিছু কাজে রত এবং ভাঙাগড়ার কাজে রত থাকে। এতে তারা তৃপ্তি পায়, অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সুতরাং শিক্ষাদান কার্যে যদি সে ব্যবস্থা নিতে পারলে শিক্ষাদান অতীব সহজ, প্রভাবশালী, আকর্ষণীয় হয়। আর শিশুরা যা শেখে তা খুবই সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল হয়ে থাকে। যেমন- অযু, নামাযের নিয়ম মৌখিক বলে দেয়ার চাইতে কার্যত করে দেখানো এবং

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োজনে সংশোধন করে দেয়া। তাহলে শিশুরা পুরো মনযোগ সহকারে শেখবে এবং তা তাদের সহজেই মুখস্ত হয়ে যাবে।

পাঠ্য বিষয় বিভক্তির মূলনীতি

অর্থাৎ যা কিছু পড়ানো হবে তাকে উপযুক্ত ভাগে বিভক্ত করে নেবে। এই বিভক্তি এমন হবে প্রতিটি অংশ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অংশের সাথে স্বাভাবিকভাবে সম্পৃক্ত থাকবে এবং মাঝে পার্থক্যসূচক চিহ্নও থাকবে। এভাবে এক কদম দুই কদম করে এগিয়ে গেলে এবং একটা যুক্তিসংগত ভাবে বিভক্ত করে শিক্ষাদানের ফলে সহজে বুঝানো সম্ভব হবে এবং ক্রমিকভাবে বিষয়বস্তুও মুখস্ত হবে। এই পদ্ধতি ছাড়া শিক্ষাদান করলে বিষয়বস্তু থাকবে বিক্ষিপ্ত আর প্রয়োজনে তার যথাযথ ব্যবহারও সম্ভব হবে না।

পুনরাবৃত্তি মূলনীতি

অর্থাৎ শিশুদের যা কিছু শিক্ষাদান করানো হবে তা পুনঃ পুনঃ অনুশীলনীর মাধ্যমে ভালভাবে মুখস্ত করাবে। অনেক কিছু শিক্ষাদান করতে গিয়ে শিক্ষকমন্ডলীর অনেকেই পুনরাবৃত্তি করার প্রতি অসতর্ক থাকে। আর খেসারত তাদেরকেই দিতে হয়। কারণ, তখন শিশুরা পেছনের পড়া ভুলে যায় আর সামনের পড়াও বুঝতে সক্ষম হয় না। তাই পুনরাবৃত্তি ও অনুশীলনীর প্রতি অসাধারণ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। পাঠের প্রত্যেকটি পড়া শেষ হলে সেই অংশের এবং পুরো পাঠ শেষ হলে পুরো পাঠের পুনরাবৃত্তি করে দেবে। যে নিয়মই পড়ানো হয় তা যেন খুব ভাল করে অনুশীলনী করা হয়। প্রত্যেক পাঠ শেষ হলে যথারীতি কিছু সময় এবং প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন পাঠ পুনরাবৃত্তি ও অনুশীলনীর জন্যে নির্ধারণ করা চাই। এতে এক সপ্তাহের পাঠক্রম ভালভাবে আয়ত্বে আসবে। পুনরাবৃত্তি ছাড়া সামনের পাঠ শুরু করা ঠিক নয়। ভেবে দেখতে হবে, যে 'ইলম' হাসিল করা শিশুদের ক্ষমতার বাইরে তা শেষ পর্যন্ত তাদের কি কাজে আসবে?

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষাদানে কতিপয় সুক্ষ্ম রহস্য

শিক্ষাদানের সাধারণ মূলনীতি আলোচনার পর এবার নিম্নে শিক্ষাদানের এমন কতিপয় সুক্ষ্ম রহস্য আলোচনা করা যাচ্ছে যেগুলো প্রাথমিক শিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষাদান বিষয়ে সেগুলো গৃহীত নীতিমালার রূপ লাভ করেছে। এসব রহস্য স্বয়ং কষ্ঠিতে যেমন পরীক্ষিত তেমনি বিবেকও এগুলোর সত্যতা ও উপকারিতার সাক্ষ্যদান করে। তাই যথাসাধ্য এগুলোর প্রতি আমল করা উচিত। অবশ্য শিক্ষকের উচিত প্রয়োজন মত এগুলোর প্রতি হস্তক্ষেপ করা। বিশেষ করে যখন সময় খুব সীমিত থাকে অথবা যখন অধিক বয়সের বালকদের পড়ানো হয় বা বালেগ শিক্ষার্থীদের পড়ানো হবে।

জানা থেকে অজানার দিকে যাবে

অর্থাৎ শিশুরা প্রথম থেকে যতটুকু জানে তার ভিত্তিতে তাদেরকে নতুন কথা শেখানো বা বুঝানো হবে। এ হচ্ছে শিক্ষাদানের স্বাভাবিক পদ্ধতি, যাতে বিষয়বস্তু যথাযথভাবে বুঝে আসে আর শিশুদের মন এমন বস্তুর দিকে প্রথম প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ ও মনযোগ নিবদ্ধ করে যাতে নতুনত্ব ও অভিনবত্বের সাথে কিছুটা পরিচিতিও নিহিত থাকে। একেবারেই নতুন বস্তু যদি হয়, যার সম্পর্কে শিশুরা ইতিপূর্বে মোটেই জ্ঞাত নয় তা শিশুদের কাছে মোটেই মনযোগ দেয়ার যোগ্য হয় না। কোন নতুন বস্তুর বিবরণ ও ব্যাখ্যা সর্বাবস্থাই পূর্ব জ্ঞাত অন্য কোন বস্তুর মাধ্যমেই আলোকপাত করা যেতে পারে। এই সূক্ষ্ম রহস্যের উদ্দেশ্য শিক্ষাদানে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

* প্রতিটি নতুন পাঠ সম্পর্কে শিশুদের পূর্ব ধারণার যথাযথ অনুমাণ করে নিতে হবে, যেন তার আলোকে নতুন কথাগুলো বলা যায় বা শেখানো সম্ভব হয়।

* নতুন পাঠের ভূমিকায় শিশুদের এমন ধরনের প্রশ্ন করতে হবে যাতে শিশুদের এতদসংক্রান্ত পূর্ব ধারণার যথাযথ অনুমাণ পাওয়া যায়। প্রশ্নাবলী মূল বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়ার সাথে সাথে এমন সহজবোধ্য

www.nagorikpathagar.org

হতে হবে যেন শিশুদের উত্তর প্রদানে অসুবিধা না হয়, আর তাদের এমন ভংগীতে জিজ্ঞাসা করতে হবে যেন শিশুরা তাদের মনের সবকিছু খোলাখুলি প্রকাশ করতে পারে।

* একই বিষয়ের বিভিন্ন পাঠ এমনভাবে বিন্যাস করা চাই যে প্রত্যেক পরবর্তী পাঠ পূর্ববর্তী পাঠের সাথে সম্পৃক্ত হয়।

* প্রতিটি নতুন পাঠ শিশুদের দৈনন্দিন জীবনে বা তাদের অভিজ্ঞতাও প্রত্যক্ষ করা বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে পড়াবে।

* নতুন পাঠ ও পুরান পাঠের পাশাপাশি তুলনা করে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ভালভাবে বুঝিয়ে দেবে।

* শিশুদের অভিজ্ঞতা অপক্ক আর তাদের চিন্তা অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এ জন্যে তাদের পূর্ব যোগ্যতা দিয়ে পাঠে উপকারিতা হাসিল করার সময় পূর্বের ধারণা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে।

সহজ থেকে কঠিনের দিকে যাবে

অর্থাৎ প্রত্যেক পাঠের প্রারম্ভ হতে হবে সহজ বিষয় দিয়ে এবং ক্রমান্বয়ে যেতে হবে অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয়ের দিকে। এ হচ্ছে শিক্ষাদান কাজের যুক্তিসংগত রহস্য। এ পদ্ধতিতেই শিশু অজ্ঞাতসারে ক্রমাগত কঠিন বিষয় আয়ত্বে আনতে পারে। তাদের অন্তর প্রশস্ত হয়। তাদের রুচী-স্পৃহা ঠিক থাকে আর তারা কঠিন বিষয়কে অসাধ্য মনে করে না। বরং দৃঢ়চিত্তে সেগুলোর মোকাবিলা করে থাকে। পক্ষান্তরে যদি শিশুকে প্রথম বারেই কঠিন বিষয়ে ফেঁসে দেয়া হয় তাহলে সে সাহস হারা হয়ে পড়ে এবং নিরাশ হয়ে চেষ্টাই ছেড়ে দেয়। এ প্রসংগে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা চাইঃ

* সহজ ও কঠিন দুটো আপেক্ষিক শব্দ। একই কথা কারো জন্যে সহজ আর কারো জন্যে কঠিন। তেমনিভাবে শিখে নেয়ার পূর্বে যে কথা কঠিন থাকে শিখে নেয়ার পর সে কথাই সহজ হয়ে যায়। এজন্যে সহজ ও কঠিন হওয়ার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট শিশুর অনুপাতে করতে হবে, নিজের হিসেবে অথবা অন্য কোন লোকের হিসেবে পরিমাপ করা যাবে না। এ প্রসংগে শিক্ষক থেকে ভুল হয়ে যায়, তারা নিজেরা একটি বিষয়কে সহজ মনে করে শিশুদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা

www.nagorikpathagar.org

করে থাকে, অথচ বিষয়টি মূলত শিশুর জন্যে কঠিন ও বোধগম্যের বাইরে। যখন শিশু তা বুঝতে সক্ষম না হয় অথবা কিছু অংশ বুঝতে পারে আর কিছু থাকে তার বোধগম্যের বাইরে। যখন শিক্ষক তার প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করে এবং অনেক সময় কঠোরতা আরোপ করতে শুরু করে। অথচ শিশু তো অপারগ ও নির্দোষ।

* পাঠক্রম তৈরীর প্রারম্ভেই প্রত্যেক বিষয়ের পাঠকে সহজ ও কঠিন হিসেবে বিন্যাস করে নেবে আর পাঠদান করার সময় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেঃ প্রথমে সহজ ও পরে কঠিন পাঠের অবতারণা করবে।

* পাঠ অত্যন্ত কঠিন হলে যেমন নৈরাশ্য ও মনের কাঠিন্য সৃষ্টি হয় তেমনিভাবে পাঠ অতি সহজ হলেও বিরক্তি ও অমনোযোগিতা এসে যায় এবং তার পেছনে সময় ব্যয় করলেও ফল হয় না। সুতরাং পাঠদানের প্রথমদিকে সহজ থেকে শুরু করে ক্রমাগত কঠিনের দিকে যেতে হবে। এতে শিশুদের মধ্যে সমস্যা ও কঠিন বিষয় সমাধান করার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে।

সরল থেকে জটিলের দিকে যাবে

অর্থাৎ প্রত্যেক পাঠে প্রথমে নিবে সরল চিন্তা, তারপর জটিল বিষয় বুঝাবে। তেমনিভাবে শিশুদের বয়স, বোধশক্তি, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ সামনে রেখে প্রতিটি বিষয়ের পাঠক্রম এমনভাবে বিন্যাস করবে যেন সরল ও সহজ বিষয়বস্তু প্রথম দিকে থাকে আর ক্রমাগত জটিল ও যৌগিক বিষয়-বস্তুর সন্নিবেশন থাকে। যেমনঃ অংক শাস্ত্রে একটা নিয়ম শেখানোর পর প্রথম উক্ত নিয়মে সহজে করার মত কিছু প্রশ্ন পেশ করবে, তারপর জটিল নিয়মের অংক করতে দেবে। আর সবশেষে এমন প্রশ্নাবলী রাখবে যেগুলোর সমাধানের জন্যে প্রথম দিকের নিয়মের সাথে কিছু অতিরিক্ত নিয়ম জানার আবশ্যকতা দেখা দেয়। নিয়ম ও সূত্র শেখানোর বেলায়ও একই নিয়ম-পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ প্রথম দিকে সরল সহজ এবং ক্রমাগত জটিল ধরনের। তবে সরল ও জটিলের বিচার সর্বদা শিশুদের যোগ্যতার মাপকাঠিতে করতে হবে। কারণ একটা জিনিস বড়দের চোখে খুব সরল লাগলেও ঐ বস্তুটাই শিশুদের চোখে অত্যন্ত জটিল মনে হয় আর তা তাদের বুঝতে বেশ বেগ পেতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

স্বতন্ত্র থেকে একক ধারণার দিকে যাবে

অর্থাৎ কোন একক ধারণা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে স্বতন্ত্র বস্তুর সাহায্য নিতে হবে। যেমন– শিশুদের গণনা, জোড়, বেজোড়, যোগ, বিয়োগ শেখাতে প্রথমে আঙুলের গিরা, বল ফ্রেম, গুলি, তেঁতুলের বিচি ইত্যাদির সাহায্য নিলে অতি সহজেই গণনা শেখানো যায়। অতঃপর কোন কিছুর সাহায্য ছাড়াই যোগ বিয়োগ করতে পারে। তেমনিভাবে মডেল, ছবি, মানচিত্র ইত্যাদির সাহায্যে কোন বিশেষ চিন্তাধারা সহজেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। একেবারেই অপরিচিত বা নতুন কোন কিছুর পরিচিতির জন্যে ওসব মডেল, ছবি ও মানচিত্র খুবই সহায়ক।

এই রহস্য থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে নিম্নোক্ত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

* পাঠ্য বিষয় আরম্ভ হবে স্বতন্ত্র ও নিরেট বস্তু নিয়ে ব্যাষ্টিক পর্যায়ে এবং নির্দিষ্ট ও আনুসঙ্গিক উপমা দিয়ে। কিন্তু তা শেষ হবে যথাসম্ভব একক চিন্তাধারার ওপর।

* নিরেট বস্তু অথবা নির্দিষ্ট ও আনুসঙ্গিক উপমা দিয়ে ততক্ষণ সাহায্য নেয়া যাবে যতক্ষণ তা প্রয়োজনীয় হয়। ক্রমাগতভাবে একক চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠার দিকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে।

* সামষ্টিক চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা হয়ে যাওয়ার পর তাকে সামষ্টিক পর্যায়ে রেখে দেয়া যাবে না। বরং পুনরায় ব্যষ্টিক অথবা সামষ্টিক পর্যায়ে রেখে দেয়া যাবে না। বরং পুনরায় ব্যষ্টিক অথবা নির্দিষ্ট উপমা দিয়ে অধিক ব্যাখ্যা জানা যাবে।

অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট চিন্তাধারা নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট করে দেবে

শিশুদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ অপূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে, তাই বিভিন্ন জিনিসের ব্যাপারে তাদের চিন্তাধারা থাকে অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। শিক্ষকের উচিৎ ক্রমাগত সেগুলোকে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট করে তোলা, এতে করে শিশুদের শিক্ষা পাকা ও নির্ভরযোগ্য হতে পারে। এটা করার পদ্ধতি হলো শিশুদের

www.nagorikpathagar.org

অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ করার যথেষ্ট সুযোগ দেয়া এবং তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এতেকরে সে যেন পর্যবেক্ষণে আসা বস্তুর বিষয়ে যেমন তেমন জানাকে যথেষ্ট মনে না করে। শিশুদের ভুল ও অসম্পূর্ণ চিন্তাধারা বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট করার জন্যে ছবি, মানচিত্র, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং উপমার সাহায্য নেয়া উচিত। আমাদের এখানে সাধারণতঃ শিশুদের প্রচলিত শব্দাবলীর সংজ্ঞা এবং কঠিন শব্দের অর্থ বদ্ধমূল করে দেয়া হয় আর তারই উপর নিশ্চিন্ত করা হয়। অথচ এমনভাবে না চিন্তাধারা স্পষ্ট হয়, না এটার অর্থ সুন্দরভাবে বোধগম্য হয়। আর উপরোক্ত পন্থায় এসব অবস্থার সুস্পষ্ট চিন্তাধারা না স্পষ্ট হয়, না তা বুঝে আসে। উপরোক্ত পদ্ধতিতে এ সবের বিদূরণ আবশ্যক।

বিশেষ থেকে সাধারণের দিকে যাবে

অর্থাৎ প্রথমে বিশেষ বিশেষ ঘটনাপঞ্জী বলবে এবং সাধারণ বিষয়ের অবতারণা করবে শেষের দিকে। কোন সাধারণ নিয়ম নীতি গ্রহণ করতে অথবা কোন সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে শিশুদের যাচাই করার, অভিজ্ঞতা হাসিল করার এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্যে যথেষ্ট অবকাশ দেবে। নৈতিক বিধি ও পদ্ধতি বুঝানোর জন্যে বিভিন্ন দৃষ্টি ভংগি ও তত্ত্ব আলোচনার পরিবর্তে নির্দিষ্ট ঘটনা বর্ণনা করবে। প্রথমে ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের ঘটনাপঞ্জী শুনাবে, তারপর যথারীতি ইতিহাস ও জাতির উত্থান পতন সম্পর্কিত কাহিনী ধারাবাহিকভাবে শুনাবে।

শিক্ষকমন্ডলী সুবিধার জন্যে সাধারণত প্রথমে নিয়ম-নীতি বা প্রচলিত বিধি ও মূলনীতি মুখস্থ করিয়ে থাকেন। ছাত্রদেরকে চিন্তা-গবেষণা করে উক্ত সিদ্ধান্ত পেতে সুযোগ দেয়া হয় না। এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। কারণ, এতে করে শিশুদের পরনির্ভর হয়ে এমন একটা কথা স্মরণ করতে হয় যা সে ভালভাবে বুঝে উঠতেও পারে না আর তা সত্তর ভুলেও যায়।

অবশ্য অভিজ্ঞতা হাসিল ও পর্যবেক্ষন কার্যে শিক্ষানবীশদের কেবল এতটুকু সময়ই লাগাতে হবে যেটুকু না দিলেই নয়। কোন সাধারণ সিদ্ধান্ত ও মূলনীতি আয়ত্বে এলে সে জন্যে অধিক পরীক্ষা নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা লাভের এবং উদাহরণ ইত্যাদির পেছনে মোটেই সময় ব্যয় করা যাবে না। বরং উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে আরও সিদ্ধান্ত ও অধিকতর সমস্যাদির সমাধান বের করার

www.nagorikpathagar.org

কাজে ব্যবহার করতে হবে।

পূর্ণ থেকে অংশের দিকে যাবে

অর্থাৎ প্রথমতঃ পূর্ণ বিষয়টির উপর একটা সামগ্রিক চোখ বুলিয়ে নেবে। অতঃপর এক একটা অংশের বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করবে। এভাবে প্রথমেই একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করে নেবে এবং পূর্ণ চিত্র স্মৃতিপটে অংকিত করে নেবে। তারপর ক্রমাগত এক একটা অংশ সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা লাভ করবে।

প্রথম দিকে শিশুদের দৃষ্টি কোন কিছুর অংশ বা তার বিস্তারিত বিষয়ের প্রতি পতিত হয় না। বরং তারা পূর্ণ বস্তুর উপর সামগ্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকে এবং প্রত্যেক বস্তুর একটা মোটামুটি ধারণা স্মৃতিতে ধরে রাখে। শিক্ষকের উচিত ধীরে ধীরে এক একটি অংশের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে পূর্ণ বস্তুর চিত্র আরো স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে ধারণা দেয়া অংশের আলোচনা শেষ করে পূর্ণ বস্তুর সাথে সেই অংশগুলোর সম্পর্ক জুড়ে দেবে।

প্রকৃতির অনুসরণ করবে

অর্থাৎ শিশু দৈহিক ও মানসিক যে স্তরে উপনীত হয়েছে শিক্ষকের মনে ঐ স্তরের বৈশিষ্টসমূহ জাগরুক রাখবে। আর তাদের স্বভাব প্রকৃতি যে পরিমাণ ধারণ ক্ষমতা রাখে কেবল সে পরিমাণ (জ্ঞান) ইলম দান করবে। স্বভাবগত চাহিদা, মৌলিক ঝোঁক প্রবণতা, মানসিক আগ্রহ ও রুচীর প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং বৈধ সীমারেখার মধ্যে তা পুরোপুরিভাবে পূরণের প্রতি যত্নবান হবে। শিশুদের স্বভাবের সাথে সংঘর্ষ করবে না। আর স্বভাব বিরোধী কোন কিছু তাদের মস্তিষ্কে জোর করে ঢুকিয়ে দেবে না। কারণ, এতে উপকারের চাইতে বরং ক্ষতি হয় অধিক। আর পরিশ্রম তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ই। সাধারণত এর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত চরম আকার ধারণ করে। কেউ কেউ শিশুদের সময় আসার পূর্বেই মানসিক পরিপক্ক বানিয়ে ছাড়ে, এটা কিছুতেই সমীচীন নয়। শিশুকে শিশু হিসেবেই গড়ে উঠতে দেবে। শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণে দৈহিক ও মানসিক অবস্থা, স্বভাব, ঝোঁক প্রবনতা, রুচি, উদ্যম-উৎসাহ ও অনুভূতি ইত্যাদির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এভাবেই পাঠদান সফল ও কার্যকর হতে

www.nagorikpathagar.org

পারে।

পন্ডিতি পদ্ধতি পরিহার করে স্বাভাবিক পদ্ধতি গ্রহণ করবে

অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ে মূল আলোচনা মানতিক বা গবেষণার বই পুস্তকের উপস্থাপনার মত শিশুদের জন্যে পেশ করবে না, বরং যেভাবে আলোচনা করলে শিশুদের ধারণ ক্ষমতার ভেতর থাকবে সেভাবেই আলোচনা করবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মানতিকী ধরনের আলোচনা মানে প্রথমে বর্ণমালায় বিশেষজ্ঞ বানানো তারপর আকার ইকার পড়ানো, তারপর দুই অক্ষর, তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ যেসব শব্দে বর্ণমালা গুলো স্বতন্ত্র থাকে। তারপর যুক্তাক্ষর ও যুক্ত শব্দ কোষ, তারপর বাক্যাবলী এবং সবশেষে রচনা পড়াবে। এই পদ্ধতি ও যুক্তিসংগত মানতেকী ধরনের ঠিকই আছে, তবে কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অত্যন্ত নিরেট শুষ্ক ও নিরস– এতে তারা মোটেই আগ্রহ উদ্দীপনা অনুভব করে না। পক্ষান্তরে এর পরিবর্তে যদি শিশুদের প্রথমে আকর্ষণীয় ছবি, চোখ ঝলসানো রঙ অথবা মূল বস্তুর সাহায্যে কয়েকটি বাক্য এমনভাবে পেশ করবে যাতে একই শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকে। অতঃপর এসব বাক্যকে ভেঙে শব্দ এবং শব্দ ভেঙে বর্ণ ও উচ্চারণ বলা হয়, তাহলে এই পদ্ধতিতে শিশুরা তা সহজেই গ্রহণ করতে পারে আর তাদের আগ্রহও সৃষ্টি হয়। তেমনিভাবে জ্যামিতি শাস্ত্রে মানতিকী পদ্ধতি হলো প্রথমে 'বিন্দু', তারপর 'রেখা' আর তারপর 'কোণ' তারপর বিভিন্ন 'ভূজ' এবং সর্বশেষে মূল পূর্ণাঙ্গ বস্তুর আলোচনা আসবে। কিন্তু শিশুদের জন্যে প্রথমে মূল পূর্ণাঙ্গ বস্তু, তারপর 'ভূজ', তারপর 'কোণ', 'রেখা', ও 'বিন্দু'– এভাবে আলোচনা করাই অধিকতর উপযোগী।

কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে রচনাবলীর জন্যে মানতিকি পদ্ধতিও অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী প্রমাণিত হয়ে থাকে। সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল শাস্ত্রের পরিপক্ক জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বনই অধিকতর ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। আর শিশুদেরও শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে এই পদ্ধতির দিকে নিয়ে আসতে হবে। এজন্যে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ধারাবাহিকতাকে পাল্টিয়ে দিতে হবে। আর তা দিতে হবে যে পর্যন্ত দেয়া অপরিহার্য। পাঠদান মানতিকী পদ্ধতিতে পেশ করলে যখন ঐকান্তিকতা বাড়বে বলে মনে হবে ঠিক সে পর্যন্ত এভাবে উল্টো করে শিশুদের

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা দেবে।

ব্যতিক্রম নিয়মের পূর্বে সাধারণ নিয়ম শেখাবে

অর্থাৎ প্রথমতঃ সাধারণ নিয়ম নীতি বিভিন্ন প্রকারের অনুশীলনীর মাধ্যমে খুব ভালভাবে স্মৃতিপটে অংকিত করে দেবে, তারপরে ব্যতিক্রম নিয়ম নীতি শেখাবে।অন্যথায় বিক্ষিপ্ত ধারণা জন্ম নেবে এবং যে নিয়ম নীতিই পড়ানো হবে তাতে দোদুল্যমান মনোভাবের সৃষ্টি হবে এবং তা মনে রাখতে ও সময় মত পুনঃ পেশ করতে কঠিন হবে। যেমনঃ ইংরেজী ভাষায় যেসব শব্দের প্রথম অক্ষর Vowel হবে তার পূর্বে An বসাতে হবে। কিন্তু এই নিয়মের সংগে সংগে একই নিশ্বাসে এই নিয়মের ব্যতিক্রম অর্থাৎ U যদি 'ইউ'র মত এবং O যদি 'ওয়া'র মত উচ্চারিত হয় তখন Consonant বসবে নিয়মটি বলবে না। বরং তা পরবর্তী সময়ে শেখানোর জন্যে বাকী রাখবে।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষাদানের উপযোগী উপাদান ও উপায়

সফল শিক্ষাদানের জন্যে যেমন কিছু মূলনীতি ও পদ্ধতি রয়েছে, তেমনি সে জন্যে কিছু প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণও রয়েছে। এসব উপায় উপকরণ প্রয়োজনে ব্যবহার করা আবশ্যক। যেমন–

১) প্রশ্ন ও উত্তর   ২) বিবরণ বর্ণনা

৩) ব্লাকবোর্ড   ৪) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৫) মানচিত্র, মডেল, তালিকা, চিত্র ইত্যাদি

৬) বাড়ীর কাজ (Home work)

৭) পাঠ্য পুস্তক

৮) সহযোগী উপাদান (গ্রামোফোন, রেডিও, ফিল্ম ইত্যাদি)

৯) পাঠাগার ও লাইব্রেরী

১০) পরীক্ষা নিরীক্ষা।

প্রশ্ন ও উত্তর

শিক্ষাদান ব্যাপদেশে প্রশ্নপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। যেসব শিক্ষক কেবল একাধারে বলতেই থাকে এবং নিজে যেমন ছাত্রদের কোন প্রশ্ন করে না, তেমনি ছাত্রদেরও প্রশ্ন করার কোন সুযোগ দেয় না। এ ধরনের শিক্ষক থেকে ছাত্ররা খুব কমই উপকৃত হয়ে থাকে। আর এ ধরনের শিক্ষাদানে শিশুরা অনেক কমই উদ্দীপনা পেয়ে থাকে।

প্রশ্নাবলীর গুরুত্ব ও উপকারিতা

www.nagorikpathagar.org

যথাযথ প্রশ্নাবলীর বেশ গুরুত্ব ও উপকারিতা রয়েছে। যেমন–

* অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করে শিশুদের পাঠের প্রতি অনুরক্ত করা যায়।

* পাঠে তাদের মনোনিবেশ স্থায়ী রাখা যায়।

* অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করে তোলা এবং ধীরগতি সম্পন্নদের গতিশীল করে তোলার ও সাহসী করে গড়ে তোলার কাজ করা যায়।

* শিক্ষার্থীদের চিন্তা গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও পাঠাভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

* তাদের যোগ্যতার পরিমাপ করা সম্ভব হয়।

* শিক্ষার্থীদের তাদের ত্রুটি অনুভব করানো যায়।

* পাঠক্রম এগুতে সহায়তা করা যায়।

* পাঠ পুনরালোচনা করানো যায়।

উদ্দেশ্যাবলী

পাঠদানের সময় শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে হয়– কিছু পাঠের প্রারম্ভে, কিছু মধ্যবর্তী সময়ে আর কিছু শেষের দিকে।

ক) প্রারম্ভিক প্রশ্নাবলীঃ এগুলো পাঠের প্রথম দিকে করানো হয়ে থাকে, সংখ্যায় স্বল্প এবং খুব সহজ হয়ে থাকে। অধিকন্তু আলোচ্য বিষয়বস্তুর সাথে এগুলোর সম্পর্ক থাকে গভীর। এসব প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলোঃ

* শিশুদের পূর্ব দক্ষতা অনুমান করা এবং তারই ভিত্তিতে নতুন জ্ঞান দান করা।

* শিশুদের শিক্ষাগ্রহণের জন্যে মনমানসিকতা তৈরী করা।

* শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে তারা ভালভাবে অবগত হতে পারে।

খ) মধ্যবর্তী প্রশ্নাবলীঃ পাঠের মাঝামাঝি স্থানে উপনীত হলে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। এগুলোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলোঃ

* শিক্ষক বুঝতে পারেন যে শিক্ষার্থী যথাযথভাবে পাঠ হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে।

* পাঠে শিশুদের মনযোগ ও আগ্রহ বহাল থাকা।

* পাঠ অগ্রসরে শিক্ষার্থী বাস্তবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

* পাঠের কঠিন অংশ যেন পরিষ্কার ও মুখস্থ হয়।

* চিন্তা গবেষণার সুযোগ পাওয়া যায় এবং জ্ঞান হাসিলের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

* অতীত জ্ঞানের সাথে নতুন জ্ঞান সংযোগ সাধিত হতে পারে।

* শিশুদের দৈনন্দিন ঘটনাপঞ্জী, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির সাথে নতুন অর্জিত জ্ঞান সমকক্ষতাও তুলনা হতে পারে।

* কিছু পর্যবেক্ষণ করানো অথবা কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করানোর কাজে সাহায্য পাওয়া যায়।

* অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করা যায় এবং ধীরগতি সম্পন্ন ছাত্রদের সাথে নিয়ে চলা যায়।

গ) সমাপনী প্রশ্নাবলীঃ পাঠের শেষের দিকে কিছু প্রশ্ন করা হয় এ জন্যে যেঃ

* পুরো পাঠের পুনরালোচনা হয়ে যায়।

* পাঠের মাধ্যমে শিশুদের যা কিছু শেখানো বুঝানো হলো শিশুদের তা ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়া যায়।

* শিশুদের কোন হোম ওয়ার্ক বা হাতে কলমে কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায়। অথবা তাদের এমন কোন কাজের দায়িত্ব প্রদান করা যায় যে কাজের একটা সমাধান আবশ্যক।

প্রশ্নাবলী কি ধরনের হওয়া চাই?

প্রশ্নাবলী দিয়ে উপরোক্ত লক্ষ্য উদ্দেশ্য তখনি অর্জিত হতে পারে যখন তাতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্টাবলী পাওয়া যায়ঃ

* প্রশ্নাবলীর ভাষা পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট, বোধগম্য ও অতিরঞ্জন মুক্ত হতে হবে। তাহলে শিশুরা সহজেই বুঝতে সক্ষম হবে। ভাষার স্পষ্টতা তাদের মনযোগ আকর্ষণের ও জবাব প্রস্তুতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। অনেকে প্রশ্নপত্রে নিষ্প্রয়োজনীয় শব্দসম্ভার অন্তর্ভূক্ত করে থাকে। যেমনঃ 'মহানবী (সঃ) কখন আবির্ভূত হয়েছিলেন?" প্রশ্ন করতে হলে বলে থাকে, "তোমরা কি বলতে পার অথবা তোমাদের মধ্যে কে বলতে পার, মহানবী (সঃ) কোন সনে আবির্ভূত হয়েছিলেন?" এ ধরনের অতিরিক্ত শব্দসম্ভার থেকে প্রশ্নপত্র মুক্ত হওয়া

www.nagorikpathagar.org

চাই।

* মৌখিক প্রশ্নাবলী যদি খুব সংক্ষিপ্ত হয়, তবেই পূর্ণ প্রশ্ন শিশুদের স্মৃতিপটে অংকিত থাকতে পারবে। যেমন- "মহানবী (সঃ) কেন হিজরত করেছিলেন?" একটা যথার্থ মৌখিক প্রশ্ন। এ প্রশ্নটিকেই যদি এইভাবে করা হয় যে, "মহানবী (সঃ) আরবের কেন্দ্রীয় শহর নিজের জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে কেন সম্পূর্ণ নতুন শহর এবং মক্কা থেকে বহুদূরে অবস্থিত মদীনা শহরে হিজরত করতে গেলেন?" তাহলে এ প্রশ্নটি মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

* প্রশ্নাবলী শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে করবে।এমন সরল যেন না হয় যে তার প্রতি ছাত্র লক্ষ্য করার ও চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করে; আর এমন কঠিনও যেন না হয় যে শিক্ষার্থীরা জবাব দানের সাহস করতেও না পারে।

* পাঠদানের প্রাক্কালে যত প্রশ্ন করা হবে, সমস্ত প্রশ্ন পরস্পর এমন সম্পর্কযুক্ত হবে যেন একটি অপরটির অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর সামগ্রিকভাবে প্রত্যেকটি প্রশ্ন মূল পাঠের সাথে সম্পৃক্ত হয়। এভাবে মনযোগের ধারাবাহিকতা থাকে আবার অপ্রয়োজনীয় কথার জন্যে সময়ও বিনষ্ট হয় না।

* দুই বা ততোধিক প্রশ্ন একত্র করে জিজ্ঞাসা করা যাবে না। যেমন- "নামাযের সময়, রাকায়াত ও উপকারিতা বল?

মাহমুদ গযনবী কোথায় কোথায় এবং কেন আক্রমণ করেছিল?"

* প্রশ্নাবলী সবিস্তার, নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হতে হবে, যেন শিশুদের মন মূল প্রশ্নের দিকে ধাবিত হয়। এমন প্রশ্ন করা উচিত নয় যে প্রশ্নের উত্তর একাধিক। যেমন- সামনে কি দেখা যায়? অথবা ম্যাপে কি দেখা যায়? এই উভয় প্রশ্নেরই বিভিন্ন উত্তর হতে পারে।

* প্রশ্নাবলী কেবল মুখস্ত বা মনে রাখা বিষয় সম্পর্কে যেন না হয়। বরং এমন বিষয় সম্পর্কেও যেন হয় যাতে শিশুদের চিন্তা করতে ও মাথা ঘামাতে হয়।

* প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে প্রশ্নাবলী সাধারণত সাদাসিদা এবং এমন ধরনের হওয়া চাই যার উত্তরে শিশুরা কিছু বলতে পারে। অবশ্য উপরের শ্রেণীসমূহে অপেক্ষাকৃত জটিল প্রশ্ন করা যেতে পারে যেন শিক্ষার্থীরা কিছু চিন্তা গবেষণা ও প্রমাণ সহ জবাব দিতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

* পূর্ব সাবধানতা ছাড়া এমন কোন প্রশ্ন করবে না যাতে শিশুরা বিভ্রান্তিতে পতিত হতে পারে। যেমন– একটা বালক ঘন্টায় ৩ মাইল পথ অতিক্রম করলে পাঁচটা বালক ঘন্টায় কত মাইল যাবে?

* এমন প্রশ্ন করা ঠিক নয় যার উত্তর কেবল হ্যাঁ, অথবা না, হবে। অথবা একই শব্দে যথেষ্ট হয়ে যায়। যদি এমন ধরনের প্রশ্ন করতেই হয় তবে সাথে সাথে কেন অথবা কিভাবে শব্দও জুড়ে দেবে। যাতে করে উত্তর প্রদানে কিছুটা চেষ্টা সাধনার প্রয়োজন হয় এবং শিক্ষক মহোদয়ও বুঝতে পারেন যে শিশু বুঝে শুনেই হ্যাঁ, অথবা না, বলছে। প্রশ্নাবলী এমন হওয়াও ঠিক নয় যে, প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর নিহিত থাকে। অথবা প্রশ্নটিতে উত্তরের প্রতি ইংগিত থাকে। যেমন, 'হযরত ঈসা (আঃ) কি নবী ছিলেন না?' গন্ডার কি ঘাসে বিচরণশীল জন্তু, না শিকড় খাওয়া কোন জন্তু?

* কোন কিছু পড়িয়ে দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করবে না। যেমন– মহানবী (সঃ) ৫৭১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন। মহানবী (সঃ) কোন সালে জন্মগ্রহণ করেছেন? অবশ্য যদি শিশু অমনোযোগী হয় অথবা তাকে অন্যমনস্ক দেখা যায়, তখন তাকে এ জাতীয় প্রশ্ন করা সংগত। অথবা এভাবে জিজ্ঞাসা করা যে অমুক ছেলে কি বলেছে? –ইত্যাদি।

প্রশ্ন করার পদ্ধতি

যথার্থ প্রশ্নপত্র তৈরী করা যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যাতে যথেষ্ট সচেতনতা, চিন্তা গবেষণা এবং অনুশীলনী ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। তেমনিভাবে প্রশ্ন করার জন্যেও বিষয় জ্ঞানের, অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখা চাইঃ

* পুরো শ্রেণীকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করবে। কারো দিকে ইংগিত করে অথবা কারো নাম ধরে প্রশ্ন করবে না। অবশ্য উত্তরটা কোন একটি ছাত্র থেকেই চাওয়া হবে।

* প্রশ্ন করার পর উত্তর ঠিক করার জন্যে কিছুটা সময় দেবে, হঠাৎ উত্তর চাওয়া ঠিক নয়।

* কতিপয় নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীকেই প্রশ্ন করা উচিত নয়। বরং পালাক্রমে সবাইকে জিজ্ঞাসা করবে। অবশ্য এই পালার ব্যাপারে কোন বিশেষ নিয়ম বা ধারাবাহিকতা থাকবে না। অন্যথায় যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না বা যার পালা

www.nagorikpathagar.org

আসবে না সে মনযোগ নিবদ্ধ করবে না।

* প্রশ্ন করার সময় পরিষ্কার শব্দে করবে যেন পুরো শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ভালভাবে শুনতে পায় এবং প্রশ্নে প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশক শব্দাবলী চয়ন করার প্রতি গুরুত্ব দেবে।

* প্রশ্ন অবশ্যাই পুনরায় করবে না। তবে শিক্ষার্থীরা কোন কারণে যদি তা শুনতে বা বুঝতে না পারে তবে তা স্বতন্ত্র কথা। তখন পুনরায় প্রশ্ন করা যায় অথবা কোন সরল প্রশ্ন উথাপন করে মূল প্রশ্নের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

সুযোগ থাকলে প্রয়োজন বোধে ব্লাকবোর্ডে প্রশ্ন লিখে দেবে। বিশেষত টেস্ট করতে অথবা বাড়ীর কাজ দিতে ব্লাকবোর্ডে লিখে দেয়াই উত্তম।

* অমনযোগী শিক্ষার্থীকে হঠাৎ প্রশ্ন করা দরকার।

* প্রশ্ন করার ধরণ হবে আন্তরিকতাময় ও স্নেহপরায়নী, তাহলে শিশু আত্মবিশ্বাস সহকারে উত্তর প্রদানে উদ্বুদ্ধ হবে; ভয়, হেয় মনোভাব, ইতস্তুতা অনুভব করবে না।

* উত্তর পেতে বেশী সময় ব্যয় করবে না।

* যদি একটি ছাত্র ঠিক উত্তর দেয় তবে অন্যান্য ছাত্রদেরও সেই প্রশ্ন করা যেতে পারে।

* মাঝে মাঝে শিশুদেরও প্রশ্ন করার সুযোগ দেবে এবং প্রশ্ন করার প্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ করবে। সাথে সাথে শ্রেণীর পরিবেশ এমনভাবের করে তৈরী করবে যে শিক্ষাদান ব্যাপদেশে কোন কথা বুঝতে না পারলে নির্দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করে নেবে। এতেকরে শিশুদের অনুধাবন করার, চিন্তা করার এবং পাঠে পুরো মনযোগ দেয়ার সাহায্য হয়ে থাকে। অবশ্য অপ্রাসংগিক প্রশ্নাবলী পরিহার করা চাই। প্রশ্ন যদি আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে পরে পৃথকভাবে তার জবাব দেবে।

প্রশ্নাবলী ধীর শান্তভাবে করবে। তাড়াহুড়া করা বা প্রশ্নের ঝড় তোলা ঠিক নয়। এতে শিশুরা ঘাবড়িয়ে যায় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

শিক্ষার্থীদের উত্তর দেওয়া

প্রশ্নাবলী থেকে তখনি পুরোপুরি উপকৃত হওয়া যায়, যখন শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রসংগে যথাযথ কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। এ প্রসংগে নিম্নোক্ত বিষয়

www.nagorikpathagar.org

সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যকঃ

* শিশুদের উত্তর হাস্য মুখে শুনে যাবে। তাদের উত্তর দানে উদ্বুদ্ধ করবে। সঠিক উত্তরের জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবে ও বাহবা দেবে। ভুল ও অযৌক্তিক জবাবের প্রতি ভৎর্সনা ও তিরষ্কার করা পরিহার করবে। অর্থহীন ও অপ্রাসংগিক উত্তর এড়িয়ে যাবে।

* ছাত্রদের কোন ভুল জবাব কৌতুক উদ্রেককারী হলে শ্রেণীতে খুশী ও হাসির বাজার মেলানো যায়। অবশ্য এমনটি করার সময় জবাব দাতা শিশুর প্রেরণার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

* কেবল এমন সব জবাব যথার্থ ও সঠিক মনে করা হবে যেগুলোঃ

১) ভাষা ও ব্যাকরণের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ হয়।

২) প্রাসংগিক হয়।

৩) যা জিজ্ঞাসা করা হয়, উত্তর তারচেয়ে কমবেশী নয়।

৪) পূর্ণ বাক্য হতে হবে। অবশ্য এর প্রতি সর্বদা জোর দেয়া ঠিক নয়, কারণ অনেক সময় অপূর্ণ বাক্যেই স্বাভাবিক উত্তর হয়ে যায়।

৫) পূর্ণ উচ্চারণ সহকারে জবাব দেবে, যেন শ্রেণীর সবাই সঠিক ভাবে শুনতে পায়।

যদি প্রথম জবাব দাতাদের পক্ষ থেকে ভুল উত্তর আসে তবে প্রথমেই সংশোধন করে দিতে হবে।

* যথাসম্ভব শিশুদের উত্তরকেই আংশিক পরিবর্তন পরিবর্ধন করে গ্রহণ করবে। যদি পুরো উত্তর শুদ্ধ না হয় তবে যতটুকু শুদ্ধ হয়েছে ততটুকু গ্রহণ করে নেবে। আর বাকী অংশ অতিরিক্ত প্রশ্ন করে অথবা সময় অভাবে নিজেই উত্তর দিয়ে শেষ করে দেবে। এতে শিশুদের সাহস বাড়ে।

* সঠিক উত্তরগুলোকে অন্যান্য ছাত্রদের পুনরায় জিজ্ঞাসা করবে। মাঝে মাঝে ছাত্রদের উত্তম জবাবকে শ্রেণীতে আদর্শ হিসেবে পেশ করবে।

* সঠিক উত্তর সাথে সাথে গ্রহণ করার পূর্বে অন্যান্য ছাত্রদের জিজ্ঞেস করে নিয়ে পরে গ্রহণ করবে। যাতে করে অন্যান্য শিশুদের ইলমের পরিধি সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা যায়।

* উত্তর চিন্তা করার সময় বলে দেয়া ঠিক নয়, আর জবাব তৈরীর মধ্যে অংশগ্রহণ করাও উচিত নয়। সাহায্যের প্রয়োজন হলে অন্য ছাত্র দিয়ে সাহায্য করিয়ে নেবে।

www.nagorikpathagar.org

* শিশু যদি ভুল উত্তর দেয় অথবা উত্তরই না দেয়, তখন সাথে সাথে উত্তর বলে দেবে না; বরং হয়ত আরো প্রশ্ন করে উত্তরের দিকে নিয়ে যাবে অথবা অন্যান্য ছাত্রদের থেকে সঠিক উত্তর জেনে নিয়ে তাকে পুনরায় বলতে দেবে।

* শিক্ষার্থীদের সকল ভুল উত্তরের প্রতি মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যে সব উত্তর সম্পর্কে দেখা যায় যে শিক্ষার্থী তা বুঝতেই পারেনি, তার অবশ্যই সংশোধন হওয়া চাই। সাথে সাথে বলে দিতে হবে যে তার উত্তরটা কি কারণে ভুল হয়েছে।

* বেপরোয়াভাবে অথবা বেআদবী সহকারে দেয়া উত্তর সমূহের মাঝে মাঝে আন্তরিকতা পূর্ণ সংশোধন উপকৃত প্রমাণিত হয়ে থাকে।

* সাধারণত সামষ্টিক উত্তর চাওয়া ঠিক নয় আর তা গ্রহণ করাও উচিত নয়। অবশ্য পুনরালোচনা অথবা অনুশীলনীর সময়, সময় বাঁচানোর জন্যে এমনটি করা যেতে পারে।

* শিশুদের এমন অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যে, যাকে প্রশ্ন করা হয়, উত্তর সেই দেবে। অন্য কেউ যেন না বলে ফেলে। কারণ অধিকাংশ মেধাবী ছাত্রদের বলে ফেলার কারণে সবাই জানে বলে ধোকায় পড়ার আশংকা থাকে। অথচ পরে দেখা যায় অনেকেই প্রশ্ন বুঝেনি।

* যদি পুরো শ্রেণী অথবা অনেক শিক্ষার্থী পুনঃ পুনঃ ভুল উত্তর প্রদান করে, তাহলে এর কারণ দর্শিয়ে শুধরে দেবে। সাধারণতঃ এর কারণঃ

১) প্রশ্নাবলী শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার বাইরের হয়।

২) শিক্ষাদান পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ আর পাঠ বোধগম্যের বাইরে।

৩) শ্রেণীর ব্যবস্থাপনা সঠিক না হয়।

৪) শিশু থেমে গেছে।

৫) পাঠ নিরস, নির্জীব ও আকর্ষণহীন হয়।

বিবরণ বর্ণনা

শিক্ষাদান ব্যাপদেশে বর্ণনার গুরুত্ব অপরিসীম। নতুন অভিজ্ঞতা হাসিলের প্রাক্কালে শিক্ষককে প্রায়ই তার সাহায্য নিতে হয়। বিশেষত ইতিহাস, ভূগোল,

www.nagorikpathagar.org

জীবন কাহিনী, শাস্ত্র জ্ঞান ও কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে। শিক্ষক কখনো কোন ঘটনা শুনিয়ে থাকেন; কখনো কোন ব্যক্তি, বস্তু ও স্থান সম্পর্কে কিছু বলে থাকেন। অনেক সময় কাহিনী শুনাতে হয়। এসব কারণে তিনি বর্ণনা প্রকাশে সামর্থ না হলে এবং তার বর্ণনা ভংগী প্রভাবশীল না হলে তিনি কিছুতেই সফল শিক্ষক হতে পারেন না।

ক) কোন ব্যক্তি, স্থান অথবা বস্তুর বর্ণনা

কোন ব্যক্তি, স্থান, প্রাণী, বস্তু অথবা ঘটনা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

* শিক্ষকের মনে সেই ব্যক্তি বা বস্তুর ধারণা এতই সুস্পষ্ট হতে হবে যেন তিনি বর্ণনা দেয়ার সময় তা প্রত্যক্ষ করছেন। এটা তখনি সম্ভব যখন তিনি সে সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন বা পর্যবেক্ষন করে থাকেন।

* সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচ্য বিষয়বস্তুর বর্ণনা পেশ করতে হবে যেন শিশুদের অন্তরে নির্ভুল ধারণা বদ্ধমূল হতে পারে।

* যথাসাধ্য সংক্ষেপে বর্ণনা পেশ করবে। অনেক বিস্তারিত বলতে গেলে শিশুদের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। অবশ্য যে জিনিস সম্পর্কে বর্ণনা দেবে তা এমনভাবে বিবৃত করতে হবে যেন শিশুর চোখের উপর তার পুরো ছবি ভাসতে থাকে।

* প্রথমে একটা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরবে। তারপর একটা বিশেষ ধারাবাহিকতায় বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করবে।

* মৌখিক বর্ণনা পেশ করাকেই যথেষ্ট মনে করা ঠিক নয়। বরং স্থান বিশেষে তার মডেল, ছবি, তালিকা, চিত্র ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করবে।

* অদেখা ও অজানা বিষয়ে বর্ণনা করার সময় জানা ও দেখা জিনিষের সাথে তুলনা করে বর্ণনা করবে।

* যা কিছু বর্ণনা করা হবে তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রথমেই বিন্যাস করে নেবে আর বর্ণনা পেশে সেই বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তাহলে কোন কিছু বাদ পড়বে না।

* যা কিছু বর্ণনা করবে তা একাধারে একই ধরনে বলে যাবে না বরং দুই তিন সমীচীন অংশে বিভক্ত করে একটা একটা করে বর্ণনা করে যাবে। প্রতিটি অংশ শেষ করার পর প্রশ্ন করে তার পুনরুল্লেখ করবে। তারপর সংক্ষিপ্ত সার

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কে নোট দেবে।

খ) কাহিনী বর্ণনা করা

আদিকাল থেকেই শিক্ষাদান প্রসঙ্গে কাহিনী বর্ণনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। কাহিনী শুনে কার ভাল না লাগে? আর শিশুরা তো সে জন্যে বেশ আগ্রহী হয়ে থাকে। দাদীমা তাদের অন্যান্য বহু ইহসানের পাশাপাশি এই কাহিনী বলার কারণেই শিশুরা তাদের প্রতি অধিক ঝুঁকে থাকে। কাহিনী সম্পর্কে তাদের স্বভাবগত রুচী ও ঝোঁকের কারণেই তারা তাঁদেরকে কাহিনীর জন্যে বাধ্য করে থাকে। তারা তো সর্বান্তকরণে কাহিনী শুনে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তাদের নিদ্রা চলে যায় আর দাদীমা'র এই দায়িত্ব থেকে নাজাত মিলে তখন, যখন তারা শেষ পর্যন্ত নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে।

গুরুত্ব ও উপকারিতা

১) কাহিনী দিয়ে শিশুদের মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উৎকর্ষ লাভে বেশ সাহায্য পাওয়া যায়। তারা নিজেদের হিরোর মত ভেবে তারই অনুরূপ সমস্ত প্রকার অবস্থার অবতারণা করে থাকে। শুনতে শুনতে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ে এবং চেহারা, দেহের নড়াচড়া, অবস্থান ইত্যাদিতে তার পরিষ্কার ছাপ অনুভূত হতে থাকে। আর তাদের মন মানসিকতায় এমন কিছু প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় যা কাহিনীর হিরোর উপর হয়ে থাকে।

২) চিন্তা শক্তির বৃদ্ধি, মূল উদ্দেশ্য, আদর্শের কাঠামো, জীবন গঠন এবং উচ্চ চিন্তা শক্তির উন্নতি সাধন ইত্যাদির জন্যে কাহিনীসমূহ অনেক বেশী কার্যকর প্রমাণিত হয়ে থাকে।

৩) কঠিন ও নিরস রচনাবলী কাহিনীর মাধ্যমে সহজ, আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে।

৪) ধ্যান ধারণা ও মৌলিক কথা কাহিনীর সাহায্যে অতি সহজে বোধগম্য হতে পারে।

৫) ভাষা শেখাতে, শব্দ সম্ভার জমা করায়, মনোভাব ও মনোবৃত্তি প্রকাশের শক্তি অর্জনে ও কাহিনীসমূহ বেশ সাহায্য করে থাকে।

৬) ইসলামিয়াত, ইতিহাস, ভূগোল, সীরাত গ্রন্থ ইত্যাদি সম্পর্কে

www.nagorikpathagar.org

অভিজ্ঞতা কাহিনীর সাহায্যে সহজেই সঞ্চিত করা যায়। আর কাহিনীর সাহায্যেই এগুলো খুব ভালভাবে স্মরণ করা যায়।

লক্ষণীয় বিষয়াদিঃ

* প্রাথমিক পর্যায়ে কাহিনীসমূহ সরল ও সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই। ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত ও জটিলের দিকে যাবে।

* শব্দাবলী সরল, বাক্য ক্ষুদ্র এবং ভাষা প্রাঞ্জল হওয়া চাই।

* ঘটনাপঞ্জী পরস্পর সম্পৃক্ত, শিশুদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত এবং তাদের রুচী, বোধ, পর্যবেক্ষন এবং অভিজ্ঞতার নিকটবর্তী হওয়া চাই।

* কাহিনীর হীরো যথাসাধ্য শিশু হওয়া বাঞ্ছনীয়, আর তার আচার আচরণ বা কীর্তি পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট দৃশ্যাবলীতে বর্ণনা করবে।

* কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু শিশুর বয়স, দক্ষতা, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট এবং মন মানসিকতার আলোকে নির্বাচন করা চাই।

* কাহিনীর ব্যক্তিবর্গ, স্থান ও বস্তুসমূহ নির্দিষ্ট করে বলা চাই।

* কাহিনীসমূহ তেজোদৃপ্ত শক্তিমত্তায় ভরপুর হওয়া উচিত। তাতে দৌড়াদৌড়ি, নাচানাচি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা, সাহস ও বীরত্ব এবং ভ্রমণ ও সমস্যা সমাধান ও প্রকাশ ইত্যাদি ঘটনাপঞ্জী থাকতে হবে।

* কথোপকথন পরিপূর্ণ হওয়া চাই।

* কাহিনী একাধারে সম্প্রসারিত হতে হবে। তাহলে মনোযোগ নিবিষ্ট এবং আন্তরিকতা স্থায়ী থাকে।

* যদি একটা সব্যাখ্য বাক্য বা বাক্যাংশ অল্প অল্প বিরতির পর পুনরাবৃত্তি করা হয় তাহলে ছোট শিশুরা বেশ মজা পায়।

* কাহিনী যে কোন বিষয় সম্পর্কেই হোক না কেন তাতে কিস্সা দিকটা প্রকট হওয়া চাই। অবশ্য সেই উদ্দেশ্যের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত যেই উদ্দেশ্যে এই কিস্সা শুনানো হচ্ছে।

* বিখ্যাত কাহিনীসমূহ পুরোপুরি পেশ করার পরিবর্তে প্রয়োজন মত শিশুদের যোগ্যতানুসারে বিন্যাস করে সাজিয়ে পেশ করবে। তবে ঐতিহাসিক ঘটনা পেশ করার সময় ঐতিহাসিক রহস্য অথবা ঘটনাপঞ্জীকে খাটো করে দেখিয়ে পেশ করা উচিত নয়।

* কখনো কখনো পরোক্ষ উক্তির পরিবর্তে প্রত্যক্ষ উক্তি করে কাহিনী বর্ণনা

www.nagorikpathagar.org

করলে মজা অনুভূত হয়। এমন কাহিনী শিশুরা অতিসত্তর মুখস্থ করতে পারে আর এগুলো তারা সহজেই বর্ণনা করতে পারে। এজন্যে হীরোর ভাষায়ই মাঝে মাঝে কাহিনী বর্ণনা করা চাই।

* শৈশবে ভূত, প্রেত্ত ও জ্বিন পরীর কিস্‌সা শিশুদের মধ্যে কল্পনা পূজার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে থাকে। আর শৈশবের প্রারম্ভে গুপ্তচর বৃত্তি ও যৌন সংক্রান্ত কাহিনী তাদের মধ্যে নির্লজ্জতা ও বদ স্বভাবের জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটায়। কাজেই এ জাতীয় কাহিনী থেকে তাদের সংরক্ষিত রাখা চাই।

* শিক্ষক সাহেব কাহিনী খুব ভালভাবে পড়ে নেবেন যেন বর্ণনা করার সময় গতিশীলতা বজায় থাকে। মাঝে মাঝে যেন থেমে যেতে না হয় অথবা বই দেখে নেয়ার প্রয়োজন দেখা না দেয়। তাহলে তো পুরো কাহিনীই নিরস হয়ে পড়বে।

* কাহিনীর যে অংশ কথোপকথন রূপে বর্ণনা করা যায় তাকে শ্রেণীতে কথোপকথন আকারে বর্ণনা করার সুযোগ দিতে হয়। অবশ্য কথোপকথনের জন্যে এমন ধরনের কাহিনী নির্বাচন করা উচিত নয় যাতে শিশুদের কোন আপত্তিকর পার্ট নিতে হয়। অন্যথায় তার মধ্যে সেই অবস্থার জন্ম নেবে এবং তার মধ্যে ঐ অভ্যাস শিকড় গেড়ে বসবে।

কাহিনী শুনানোর পদ্ধতি

*কাহিনী সর্বদা মৌখিকভাবে শুনাবে। পড়ে পড়ে শুনানোর ফলে কাহিনী শুনানোর উদ্দেশ্য কার্যকর হবে না। কখনো যদি পড়ে শুনানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে তা এমনভাবে শুনাতে হবে যেন মুখেই বলা হচ্ছে।

* শুনানোর ধরণ আনন্দকর ও উচ্চারণ ভংগী স্বাভাবিক হওয়া চাই। প্রয়োজন মত আওয়াজে উঁচু নিচু এবং ভাব ভংগীতে সন্তোষজনক প্রভাব প্রকাশ পেতে হবে।

* শিক্ষক নিজে যদি কাহিনী তৃপ্তি আনন্দ সহ শুনিয়ে থাকে এবং কাহিনীর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তবে শিশুরাও তা শুনতে আনন্দ অনুভব করে এবং প্রভাবিত হয়। তাই ভাষা, বর্ণনা ও ভংগী ইত্যাদিতে উদ্দিষ্ট পরিস্থিতি ও অবস্থা সৃষ্টির জন্যে সচেষ্ট হতে হবে।

* কাহিনী একাধারে শুনানোর পরিবর্তে দু'তিনটে যুক্তিসংগত ভাবে বিভক্ত করে শুনানো উচিত। একটা অংশ শুনানোর পরে যথার্থ প্রশ্ন উথাপন করে গুরুত্ব

www.nagorikpathagar.org

পূর্ণ দিকগুলোর পুনরাবৃত্তি করবে। তারপর পরবর্তী অংশ শুরু করবে। সবশেষে প্রশ্ন করে পুরো কাহিনীর সারমর্ম শুনে নেয়া চাই।

* কথায় স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার এবং প্রত্যেক ঘটনার পটভূমিকা বর্ণনা করে যথাসম্ভব সব্যাখ্য চিত্র দেখানো আবশ্যক। আর ব্লাকবোর্ডের সাহায্যে অধিক বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা চাই।

* বিষয় সম্পর্কিত কাহিনীতে যথাযথ প্রশ্নের মাধ্যমে যে কথা বুঝানোর জন্যে কাহিনীর সাহায্য নেয়া হলো তা ভালভাবে বুঝিয়ে দেবে।

* কাহিনী শুনাবার সময় সর্বক্ষণ যে বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্যে কাহিনীর অবতারণা করা হচ্ছে সে বিষয়টির প্রতি মনকে নিবদ্ধ রাখতে হবে।

* কাহিনীর যে সব অংশ শিশুদের কথোপকথনের আকারে শুনাতে হবে সেসব শুনানোর সাময় শিক্ষক মহোদয় কথোপকথনের আকারে প্রকাশ করবেন।

* মাঝে মাঝে শিশুদেরও কাহিনী শুনানোর সুযোগ দিতে হবে। আর এ প্রসংগে যথার্থ উপস্থাপনের মাধ্যমে যথাযথ পথ প্রদর্শন হতে পারে।

ব্লাকবোর্ডের গুরুত্ব ও ব্যবহার

শিক্ষাদান কাজকে সহজ, কার্যকর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে ব্লাকবোর্ডের বেশ প্রয়োজন রয়েছে। পাঠ পরিষ্কার করার জন্যে ব্লাকবোর্ড অনেক সাহায্য করে থাকে। কিন্তু নেহাত আক্ষেপ ভরে বলতে হচ্ছে যে, স্বল্প সংখ্যক শিক্ষকই এ থেকে যথাযথ উপকৃত হতে পারছেন।

গুরুত্ব ও উপকারিতা

* পাঠের কঠিন ও জটিল অংশ সহজসাধ্য করার জন্যে ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্যে ব্লাকবোর্ড অত্যন্ত সস্তা ও যথার্থ উপকরণ, প্রয়োজনে তাতে অত্যন্ত স্পষ্ট ও আকর্ষণীয় ছবি, তালিকা ও চিত্র ইত্যাদি অংকিত করা যায়। এতে সময় ও অর্থের অপচয় হয় না। অংকনের কৌশল জানা থাকলে পূর্বে অংকিত বা ছাপানো বস্তুর চাইতে এটা অধিকতর কার্যকর প্রমাণিত হয়ে থাকে।

* শিশুদের সম্মুখে এতে যা কিছু বানানো হয় বা লিখে দেয়া হয় তাকে

www.nagorikpathagar.org

শিশুরা অত্যন্ত মনযোগ ও একাগ্রতার সাথে অবলোকন করে থাকে। তাদের বুঝে আসে অতি সহজে, আর প্রয়োজনে তারা এর অনুলিপিও করতে সক্ষম হয়।

কেবল মৌখিক পড়াতে থাকলে শিশুরা কেবল কানের সাহায্য নেয় আর একাধারে শুনতে শুনতে একঘেয়েমীও এসে যায়। ব্লাকবোর্ডের ব্যবহারে তারা চোখের সাহায্য নেয়ার সুযোগও পায়। তাছাড়া কাজ বন্ধ করে ব্লাকবোর্ডে লেখার ফলে কাজের ধরন পরিবর্তন হওয়ার কারণে তাদের একঘেয়েমী দূর হয়ে যায় এবং মনযোগ ও আকর্ষণ বৃদ্ধিতে সাহায্য হয়ে থাকে। অধিকন্তু, একাধিক ইন্দ্রিয় কাজে লাগানোর ফলে বুঝতে ও স্মরণ রাখতে নেহাত আসান হয়ে থাকে।

* শিশুদের মৌখিক কোন নির্দেশ দিলে অথবা সমাধান বের করার জন্যে কোন সমস্যা বা হোম ওয়ার্ক দিলে তারা কখনো কখনো ভুল বুঝতে পারে। বলা হয় একটা কিন্তু তারা করে বসে অন্যটা। ব্লাকবোর্ডে লিখে দেয়ার ফলে কাজটা নির্দিষ্ট হয়ে যায় আর ছাত্র ভুল বুঝতে বা সন্দেহে পড়া থেকে মুক্তি পায়।

* ব্লাকবোর্ডের ব্যবহারে পাঠের সার সংক্ষেপ ও সংক্ষিপ্ত নোট ধারাবাহিক ও বিন্যস্তভাবে শিক্ষার্থীদের হস্তগত হয়। যাতে করে তারা সহজে শিখতেও পারে এবং নিজ নিজ নোটবুকে নির্ভুলভাবে লিখে নিতে সক্ষম হয়। বিষয়ের বিভিন্ন পয়েন্টের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেও ব্লাকবোর্ড অত্যন্ত কার্যকর।

ব্যবহার পদ্ধতি

ব্লাকবোর্ড শিক্ষকের বাঁ দিকে এমনভাবে লাগাবে যেন তাতে আলো প্রতিবিম্বিত না হয় আর পুরো শ্রেণীর শিক্ষার্থীগণ সহজে দেখতে পায়। তাছাড়া শিক্ষকেরও লিখার সুবিধা হয়।

* ব্যবহারের পূর্বে ব্লাকবোর্ড ভালভাবে পরিষ্কার করে নেবে।

* ডাস্টার যদি সামান্য আর্দ্র ব্যবহার করা যায় তাহলে উত্তম। কিন্তু বেশী আদ্র বা নরম হতে পারবে না। কাজ শেষে সত্বর পরিষ্কার করে দেবে।

* ব্লাকবোর্ডে যা কিছু লেখা হবে, আঁকা যাবে তা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট, বিশুদ্ধ, সরল লাইনে এবং মোটা ও সমান অক্ষর বিশিষ্ট হতে হবে।

* ঘর বা সরাইয়ের নিকটবর্তী করে নেবে। ৪৫° কোণে রাখা ব্লাকবোর্ডে আঁকবে। মোটা লিখতে হলে চকের মাথা ঘষে নেবে, লম্বা রেখা অংকন করতে হলে দুই প্রান্তে বিন্দু এঁকে তা মিলিয়ে দেবে। রঙ লাগাতে হলে ব্লাকবোর্ডকে অপর পিঠ করে নেবে।

www.nagorikpathagar.org

* লেখার সময় কড়কড় শব্দ যেন বের না হয়। অন্যথায় শিক্ষার্থীদের একাগ্রতা বিনষ্ট হতে পারে। অনেক সময় চকের মাথায় কংকর থাকলে আওয়াজ বের হয়ে থাকে এমতাবস্থায় চকের (খড়ির) মাথা ভেঙে দিয়ে কংকর বের করে দিতে হয়।

* পুরো শ্রেণীর প্রতি লক্ষ্য রেখে লিখবে। মাঝে মাঝে পেছনের ছাত্রদের কাছে গিয়ে ব্লাকবোর্ডের লেখা দেখা যায় কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবে।

* শ্রেণীর দিকে পিঠ করে লেখা ঠিক নয়, বরং একটা কোণ বা পাশে থেকে লিখবে। লেখার সময় শ্রেণীর দিকে বার বার তাকিয়ে কিছু বলতে বা জিজ্ঞেস করতে থাকবে, এতে শ্রেণীর নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

* বোর্ডে লিখিত বিষয় হয়তো নিজে উচ্চস্বরে পড়ে দেবে অথবা কোন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পড়িয়ে দেবে, তাহলে কোন কথা বাদ পড়লে বা পড়তে অসুবিধা হলে তা সংশোধন হয়ে যাবে।

* পরিচ্ছন্ন লিখতে বা অংকন করতে বেশ অনুশীলন করবে। লাইন ড্রয়িং সহজও হয় কার্যকরও হয়। তাছাড়া স্বল্প আয়াসে আয়ত্বও করা সম্ভব হয়। প্রকাশ থাকে যে ভুল অথবা খারাপ বা বিশ্রি লেখার চাইতে না লেখাই শ্রেয়। এতে শিশুদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং বিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

* প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে যথাসাধ্য রঙিন চক ব্যবহার চাই। এতে শিশুদের মনোযোগ ও আকর্ষণ বৃদ্ধিতে সহায়তা হয়ে থাকে। অবশ্য উপরের শ্রেণীগুলোতে সাধারণত সাদা চক ব্যবহার করাই উত্তম। গুরুত্ব পূর্ণ পয়েন্ট লাল রং এবং শিরোনামসমূহ রঙিন চক দিয়ে লেখা চাই।

* পাঠের সারসংক্ষেপ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই। পাঠ চলার সময় সারমর্ম নোট করানো উচিত। এভাবে পাঠ সমাপ্তির সাথে সাথে সারমর্ম লেখাও শেষ হয়ে যাবে।

* মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের ব্লাকবোর্ড ব্যবহারের সুযোগ দেবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

পাঠদান প্রাক্কালে শিক্ষককে অনেক সময় কোন কঠিন, নতুন, অস্পষ্ট ও

www.nagorikpathagar.org

দ্ব্যর্থক কথায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দিতে হয়, যেনঃ

* জটিলতা বিদূরিত হয়।
* ধারণা পরিষ্কার হয়।
* মূল কথা ভালভাবে স্মৃতিপটে অংকিত হয়।

এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দু'প্রকারে হতে পারে–

১) মৌখিক।

২) দৃশ্যে।

যেমন– ছবি, চিত্র, গ্লোব, তালিকা ইত্যাদি।

মৌখিক ব্যাখ্যা

মৌখিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষন দেয়ার সময় প্রয়োজন ও স্থান ভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন–

* কঠিন শব্দাবলীর অর্থ বুঝাতে হয়ত সরল প্রতিশব্দ বলবে অথবা বিপরীতার্থক শব্দ বলবে অথবা ঐসব শব্দ বাক্যে ব্যবহার করে অর্থ বুঝিয়ে দেবে আর ব্যবহার পদ্ধতিও বলে দেবে। ঘটনা প্রকাশক শব্দ হলে ঘটনা সংক্ষেপে শুনিয়ে দেবে, পারিভাষিক শব্দ হলে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দেবে।

* অপরিচিত কিছু বুঝাতে হলে কোন পরিচিত বস্তুর সাথে তুলনা করবে অথবা তার সাতে অনুকূল ও প্রতিকুল সম্পর্ক বর্ণনা করে পেশ করবে।

* জটিল বাক্যের অর্থ সরল শব্দ ও সহজ ভংগীতে বর্ণনা করবে।

লক্ষণীয় বিষয়াদি

* ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করার পূর্বে তার আবশ্যকতার অনুভূতি জাগ্রত করবে। তাহলে শিশু একাগ্রচিত্তে শুনবে। শিক্ষক নিজে ব্যাখ্যা পেশ করার পূর্বে যদি শিশুদের তা ব্যাখ্যা করতে আহ্বান করা হয় তাহলে, তারা সহজেই তার আবশ্যকতা অনুভব করবে।

* শিশুদের ভাষা ও ভংগীতেই ব্যাখ্যা পেশ করবে, তাহলে কথাও বুঝে আসবে আর শিশু নিজেই প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

* ব্যাখ্যা করার সময় পাঠের প্রকৃত লক্ষ্য উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, আর যথাসাধ্য সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করবে। এতে করে অপ্রাসংগিক ও নিরর্থক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সময় ব্যয় হবে না।

www.nagorikpathagar.org

* ব্যাখ্যার আবশ্যকীয় পয়েন্ট সমূহের নোট যদি ব্লাকবোর্ডে লিখে দেয়া যায় তাহলে তার উপকারিতা বেড়ে যায়।

* মৌখিক বলে দেয়াকে যথেষ্ট মনে করবে না বরং সম্ভব হলে ব্লাকবোর্ডে ছবি ও গ্রাফ ইত্যাদি এঁকে অধিকতর স্পষ্ট করবে।

* ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সময় শিক্ষার্থীদের বেশী বেশী করে প্রশ্ন করার সুযোগ দেবে।

ছবি, মডেল ও চার্ট ইত্যাদি

প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে কার্যকর শিক্ষাদানের জন্যে বিভিন্ন বস্তু, তাদের মডেল, ছবি ও চার্ট ইত্যাদির ব্যবহার নেহায়েত উপকারী ও আবশ্যকীয়। কারণ এগুলোর সাহায্যেঃ

* নতুন অভিজ্ঞতা সহজেই অন্যকে বুঝাতে ও স্মৃতিবদ্ধ করতে পারা যায়।

* শিশুদের চিন্তাধারা বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন হয়।

* পাঠে একাগ্রতা ও আকর্ষণ বাড়ে।

* বর্ণনা সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়।

* মৌখিক ব্যাখ্যার মোকাবিলায় এগুলোর সাহায্যে স্মৃতিতে অত্যন্ত গভীর নকশা অংকিত হয়। ফলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা স্মরণ থাকে।

* পর্যবেক্ষণের প্রশিক্ষণ হয় এবং লক্ষণীয় দিকসমূহের প্রতি শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

দৃশ্য ব্যাখ্যা-দৃষ্টান্তের প্রকারভেদ

দৃশ্য ব্যাখ্যাদি বা দৃষ্টান্তের শ্রেণী বিভাগ নিম্নরূপঃ

১) মূল বস্তু।

২) মডেল, স্লাইড শো, গ্লোব ইত্যাদি।

৩) ফটো, দৃশ্য, পোস্টার ইত্যাদি।

৪) নকশা, কাঠামো, গ্রাফ, চার্ট ইত্যাদি।

৫) কাজ বা হাতে কলমে দেখানো অথবা পর্যবেক্ষণের জন্যে নিয়ে যাওয়া।

১) মূলবস্তু

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষাদানের সময় যদি মূলবস্তু শিশুদের সম্মুখে পেশ করা যায় আর শিশুরা তা দেখতে, স্পর্শ করতে পারে আর খাওয়ার দ্রব্য হলে ঘ্রাণ নিতে ও স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ পায় তাহলে অভিজ্ঞতা খুবই স্পষ্ট হবে এবং বিশুদ্ধ ধারণা লাভে সক্ষম হবে। তাই যেসব বস্তু সহজে পাওয়া যায় আর শ্রেণীতেও আনা যায় অথবা সেগুলো সহজেই লাভ করা যায় সেসব বস্তুর জ্ঞান এ ভাবেই পৌছানো যায়। কচি শিশুদের জন্যে তো এমনটি করা নেহায়েত আবশ্যক। কারণ তাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ অপূর্ণাঙ্গ ও সীমিত হয়ে থাকে এবং প্রতিকৃতি ছবি, নকশা ও চার্ট ইত্যাদির সাহায্যে ভালভাবে বুঝতে পারে না। মূলবস্তুটা যথাসম্ভব তাদের সম্মুখে নিয়ে দেখানোই উত্তম। পর্যবেক্ষণের সময় গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা চাই অন্যথায় অনেক বস্তুর প্রতি তারা নিজেরা লক্ষ্য করে না আর না তাতে ওদের পর্যবেক্ষন ক্ষমতা সৃষ্টি হতে পারে।

২) মডেল

ভূগোল, ইতিহাস ও সাধারণ বিজ্ঞানের এমন কতিপয় বস্তুর অভিজ্ঞতা পৌছানোর দরকার হয়ে পড়ে যেসব বস্তু নাগালের বাইরে অথবা যেগুলো বৃহদাকাশের অথবা অন্য কোন কারণে যেগুলো শ্রেণীতে আনয়ন করা সম্ভবপর নয়। বাধ্য হয়ে সেগুলোর মডেল পেশ করতে হয়। মডেল স্বল্প ব্যয়ে সঠিক ও পরিচ্ছন্ন করে তৈরী করার চেষ্টা করতে হবে। মডেল তো বস্তুরও হতে পারে আর দৃশ্যাবলীর ও মানচিত্রেরও হতে পারে যা যথাযথ হওয়ার কারণে শিশুদের জন্যে বোধগম্য হতে পারে, আর তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতেও পারে। কিন্তু প্রকৃত বস্তুর তুলনায় আকারে ক্ষুদ্র হয় বিধায় তা দেখে শিশুদের মাঝে ভুল ধারণারও সৃষ্টি হতে পারে। এ জন্যে মডেলের সাথে মূল বিষয়ের প্রতিকৃতিও দেখানো হলে বিজ্ঞান ও দৃশ্যাবলী সম্পর্কে বিশুদ্ধ ধারণা লাভ করতে পারবে।

৩) চিত্র, পোস্টার ইত্যাদি

শিশুরা কাহিনীর মত চিত্রের প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে থাকে। কোন চিত্র দেখলে তা মনোযোগ সহকারে দেখার এবং সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হাসিলের আকাংখা করে থাকে। তাই আকর্ষণীয় রঙের পোস্টার ও চিত্রের কারণে পাঠ যেমন

www.nagorikpathagar.org

আকর্ষণীয় হয়ে থাকে তেমনি তা বোধগম্যও হয়ে থাকে। স্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্যে এগুলো থেকে বেশ সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এ প্রসংগে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

* ছবি যেন আকারে বড়, আকর্ষণীয় রঙ ও সুদর্শন হয় আর সেগুলোতে ঐসব জিনিষের বিবরণ স্পষ্ট থাকে যে কারণে তা শিশুদের দেখানো হয়।

* নিজের তৈরী অথবা সহকর্মী শিক্ষকের সাহায্যে তৈরী হলে ভাল হয়।

* প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট এমন একটা এলবাম থাকা চাই যাতে তাঁর বিষয় সম্পর্কিত ছবিসমূহ সংগ্রহ করা থাকে। প্রাচীন ইংরেজী বই থেকে বিশেষ ছবি সংগ্রহ করা যেতে পারে।

* পোস্টার ও এ জাতীয় জিনিস তৈরী করতে বয়স্ক ছেলেদের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

* প্রত্যেক শিক্ষককে আধুনিক ধরনের সরল ছবি অংকনের অভ্যাস করতে হবে। এ ধরনের ছবি খুব সহজে ও স্বল্প সময়ে তৈরী করা সম্ভব হয়। এতদসত্ত্বে এগুলো বেশ কার্যকর ও শিশুদের পছন্দসই হয়ে থাকে।

৪) মানচিত্র, চার্ট, গ্রাফ ইত্যাদি

নয় দশ বছরের শিশু প্রকৃত বস্তু অথবা সেগুলোর মডেল ও ছবির পরিবর্তে মানচিত্র ও নকশার সাহায্যে সহজে বুঝতে পারে। তাই ক্রমাগত এসবের সাহায্যে উপকৃত হওয়া চাই। ইতিহাসে নকশা ও টাইম চার্টের সাহায্যে, ভূগোল ও সাধারণ বিজ্ঞানে বিভিন্ন প্রকারের চিত্র, নকশা, গ্লোব, গ্রাফ ও চার্টের সাহায্য নেয়া চাই।

৫) হাতে কলমে কাজ, অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ

মৌখিক বুঝানোর পরিবর্তে যদি শিশুদের কোন কাজ হাতে কলমে করে দেখানো হয়, তাহলে কাজটি সহজেই বুঝে আসে। যেমন, নামায আদায়-পদ্ধতি নিজে পড়ে দেখানো। এ জাতীয় সব কাজে মৌখিক বর্ণনা প্রদানের তুলনায় কাজটা করে দেখিয়ে দেয়া অধিকতর উপযোগী প্রমাণিত হয়ে থাকে। তেমনিভাবে সাধারণ বিজ্ঞান ও ভূগোল ইত্যাদি বিষয়বস্তুর (Practical) দেখানো হলে শিশুদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ সুযোগ এবং জ্ঞান হাসিলের বেশ সহায়ক হয়ে থাকে। এসবের মাধ্যমেও পুরো উপকৃত হওয়া চাই।

www.nagorikpathagar.org

লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

* উদাহরণ নির্বাচনের ব্যাপারে শিশুদের বয়স, মেধা ও রুচীর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। এতে শিশুদের যেমন মনযোগ বসে তেমনি বুঝতেও সহজ হয় এবং বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হওয়ার সাথে সাথে মনে রাখাও আসান হয়ে থাকে।

* যে বিষয় বুঝানোর জন্যে এসব উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে সে বিষয়ের সাথে এগুলোর সরাসরি সম্পর্ক থাকা চাই এবং যথাসাধ্য ও কেবল ওসব বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্বলিত হতে হবে। অপ্রাসংগিক ও অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার ফলে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার পরিবর্তে জটিলতা ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে থাকে।

* শ্রেণীর সম্মুখে যথাযথ নিয়মে পেশ করতে হবে যেন প্রত্যেক শিশু পরিষ্কার দেখতে পায়। প্রয়োজনীয় পয়েন্ট সম্পর্কে প্রশ্ন উথাপন করে অথবা নির্দেশ দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যেন আবশ্যকীয় বিষয় পর্যবেক্ষণ থেকে বাদ না পড়ে।

* উপমা সম্পর্কে শিশুদের পঞ্চইন্দ্রিয়কে যত বেশী ব্যবহার করা যাবে ততই উত্তম। যেমন– দেখার, স্পর্শ করার, ঘ্রাণ নেয়ার, স্বাদ নেয়ার এবং শব্দ থাকলে তা শ্রবণ করার সুযোগদান। এভাবে অধিক বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট ধারণা জন্ম নিতে পারে।

* প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে প্রকৃত বস্তু বা তার মডেল দেখাবে তারপর ক্রমান্বয়ে ছবি, নকশা, গ্রাফ ইত্যাদির ব্যবহার করবে।

* সকল প্রকার উপমা বিশ্লেষণের উপকরণ শিশুদের সম্মুখে একই সাথে উপস্থাপন করবে না। বরং সবগুলো আড়ালে রেখে প্রয়োজন বোধে একটা একটা করে শ্রেণীর সম্মুখে নিয়ে আসবে। অন্যথায় শিশুদের দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হয়ে অনুসন্ধিৎসা বাকী থাকবে আর দেখনোর সময় উদ্দিষ্ট আগ্রহও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

* শিশুদের সম্মুখে এনেই নিয়ে যাবে না বরং তাদের সম্মুখে এতক্ষণ সময় রেখে দেবে যতক্ষণে তারা তৃপ্ত হবে ও আবশ্যকীয় দিকসমূহের যথাযথ পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

* প্রতিটি বিদ্যালয় নকশাসমূহ, গ্লোব, মডেল, এলবাম, বিভিন্ন পোস্টার,

www.nagorikpathagar.org

ছবি, চার্ট ইত্যাদি তৈরী ও সংগ্রহ করে নেবে যেন পাঠদান কার্যকর ও আকর্ষণীয় বানানোর জন্যে শিক্ষক মন্ডলী তা থেকে সাহায্য নিতে পারে। অধুনা অনুরূপ একাধিক ফরমের উপকরণাদি মজুদ রাখা হয়, যাদের থেকে বিভিন্ন প্রকার উপকরণ সংগ্রহ করা যায়।

৬) শিক্ষা সফর ও পিকনিক

সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কিত এমন কতক বিষয় সিলেবাসভূক্ত থাকে যে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাঠ্য বই থেকে লাভ করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি শ্রেণীতে বসিয়ে বর্ণনা বিবরণ পেশ করেও সম্ভব নয়। বরং শিশুদের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গিয়েই ওসব বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভ করানো যেতে পারে। যেমন– কারখানা, বিখ্যাত বাজার, নদ নদী, মৌসুম ও প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে। তেমনিভাবে এমন কতিপয় সামষ্টিক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক বৈশিষ্ট রয়েছে যা সাধারণত শ্রেণীতে বসে হাসিল করা সম্ভবপর নয়; বরং সে জন্যে বাইরে যাওয়া একান্ত আবশ্যকীয়।

বর্ণনা বাচক শিক্ষা সম্পর্কে শিশুরা যেখানে সাধারণত ঘাবড়িয়ে যায় আর ছুটির অপেক্ষায় থাকে, সেখানে সফর ও ভ্রমণে তারা আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করে থাকে। তারা পুরো মনযোগ সহকারে তাতে অংশগ্রহণ করে। আর এ ব্যাপারে অসংখ্য অসুবিধা ও কষ্ট ক্লেশ অকাতরে বরদাস্ত করে থাকে। সুতরাং শিক্ষাদান প্রসংগে এমনি ধরনের সফর ভ্রমণের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষা সফরের প্রধান লক্ষ্য থাকবে শিক্ষা হাসিল করা আর পিকনিকের উদ্দেশ্য থাকবে প্রশিক্ষণমূলক। কিন্তু তার মানে এ নয় যে এখানেও শ্রেণীর পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। বরং এখানে তাদের স্বাধীনতা, চিত্তাকর্ষণ ও আনন্দ আহ্লাদের অবকাশ দিতে হবে।

শিক্ষা সফরের অর্থ হবে যেই বস্তুর পর্যবেক্ষণ করানোর উদ্দেশ্যে সফর করানো হবে শিশুরা যেন তার পরিষ্কার ছবি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তাদের পর্যবেক্ষণ প্রশিক্ষণ হওয়া চাই। তাদের চিন্তাধারা স্পষ্ট হওয়া চাই। তাদের অভিজ্ঞতায় সংযোগ সাধিত হয়, পাঠের উদ্দেশ্য সুন্দর ও ভালভাবে পূর্ণ হয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং সেগুলোর ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান হাসিল করার অনুপ্রেরণা লাভ হয়।

www.nagorikpathagar.org

প্রশিক্ষণ সফরের অর্থ হচ্ছে, শিশু চলাফেরা, খাওয়া পরার, মেলামেশার আদব শিখবে। ভ্রমণ ও ভ্রমণের ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি শিখবে। মিলেমিশে ভাগবন্টন করে খাবে, পরস্পর সহযোগিতা করবে, ঘরের বাইরের কষ্ট-ক্লেশের অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে আর সফরে খাওয়া-দাওয়া, নামায ও বিশ্রাম ইত্যাদি ব্যাপারে আবশ্যকীয় ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে এই প্রোগ্রাম অত্যধিক লম্বা হওয়া ঠিক নয়। ছোট ছোট শিশুদের জন্যে সাধারণত বিদ্যালয় বা বাড়ীর নিকটবর্তী স্থানে এক দুই ঘন্টার জন্যে, বড় ছেলেদের জন্যে সাধারণত কিছুটা দূরে তিন চার ঘন্টার জন্যে হতে পারে। এ জাতীয় সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী বিরতির সাথে অথবা সর্বশেষ ঘন্টায় হতে পারে। অবশ্য মাঝে মাঝে পুরো দিনের জন্যে কর্মসূচী নেয়া যেতে পারে যাতে করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উভয় প্রকারের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। এ ধরনের কর্মসূচী সপ্তাহের শেষ দিন অথবা ছুটির দিনে করাই সমীচীন। তাহলে ফেরত আসার পর কিছুটা বিশ্রাম গ্রহণ করার সুযোগ মিলতে পারে।

লক্ষণীয় বিষয়াদি

ঐসব ভ্রমণ থেকে পূর্ণ উপকারিতা পাওয়ার জন্যে নিম্নোক্ত কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

* শিক্ষার্থীর সংখ্যা এ পরিমাণ হতে হবে যেন কন্ট্রোল করতে বেগ পেতে না হয়।

* সফর আরম্ভ করার পূর্বে শিশুদের কাছে ভ্রমণের উদ্দেশ্য ভালভাবে ব্যাখ্যা করে দেবে।

* ভ্রমণের পূর্ণ বিবরণ তাদের পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করবে। আবশ্যকীয় সামানের তালিকা তৈরী করবে আর সেগুলো যোগাড় করবে। তত্বাবধান কাজের দায়িত্ব অর্পণ করবে ক্যাপটেন এর উপর।

* যে স্থানে তাদের নিয়ে যেতে হবে সেখানে শিক্ষক মহোদয় একবার গিয়ে দেখে আসবেন।

* স্বল্প সময় ও স্বল্প ব্যয়ে এসব ভ্রমণ করাবে যাতে করে শিক্ষার জন্যে ক্ষতি না হয় আর অর্থের উপরও চাপ না পড়ে।

* সমস্ত কাজ যথাসম্ভব শিক্ষার্থীদের হাতে আনজাম দেবে।

www.nagorikpathagar.org

* বৈধ সীমায় রেখে শিশুদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে।

অন্যান্য সহায়ক সামানাদি

উপরোক্ত সামগ্রি ছাড়াও সামর্থ থাকলে নিম্নোক্ত সামানাদি দিয়ে শিক্ষাদান কার্যকে আরও আকর্ষণীয় ও কার্যকর বানাবার সহায়ক হতে পারে। আর শিক্ষার্থীরা সেগুলোর সাহায্যে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হতে পারে।

* রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্যে প্রচারিত কর্মসূচী শুনানো।
* গ্রামোফোনের যেসব রেকর্ড উচ্চারণ শেখানোর জন্যে তৈরী করা হয়েছে।
* টেপ রেকর্ডিং মেশিনের সাহায্যে সংগৃহীত উপকরণাদি।
* স্লাইড শো'র সাহায্যে দেখানো ছবি ও দৃশ্যাবলী।
* শিশুদের উপযোগী ফিল্ম যা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্যে তৈরী করা হয়।
* সংবাদ পত্র বিশেষত শিশু পত্রিকা ও শিশু সাহিত্য।

বাড়ির কাজ Home Work

লেখাপড়া অথবা কাজ বা নৈতিক প্রশিক্ষণমূলক যেসব কাজ শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে করার জন্যে দেয়া হয় তাকে বলা হয় হোম ওয়ার্ক বা বাড়ীর কাজ।

শিশুদের মধ্যে নিজের দেহের গঠন অনুযায়ী যথেষ্ট সবলতা থাকে। তারা কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকতে চায়। যেহেতু বিদ্যালয়ে তারা কেবল কয়েকটি ঘন্টা অতিবাহিত করে থাকে, বাড়ীর দায়িত্বও কেবল নামে মাত্র তাদের উপর অর্পিত হয়ে থাকে, এ জন্যে তাদের কাছে থাকে অতিরিক্ত সবলতা ও অবকাশ। কিন্তু যথাযথ কর্ম ব্যস্ততা ও উপকারী দায়িত্ব না থাকলে তাদের সামর্থ ও যোগ্যতা প্রায়ই ভুল খাতে প্রবাহিত হতে থাকে, আর অমূল্য সময় ব্যয় হয়। অনর্থক ও ক্ষতিকর কাজে শিশুদের বাড়তি শক্তি ও অতিরিক্ত সময় কাজে লাগানোর জন্যে হোম ওয়ার্ক একান্ত আবশ্যক।

হোম ওয়ার্ক দেওয়ার সাধারণ প্রথা হচ্ছে, লেখাপড়া, শব্দাবলী বা অর্থ মুখস্থ করা, রচনা, অনুবাদ ও ব্যাকরণের অনুশীলন করা অথবা অংক করার মত যেসব নিরস কাজ সারাদিন বিদ্যালয়ে সম্পন্ন করতে হয় তার অবশিষ্ট কাজ বাড়ীতে করার জন্যে দেয়া হয়ে থাকে। আর তা সমাধা করার দায়িত্ব অভিভাবকের উপর ন্যস্ত বলে মনে করা হয়। কাজেই যেসব শিক্ষার্থী ঠিক মত

www.nagorikpathagar.org

কাজ করে আসে তাকে বড় ভাগ্যবান আর যে অভিভাবক সে কাজে সহায়তা করে তাকে বেশ ভাল মনে করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যেসব শিক্ষার্থী হোম ওয়ার্ক সমাধান না করে বিদ্যালয়ে আসে তাদের শাস্তির উপযুক্ত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। আর যেসব অভিভাবক উক্ত কাজে শিক্ষার্থীদের জন্যে পুরো বন্দোবস্ত না করেন তাদের দোষী বলে মনে করা হয়। হোম ওয়ার্কের এই গতানুগতিক ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি ও অসুবিধা রয়েছে বিধায় এগুলোর তীব্র সমালোচনা করা হয়। যেমনঃ

* শিশুদের উপর কাজের এত অধিক বোঝা পড়ে যাতে তাদের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

* যেসব কাজ শিশুরা বিদ্যালয়ে করতে করতে বিরক্তি অনুভব করে সেই কাজগুলোই যখন তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, তখন তারা ওসব কাজকে নিরর্থক ভাবে আর তাতে কোন তৃপ্তি অনুভব করে না। ফলে হোম ওয়ার্কের জন্যে তারা প্রায়ই শাস্তি পেয়ে থাকে। পরিণামে শিশুরা আসল শিক্ষা ক্ষেত্র ছেড়ে পালানোর পথ বেছে নেয়।

* স্বাধীনতার সাথে নিজেদের তৃপ্তিদায়ক কাজে আত্মনিয়োগ করার কোন অবকাশই তারা পায় না।

* শিশুদের পারিবারিক জীবন ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তারা ভাই বোন খেলাধূলা ও মেলামেশা করার সময় পায় না, একত্রে অবস্থান, ঘরের কাজে অংশ গ্রহণ, মাতাপিতার খিদমত করতে এবং সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের কোন অবকাশই তারা পায় না। অথচ এ সমস্ত কাজ ও তাদের লেখাপড়া বা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেরই অংশ বিশেষ।

* অনেক শিশু এমন হয়ে থাকে যাদের পারিবারিক অবস্থা ওসব কাজের আনুকূল্য প্রদান করে না অথবা শিশুরা তা করতে সমর্থ হয় না, তারা শাস্তির ভয়ে অপরের কাছে গিয়ে তাকে নকল করতে এবং শিক্ষকদের প্রতারিত করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

* শিক্ষক নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে চলে, ওজর পেশ করে আর অভিভাবকদের উপর জোর পূর্বক চাপিয়ে দেয় এবং এ প্রসংগে শিক্ষার্থীদের বিপদে ফেলা হয়।

www.nagorikpathagar.org

গুরুত্ব ও উপকারিতা

কিন্তু এসব অভিযোগ প্রকৃত পক্ষে হোম ওয়ার্কের ধরন, পরিমাণ এবং এ প্রসংগে গৃহিত শিক্ষকের ভূমিকার উপর নির্ভর করে। এসব অভিযোগ বিদূরিত হলে হোম ওয়ার্কের গুরুত্ব ও উপকারিতা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। হোম ওয়ার্ক যদি যথারীতি দেয়া হয় এবং আন্তরিকতা সহকারে মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে এটা শিক্ষার অত্যন্ত কার্যকর পন্থা, তাছাড়া এথেকে নিম্নোক্ত উপকারিতা আশা করা যেতে পারে।

* শিশুরা অবসর সময় ভবঘুরে, লম্পটগিরি বা চরিত্রহীনতামূলক কাজে ব্যয় করার পরিবর্তে ঘরে বসেই উত্তম ও উপকারী কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

* কারো সাহায্য বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজে নিজে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

* শ্রেণীতে শেখা বিষয় পূর্ণ অনুশীলন করতে এবং পড়া বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে অথবা পঠিত বিষয় পুনরালোচনা করার সুযোগ পায়।

* সিলেবাস বহির্ভূত অথচ সিলেবাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ কাজ আনজামদানের সহযোগিতা পাওয়া যায়। অধিকন্তু শিশুদের যেসব বিষয়ে বা কাজে আগ্রহ থাকে তৎপ্রতি অধিক মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পায়।

* যেসব কাজ শিশু নিজে করতে-সক্ষম সেসব কাজে শিক্ষকের সময় ব্যয় করতে হয় না। ফলে তিনি এই উদ্বৃত্ত সময়কে শিক্ষার অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন।

* সামাজিক জটিলতা ও সমাজের আওতার পরিবর্ধনের সাথে সাথে সিলেবাসও পরিবর্তিত হতে থাকে। এর পূর্ণতা হোম ওয়ার্ক ছাড়া সম্ভব নয়।

অভিভাবকগণ নিজেদের সন্তানাদির উন্নতির গতি প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হবে। আর তারা শিক্ষক মন্ডলীর পরামর্শ ও সহযোগিতার পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে। এভাবে হোম ওয়ার্ক সম্পর্ক স্থাপন এবং পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যম হিসেবে গণ্য হতে পারে।

* শিশুদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা জন্ম নেবে আর তারা নিজেদের জ্ঞান অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্যে যথাযথ শ্রম মেহনত ব্যয় করতে অভ্যস্ত হবে।

* হোম ওয়ার্কের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে এমন অনেক অভ্যাস সৃষ্টি করা সম্ভবপর হবে যাতে করে তাদের অবকাশ মুহূর্তসমূহ আজীবন উপকারী কাজে ব্যয়িত হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

লক্ষ্যণীয় বিষয়াদি

* হোম ওয়ার্ক দেওয়ার সময় শিশুদের বয়স, তাদের দৈহিক ও মেধাগত অবস্থা, তাদের পারিবারিক পরিবেশ, তাদের যোগ্যতা ও সামর্থ এবং তাদের রুচী আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। শিশুদের খাওয়ার, খেলার সময় অবকাশ অবশ্যই থাকা চাই। ছয় সাত বছর বয়স পর্যন্ত তো কোন হোম ওয়ার্ক দেয়াই সমীচীন নয়। দশ বছর বয়স পর্যন্ত যা কিছু শ্রেণীতে শেখানো হয় তাতেই যথেষ্ট করা চাই। অবশ্য বিদ্যালয়ের গুরুত্ব পূর্ণ দিকসমূহ, বাড়ীর জন্যে ফুল-পাতা, চড়ইর পালক, ফলের বীজ, সামুক, সীসা ও চীনা মাটির সুন্দর টুকরো, টিকেট, ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ করা, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা হাসিলের জন্যে সুশৃঙ্খল কর্মসূচীর অধীনে ভ্রমণ করা, ফুল লাগানো, কবুতর, ছাগল, খরগোশ ইত্যাদি প্রতিপালন, কোন মডেল বা কোন বস্তুর ড্রয়িং করা, পারিবারিক কাজে আত্মনিয়োগ, মাতাপিতার খিদমত দরিদ্র ও অক্ষম লোকদের সাহায্য, ছোট ভাইবোনের মনোরঞ্জন, মসজিদের পরিচ্ছন্নতার কাজ ইত্যাদি দেয়া যেতে পারে। অথবা পড়ার জন্যে সরল ভাষায় লেখা সচিত্র কাহিনীর বই, বিখ্যাত মনীষীদের কৃতিত্ব, অভিযান ও ভ্রমণ কাহিনী এবং সহজ কবিতাপঞ্জী ইত্যাদি দেয়া যেতে পারে। পরবর্তী শ্রেণীসমূহেও শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও রুচী, যোগ্যতা, পারিবারিক অবস্থা ও পরিবারে সন্তানাদির দায়িত্ব, মাতাপিতার কর্ম ব্যস্ততা, অসুস্থতা, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির প্রতি পুরো লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আর এমন দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে যা সে অন্যের সাহায্য ছাড়াই নিজে সহজে আনজাম দিতে সক্ষম হয়।

* বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকমন্ডলী একত্রিত হয়ে হোম ওয়ার্কের এমন টাইম টেবিল তৈরী করতে হবে যাতেকরে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। শিশুদের উপর কাজের চাপও সৃষ্টি না হয় আর প্রত্যেক শিক্ষক নিজের পালাক্রমে আবশ্যকীয় হোম ওয়ার্ক দিতে পারে। প্রধান শিক্ষক তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। অন্যথা প্রত্যেক শিক্ষক নিজ বিষয়ে সর্বাধিক কাজ নিতে চাইবে। আর শিশু অকারণে কষ্ট পাবে। সময় তালিকা নির্ধারণ করে ঠিক করে দেবে যেন কোন শিক্ষক নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সময়ের অধিক কাজ নিতে না পারে।

* ছুটি তো এ জন্যে হয়ে থাকে যেন শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের চিন্তা মুক্ত হয়ে

www.nagorikpathagar.org

অন্য ধরনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু শিক্ষক মন্ডলী সাধারণত ছুটির সময়ও বিদ্যাগত অনেক হোম ওয়ার্ক দিয়ে থাকেন, যা শিশুদের উপর বোঝা হয়ে থাকে আর অন্যান্য চিত্তাকর্ষক কাজ কর্মের জন্যে তা করতেও পারে না। ফলে তারা অনর্থক শাস্তির উপযুক্ত হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের ছুটি শিশুদের স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, দৈহিক, নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণের জন্যে বেশ উপযুক্ত অবকাশের যোগান দিয়ে থাকে। সুতরাং হোম ওয়ার্ক ওসব কাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং এমন হওয়া চাই যাতে পরিবারের অন্যান্যরাও উপভোগ করতে পারে।

* রাগান্বিত মনে অথবা শাস্তির জন্যে অবশ্যই হোম ওয়ার্ক দেবে না। আর এমনভাবেও দেয়া ঠিক নয় যাতে শিশুরা তাকে অসম্ভব মনে করে। বরং তাকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং কাজ দেয়ার সময় তাকে এই নিশ্চয়তা দেবে যে কাজটা সামান্য শ্রম ব্যয়ে করা যাবে। আর কাজটা এমন ধরনের হতে হবে যে শিশু যেন সামান্য চেষ্টা করেই তা সমাধা করতে পারে। এভাবে অতিরিক্ত কাজের জন্যে সাহসের সঞ্চার হয়ে থাকে। কাজটা যদি এমন হয় যে, চেষ্টা সত্ত্বেও তা সমাধান করা যাচ্ছে না, তাহলে শিশু নিরাশ হয়ে পড়বে এবং অতিরিক্ত কাজের প্রতি তার মন বসবে না।

* যে কাজই দেয়া হোক না কেন তা অর্পণ করার সময় তাকে এই আশ্বাস দেয়া চাই যে এতে অবকাশ কালটা লেখাপড়ার সহায়ক কাজে ব্যয় করা যাবে এবং সে নিজে অধ্যয়ন অথবা কোন উপকারী কাজে অবকাশকালকে ব্যয় করতে অভ্যস্ত হবে।

* নিয়মাবলী বুঝানো এবং এর ব্যবহার শেখানো এবং প্রাথমিক অনুশীলনীর কাজ শ্রেণীতেই সমাপ্ত করিয়ে দেবে। তারপর এমন কাজ দেবে যে কাজ শিশু নিজে নিজে পরিশ্রম করে সমাধা করতে সক্ষম হয়।

* হোম ওয়ার্ক যথা সময়ে পরীক্ষিত ও সংশোধিত হওয়া চাই। অন্যথা শিশুদের উদ্দীপনায় ভাটা পড়বে আর তাদের মাঝে শিথিলতা অনুপ্রবেশ করবে।

লিখিত কাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংশোধন

শিশুদের থেকে শ্রেণীতে বা বাড়ীতে যে কাজ নেয়া হয় এগুলোর পুরো সংশোধন কঠিন হলেও আবশ্যকীয়। কারণ এতে শিশুরা নিজের ভুল সংশোধনের বিষয় অবগত হয়ে নিজে নিজে সংশোধিত হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

এ প্রসংগে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক–

* কাজ শেষ হলে সত্ত্বর তা সংশোধন করে দেবে। শিশুকে নির্দেশনা দিয়ে যদি সংশোধন করা যায় তবে তা অতি উত্তম। তা না হলে অন্তত তার সামনে সংশোধন করা চাই। এতে শিশু নিজের ভুল উপলব্ধি করতে পারবে আর সহজেই সংশোধিত হওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে।

* লিখিত কাজ দেয়ার পূর্বে মৌখিকভাবে অনুশীলন করাবে। তাহলে ভুল হবে কম আর সংশোধন হবে সহজসাধ্য।

* বিশুদ্ধতার জন্যে স্থানগুলো চিহ্নিত করে শিক্ষার্থীকে তা জানিয়ে দেবে। এতে সময় কম ব্যয় হবে।

* সামষ্টিক ভুলের সংশোধন হতে হবে সামগ্রিকভাবে পুরো শ্রেণীতে। তাহলে একই কথা বিভিন্নজনকে স্বতন্ত্রভাবে বুঝাতে হবে না।

* সঠিক কাজের জন্যে উপযুক্ত মন্তব্য এবং ভুল কাজের জন্যে আবশ্যকীয় নির্দেশ দেওয়া চাই। এতে পরবর্তী কাজে সাহায্য হবে।

পাঠ্য পুস্তক সমূহ

পাঠদান কাজে উপযুক্ত পাঠ্য বই অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। উপযুক্ত পাঠ্য বই দিয়ে শিক্ষকের কাজ বেশ সহজ হয়ে যায়। কারণ তখন সে জন্যে শিক্ষককে অধিক নোট দেয়ার অথবা বেশী অনুশীলনী তৈরী করার প্রয়োজন পড়ে না। স্বল্প যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকও এ ধরনের বই দিয়ে কাজ চালিয়ে দিতে পারে। অনুশীলনী ও পুনরালোচনার কাজ উপযুক্ত পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে যথেষ্টরূপে সম্পন্ন হতে পারে।

যথোপযুক্ত পাঠ্য বই নির্বাচন

বাজারে বিভিন্ন প্রকারের পাঠ্য বই পাওয়া যায়; কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে খুব কম বইই উপযুক্ত পাওয়া যায়। শিশুদের জন্যে এমন বই নির্বাচন করা উচিত–

* যে সব বই গোঁড়ামী, সংকীর্ণতা এবং কুফর ও শিরক মুক্ত হবে।

* যেগুলো থেকে উচ্চ লক্ষ্য নির্ধারণে, পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন-পদ্ধতি গঠনে, চরিত্র সংশোধনে এবং দৃষ্টিভংগী উদার ও প্রশস্ত করনে সাহায্য পাওয়া যাবে।

www.nagorikpathagar.org

* যেগুলোর ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল, বর্ণনা পদ্ধতি সুস্পষ্ট এবং শিশুদের জন্যে আকর্ষণীয় ও বোধগম্য হবে।

* যে সব বই শিশুদের বয়স, ব্যক্তিগত অবস্থা, ঝোঁক প্রবনতা, আকর্ষণ এবং স্বাভাবিক চাহিদা মোতাবেক লেখা হয়েছে।

* যেগুলোর কাগজ শক্ত, শিরোণামা আকর্ষণীয়, মুদ্রণ পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ, বর্ণমালা সুস্পষ্ট, দাম কম এবং সাইজ ও পরিমাণ এমন হবে যেন শিশুদের সেগুলো বিদ্যালয়ে বহন করে নিতে কষ্ট ক্লেশের সম্মুখীন হতে না হয়, আর যেগুলো সহজে পাওয়া যাবে।

* যে সব বই অনুমোদিত অধ্যায়গুলোর সব কয়টি সম্বলিত হয়, যেন অন্য বইয়ের সহযোগিতা নেয়ার প্রয়োজন কমই দেখা যায়।

* যেগুলো উজ্জ্বল রংগের এবং প্রয়োজনীয় আকৃতি ও চিত্রাংকণে সজ্জিত থাকে।

* যেগুলোতে যথোপযুক্ত অনুশীলনী এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকায় পূর্ণ থাকবে।

* যেগুলো তৈরীতে অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আর যেগুলোর মূল বিষয়বস্তু শিশুদের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্ক রেখে তৈরী করা হয়েছে।

* যেগুলোর শিক্ষা শিশুদের অনুসন্ধিৎসা জাগাবে, সেগুলো অধ্যয়নে উদ্বুদ্ধ করতে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং তাদের আন্তরিক চাহিদা বহাল রাখতে সহায়ক প্রমাণিত হবে।

পাঠ্য বইয়ের ব্যবহার

কেবল পাঠ্য বই পড়াকে যথেষ্ট মনে না করা উচিত, বরং নিজের পক্ষ থেকেও আবশ্যকীয় বিষয়াদির সংস্থান করা চাই।

* প্রতিটি পুস্তকের সমস্ত অধ্যায় বা পাঠ সমান দরকারী ও উপকারী হয় না। এ জন্যে পূর্ণ বই একটু একটু করে পড়িয়ে শেষ করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা চাই। বরং যে সব পাঠ বা অধ্যায় সহজে বুঝে আসবে না অথবা যে সব পাঠ অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রয়োজনীয় বা নিষ্প্রয়োজনীয় হয় তদস্থলে অন্য আবশ্যকীয় বিষয় সংযোজন করা উচিত। এছাড়া কোন কোন সহজ সরল পাঠ বা অধ্যায়ের কিছু অংশ পড়িয়ে বাকী অংশ শিক্ষার্থীদের উপর ছেড়ে

www.nagorikpathagar.org

দেবে।

* সাধারণত অনুশীলনী ও শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কিত নির্দেশিকা হচ্ছে পাঠ্য পুস্তকের প্রাণ স্বরূপ। কিন্তু অনেক কম শিক্ষকই তা থেকে উপকৃত হয়ে থাকে, আর কেউ কেউ তো তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না। এটা কিন্তু ঠিক নয়। বরং এগুলো থেকে পুরো ফায়দা হাসিল করা আবশ্যক এবং এগুলোকে মৌখিক বা লিখিত আকারে আয়ত্বে আনার চেষ্টা করানো উচিত।

* পাঠদানের সময় নিজের পক্ষ থেকেও প্রশ্নাবলী উত্থাপন করে এবং অনুশীলনী দিয়ে শিশুদের স্বভাব পরীক্ষার সুযোগ দিতে হবে।

* কম পাঠ্য পুস্তক থেকেই কাজ নেয়ার চেষ্টা করা চাই।

* ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান এবং অন্যান্য জ্ঞান হাসিল বিষয়ক রচনাবলীতে পাঠ্য পুস্তুকের সাথে সাথে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখতে হবে।

লাইব্রেরী ও পাঠাগার

পাঠ্য পুস্তক যতই উপযোগী ও উপকারী হোক না কেন, শিশুদের জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি, শব্দ ভান্ডারে সংযোগ, অধ্যয়নের কলা, বই পড়ার স্পৃহা, দৃষ্টিভংগীর প্রসারতা, আদর্শের অনুকরণ, মনোভাব ব্যক্ত করণের যোগ্যতা, অন্যদের মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী অনুধাবনের যোগ্যতা এবং অবসর সময়ে ব্যবহারের জন্যে অতিরিক্ত উপযোগী বই, সংবাদপত্র ও সাময়িকী ইত্যাদি অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

স্বয়ং শিক্ষকমন্ডলীকে নিজের শিক্ষকতার যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্যে, নিজের জানা বিষয়কে আপটুডেট রাখা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সহায়তা গ্রহণ এবং উৎস সংগ্রহণে বিভিন্ন বই ও সাময়িকীর প্রয়োজন হয়। ছাত্র শিক্ষকের উপরোক্ত প্রয়োজন পুরণের জন্যে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লাইব্রেরী থাকা চাই। লাইব্রেরীতে শিক্ষকমন্ডলী এবং প্রত্যেক বয়সের, রুচীর ও যোগ্যতার শিক্ষার্থীর জন্যে উপকারী ও আবশ্যকীয় পুস্তকের ভান্ডার থাকতে হবে। লাইব্রেরীতে প্রতি বছর সামর্থ অনুযায়ী নতুন নতুন বইয়ের সংযোজন হতে হবে। লাইব্রেরীর সাথে একটা পাঠাগারও আবশ্যক যাতে শিক্ষার্থী ও

www.nagorikpathagar.org

বয়স্কদের জন্যে উৎকৃষ্ট সংবাদপত্র ও সাময়িকী রাখা বা ক্রয় করে তাদের থেকে এসব জিনিস ধার নেয়া যেতে পারে। অথবা এগুলোর মধ্যে যা তাদের পড়ার পর অকেজো হয়ে যায় এবং তারা এদিক সেদিক বিক্ষিপ্ত ফেলে দেয়, সেগুলো বিদ্যালয়ের জন্যে নেয়া যেতে পারে। কোন কোন পরিবারে প্রাচীন অনেক বইয়ের ভান্ডার পড়ে থাকে যেগুলো উইপোকার খোরাক হয়ে থাকে, অথবা শিশুদের পড়া বই এদিক সেদিক বিক্ষিপ্ত পড়ে থাকে। এদিকে গুরুত্ব দিয়ে ঐসব পুস্তক বিনামূল্যে অথবা স্বল্প দামে বিদ্যালয়ের জন্যে নিয়ে আসা যেতে পারে। সংবাদ পত্র, সাময়িকী এবং পুস্তকের প্রকাশক বৃন্দ এমনিই স্কুল ও লাইব্রেরীর জন্যে সৌজন্য সংখ্যা দিয়ে থাকে, সেগুলো থেকেও উপকৃত হওয়া যায়। যদি চাঁদা ধরার বা ফান্ড খোলার বাধ্য বাধকতার সম্মুখীন হতে হয় তবুও লাইব্রেরীর প্রয়োজন ও উপকারের জন্যে তা করা উচিত।

নির্বাচন

মুদ্রণ সুবিধা ও শিক্ষার প্রসারের ফলে ভালমন্দ সকল প্রকার বই প্রকাশিত হয় এবং উপকারী ক্ষতিকর সব ধরনের সংবাদ পত্র ও সাময়িকী প্রকাশ করা হয়। সুতরাং এগুলোর নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের জন্য ঐসব সামগ্রী ও পত্র পত্রিকা আনতে হবে যেগুলো পবিত্রতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ এবং সকলের জন্যে উপকারী। এগুলোর নির্বাচন কোন এক ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়। বরং অধ্যয়নে পারদর্শী ও নির্বাচনের যোগ্যতা সম্পন্ন বিভিন্ন শিক্ষকমন্ডলীর পরামর্শ ক্রমে হওয়া চাই। নির্বাচনে বয়সের বিভিন্নতা, রুচীর পার্থক্য এবং অযোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্র ছাত্রীর মন-মানসিকতা ও প্রয়োজনীয়তা এবং রচনা বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বিখ্যাত বিদ্যালয় ও প্রকাশকদের পক্ষ থেকে প্রতি বছর পুস্তকের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশিত হয়। নির্বাচনে এগুলোর সাহায্য গ্রহণ করা যায়।

লাইব্রেরীতে শিক্ষণীয় কাহিনী, উত্তম কিসসা, কবিতা গুচ্ছ, ঐতিহাসিক ও নৈতিক নভেল নাটক, নবী রসূল ও আদর্শবান ব্যক্তিবর্গের চরিত্র, বিখ্যাত লোকদের কার্যক্রম, আবিষ্কার, উদ্ভাবন, ইতিহাস, পর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনী, ইসলামিয়াত, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, সাধারণ বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত বড় ছোট ধরনের বই থাকা চাই। শিক্ষক

www.nagorikpathagar.org

মন্ডলীর জন্যে বিভিন্ন ভাষার অভিধান, রেফারেন্স বই, শিশুদের স্বভাব ও শিক্ষার বিষয়ে লিখিত বই, বিশ্বকোষ ইত্যাদি যোগাড় করার চেষ্টা করা উচিত।

সাত আট বছরের শিশুরা যেহেতু চালু করে পড়তে ও বুঝতে সক্ষম নয়, সেহেতু তাদের জন্যে ছবির বই অথবা সহজ ভাষায় মোটা অক্ষরে লেখা আকর্ষণীয় সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং ছোট ছোট কবিতার ছবি দেয়া বইসমূহই উপযোগী বলে গণ্য হবে ছবি যথাসম্ভব উজ্জ্বল রংগের বড় আকারের হওয়া চাই।

আট নয় থেকে এগার বার বছর বয়সের শিশুদের জন্যে কিসসা কাহিনী, আবিষ্কার উদ্ভাবন, ভ্রমণ, শিকার ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত সহজ সরল, চিত্তাকর্ষক ও সচিত্র বই ও ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি উপযোগী হয়ে থাকে।

বার তের বছর থেকে সতর আঠার বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্যে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত, বিখ্যাত লোকদের কৃতিত্ব, উচ্চ কর্মশীল ব্যক্তিবর্গের জীবনী, পবিত্র গল্প, ঐতিহাসিক ও সংশোধনমূলক নভেল, উদ্বুদ্ধকারী কবিতা এবং সৎসাহস উদ্দীপক সাহিত্য সম্পর্কে পবিত্র গ্রন্থাবলী থেকে পুরোপুরি উপকৃত হতে পারে। বই পুস্তক নির্বাচনে এসব বয়সের শিক্ষার্থীর রুচীর প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই।

লক্ষ্যণীয় বিষয়াদি

* লাইব্রেরী ও পাঠাগারের জন্যে একটা স্বতন্ত্র কক্ষ থাকা চাই। তাতে বই পুস্তক সংরক্ষণ, বিন্যাস ও নিয়ম মাফিক রাখার জন্যে আলমারী হওয়া উচিত এবং পাঠাগারের দেওয়ালসমূহ উদ্ধৃতি ও উজ্জ্বল রংগের পোস্টার দিয়ে সজ্জিত হওয়া চাই।

* এমন একজন শিক্ষককে লাইব্রেরীয়ান বানানো উচিত যিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন, বই পত্রের সংরক্ষণ, বিন্যাস ও রীতিমত রাখার নিয়ম পদ্ধতি জানেন।

* লাইব্রেরীয়ান হবেন এমন যিনি প্রত্যেকটি বই কোন স্থানে রাখা হয়েছে সে বিষয় ভালভাবে ওয়াকিফ থাকবেন। তিনি আরো জানবেন কোন বিষয়ের বই এবং কাদের জন্যে দরকারী বই কোন তাকে রাখা হয়েছে। বই ইস্যুর জন্যে

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে তারিখ ও সময় নির্দিষ্ট করে দেবে। শিক্ষার্থীরা বই নিতে এলে অত্যন্ত ভদ্রতাসহকারে তাদের বয়স, দক্ষতা, পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী উপযোগী পুস্তকের অবস্থান বলে দেবে।

* শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে যে লাইব্রেরীর বইকে যেন তারা আমানত মনে করে সংরক্ষণ করে। নষ্ট হওয়া, পাতা ভাঙা ও পাতা ছিড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফেরত দেয়।

* শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি করা শ্রেণী শিক্ষকের কাজ। প্রত্যেক শ্রেণীর উপযোগী কিছু কিছু বই বিভিন্ন শ্রেণীতে রেখে দিয়ে সেগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বইয়ের বাইরে বই পড়ার অভ্যাস করানোর জন্যে শ্রেণী শিক্ষক চেষ্টা করতে পারেন। আর প্রয়োজনে তারা যেন সব সময় বই পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করবে। শ্রেণী শিক্ষক মাঝে মাঝে শ্রেণীতে ঐসব বই সম্পর্কে আলোচনা করবেন। তাঁদের নির্বাচিত বইয়ের পরিচয় করিয়ে দেবেন, সে সব পুস্তক অধ্যয়ন করার আবশ্যকতা বলে দেবেন শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে গিয়ে লাইব্রেরীর পছন্দনীয় বই নিতে সহযোগিতা ও পথ প্রদর্শন করবেন। পছন্দনীয় বই একাধিক কপি রাখবে যেন একই সময় কয়েকজন শিক্ষার্থী উপকৃত হতে পারে। কোন ছাত্র কি পরিমাণ পুস্তক এক বছরে অধ্যয়ন করলো তার রেকর্ড সংরক্ষণ করবে এবং অধ্যয়ন ও প্রতিযোগিতার স্পৃহা তৈরী করবে।

* লাইব্রেরী থেকে বই পাওয়ার যথাসম্ভব সহজ নিয়ম রাখবে। অবশ্য রেফারেন্সের বই, অভিধান ও বিরল বইগুলো বাড়ী নিয়ে যেতে দেয়া ঠিক নয়।

* সাময়িকী সমুহের নথি রাখা চাই যেন প্রয়োজনে এগুলোর উপকারী প্রবন্ধাবলী থেকে উপকৃত হওয়া যায়।

পরীক্ষা, নির্বাচন ও পাশ

বিদ্যালয়ের অবশ্য কর্তব্যসমূহের মধ্যে রয়েছে মাঝে মাঝে ছাত্রদের মেধা ও যোগ্যতা যাচাই করে দেখা ও তাদের উন্নতি অগ্রগতির হার পরীক্ষা করা। যেমন–

* শিক্ষকমন্ডলী নিজেদের চেষ্টার ফলাফল অনুমান করতে পারেন। আর

www.nagorikpathagar.org

তাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী রুটীন, কর্ম পদ্ধতি ও শিক্ষাদান নীতির যথোপযুক্ত পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হতে পারে।

* ছাত্রবৃন্দ নিজেদের শ্রম, মেহনত, মনযোগ, যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে যথার্থ মান নির্ণয়ে সাহায্য পেতে পারে।

* মাতাপিতা আপন সন্তানাদির অগ্রগতির অনুমান করতে পারে।

* প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণ শিক্ষকমন্ডলীর কার্যক্রম এবং তাদের চেষ্টা সাধনার ফলাফলের ব্যাপারে ধারণা লাভ করতে পারে।

* ছাত্র শিক্ষক উভয়ই পরিশ্রমের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ ও বিগত কাজের পুনরালোচনা ও যাচাই করার সুযোগ পেতে থাকবে।

* শ্রেণী বিন্যাস করণ, উত্তীর্ণ ঘোষণা করা অথবা ভবিষ্যৎ শিক্ষা সম্পর্কে যথাযথ পথনির্দেশ হতে পারে।

* ছাত্রদের পজিশন ও মর্যাদা নির্ধারণের এবং ভবিষ্যতে তাদের উপর দায়িত্ব অর্পণের জন্যে সমাজ একটা মানদন্ড খুঁজে পাবে।

পরীক্ষাসমূহ

যাচাই ও পরীক্ষার জন্যে আবহমান কাল থেকে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে। যেমন– আমরা সবাই জানি পরীক্ষার সময় ছাত্রদের দূরে দূরে বসিয়ে প্রশ্নাবলী দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময় অর্থাৎ সাধারণত তিন ঘন্টার মধ্যে তাদের থেকে ওসব প্রশ্নের উত্তর লিখিয়ে নেয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে ছাত্রদের প্রতি বেশ দৃষ্টি রাখা হয়। সময় শেষ হওয়া মাত্রই পরীক্ষার খাতা নিয়ে পরীক্ষকের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়। তাঁরা এগুলো যাচাই করে নম্বর দিয়ে থাকেন। নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্রদের পাস–ফেল নির্ধারণ করা হয়। এই পরীক্ষাসমূহ সাধারণত দু'ধরনের ১) আভ্যন্তরীণ (Internal) ২) জাতীয় (External)।

১) আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা (Internal Examination) যে পরীক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় থাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এককভাবে। এসব পরীক্ষায় প্রশ্ন পত্র ঠিক করা, খাতা পরীক্ষা করা, পাস–ফেল নির্ণয় করা ইত্যাদির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্ণ ক্ষমতা শিক্ষক মন্ডলীর। এসব পরীক্ষা সাধারণত ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক হয়ে থাকে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক বা মাসিক পরীক্ষাও হয়ে থাকে।

২) জাতীয় পরীক্ষা (External বা National Examination) যে

www.nagorikpathagar.org

সব পরীক্ষা কোন বোর্ডের তত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে এ জাতীয় পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র তৈরী করা, খাতা পরীক্ষা করা এবং পাশ-ফেল এর সিদ্ধান্ত থাকে বাইরের শিক্ষকমন্ডলী ও কর্তা ব্যক্তিদের হাতে।

পরীক্ষাসমূহের ত্রুটি

পরীক্ষার বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে এমন সব মৌলিক ত্রুটি রয়েছে যে কারণে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির বেশ মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। আর যে উদ্দেশ্যে এসব পরীক্ষা নেয়া হয় সে উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না। যেমন-

* বর্তমানে পরীক্ষাটাই শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিণত হয়ে পড়েছে। আর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বুনিয়াদী উদ্দেশ্য দৃষ্টি থেকে দূরে সরে গিয়েছে। ছাত্র ও অভিভাবক, শিক্ষকমন্ডলী ও দায়িত্বশীল সবারই ইচ্ছা ও অভিলাষ হলো যেন কোন মতে কেবল পরীক্ষার ফলাফলটা ভাল করা যায়। কাজেই পরীক্ষার সাথে সরাসরি সম্পর্ক নেই, এমন সব চেষ্টা সাধনা ও কাজ-কর্ম এবং গুণাবলী ও বৈশিষ্টাবলীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দিক থেকে সেগুলোর যতই গুরুত্ব থাকুক না কেন। কর্মতৎপরতা ও বইয়ের সেসব অংশের প্রতিই গুরুত্বারোপ করা হয় যে সব অংশ পরীক্ষার দিক থেকে গুরুত্ব রাখে। কেবল নির্বাচিত অংশ অধ্যয়ন করা হয়ে থাকে। কেবল সারমর্ম ও অর্থবহ দিয়ে কাজ নেয়া হয়। পাসের জন্যে বিভিন্ন প্রকার নোট কপি ব্যবহার করা হয়, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র জানার জন্যে, প্রতারণা করার জন্যে, খাতা আউট করার জন্যে, নকল করার জন্যে, পরীক্ষায় পজিশন লাভের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করার জন্যে, সুপারিশ করার জন্যে এমন কি কোন কোন অবস্থায় ঘুষ প্রদানেও বিরত হয় না।

* প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি চরম অনির্ভরযোগ্য। এথেকে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও যোগ্যতার যথার্থ যাচাই করা সম্ভব হয় না। কারণ-

১) প্রশ্ন পত্র সাধারণত এমন ধরনের হয়ে থাকে যার উত্তর দিতে পারাটা নির্ভর করে মুখস্ত শক্তির উপর। ফলে না বুঝে মুখস্ত করে লিখে দিতে পারলেই ভাল নম্বর পাওয়া যায়। এতে অন্যান্য মেধা ও যোগ্যতা সম্পর্কে কোন অনুমান করা সম্ভবপর হয় না।

২) বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলেও প্রকাশ ক্ষমতা, লেখার ও শব্দ প্রয়োগের উপর ক্ষমতা থাকলে যথেষ্ট নম্বর পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে বিষয়

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও লেখার বা প্রকাশ ক্ষমতা না থাকায় পরীক্ষায় ভাল নম্বর পায় না।

৩) নম্বর দেওয়ার কোন সার্বিক পদ্ধতি নেই। সম্পূর্ণ কিছু নির্ভর করে পরীক্ষকের মেজাজ, মনোভাব ও পছন্দের ওপর। অথচ তাঁদের মধ্যে কেউ নম্বর দিতে বেশ কার্পণ্য করে আর কেউ অত্যন্ত উদারমনা হয়; কেউ কঠোরতা সহকারে পরীক্ষার খাতা দেখে, আর কেউ দেখে অত্যন্ত সরলতার সাথে। অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে একই কপি বিভিন্ন পরীক্ষক বিভিন্ন রকম বেশ কম নম্বর দিয়ে থাকে। এমনকি শতকরা পঞ্চাশ নম্বর পর্যন্ত পার্থক্য দেখা যায়। পরীক্ষার খাতা দেখার সময় পরীক্ষকের মন-মানসিকতা হাসি খুশীতে থাকলে অথবা কোন পরীক্ষার্থীর কোন বাক্য পছন্দনীয় দেখলে সে ভাল নম্বর পেয়ে যায়। আর অবস্থা এর বিপরীত হলে ফলাফল হয় বিপরীত। নম্বরের উপর তার প্রভাব অবশ্যই পড়ে থাকে।

৪) পরীক্ষার্থীরা যে প্রশ্নোত্তর শিখে আসে সৌভাগ্য ক্রমে তা পরীক্ষায় এলে তাকে কে ঠেকায়, আর বিপরীত হয়ে গেলে তার সমস্ত চেষ্টা সাধনা ব্যর্থ।

৫) পরীক্ষার খাতায় লেখার সময় পরীক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ভাল থাকলে, পরীক্ষার পরিবেশ অনুকূল হলে, মন মানসিকতা ঠিক ঠাক থাকলে, যথাসময়ে সমস্ত কথা ধারাবাহিকভাবে মনে পড়ে গেলে ভাল নম্বর পাওয়া যায়। অন্যথায় সমস্ত চেষ্টা বৃথা চলে যায়।

৬) সীমিত সময়ে পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে। আর এত স্বল্প সময়ে মেধা ও যোগ্যতার যথাযথ যাচাই বাছাই করা সম্ভব হয় না।

* প্রচলিত পরীক্ষার মাধ্যমে কেবল বইয়ের জ্ঞান ও বিষয় সম্পর্কে যোগ্যতার কিছুটা যাচাই হয়ে থাকে। আর তাও হয় অত্যন্ত অস্পষ্ট। ব্যক্তিত্বের অন্যান্য সকল দিক থেকে তাদের থেকে কোন প্রকার ধারণা লাভ করা যায় না।

* ছাত্ররা কেবল পরীক্ষার সময় সামনে এলে কিছুটা শ্রম ব্যয় করে আর তাও কেবল না বুঝে মুখস্ত করা পর্যন্ত। ফলে যাকিছু পড়ে থাকে পরীক্ষার পর পরই তার সবকিছু ভুলে যায়।

* কোন কোন ছাত্র পরীক্ষার সময় এমন প্রাণপণ চেষ্টায় মত্ত হয়ে পড়ে যে তার স্বাস্থ্য চিরজীবনের তরে নষ্ট হয়ে পড়ে।

* পরীক্ষার টেনশন ছাত্রদের পাঠ্য বই ছাড়া অন্য বই পড়ার সুযোগই দেয়

www.nagorikpathagar.org

না। তাদের সম্পূর্ণ লক্ষ্য থাকে ও খেয়াল আবর্তিত হয় কেবল পাঠ্য বইয়ের উপর।

* জাতীয় পরীক্ষায় (External Examination) সাধারণত পরীক্ষক এমন ধরনের লোক হয়ে থাকেন যিনি ঐ বিষয়ে যতই অভিজ্ঞ ও দক্ষ হোন না কেন, তিনি শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে থাকেন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ফলে তাঁরা যথার্থ অনুমানে ব্যর্থ হন।

সুতরাং প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিপূর্ণ। তাই বলে পুরো পরীক্ষাই বাতিল বলে ঘোষণা দেবে না, বরং তাকে পুরো কার্যকর ও উপকারী করে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

পরীক্ষা অর্থবহ করার নিয়মাবলী

পরীক্ষা যেন পড়ার উদ্দেশ্যে না হয়, বরং যে জন্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তা যেন পরিপূর্ণভাবে লাভ করা যায়।

* ব্যক্তিত্বের যাবতীয় দিকের যাচাই বাছাই করার চেষ্টা সাধনা করবে।

* শ্রেণীর কাজ ও বাড়ীর কাজকেও পরীক্ষার অংশ রূপে গণ্য করবে এবং সে জন্যেও কিছু নম্বর নির্ধারণ করবে তাহলে ছাত্ররা পুরো বছরের কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখতে বাধ্য হবে।

* পরীক্ষাকে 'জুজু বুড়ী' বা ভয়ের বস্তুতে পরিণত না করে তাকে বিদ্যালয়ের একটা দৈনন্দিন কর্মের অংশ হিসেবে গণ্য করবে।

* প্রশ্নাবলী এমনভাবে নির্বাচন করবে যেন কেবল মুখস্ত ও হাফেজীর উপর নির্ভরশীল না হয়ে বুঝ-বুদ্ধি, যুক্তি-প্রমাণ, উপসংহার টানার কাজে এবং জ্ঞাত বিষয়কে কাজে লাগানোর যোগ্যতার অনুমান করাও সম্ভবপর হয়।

* প্রশ্নাবলী পুরো বিষয়ের উপর বিস্তৃত হওযা চাই যেন বইয়ের কোন বিশেষ অংশ নির্বাচন করে পড়ার অভ্যাস না হয়।

* কিছু নম্বর মৌখিক পরীক্ষার জন্যে (VIVA VOCE) নির্দিষ্ট রাখা চাই যেন বাচন ভংগী, বাগ্মিতার যোগ্যতা এবং মৌখিক বর্ণনার অনুমান করা যায়।

* এমন পদক্ষেপ নেয়া চাই যাতে করে পরীক্ষা ভাগ্যের খেলায় পরিণত না হয়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের মন্তব্য, দৈনন্দিন কাজের রেকর্ড (অগ্রগতি তালিকা) সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষার ফলাফল, নির্ধারিত পরীক্ষার ফলাফল এবং

www.nagorikpathagar.org

পরীক্ষার সময়কার দৈহিক ও মানসিক অবস্থার প্রতিও লক্ষ্য রাখবে।

* জ্ঞান বা মেধা যাচাইয়ের প্রশ্নপত্র এমনভাবে তৈরী করবে যাতে বাচনিক ও বর্ণনামূলক কাজের সাথে সম্পর্ক থাকে কম। যেমন– প্রশ্ন এমনভাবে করবে যাতে শূন্যস্থান পূরণের, অশুদ্ধকে শুদ্ধ করার, একাধিক প্রশ্নোত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তর বের করার মাধ্যমেই কাজ চলে; আর এক প্রশ্নের উত্তরে অধিক পরিমাণে লিখতে না হয়।

* এমন ধরনের শিক্ষকদের পরীক্ষক রূপে নির্বাচন করবে যাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, ইনসাফপ্রিয়তা এবং ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হন এবং সাথে সাথে শিক্ষাদানেও অভিজ্ঞ হন। বিশেষত তাদের এমন সব বয়সের শিক্ষার্থীর ব্যাপারে অভিজ্ঞতা থাকা চাই– যাদের পরীক্ষক তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে।

* প্রশ্ন পত্রের প্রত্যেকটি প্রশ্নের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে এগুলো ছাত্রদের বুঝতে কোন অসুবিধে হবে না আর তা ছাত্রদের বয়স, মেধা, বোধগম্যতা ও যোগ্যতার মাফকাঠি অনুযায়ী হবে। অধিকন্তু তা শিক্ষাদানের মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথেও হবে সামঞ্জস্যশীল।

* কচি শিশুদের পরীক্ষা বেশীর ভাগই মৌখিক হওয়া চাই আর যে ব্যক্তিকে তাদের পরীক্ষা নিতে দেবে যাঁদের সাথে শিশুদের বেশ অন্তরঙ্গতা থাকে অথবা যাঁরা সহজেই শিশুদের অন্তরঙ্গ বানিয়ে নিতে পারেন।

* পরীক্ষা নিতে হবে শিক্ষার্থীরা কি কি পারে তা জানার জন্যে; কি কি পারে না তা জানার জন্যে নয়, আর তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা কেমন তা যাচাই করার জন্যে। এটা তো তখনি সম্ভব যখন সর্বস্তরের মেধা সম্পন্ন ও ঝোঁক প্রবনতার শিক্ষার্থীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়। আর তাদের যথেষ্ট রূপে নির্বাচনের সুযোগ ও স্বাধীনতা দেয়া হয়।

* প্রশ্নপত্রে কেবল পাঠ্য বইয়ের প্রশ্নই করবে না বরং পাঠ্য বই বহির্ভূত এমন প্রশ্নও করবে যাতে তাদের জ্ঞানের পরিধি ও সাধারণজ্ঞানও যাচাই করা যায়।

* পরীক্ষা নিতে হবে আনন্দ ঘন পরিবেশে যেন শিশুরা সাহস ও উদ্দীপনার সাথে উত্তর দিতে পারে। পরীক্ষার নামই শিশুদের ভীত সন্ত্রস্ত করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। যে কোন কারনে যদি শিশুরা সাহস হারিয়ে ফেলে তাহলে তারা পরীক্ষা দেবে কিভাবে?

www.nagorikpathagar.org

* পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রদের নৈরাশ্য ও হীনমন্যতা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিত এবং ভবিষ্যতে কৃতকার্যতা লাভের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ সৃষ্টি করা চাই।

পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য আবশ্যকীয় কথা

শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের যাচাই করা, তাদের অগ্রগতির পরীক্ষা করা, অগ্রগতি রিপোর্ট যথাযথ সময়ে তৈরী করা ইত্যাদি কাজ যথাসময়ে আনজাম দেয়া চাই। অবশ্য নিয়ম মাফিক পরীক্ষা বছরের দু'বার হওয়াই যথেষ্ট।

১) ষান্মাষিক পরীক্ষা– শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি সময়ে।

২) বার্ষিক পরীক্ষা– শিক্ষাবর্ষের সমাপনান্তে।

বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রত্যেক বিষয়ের নম্বর শ্রেণী ভিত্তিক বিবেচনা করা হয়। তন্মধ্যে শতকরা বিশ নম্বর রাখা চাই দৈনন্দিন কাজ ও মাসিক যাচাইয়ের জন্যে নির্দিষ্ট করে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাংলা হস্তাক্ষর ও বানান, শূন্যস্থানে উপযুক্ত অক্ষর বা শব্দ বসানো এবং লিখিত অংক ছাড়া বাকী বিষয়ের উপর মৌখিক অথবা প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা হওয়া চাই। মৌখিক পরীক্ষাসমূহে শিক্ষার্থীদের সামনে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন করে উত্তর দেওয়ার জন্যে সামান্য সময় চিন্তা করে দেখার অবকাশ দেবে। কচি শিশুরা ভীতির কারণে জানা বিষয়ে ঠিক ঠাক উত্তর দিতে পারে না। তাদের ভীতি দূর করে সাহসের সঞ্চার করে উত্তর প্রদানের সুযোগ করে দেবে। মৌখিক পরীক্ষার প্রশ্নাবলী ছোট, ভাষা সকলের বোধগম্য ও সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে বাংলা রচনা, বানান ও হস্তলিপি ইংরেজী বানান ও হস্তলিপি এবং লিখিত অংক ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা মৌখিক বা প্রাকটিক্যাল হওয়া উচিত। জ্ঞান যাচাই সম্পর্কিত বিষয়ের প্রশ্নপত্র লিখিত হবে। তবে শর্ত হলো উত্তর যেন সংক্ষিপ্ত হয়। আর প্রশ্নপত্র এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে রচনা বা প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন পড়ে খুব কম।

পঞ্চম শ্রেণী ও পরবর্তী শ্রেণীসমূহে সকল পরীক্ষা লিখিত হওয়া চাই। তবে নাজেরাহ, কিরাআত, হেফজ, মানসাংক এবং বিভিন্ন ভাষায় বলার ও পড়ার যোগ্যতা যাচাই করবে কেবল মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। আর্ট ক্রাফটের পরীক্ষা

www.nagorikpathagar.org

হবে প্রাকটিক্যাল। চরিত্র ও সামাজিকতার বিষয়ে কোন লিখিত পরীক্ষা হবে না বরং এ বিষয়ের নম্বর দেবে দৈনন্দিন আমল আখলাকের হিসাবের ফলাফলের ভিত্তিতে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরবর্তীতে দেওয়া তালিকায় দেখা যেতে পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্যে সম্ভাব্য নম্বর তালিকা

১) ইসলামিয়াত–১০০
ক) চরিত্র ও সামাজিকতা–২৫ খ) তাজবীদ বা বিশুদ্ধ পাঠ–২৫
গ) ওযু, নামায, প্রাকটিক্যাল, সূরাসমূহ ও দোয়া–২৫
ঘ) নবীদের কাহিনী, মহানবী (সঃ) সম্পর্কে কাহিনী–২৫।

২) বাংলা–১০০
ক) পাঠ–৫০ খ) কাহিনী, কবিতা, ব্যাকরণ ও ভাষা–২০
গ) হস্তলিপি, বানান ইত্যাদি–৩০।

৩) অংক শাস্ত্র–১০০
ক) লিখিত–৫০ খ) মৌখিক–৫০

৪) সাধারণ জ্ঞান–৫০
ক) ভূগোল–২৫ খ) সাধারণ বিজ্ঞান–২৫।

৫) আর্ট ক্রাফট–৫০

* সর্বমোট= ৪০০

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্যে সম্ভাব্য নম্বর তালিকা

১) ইসলামিয়াত–১৫০
ক) চরিত্র ও সমাজবিদ্যা–৫০ খ) কুরআন হাকীম–৪০
গ) ফিকহ্ ও আকায়িদ–৩০ ঘ) সীরাত ও জীবনী–৩০।

২) বাংলা–১০০

www.nagorikpathagar.org

ক) পাঠ্য–৫০ খ) রচনা–৫০।

৩) ইংরেজী–৫০

ক) পাঠ্য–২৫ খ) রচনা–২৫।

৪) অংক শাস্ত্র–১০০

ক) লিখিত–৭৫ খ) মৌখিক–২৫।

৫) সাধারণ জ্ঞান–৫০

ক) ভূগোল–২৫ খ) সাধারণ বিজ্ঞান–২৫।

৬) আর্ট ক্রাফট–৫০

* সর্বমোট= ৫০০

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর সম্ভাব্য নম্বর তালিকা

১) ইসলামিয়াত–২০০

ক) কুরআন–৫০ খ) ফিকহ্ ও আকায়িদ–৫০

গ) সীরাত ও জীবনী–৫০ গ) চরিত্র ও সমাজবিদ্যা–৫০।

২) বাংলা–১০০

ক) পাঠ্য–৫০ খ) রচনা–৫০।

৩) আরবী–১০০

ক) পাঠ্য–৫০ খ) রচনা–৫০।

৪) ইংরেজী–৫০

ক) পাঠ্য–২৫ খ) রচনা–২৫।

৫) অংক শাস্ত্র–১০০

www.nagorikpathagar.org

ক) লিখিত–৭৫ খ) মৌখিক–২৫।

৬) সাধারণ জ্ঞান–১০০
ক) ইতিহাস ও সংস্কৃতি–৪০ খ) ভূগোল–৩০
গ) সাধারণ বিজ্ঞান–৩০।

৭) আর্ট ক্রাফট–৫০

* সর্বমোট=৭০০

সপ্তম ও তৎপরবর্তী শ্রেণীসমূহে

এসব শ্রেণীতে ইসলামিয়াত ও আরবী ভাষা হবে মৌলিক বিষয়। এগুলোর প্রতি সময় ও লক্ষ্য দিতে হবে অধিক পরিমানে। কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিসমূহ আরবীতেই শেখাতে হবে। অন্যান্য বিষয় বিবেচিত হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে।

১) ইসলামিয়াত–২৫০
ক) ফিকহ্ ও আকায়িদ–৫০ খ) ইসলামের ইতিহাস–৫০
গ) সীরাত ও জীবনী–৫০ ঘ) চরিত্র ও সমাজবিদ্যা–১০০।

২) আরবী–১০০
ক) পাঠ্য বই–৫০ খ) অনুবাদ ও রচনা–৫০।

৩) বাংলা–১০০
ক) গদ্য ও প্রবন্ধ–৫০ খ) পদ্য ও অনুবাদ–৫০।

৪) ইংরেজী–১০০
ক) পাঠ্য–৫০ খ) অনুবাদ ও রচনা–৫০।

৫) অংক–১০০

www.nagorikpathagar.org

ক) পাটী গণিত–৫০ খ) এলজেবরা ও জ্যামিতি–৫০।

৬) সাধারণ জ্ঞান–১৫০

ক) ইতিহাস ও সংস্কৃতি–৫০ খ) ভূগোল–৫০

গ) সাধারণ বিজ্ঞান–৫০।

৭) পেশা শিক্ষা–৫০

(হাতে কলমে ১ম, ২য় ও ৩য় বিভাগ)

* সর্বমোট=৮০০

ফলাফল

১) প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে পাস নম্বর ধরা হবে (শতকরা) ৪০%, তবে তা হবে প্রতি বিষয়ে অন্তত ২০ নম্বর পাওয়া সাপেক্ষে। পরবর্তী শ্রেণীসমূহে পাস নম্বর ৩০% ধরা উচিত।

২) সর্বমোট ৪৪% পর্যন্ত তৃতীয় বিভাগ, ৪৫% হতে ৫৯% পর্যন্ত দ্বিতীয় বিভাগ এবং ৬০% থেকে উর্ধে প্রথম বিভাগ বলে বিবেচিত হবে।

৩) প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে যেসব শিক্ষার্থী, কুরআন হাকীম তিলাওয়াত এবং বাংলা ও অংকে দুর্বল হবে তাদের প্রমোশন দেয়া যাবে না। পরবর্তী শ্রেণীসমূহে ইসলামিয়াত ও আরবী দুর্বলদের প্রমোশন দেয়া যাবে না।

৪) যে সব ছাত্রছাত্রী অসুস্থতার দরুন পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি তাদের পুনঃ পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দিতে হবে।

৫) প্রাথমিক শ্রেণীসমূহের যেসব শিক্ষার্থীর সারা বছরের রেকর্ড ভাল থাকে অথচ বার্ষিক পরীক্ষায় কোন কারণে উত্তীর্ণ হতে না পারে, তাদের বর্ষ নষ্ট হতে দেবে না, বরং পূর্বের রেকর্ডের ভিত্তিতে তাদের উত্তীর্ণ ঘোষণা দেবে। এ ক্ষেত্রেও দুর্বল শিক্ষার্থীদের প্রমোশনের প্রশ্নে সতর্ক থাকতে হবে।

ফলাফল ফরম

ফলাফল দু'ধরনের ফরমে তৈরী করবে। একটা হলো পুরো শ্রেণীর সামষ্টিকভাবে যা অফিসের রেকর্ড হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। দ্বিতীয় ধরনের ফরম থাকবে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের কাছে পাঠানোর জন্যে তাদের পৃথক

www.nagorikpathagar.org

পৃথক ফরম। দ্বিতীয়টি তাদের অগ্রগতি প্রতিবেদন হিসেবে গণ্য হবে। নমুনা ফরম নিম্নে দেয়া গেল।

পরীক্ষা, যাচাই ও অগ্রগতি প্রতিবেদন

ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্যে শিক্ষার্থীদের সকল দিকের প্রতি সমপরিমাণে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক এবং মাঝে মাঝে বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী করা দরকার। এর ফলে শিক্ষকমন্ডলী ও অভিভাবক শিশুর অবস্থা ও অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত থাকবে এবং প্রয়োজনে সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারবে।

১) দৈহিক অবস্থার নিরীক্ষাঃ

ভর্তির সময় ও প্রতি শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিকে নিম্নলিখিত বিষয়ের নিরীক্ষা করে অগ্রগতি প্রতিবেদনের অন্তর্ভূক্ত করে নেবে। ক) দেহের আকার খ) ওজন গ) আকৃতি ঘ) শ্রবন শক্তি ঙ) কোন সাময়িক অসুস্থতা চ) সাধারণ দৈহিক অবস্থা ছ) টীকাদান জ) জরুরী নির্দেশিকা।

স্বাস্থ্য নিরীক্ষার জন্যে মাঝে মাঝে কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করলে ভাল হয়।

অন্ততঃ ভর্তির তৃতীয় মাসে সাধারণ স্বাস্থ্যগত অবস্থা খেলাধূলায় অংশগ্রহণ, ব্যায়ামের অভ্যাস এবং স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়ম-নীতির পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে তা অগ্রগতি প্রতিবেদনের অন্তর্ভূক্ত করা উচিত।

২) বাস্তবতা, নৈতিকতা ও সামাজিকতা সম্পর্কিত পরীক্ষা নিরীক্ষা

শিক্ষাবর্ষের প্রথমেই বিস্তারিতভাবে এবং প্রতি তিন মাস অন্তর মোটামুটিভাবে নিজের পর্যবেক্ষণ এবং অভিভাবকদের রিপোর্টের আলোকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অন্তর্ভূক্তি আবশ্যক।

* পছন্দনীয় অভ্যাস ও আচরণঃ নামাযে নিয়মতান্ত্রিকতা, সত্য বলা, সাধারণ সংশোধন ইত্যাদি।

* অপছন্দনীয় অভ্যাস ও আচরণঃ মিথ্যা, চুরি, বদভ্যাস, সিগারেট পান ইত্যাদি।

www.nagorikpathagar.org

* পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাঃ দেহ, পোষাক ও লেখাপড়ার উপকরণ সম্পর্কে।

* বিভিন্ন স্থানের আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখাঃ মসজিদের আদব রক্ষা করা, শ্রেণীর আদব রক্ষা করা, সমাবেশের আদব রক্ষা করা, খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা, মেলামেশা এবং কথোপকথন করার আদব রক্ষা করা।

* শিক্ষকমন্ডলী, মাতাপিতা, ভাইবোন, শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের সাথীগণ, সহগামীদের সাথে আচরণ ও কথোপকথন।

* দায়িত্ববোধ, শ্রম ও মনোনিবেশ, বিশেষত উপস্থিতি ও সময়ের অনুসরণের ব্যাপারে, লেখাপড়া ও হোম ওয়ার্কে আন্তরিকতা, শ্রেণীর পরিচ্ছন্নতা, বিশ্রাম, বাড়ী ও বিদ্যালয়ের কাজে অংশ গ্রহণ, পাঠ বহির্ভূত কাজে অংশ গ্রহণ এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়ে।

শিক্ষা সম্পর্কিত অবস্থার পরীক্ষা—নিরীক্ষা

বছরের শুরুতে নিম্নোক্ত বিষয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অন্তর্ভূক্তি আবশ্যক।

১) সাধারণ মেধা শক্তি ২) কোন কোন বিষয়ে ভাল, ৩) কোন কোন বিষয়ে দুর্বল, ৪) দুর্বলতাসমূহ বিদূরণের পরামর্শ।

অতপর দৈনন্দিন লিখিত ও মৌখিক কাজ ও যাচাইয়ের ফলাফলের আলোকে মাসিক রিপোর্ট এবং ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল লিখে রাখবে।

বহিঃ পাঠ বিশেষত লাইব্রেরী ও পাঠাগার থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরী হওয়া আবশ্যক। এসব যাচাই পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে ছাত্র অভিভাবকদের অবহিত করতে হবে যেন তাঁরাও সহযোগিতা করতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তিগতভাবে ও সামষ্টিকভাবে শিক্ষাদান

আমাদের দেশে কোন কোন মক্তব মাদ্‌রাসা এখনও এমন আছে যাতে প্রথম থেকেই কোন শ্রেণী করা নেই, বরং প্রত্যেক বালক-বালিকাকে স্বতন্ত্রভাবে পাঠদান করা হয়ে থাকে। শিক্ষক একটা শিশুকে ডেকে নেয়, তার পেছনের পাঠ শুনে আর নতুন পাঠ দিয়ে তা আয়ত্ব করার জন্যে ছেড়ে দেয়। এভাবে পালাক্রমে সমস্ত শিশুকে পাঠদান করা হয়। কখনো কখনো নতুন পাঠদানে ও পুরান পাঠ শ্রবনে অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্রদের সহযোগিতা নেয়া হয় এবং নিজের পাঠ সত্তর আয়ত্ব করতে পারে অথবা দক্ষতা ও যোগ্যতায় অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় অগ্রগামী হয়। এই ব্যবস্থার কিছু উপকারিতাও রয়েছে। যেমন-

* শিক্ষক প্রত্যেক শিশুর প্রতি স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টি রাখেন।

* প্রত্যেক শিশু নিজের স্বভাবগত হারে অগ্রগতি লাভের সুযোগ পায়।

* শিশুরা সাথীদের পাঠ শিখতে সহযোগিতা করে থাকে।

* অন্যদের পাঠ শেখাতে শিশুর নিজের পাঠ ভালভাবে আয়ত্বে আসে এবং দক্ষতা ও যোগ্যতা বেড়ে যায়।

তাদের কিছু ক্ষতিও হয়ে থাকে। যেমনঃ

* এক সময় শিক্ষক কেবল একটি শিশুর প্রতি দৃষ্টি দিতে পারে। ফলে অনেক শিশুর যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়।

* সারা দিনে মাত্র দু'একটা বিষয় হতে পারে।

* একা বসার কারণে শিশু প্রায়ই দুষ্টুমী করে থাকে। তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে শিক্ষককে বেশ বেগ পেতে হয়।

* শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে শিক্ষাদান করলে তা অত্যন্ত অপূর্ণ হয়।

* শিক্ষাদান কার্যে শিক্ষক যাদের সহযোগিতা গ্রহণ করেন সে সব শিশুদের মধ্যে বিদ্যার অহমিকা এবং মর্যাদানুভূতি সৃষ্টি হয় আর সাথীদের নিকৃষ্ট মনে

www.nagorikpathagar.org

করে আর তাদের সাথে অসদাচরণ করতে থাকে।

মোট কথা, একা একা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দুটোই অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। পক্ষান্তরে শ্রেণীবদ্ধভাবে পুরো শ্রেণী একত্রে শিক্ষাদানের রীতিনীতিও রয়েছে। তাতে অনেক উপকার হয়ে থাকে।

সামষ্টিক শিক্ষাদানের সুবিধা

* ছাত্র শিক্ষক উভয় অন্যান্য উপকারী কাজের জন্যে বেঁচে যায়।

* একই শিক্ষক একাধিক ছাত্রদের শিক্ষা দিতে পারেন। ফলে স্বল্প ব্যয়ে অনেক কাজ হয়।

* শিক্ষক পুরো শ্রেণীর প্রতি একই সাথে দৃষ্টি রাখতে পারে আর সমস্ত শিক্ষার্থীকে কর্মরত রাখতে পারে। ফলে শৃঙ্খলা ঠিক থাকে আর শিক্ষার্থীদের প্রতি কঠোরতা আরোপের প্রয়োজন হয় না।

* কতিপয় শিক্ষার্থীর এক জাতীয় সমস্যার একত্রে সমাধান হয়। সবাইকে পৃথক সময়দানের আবশ্যকতা দেখা দেয় না।

* কোন পাঠ পুরো শ্রেণীকে শেখাতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায়। এতে শিক্ষার্থীরা একই কথা বিভিন্ন পদ্ধতিতে পেশ করার কৌশল শিখতে পারে।

* মেনে চলার জন্যে শিক্ষার্থীরা একাধিক উত্তম আদর্শ পায়।

* সহপাঠীদের সাথে শিশুরা বেশ আনন্দ পায়।

* সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতি এবং অন্যান্য সামষ্টিক গুণাবলীর সৃষ্টি হয়।

* বই পত্র ও শিক্ষার উপকরণের অভাব অনুভূত হয় না। অন্যান্য সাথী থেকে সাহায্য পাওয়া যায়।

* শিক্ষার্থীরা অন্যের দেখাদেখি শিক্ষা কার্যে আকৃষ্ট হয় এবং অন্যদের শিক্ষক থেকে শিক্ষা নিতে দেখে নিজেও প্রভাবিত হয়। ফলে পুরো শ্রেণী শিক্ষকের দ্বারা প্রভাবিত হতে দেখে শিক্ষক নিজে অধিকতর স্পৃহা লাভ করে।

* প্রতিযোগিতার বিভিন্ন সুযোগ পাওয়া যায় যাতে ছাত্র ছাত্রীরা অসাধারণ শ্রম ও মনোনিবেশ সহকারে কাজ করতে উৎসাহ পায়।

www.nagorikpathagar.org

অসুবিধা বা ত্রুটিসমূহ

সামষ্টিক শিক্ষাদানে যেমন অসংখ্য সুবিধা আছে তেমনি কতিপয় মৌলিক ত্রুটিও রয়েছে। যেমন–

* সামষ্টিক পাঠ (শ্রেণীবদ্ধ শিক্ষা) এই ধারণায় দেয়া হয় যে ক্লাসের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী সমান যোগ্যতা রাখে। (অথচ দেহ, মেধা, মানসিকতা ও স্বভাবের দিক থেকে প্রত্যেকের মাঝে পার্থক্য, স্বভাবজাত বিভিন্নতা রয়েছে) এ পদ্ধতিতে স্বতন্ত্র পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে সবাইকে একই লাঠি দিয়ে হাঁকানো হয়ে থাকে।

* শ্রেণীবদ্ধ পদ্ধতির শিক্ষাদানে মেধাবী ও মেধাহীন, উভয় ধরনের শিক্ষার্থীর ক্ষতি হয়ে থাকে। মেধাবীদের ধীরে চলতে আর মেধাহীনদের দ্রুত চলতে বাধ্য করা হয়। ফলে উভয় প্রকারের শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ স্বভাব প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি অনুসারে চলতে সুযোগ পাচ্ছে না।

* শিক্ষা দেয়া হয় মধ্যম ধরনের মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে। ফলে লেখাপড়ার গতি ও মান থাকে পেছনে এবং ছাত্র শিক্ষক কেউই অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট হতে পারে না।

* অনুপস্থিতি বা অসুস্থতার কারণে যেসব শিশু পেছনে থেকে যায়, তাদের প্রতি স্বতন্ত্র দৃষ্টি দেয়া সম্ভবপর হয় না। ফলে ঘাটতি পুরণ না হওয়ায় সে আরও অধিক নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। অনেক সময় এই অবস্থা ভাল মেধাবী ছাত্রদের মাঝে দুষ্টুমী ও লেখাপড়ার প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

* ছাত্র শিক্ষক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। ফলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উন্নতি ও অগ্রগতির হার ভালভাবে অনুমান করা যেমন সম্ভবপর হয় না তেমনি তাদের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেয়াও সম্ভব হয় না।

* দুষ্টু সাথীদের খারাপ প্রভাব পড়ার আশংকাও থাকে।

* শিক্ষার্থীদের পাঠে বাস্তব চিত্তাকর্ষণ লাভ করার ও নিজে হাতে কলমে শেখার সুযোগ মিলে খুব কম।

* সব চাইতে অধিক ক্ষতি হয় এই যে শ্রেণীবদ্ধ ব্যবস্থা ছাত্রদের পরিবর্তে পাঠের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় অধিক, আর সমস্ত লক্ষ্য অধিকতর পাঠ শেষ করার প্রতি নিবদ্ধ থাকে। শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগতভাবে ঐ পাঠে কতটুকু উপকৃত হচ্ছে

www.nagorikpathagar.org

তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা হয় অনেক কম।

ক্ষতিসমূহ হতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়

শ্রেণীবদ্ধ (সামষ্টিক) পদ্ধতিতে অনেক দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন বাস্তব কারণে এই পদ্ধতিই গ্রহণীয় ও সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে। শিক্ষা দিতে হবে তো সার্বিক ভাবেই। তবে উপরে বর্ণিত ক্ষতি ও দোষ থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টাও করতে হবে। এ প্রসংগে কতিপয় ব্যবস্থা নিম্নে দেয়া হলো।

* ভর্তি ও শ্রেণীবদ্ধ করার সময় অত্যন্ত তীব্রভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এক শ্রেণীতে যথাসম্ভব একই বয়স, সমান মেধা, দৈহিক ও মানসিক শক্তি সম্পন্ন এবং একই মানের শিক্ষার্থীদের নেয়া হয়।

* শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্য ও বৈশিষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আর তাদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য রাখার জন্যে অবশ্যই কিছু সময় বের করবে।

* শিক্ষার্থীদের সাথে একান্ত সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করবে এবং লক্ষণীয় বিষয়াদির প্রতি ইংগিত করে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

* শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যথাসাধ্য পবিত্র রাখার চেষ্টা করবে। শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উত্তম আদর্শ পেশ করবে যেন তারা উত্তম প্রভাবে প্রভাবিত হতে পারে এবং নিকৃষ্ট সাহচর্য ও খারাপ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

* যোগ্যতানুসারে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রুপে ও অংশে বিভক্ত করবে। প্রত্যেক গ্রুপের একজন ক্যাপটেন ঠিক করে দেবে। তাদের গ্রুপের সাথে মিলেমিশে কাজ করার সুযোগ দেবে আর প্রয়োজন মত প্রত্যেক গ্রুপকে সহায়তা করবে।

* যথাসম্ভব অধিক প্রশ্নাবলী, অনুশীলনী এবং লিখিত ও বাস্তব কাজ দিয়ে ব্যক্তিগত চেষ্টা সাধনা ও দক্ষতার পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

* ব্যক্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতে ও ঝোঁক প্রবনতার নিরীখে বাড়ীর কাজ (Home work) দেবে।

* দুর্বল ও পেছনে পড়া শিক্ষার্থীরা অধিকতর দৃষ্টি পাওয়ার যোগ্য। তাদের নিয়ে এগুনোর পুরো চেষ্টা করবে। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের লিখিত কাজ বা বাস্তব কাজ দিয়ে দুর্বলদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেয়ার সময় বের করে নেবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার স্বাভাবিক গতি বৃদ্ধির জন্যে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দেবে।

www.nagorikpathagar.org

বিষয়াদির পারস্পরিক সম্পর্কের সুদৃঢ়তা

বিদ্যালয়গুলোতে বিষয়ের বোঝা দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রতিটি বিষয় যেহেতু জীবনের কোন না কোন স্তরের সাথে সম্পৃক্ত সুতরাং কোন একটি বিষয় বাদ দেওয়াও যায় না। সাধারণ বিদ্যালয়ের তুলনায় দ্বীনি বিদ্যালয়সমূহে বিষয়ের চাপ আরও অধিক হতে চলছে। কারণ, সেখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ইসলামিয়াত ও আরবী শিক্ষাও বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত বিষয়াদি পড়তেই হয়।

১) ইসলামিয়াত, ২) বাংলা, ৩) ইংরেজী, ৪) অংক, ৫) সমাজবিদ্যা (ভূগোল, ঐতিহাসিক কাহিনী, নাগরিক প্রশিক্ষণ) ৬) সাধারণ বিজ্ঞান, ৭) আর্ট ক্রাফট।

কোথাও কোথাও উর্দূ এবং ফার্সী ভাষা প্রাথমিক শ্রেণীসমূহেই পড়ানো ও পরিচিতি দেয়া হয়। এবার একটু ভেবে দেখুন একটা অল্প বয়সের শিশুর মাথায় কত বড় বোঝা? তদুপরি রয়েছে–

* প্রতিটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় স্বতন্ত্রভাবে।

* ওসব বিষয়ের অধিক পরিমাণে উপবিভাগের মাধ্যমে প্রত্যেক বিষয়ের জন্যে স্বতন্ত্র ঘন্টা রাখা হয়। যেমন– ইসলামিয়াত, মৌখিক পাঠ (কিরআত) ফিকহ্ ও আকায়িদ, সীরাত ও জীবনী ইত্যাদি। বাংলায় পদ্য, গদ্য, রচনা, ব্যাকরণ, বানান ও হস্তলিপি ইত্যাদি। তেমনিভাবে অন্যান্য ভাষায়, সমাজবিদ্যায়, ভূগোল, ইতিহাস, সাধারণ বিজ্ঞানে অধ্যয়ন শক্তি, স্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি।

* এসব উপবিভাগীয় বিষয়াবলীকে স্বতন্ত্রভাবে নেয়া হয়। ফলে সংখ্যা

www.nagorikpathagar.org

আরও বৃদ্ধি পায়।

* প্রতিটি বিষয়ের পাঠও পড়ানো হয় স্বতন্ত্রভাবে। একই বিষয়ের বিভিন্ন পাঠেও কোন সম্পর্ক থাকে না।

* কোন কোন প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শ্রেণীসমূহেও একই শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করা হয়ে থাকে। এ জন্যে বিষয়গুলোর পারস্পরিক পার্থক্যও বেড়ে যায়।

মোটকথায় কিছু বাধ্য হয়ে আর কিছু আমাদের প্রচেষ্টার অভাবে বিষয়ের বোঝা শিশুদের জন্যে অসহনীয় হয়ে পড়ে। পরিণামে এই দাঁড়ায় যে–

* প্রাথমিক পর্যায়েই বিষয়ের বোঝার নিচে পড়ে তাদের স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়ে যায়।

* দৈহিক বৃদ্ধি থেমে যায় আর মেধাও কমে যায়।

* সমস্ত বিদ্যাকে একটি একক হিসেবে পেশ করার পরিবর্তে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে পেশ করার ফলে ছাত্রদের মানসিক বিক্ষিপ্ততায় পতিত হয়।

* বিভিন্ন বিষয় পরস্পরের সাথে এবং একই বিষয়ের বিভিন্ন পাঠ পরস্পর গভীর ঘনিষ্টতা রাখে। যদি সম্পৃক্ত করে পাঠদান করা হয়, তাহলে যেমন সুস্পষ্ট হয়, তেমনি বুঝেও আসে আর শিক্ষার্থী চিত্তাকর্ষণ ও অনুভব করে। কিন্তু পৃথক পৃথক করার ফলে শিশুদের তা থেকে বঞ্চিত করা হয়। যেমন পাঠ্য বইয়ে যাকিছু পড়ানো হয় রচনা, ব্যাকরণ ও অন্যান্য লিখিত বিষয়াদি যদি একই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হয়, তাহলে বিষয়টি সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি সেগুলোর একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করে নেয়া হয়, তাহলে বোঝা ভারী হয়ে যায়।

এ জন্যে বিষয়ের চাপ কমানো এবং শিক্ষাদানকে কার্যকর করার জন্যে বিষয়াদিকে যথাসম্ভব একটাকে অপরটার সাথে সম্পৃক্ত করে পড়ানো এবং একই পাঠ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে শিক্ষা দেয়া আবশ্যক। প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে ক্লাস টিচার ব্যবস্থা চালু করবে এবং একই শ্রেণীর অনেক বিষয় একই শিক্ষকের দায়িত্বে দেবে যেন তারা বিষয় ও শিক্ষার মধ্যে সহজেই সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্ক স্থাপনের শ্রেণীভেদ

সম্পর্ক স্থাপন (সন্ধি) দু' প্রকারঃ

১) পরস্পর সন্ধি (সম্পর্ক স্থাপন) ২) এককেন্দ্রীভূতকরণ।

* পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন নীতিঃ অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়কে পরস্পরের সাথে একই বিষয়ের বিভিন্ন পাঠকে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত করে পড়ানো।

* এককেন্দ্রীভূতকরণ নীতিঃ অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ বিষয় বা পেশাকে কেন্দ্রীয় মর্যাদা দান এবং বাকী সমস্ত বিষয়কে তার সাথে সম্পৃক্ত করা।

এককেন্দ্রীভূত সম্পর্ক স্থাপন নীতিতে নিঃসন্দেহে সমস্ত জ্ঞাতব্য একই কেন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত আর পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন নীতিতে বিভিন্ন বিষয় স্মৃতিপটে অংকিত হয়ে থাকে। ফলে স্মৃতি শক্তি চিন্তার বিক্ষিপ্ততা থেকে সংরক্ষিত থাকে এবং প্রয়োজন বোধে সমস্ত সম্পৃক্ত বিষয়াদির ব্যবহার করা সম্ভব হয়। কিন্তু প্রথমতঃ সমস্ত বিষয় বা পেশাকে একটার সাথে অথবা সমস্ত বিষয়কে পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় মর্যাদা প্রাপ্ত বিষয়ের তো অসাধারণ গুরুত্ব দেয়া হয় আর অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান গৌন ও অংগহীন থেকে যায়। দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকমন্ডলী যদি ইসলামিয়াতকে কেন্দ্রীয় মর্যাদা দিয়ে বাকী সমস্ত অথবা অধিকাংশ বিষয়কে তার সাথে সম্পৃক্ত করে পড়ান, তাহলে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে। কিন্তু সে জন্যে যে পরিমাণ দক্ষতা ও প্রস্তুতি এবং যেসব পাঠ্য বইয়ের আবশ্যক হবে, তা না পাওয়ার কথাটাই প্রথমে চিন্তা হয়।

পারস্পরিক সম্পর্ক নীতি অবলম্বনে পাঠদান তুলনামূলকভাবে সহজ ও কার্যকর করা সুবিধাজনক। এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া দরকার। এতে শিক্ষার্থীদের বোঝা অনেকাংশে হালকা হয়ে আসে।

পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের নিয়মাবলী

* প্রতিটি বিষয়ের পাঠকে এমনভাবে বিন্যাস করবে যেন পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। প্রতিটি নতুন পাঠের সাথে পূর্বের পাঠের সম্পর্ক মিলিয়ে

www.nagorikpathagar.org

পড়াবে।

* বিভিন্ন বিষয়ের প্রান্তিক বিভাজ্যতা অবশ্যই করবে না, বরং প্রত্যেক বিষয়ের বিভিন্ন শাখাকে পরস্পর সম্পৃক্ত করে পড়াবে। ব্যাকরণ, রচনা, পত্র প্রবন্ধ লিখন, বানান হস্তলিপি, সুন্দর হস্তাক্ষর ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত অনুশীলনী ভাষা ও সাহিত্যের বইয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে হয়ে যে বিষয়টি তখন শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়, তেমনিভাবে সাধারণ বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, আর্ট ক্রাফট ও অংক প্রভৃতিকেও প্রান্তিক বিভাজন করবে না। বরং এগুলোর প্রত্যেক গ্রুপকে একই বিষয় গণ্য করে পড়াবে।

* প্রত্যেক পাঠ শিক্ষার্থীদের জীবন, তাদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সাথে অবশ্য সম্পর্ক স্থাপন করে পড়াবে।

* দুটো পৃথক বিষয়ের যে সব পাঠ পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে সেগুলোকে সম্পৃক্ত করেই পড়াবে। যেমন– ক্রাফটে যা কিছু তৈরী করা হচ্ছে আর্টে তা সুসজ্জিত করিয়ে নেবে। ইসলামিয়াত পড়াবেন তো ভূগোলে তৎকালীন আরবের অবস্থা বলে দেবেন, আর বাংলায় কোন প্রশস্তি পড়িয়ে দেবেন।

www.nagorikpathagar.org

পাঠদান পদ্ধতিসমূহ

শিক্ষানবীশদের কোন নতুন বিষয়ে শিক্ষাদান করার পদ্ধতি দুটো হতে পারে।

* একটা এই যে আমরা শিক্ষার্থীদের কোন নিয়ম পদ্ধতি বা মূলনীতি ইত্যাদি পড়িয়ে দেব, আর ছাত্রদের থেকে আশা করব যে তারা আমাদের উপর ভরসা করে ঐ নিয়ম নীতিগুলো মেনে নেবে। অবশ্য অধিকতর নিশ্চয়তার জন্যে আমরা প্রমাণ হিসেবে উপমা পেশ করব যেন তার ভিত্তিতে তারা সেই নিয়ম নীতিগুলোর যথার্থতা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারে।

* দ্বিতীয়টা হলো আমরা শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন ইত্যাদির সুযোগ করে দেব যেন তারা নিজেরা ঘটনাবলী ও বিষয়বস্তু বুঝে নিয়ে তা থেকে কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

প্রথম পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা অবগত হয় পরোক্ষভাবে, আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে হয় প্রত্যক্ষভাবে। উভয় পদ্ধতিই স্ব স্ব স্থানে গুরুত্বের অধিকারী। আর শিক্ষকমন্ডলী এই উভয় পদ্ধতিই গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু প্রথম পদ্ধতিতে যেহেতু শিক্ষার্থীরা কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বা কোন কিছুর প্রকৃত অবস্থা জানতে বিশেষ চেষ্টা সাধনার প্রয়োজন হয় না, তারা হয় অজ্ঞাত শ্রোতা আর তারা কেবল বিষয়টি সম্পর্কে কৃত কর্ম গ্রহণ করে মাত্র। তাছাড়া তাদের জ্ঞানটা হয় অন্যের দান যা তারা পায় বিনা পরিশ্রমে। ফলে তারা তা এক কানে শুনে আর অপর কান দিয়ে দেয় বের করে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে তারা কার্যত চিত্তাকর্ষণ সম্পন্ন হয়, আর মূল বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে তাদের বেশ শ্রম মেহনত ব্যয় করতে হয়। এ জন্যে এ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা হয় কর্তা হিসেবে, আর শিক্ষাদানে ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার অসাধারণ কার্যকারিতা থাকে। এই পদ্ধতিতে তারা যেসব নিয়ম নীতি শেখে তা হচ্ছে তাদের নিজেদের অর্জিত যাকে তারা ভালভাবে স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখে।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষাদানের এই দ্বিতীয় পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জন্যে অধিকতর উপযোগী ও উপকারী হয়ে থাকে।

শিক্ষাদানের অন্তক্রিয়া (সরাসরি) পদ্ধতি

শিক্ষাদানের যে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জী, প্রকৃত বিষয় অথবা উপমার বিশ্লেষণ করে সরাসরি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং কোন নীতি, নিয়ম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে পদ্ধতির নাম অন্তক্রিয়া। যেমন– দাদী মারা গেলেন, নানা মৃত্যু বরণ করছেন, গতকাল হামিদ মারা গেলেন, আজ মাহমুদা পরপারে চলে যাচ্ছে। মানুষ মরতে থাকে। সুতরাং মানুষ মরণশীল/মানব নশ্বর।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষক একটা বিশেষ বিন্যাসে শিক্ষার্থীদের বিশেষ ঘটনাপঞ্জী, উপমা, অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করেন। শিক্ষকের নির্দেশিকা অনুসারে শিক্ষার্থী ঐসব উপমা, বিশ্লেষণ এবং পরস্পরের তুলনা করে সেগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বের করে। এভাবে শিক্ষার্থীরা কোন প্রকৃত সত্যে উপনীত হয় অথবা কোন সাধারণ নীতি সূত্র বের করে। যেমন শিক্ষার্থীরা ৩ কে ৫ বার যোগ করে (৩+৩+৩+৩+৩=১৫) এবং ৩ কে ৫ দিয়ে গুণ করে (৩ X ৫ =১৫) উভয় অবস্থায় একই ফল বের করে। এই নিয়মটি কয়েকটি সংখ্যায় প্রয়োগ করে, যেমন– ৮ সংখ্যাটিকে ৪ বার যোগ করে (৮+৮+৮+৮=৩২) অথবা ৮ কে ৪ দিয়ে গুণ করে (৮ X ৪ =৩২) উভয় অবস্থাই ফল পায় ৩২। এ ধরনের অসংখ্য উপমা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে,

['যোগ' এর সহজ পদ্ধতি 'গুণ' করে বের করা]

* আমরা কোন ত্রিভূজের তিন কোন কেটে বিন্যাস করে পাশাপাশি রেখে

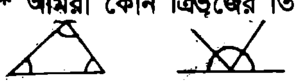

অথবা

কোণগুলোকে মেপে যোগ করে তাহলে দেখা যায় যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে মোট হয় ১৮০° (দুই সমকোণ) এবার তারা এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে যে,

www.nagorikpathagar.org

ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমাকোণের সমান (১৮০°)।

* তেমনিভাবে কোন ধাতুর একটা গোল্লা একটি রিং এর অথবা একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সহজেই বের করা যায়। কিন্তু ধাতুর গোল্লাটিকে গরম করলে ঐ রিং অথবা ছিদ্র দিয়ে আর ভেতরে প্রবেশ করে না। একই কাজ বিভিন্ন ধাতুর গোল্লার বেলায় প্রযোজ্য। প্রত্যেক বারেই একই ফল পাওয়া যায়। অবশেষে শিক্ষার্থীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে,

"বস্তুকে তাপ দিলে প্রসারিত হয়।"

কিন্তু যখন গোল্লাটি শীতল করা হয় তাহলে পুনরায় তা রিং বা ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বের করা যায়। ফলে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে,

"বস্তু শীতল হলে সংকুচিত হয়।"

এই পদ্ধতির সুবিধাদি

* জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জনের এ হচ্ছে যুক্তিসংগত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। শিক্ষক বিশেষ উপমা বা ঘটনাপঞ্জীকে একটা বিশেষ বিন্যাস সহকারে পেশ করে। শিক্ষার্থীরা তা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত বা সূত্র বের করে।

* শিক্ষার্থীদের পাঠে কার্যকর চিত্তাকর্ষণ থাকে আর তারা সর্বান্তকরণে তৎপ্রতি মনোযোগী ও রত থাকে।

* শিক্ষার্থীদের চিন্তা গবেষণা, প্রমাণ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত প্রদানের পুরো সুযোগ মিলে।

* নিজে হাতে কলমে শেখার সমস্ত উপকারিতা পায়, বিদ্যার সুদৃঢ়তা, বিদ্যার প্রতিফলনের কৌশল, সফলতার তৃপ্তি, সমস্যার নিজে জড়িত হওয়ার যোগ্যতা, প্রকৃতিগত চাহিদা ও স্বভাবজাত প্রবৃত্তি সতৃপ্ত হয়।

* নিজের চেষ্টায় প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়ার নিয়ম যোগ্যতা হাসিল করতে পারে এবং দৈনন্দিন সম্মুখে আসা ঘটনাপঞ্জী থেকে নীতিমালা বের করার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ক্রমান্বয়ে নিজের যোগ্যতা বেড়ে যায় ও দক্ষতা জন্মে।

* শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা জন্ম লাভ করে আর তারা শিক্ষকের উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়ার অভ্যস্ত হয় না।

* অনুসন্ধান ও অনুসন্ধিৎসার দক্ষতা ও যোগ্যতার সৃষ্টি হয়।

* মানব জাতি সমস্ত বিদ্যা এভাবেই হাসিল করেছে। নিজে পর্যবেক্ষন ও

www.nagorikpathagar.org

পরীক্ষা করেছে। প্রতিবার কিছু হারিয়েছে, কিছু পেয়েছে। সুতরাং জ্ঞান হাসিলের এ হচ্ছে স্বভাবজাত ও প্রাকৃতিক পদ্ধতি।

এই পদ্ধতির অসুবিধা বা ত্রুটিসমূহ

এ পদ্ধতি গ্রহণে কিছু ক্ষতির আশংকাও রয়েছে। ছাত্রদেরকে সেগুলো থেকে হেফাজত করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন–

* অনেক সময় আনন্দের আতিশয্যে শিক্ষার্থীরা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। অসংখ্য দিক তাদের দৃষ্টির বাইরে থাকে।

* কতিপয় বিশেষ ঘটনাপঞ্জী অথবা উপমা থেকে কোন নীতি বানিয়ে নেয়। অথচ অন্যান্য অনেক উপমার উপর সেই নীতির যথার্থ প্রয়োগ সম্ভব হয় না।

যেমন– শিশুরা দেখে যারা উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করে অথবা খাওয়া পরা লোক হয় তাদেরকে মানুষ বেশ অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানায়। নিজেদের এমনি সীমিত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে শিশুরা সিদ্ধান্ত নেয় যে, ধন দৌলত ও চাকচিক্যময় পোষাক পরিচ্ছদই ইজ্জত সম্মানের মানদন্ড। অথচ সুদখোর, ঘুষ খোর এবং হারাম পথে উপার্জনকারী এবং ফ্যাসনকারী পকেটমারদের কেউ (অন্তর দিয়ে ভালবাসে না) পছন্দ করে না বা সম্মানের চোখে দেখে না। সুতরাং শিক্ষা নবীশদের তাড়াহুড়া করা থেকে বাঁচাতে হবে। তাছাড়া তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় বা সূত্র বের করে তাকে অন্যান্য উপমা। উদাহরণ ও ঘটনাপঞ্জীর সাথে মিলিয়ে তার বিশুদ্ধতা যাচাই করার প্রশিক্ষণ দেবে। তাড়াহুড়ার মধ্যে কেবল কতিপয় উপমার ভিত্তিতে মূলনীতি তৈরী করবে না।

শিক্ষাদানের বহিঃক্রিয়া পদ্ধতি

এ হচ্ছে আন্তক্রিয়া পদ্ধতির বিপরীত। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক নিজেই শিক্ষার্থীদের কোন সাধারণ নীতি, বিধি বা কানুন বলে দেন। তারপর বিশেষ উদাহরণ দিয়ে তার ব্যাখ্যা করেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের উপর ভরসা করে তা মেনে নেয়। অধিক বিশ্বাসের জন্যে তারা শিক্ষার্থীদের আরও কিছু উপমার উপর এই বিধি স্থাপন করার সুযোগ দিয়ে থাকে। যেমন– ব্যাকরণ শিক্ষক বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয় বা বিশেষণের কথা বলে দিল, উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করলো, ছাত্ররা শিক্ষকদের কথায় ভরসা করে তা মেনে নিল। একটা প্যারাগ্রাফ

www.nagorikpathagar.org

বা অনুচ্ছেদ দিয়ে শিক্ষার্থীদের বলা হলো তারা যেন তা থেকে বিশেষ্য, ক্রিয়া, অব্যয় ইত্যাদি বের করে দেয়। যদি তারা যথাযথভাবে বের করতে পারে তবে পাঠদান সফল হলো। এমনিভাবে অংকশাস্ত্রে কোন সূত্র বা নিয়ম বলে দিয়ে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দেয়া হলো। তারপর শিক্ষার্থীরা উক্ত নিয়ম অনুসরণে অতিরিক্ত প্রশ্নাবলীর সমাধান করে। যেমন গুণ করতে দিলে নামতা শেখে নেয়। বিয়োগের বেলায় উপরের সংখ্যা ছোট হলে দশমিকের সংখ্যা থেকে ধার নেয় ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা এর অনুসরণ করতে পারলে শিক্ষাদান সফল হলো বলে গণ্য হবে।

অসুবিধাসমূহ

এই পদ্ধতির কতিপয় ত্রুটি বা অসুবিধা রয়েছে। যেমনঃ

শিক্ষার্থীর অবস্থা হয় অপরিচিত শ্রোতার মত। ফলে তারা পাঠে বাস্তব মনোযোগী হয় না।

* প্রকৃত সত্য পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা সরাসরি নিজের চেষ্টায় যেহেতু উপনীত হতে পারে না তাই তাদের বিদ্যা সুদৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য হয় না। তা প্রয়োজন মত বাস্তবায়িত করার ও প্রয়োগ করার ক্ষমতাও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় না।

* শিক্ষাদান কাজের অধিক পরিমাণ সীমিত থাকে নিয়ম, সূত্র, মূলনীতি ও বিধি-বিধান শেখানোর উপর। আর এগুলো দীর্ঘদিন পর্যন্ত মনে থাকে না। কারণ এগুলো তো তাদের নিজের হাতে অর্জিত নয়।

* এই পদ্ধতি 'ছাত্রদের হাতে কলমে' শেখার এবং এর যাবতীয় উপকারিতা থেকে তাদের বঞ্চিত করে দেয়।

* বিদ্যা অর্জনের এ হচ্ছে অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক পদ্ধতি। এতে ব্যক্তিগণ জীবনে পূর্ণ বিষয় অনুধাবন করতে শেখে ঠিক, তবে কিন্তু নিজে ভেবে চিন্তে নয়। নিজের চিন্তাভাবনা তো ওসব পূর্ণ বিষয়াদির ভিত্তিতে গড়ে উঠে।

সুবিধাসমূহ

এই পদ্ধতির কিছু সুবিধার দিকও রয়েছে। যেমন-

* প্রবীনরা যে শিক্ষাটা অনেক শ্রম ব্যয়ে ও অনেক কাঠ খড়ি নষ্ট করে শিখেছে তা নবীণদের হাতে তুলে দেয়। ফলে পরবর্তী বংশধর ওসব নিজে করে শেখার পেছনে নষ্ট হয় না যেগুলো শিখতে পূর্ববর্তী বংশধরগণ অনেক সময়,

www.nagorikpathagar.org

শক্তি, অর্থ সম্পদ ব্যয় করেছেন।

* শিক্ষকের কাজ খুব সহজ হয়। তাঁরা একটা নিয়ম বা বিধি বলে দেন আর শিক্ষার্থীরা তা শিখে তার সাহায্যে অনেক সমস্যার সমাধান করে থাকে।

* সমস্ত কিছু নিজে করে শেখা সম্ভব নয়। কারো হাতে না এত সময় আছে না আছে তত শক্তি সামর্থ।

তাই এই পদ্ধতি অবলম্বনে এমনিতেই অনেক বিদ্যা শেখা যায়।

যা হোক কচি শিশুদের শিক্ষাদান কার্যে অন্তক্রিয়া বা সরাসরি পদ্ধতি অধিকতর উপযোগী ও কার্যকর। যথাসম্ভব এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা যেতে পারে। অবশ্য প্রয়োজন দেখা দিলে স্বতন্ত্র কথা। যেমন সময় স্বল্প হলে, নিজে অভিজ্ঞতা হাসিল ও পর্যবেক্ষণ করলে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির আশংকা থাকলে, অথবা এমনটি করা কোনভাবে অসমীচীন মনে হলে। অবশ্য বয়স্ক শিক্ষার্থীরা যেহেতু তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ ধারণা সম্পন্ন হয়, তাদের মধ্যে প্রমাণ গ্রহণের যোগ্যতাও পাকাপোক্ত হয়, ফলে তাদের বহিক্রিয়া পদ্ধতির মাধ্যমে স্বল্প সময়ে অনেক কিছু শেখানো যায় আর তাদের জন্যে এই পদ্ধতি খুবই উপকারী বটে। কিন্তু তাদের জন্যে অনুশীলনী ও পুনরাবৃত্তির যথেষ্ট সুযোগ থাকা চাই। অন্যথায় এই পদ্ধতির জ্ঞান তারা দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে না, আর তা প্রয়োগ করতেও নানা ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হবে।

তুলনা

অন্তক্রিয়া পদ্ধতি	বহিক্রিয়া পদ্ধতি
১) বিশেষ ঘটনাপঞ্জী ও স্বতন্ত্র দৃষ্টান্তাবলীর উপর গবেষণা চালিয়ে তা থেকে সংজ্ঞা, নিয়ম, বিধিবিধান বের করা হয়।	১) সংখ্যা নিয়ম ও বিধি বিধান প্রথমে শিখিয়ে দেয়া হয়। অতপর সেগুলোর উপর বিশেষ ঘটনাপঞ্জী, স্বতন্ত্র দৃষ্টান্তবলীর প্রয়োগ করা হয়।
২) এই পদ্ধতিতে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়।	২) এই পদ্ধতিতে পূর্ব অভিজ্ঞতা সুদৃঢ় হয়।
৩) এই পদ্ধতি উদ্ভাবন ও	৩) এই পদ্ধতিতে অন্যের অভিজ্ঞতার

www.nagorikpathagar.org

গবেষণার দিক নির্দেশনা করে থাকে।	প্রতি আস্থা লাভ করা যায়।
৪) এ হচ্ছে অত্যন্ত ধীর গতির পদ্ধতি। কারণ শিক্ষার্থী নিজে ক্রমান্বয়ে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।	৪) এ পদ্ধতিতে কাজের গতি হয় দ্রুত। কারণ শিক্ষার্থীকে নিজে কোন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ করতে হয় না। বরং প্রবীনদের জ্ঞান অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হয়।
৫) বিভিন্ন ধীশক্তি ও যোগ্যতা, যেমন– চিন্তা গবেষণা, প্রমাণ গ্রহণ, সিদ্ধান্ত শক্তি ইত্যাদির প্রশিক্ষণ হয়।	৫) বেশীর ভাগ মুখস্থ শক্তিতে কাজ করাতে হয়। মেধার অন্যান্য শক্তিকে কাজে লাগানোর সুযোগ কমই থাকে।
৬) শিশুদের (শিক্ষার্থীদের) মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতার সৃষ্টি হয়।	৬) শিক্ষকের উপর ভরসা করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়।
৭) এতে চিন্তার গতি সম্মুখের দিকে ধাবিত হয় এবং বিশেষ ঘটনাপঞ্জী থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণা জন্মে।	চিন্তার গতি নিচের দিকে থাকে এবং সিদ্ধান্তের আলোকে ঘটনাপঞ্জীর নিরীক্ষা করা হয়।
৮) নিজে করে শেখার (হাতে কলমে) সুযোগ পাওয়া যায়। এ জন্যে জানাটা পরিপক্ক হয় ও কাজে আসে এবং প্রয়োজনে প্রয়োগ করা যায়।	৮) অন্যের শেখানোর প্রতি ভরসা করতে হয়। ফলে এই বিদ্যার প্রতি পুরো বিশ্বাস জন্মে না আর তা ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার সুযোগ আসে না।
৯) এতে প্রশিক্ষণ হয় অধিক আর শেখানো হয় কম।	৯) এতে শেখানো হয় অধিক আর প্রশিক্ষণ হয় কম।

www.nagorikpathagar.org

১০) এই পদ্ধতি শিশুদের জন্যে উপযোগী।	১০) এই পদ্ধতি বয়স্কদের জন্যে উপযোগী।

অনুসন্ধান পদ্ধতি বা আবিষ্কার পদ্ধতি

"আগুন পুড়ে ফেলে"- এ হচ্ছে একটা সাধারণ সত্য। এই জ্ঞান আমরা জীবনের প্রথম ভাগেই পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছি। যদি একটি কচি শিশুকে বলা হয় যে, "মনু! আগুন পুড়ে ফেলে।এতে হাত দিও না,তাহলে জ্বলে পুড়ে যাবে ও কষ্ট পাবে।" তাহলে আমাদের কথায় বিশ্বাস করে হয়ত সে এই সত্য মেনে নিতে পারে এবং কিছুটা আগুন থেকে বেঁচে চলবে। কিন্তু তার বিশ্বাস জন্মিবে তখন, যখন সে দেখে যে তার মা খানা পাকাতে গিয়ে পুড়ে গেছেন আর তিনি বেশ কষ্ট পাচ্ছেন। আর পূর্ণ বিশ্বাস তো তখনি হতে পারে যখন সে নিজে পুড়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করবে, আর তারপরে সে দুধের মাঠা বা দধিও ফুঁ দিয়ে পান করবে।

শিশুদের স্বভাব হলো তারা অন্যের কথায় কমই বিশ্বাস করে। তারা নিজেরা পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা হাসিলের মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চায়, আর কেবল তখনি তাদের জ্ঞান পাকা ও বিশ্বাস দৃঢ় হয়। এ জন্যে শিক্ষাদানে এই বিষয়টির গুরুত্ব দেয়া হয় যে শিশুদের সবকিছু শিখিয়ে না দিয়ে বরং নিজে নিজে শেখার এবং নিজের চেষ্টায় প্রকৃত সত্য উদঘাটনের অধিকতর সুযোগ দেয়া চাই। অনুসন্ধান পদ্ধতিও মূলত এ উদ্দেশ্যেই তৈরী করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের মাঝে অনুসন্ধান ও খোঁজ করার মনোবৃত্তি জাগ্রত হয়, আর এভাবে যে জ্ঞান আহরণ করে তা পাকাপোক্ত হয়ে থাকে।

এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী হয় একজন অনুসন্ধানী বা আবিষ্কারক আর শিক্ষক হন একজন উপদেষ্টা, সহায়ক ও পথপ্রদর্শক। শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করে এবং আবশ্যকীয় উপকরণাদির সংস্থান করে তাদের সর্বাধিক স্বাধীনতা দেয়া হয় যেন তারা নিজেরাই প্রকৃত সত্য ও রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হয়। শিক্ষক তাদের অনুসন্ধিৎসাকে জাগ্রত রাখে ও প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে থাকে। সম্ভাব্য প্রশ্ন সংকেত প্রদান করার মাধ্যমে আর কখনো সরাসরি কিছু বলে দিয়ে সত্য ও সিদ্ধান্ত পর্যন্ত পৌঁছার কাজে শিক্ষার্থীকে পথনির্দেশ দিতে থাকেন। এভাবে শিশু

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষকের সহায়তায় সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিজে উপনীত হয়। বিজ্ঞান, অংক এবং স্থানীয় ভূগোল পড়াতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।

সুবিধাসমূহ

এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে অনেক সুবিধা রয়েছেঃ

* শিক্ষার্থীরা যেহেতু নিজে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সুযোগ পায় তাই তারা পাঠে বাস্তব ভূমিকা নিয়ে থাকে।

* এই পদ্ধতিতে অর্জিত বিদ্যা মজবুত হয় ও আজীবন তা বিস্মৃত হয় না। এমনি বিদ্যার উপর পুরো বিশ্বাস ও ভরসা থাকে আর প্রয়োজনে তা প্রয়োগও করা যায়।

* এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধান ও খোঁজ নেয়ার ঝোঁক প্রবনতার সৃষ্টি হয়। তারা স্বাবলম্বন শেখে ঘর বিদ্যালয়ের সময়ের বাইরেও অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা হাসিল করতে থাকে।

* কাজ করে শিখতে পারা এবং নিজের প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করার মাঝে যে আনন্দ লাভ হয় তা আরও অধিক প্রচেষ্টা করতে উৎসাহ প্রদান করে।

* এতে চিন্তা গবেষণা, প্রমাণ গ্রহণ এবং মিমাংসা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি লাভ করে।

কিন্তু এই পদ্ধতি ব্যবহারের অর্থ এ নয় যে শিশুদেরকে নিজেরা কোন কিছু শিখিয়ে দেবে না, বরং সবকিছু তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ করে শিখতে দেবে। যেমন– কোন কোন চরমপন্থীরা এমনি বলে থাকে। অতীতে যে সব ভুল করে মানুষকে খারাপ ও ভুল ফলাফল ভোগ করতে হয়েছিল এখনও শিশুদের সেসব ভুল পুনরায় করতে দেয়া চরম বোকামী ও অযৌক্তিক। তাহলে তারা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে, অতীত অবিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে তাদের সম্পর্ক চ্যুত হয়ে যাবে, আর তারা আজীবন এমন সব সাধারণ নিষ্প্রয়োজনীয় বা মারাত্মক কথার পেছনে কাটাবে যে সম্পর্কে তারা অত্যন্ত সহজে অতি অল্প সময়ে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান–বিজ্ঞান হাসিল করতে পারে। অবশ্য কাজ নষ্ট হতে দেখলে অথবা সময় নষ্ট হতে দেখলে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দেবে এবং যে ধরনের কাজে কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে সে ধরনের কাজে কিছুটা অধিক অবকাশ দিবে।

www.nagorikpathagar.org

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা-পদ্ধতি

কিন্ডার গার্টেন অর্থ শিশু উদ্যান। অর্থাৎ এমন বাগান যাতে শিশুরা প্রবৃদ্ধি লাভ করে। যে শিশু বিদ্যালয়ে ক্রীড়াচ্ছলে বা জিনিসপত্রের সাহায্যে শিক্ষা দেয়া হয়। এটা মূলত কচি শিশুদের (তিন চার বছর থেকে ছয় সাত বছর বয়সের শিশু) এমন বিদ্যালয়ের সংশোধিত নাম যা জার্মানের এক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ফ্রুবেলের দেয়া কাঠামোতে চালানো হচ্ছে। এসব বিদ্যালয়ে শিশুরা চারাগাছ তুল্য আর শিক্ষকগণ মালী তুল্য। শিক্ষকের কাজ হলো এসব কচিকাঁচাদের উন্নতির জন্যে মালীর মত অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে দেয়া আর আবশ্যকীয় জিনিস সংস্থান করে ওসব চারাগাছের আভ্যন্তরীণ নড়চড়ের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির সুযোগ দেবে।

এই পদ্ধতির আবিষ্কারক ফ্রুবেল ১৭৮৩ ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন। সৎ মায়ের যন্ত্রণায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে জংগলে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করতেন। প্রাথমিক শিক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা হয়নি। পরবর্তীকালে তিনি নিজ চেষ্টায় শিক্ষাদান পদ্ধতিতে দক্ষতা অর্জন করেন। ১৮৩৭ ইং সনে তিনি কচিকাঁচা শিশুদের জন্যে কিন্ডারগার্টেন নামে একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কচিকাঁচা শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান কাজকে কার্যকর ও উপযোগী করে তোলার ব্যাপারে তাঁর এই প্রচেষ্টা ছিল একটা বিপ্লবী পদক্ষেপ। ইতিপূর্বে কচিকাঁচা শিশুদের অংগহীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা তো অনেকই হয়েছে, কিন্তু একটা বুঝে শুনে পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব পদক্ষেপ তিনিই গ্রহণ করেছেন। ১৯৫২ ইং সনে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন আস্তিক এবং ধর্মীয় জীবন যাপনের জন্যে একান্ত আন্তরিকতা সম্পন্ন। তাঁর মতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য–

"স্বচ্ছ, আন্তরিকতাপূর্ণ, দোষমুক্ত ও পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করার উপযোগী করে তৈরী করা।"

আর যেহেতু এই উদ্দেশ্য একমাত্র পবিত্র ধর্মীয় জীবন যাপনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে এ জন্যে তিনি মনে করেন শিক্ষার ভিত্তি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। তাঁর মতে শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যেন ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পারে। আর তার মধ্যে "সমষ্টির মাঝে ব্যক্তি"র অনুভূতি জাগ্রত হয়। তাঁর উপস্থাপিত মূলনীতি হলোঃ

www.nagorikpathagar.org

* সামষ্টিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমেই ব্যক্তিত্বের উপযোগী বৃদ্ধি লাভ সম্ভব। এ জন্যে শৈশবকাল থেকেই শিশুদের মধ্যে মিলেমিশে জীবন যাপনের আবশ্যকতার অনুভূতি জাগ্রত করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচ্চরিত্র ও সামষ্টিক গুণাবলী সৃষ্টি করা চাই।

* যেভাবে বীজের মধ্যে বৃক্ষ সৃষ্টির পুরো যোগ্যতা মওজুদ থাকে। কেবল অনুকূল পরিবেশ ও আবশ্যকীয় সাহায্য পাওয়ার দরকার। তেমনিভাবে শিশুর মধ্যেও উন্নতির পুরো যোগ্যতা মওজুদ থাকে। এ জন্যে তার আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাময় শক্তির বিকাশ সাধন এবং ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের (যেমন– মানসিক, দৈহিক, কার্যত, নৈতিক, উদ্বুদ্ধতা ও আত্মিক) সম্মিলিত উন্নতি সাধনে সাহায্য করা চাই, তারা নিজের আভ্যন্তরীণ গতিতে নিজেই বুদ্ধি লাভ করবে।

* শিক্ষার কার্যকর মাধ্যম হলো শিশুদের স্বয়ংক্রিয়তা। তারা নিজেরা করে শিখতে পারে অনেক উন্নতভাবে। তাই তাদের স্বভাবজাত ও অনিচ্ছাকৃত কাজকর্ম, পদক্ষেপ ও ব্যস্ততার মাধ্যমে তাদের শিক্ষাদান করা চাই।

* শিশুদের প্রবৃদ্ধির জন্যে খেলাধূলা অত্যাবশ্যক। তাই খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা আবশ্যক।

* বিদ্যালয়ের পরিবেশ এমন হওয়া উচিত যেন শিশুরা স্বাধীনতা ও আনন্দ লাভে সক্ষম হয় এবং বিভিন্ন মাধ্যম (যেমন, গঠনমূলক কার্য, সংগীত এবং অনুকরণীয় খেলাধূলা) দ্বারা নিজের মনোভাব ও স্পৃহা খুলে প্রকাশ করতে পারে। বহির্চাপ মুক্ত হওয়া চাই। বরং ক্রমাগত নিজে নিজে স্মরণ করতে পারার চেষ্টা থাকা চাই।

* শিশুর স্বভাব ও প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে শিক্ষাদান করা চাই। আর এ প্রসংগে শিশুর আন্তরিক সহযোগিতা হাসিল করা উচিত।

অনুমোদিত সিলেবাস ও শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রভৃতি

কচিকাঁচা শিশুদের জন্যে লেখাপড়া অথবা অংক ইত্যাদির জন্যে কোন নিয়মিত সিলেবাস তৈরী করা যায় না। কারণ ছয় বছর বয়স হওয়ার পূর্বে শিশু যথারীতি শিক্ষাদানের ভার বহনের উপযুক্তই হয় না। এ জন্যে ফ্রুবেল কচিকাঁচা

www.nagorikpathagar.org

শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্যে সাতটি সরঞ্জাম ও বিশটি কর্মের প্রস্তাব পেশ করেছেন এগুলো এমন খেলনা যা শিশুরা নিজের মতানুসারে ব্যবহার করে থাকে। সরঞ্জামাদি তো শিশুদের মানসিক প্রশিক্ষণে সাহায্য করে আর কর্মসমূহ বিভিন্ন পারদর্শিতার সৃষ্টি করে থাকে।

* প্রথম সরঞ্জামঃ বিভিন্ন রঙের কাঠ বা উল নির্মিত বলের সমন্বয়। এগুলোকে শিশুরা স্বাধীনভাবে গড়িয়ে থাকে আর এগুলো দিয়ে রঙ, আকার, আকৃতি, নড়চড়, কাঠিন্য, নরম ইত্যাদির জ্ঞান হাসিল করে।

* দ্বিতীয় সরঞ্জামঃ গোল, চতুষ্কোণী ও বেলুনের আকৃতি কাঠের খেলনার সমন্বয়। এগুলো দিয়ে বিভিন্ন রঙ, রূপের বস্তুর মধ্যে পার্থক্য ও সামঞ্জস্যের অনুমান করা যায়।

* তৃতীয় সরঞ্জামঃ কাঠের একটা বড় চতুষ্কোণী। এর দিক বা অংশ হয় মোট আটটা। এসব অংশকে বিন্যাস করে শিশুরা মেঝে, চোকি, বেঞ্চ, সিঁড়ি ইত্যাদি তেরী করতে পারে। এগুলো দিয়ে গণনা শিখে এবং জোড় বেজোড়ের প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারে।

* চতুর্থ সরঞ্জামঃ শিশুদের গঠনমূলক যোগ্যতা সৃষ্টির জন্যে আটটা টুকরো বিশিষ্ট একটা চতুষ্কোণী। তৃতীয় সরঞ্জামের সাথে এর তুলনা করানো হয়। আর একে বিন্যাস করে বিভিন্ন বস্তু তৈরী করা হয় এবং বিভিন্ন ডিজাইন তৈরী করা হয়।

* পঞ্চম সরঞ্জামঃ সাতাইশটি ছোট চতুষ্কোণী সমন্বয়। এগুলোকে বিন্যাস করে বিভিন্ন প্রকারের ডিজাইনের দালান তৈরী করা যায়। তৃতীয় সরঞ্জামের সাথে অনেকটা তুলনীয়। এটা তুলনামূলকভাবে পেচানো হয়ে থাকে আর কচিকাঁচাদের দেয়া হয় না।

* ষষ্ঠ সরঞ্জামঃ এতে আঠারটি বড় এবং নয়টি ছোট চতুষ্কোণ ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট টুকরো থাকে। চতুর্থ সরঞ্জামের সাথে এর তুলনা করা যায় আর এগুলোকে বিন্যাস করে পুতুলের ঘর, বিদ্যালয়, ক্ষেত ইত্যাদি বানানো হয় এবং বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন তৈরী করা হয়।

* সপ্তম সরঞ্জামঃ উপরে বর্ণিত ছয়টি সরঞ্জাম পূর্ণ বস্তু সম্পর্কে ধারণা কায়েম করা যায়। সপ্তম সরঞ্জাম দু'টো এমন ছোট বাক্সের সমন্বয়ে গঠিত হয় যাতে জ্যামিতির বিভিন্ন টুকরো ভর্তি থাকে। এগুলো দিয়ে জ্যামিতির আকার-আকৃতি চেনা যায়।

www.nagorikpathagar.org

* এ ছাড়াও তারের আংটি, দড়ি, পেনসিল, রংগিন কাগজ, চাকা, ঝুনঝুনি, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের খেলনা হয়ে থাকে।

* ফ্রুবেলের মতে শিশুদের জন্যে শিক্ষকের সামনে নিম্নোক্ত প্রবন্ধ, বিষয়াদি ও কাজকর্ম থাকা চাই।

১) ধর্ম ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ।

২) সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশঃ বাগান করে ও পশু পালনের মাধ্যমে।

৩) গণনা শেখানোঃ প্রকৃত বস্তুর সাহায্যে এবং প্রাথমিক জোড় বিজোড় ধারণা দান।

৪) ভাষা শিক্ষা দেয়াঃ কিসসা কাহিনী, গজল কবিতা ইত্যাদির সাহায্যে।

৫) হস্তশিল্পঃ গঠনমূলক যোগ্যতা চাংগা করার জন্যে বিভিন্ন ধরনের অনুশীলনী।

৬) খেলাধূলা ও ভারসাম্যপূর্ণ নড়াচড়ার মাধ্যমে দৈহিক প্রশিক্ষণ দান।

* শিক্ষা পদ্ধতি এমন ধরনের হওয়া চাই যেন শিশুরা খেলাধূলা, কিসসা কাহিনী, গজল কবিতা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক কিছু শিখতে পারে। লেখাপড়ার প্রচলিত পদ্ধতি এই কচি বয়সে অবশ্যই ব্যবহার করা যাবে না।

সুবিধাসমূহ

* এই পদ্ধতিতে কচিকাঁচা শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কাজ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, কার্যকর ও উপকারী হয়ে থাকে। 'ফ্রুবেল' হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি শিশু শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন এবং কার্যকর শিক্ষাদানের একটা আকর্ষণীয় বাস্তব স্ট্রাকচার পেশ করেছেন।

* বিদ্যালয়ের পরিবেশ ঘরের পরিবেশের মত হয়। শিশুরা কোন অপরিচিতি অনুভব করে না, তারা হাসি খুশী বিদ্যালয়ে গিয়ে দিন কাটায়। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি, দায়িত্বানুভূতি ইত্যাদির মত সামষ্টিক গুণাবলী গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

* শিশুদের জন্যে হাতে কলমে শিখার ও বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়।

* কোন প্রকার বোঝা অনুভব করা ছাড়াই শিশুরা খেলাধূলার মাধ্যমে পূর্ণ চিত্তাকর্ষণ, মনোযোগ ও অনুরক্ততা সহকারে অসংখ্য কথা শিখে নিতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

* অনুকরণমূলক খেলাধূলায় তারা দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য কাজ পদ্ধতি, আদব, নিয়মনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তবে অভিজ্ঞ হতে পারে।

* সরঞ্জামাদি, খেলাধূলা এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় কার্যাবলীর সাহায্যে শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক সমন্বিত হয়।

অসুবিধাসমূহ

এই পদ্ধতিতে যেমন অসংখ্য সুবিধাবলী রয়েছে তেমনি বেশ কিছু অসুবিধাও আছে। যেমন–

* শিক্ষা ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। ফলে কেবল ধনী লোকেরাই এতে উপকৃত হতে পারে।

* শিশুদের খেলাধূলায় যে স্বাধীনতা থাকা চাই, খেলাধূলার মধ্যে শিক্ষাকে উদ্দেশ্য রূপে অন্তর্ভূক্ত করার কারণে তা পাওয়া যায় না।

* ছোট ও কচিকাঁচা শিশুদের খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের গুরুত্ব রয়েছে ঠিক। কিন্তু বিদ্যালয়ে সর্বদা খেলাধূলার মাঠের মত পরিবেশ সৃষ্টি করাও বৈধ নয়। এতে তো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়। খেলাধূলা তো সে সর্বত্রই করতে পারে, তাহলে বিদ্যালয়ের প্রয়োজন কি?

* সামষ্টিকতার প্রতি এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় যে ব্যক্তিত্ব তাতে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। কচিকাঁচা শিশুর মনে এমন সামষ্টিকতার অনুভূতি সৃষ্টি করা হয় অসময়ে বা সময় আসার পূর্বে, তাছাড়া এ হচ্ছে স্বাধীনতা প্রিয় স্বভাবের উপর এক ধরনের বাধ্যবাধকতা।

* খেলাধূলা ও সরঞ্জামাদির মাধ্যমে অবশ্যই বেশ কিছু কথা শেখানো যায়। কিন্তু যেসব নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী বিকাশের আশা ফ্রুবেল করেছিলেন এবং সে জন্যে তিনি যে ওকালতি করছেন তাতো কল্পনা মাত্র। আর সুধারণা পোষণের চাইতে এর বেশী কোন মর্যাদা নেই।

যাহোক, মোটামুটিভাবে ফ্রুবেল কচিকাঁচা শিশুদের শিক্ষা দীক্ষায়, খেলাধূলায়, গঠনমূলক কার্যাবলী এবং তাদের স্বভাবজাত ঝোঁক প্রবনতার প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিশুদের বেশ বিরাট খিদমত করেছেন। প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে এ সবের প্রতি পুরো লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

www.nagorikpathagar.org

মানটে সুরী শিক্ষাপদ্ধতি

এ পদ্ধতির আবিষ্কারক ইটালীর এক মহিলা মেয়র অথবা মনিসুর। তিনি ১৮৭০ ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন। ডাক্তারী পাস করে একটা হাসপাতালে শিশু চিকিৎসা করতে থাকেন। তিনি অসহায় শিশুদের প্রতি অসাধারণ সহানুভূতি পোষন করতেন। এই সহানুভূতির ফলে তিনি ৩ থেকে ৭ বছরের শিশুদের শিক্ষা (পদ্ধতি) স্কীম উপস্থাপন করেন। তিনিও ফ্রুবেলের মত পুথিগত বিদ্যার পরিবর্তে খেলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রবক্তা ছিলেন। এই স্কীমও মূলত কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতিরই এক পরিবর্তিত রূপ মাত্র। উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য কেবল নামে মাত্র ছিল। মানটেসুরী পদ্ধতিতেও আমাদের দেশে[১] অনেক বিদ্যালয় চালু আছে। তিনি উপমহাদেশেও এসেছিলেন। ১৯৫২ ইং সনে তিনি পরলোকগমন করেন। এই স্কীম অধুনা বার বছর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

মৌলিক নীতিমালা

মানটেসুরী স্কীম নিম্নলিখিত মৌলিক নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিতঃ

* শিশুদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, তাছাড়া তাদের আভ্যন্তরীণ প্রতিভার বিকাশ সম্ভব নয়।

* ব্যক্তিত্বের সকল দিকের প্রতি সাধারণভাবে এবং দৈহিক ও অনুভূতির প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিবে।

* শিশুদেরকে নিজেরা করে শিখার সুযোগ করে দেবে।

* ইন্দ্রিয়ানুভূতির যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেবে। বিশেষত স্পর্শ করার বিষয়ে। কেননা প্রাথমিক জীবনে এটা হয় বুনিয়াদী অনুভূতি। ইন্দ্রিয়ানুভূতিই হচ্ছে জ্ঞান চর্চার মাধ্যম। আর বর্হিজগত সম্পর্কে যত ধারণাই আমাদের মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে তা এ পথেই গমন করে। এ জন্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রশিক্ষণ যত ভাল হবে ততই স্পষ্ট জ্ঞান ও পরিপক্ক বিদ্যা অর্জন করা সম্ভব হবে ইন্দ্রিয়ানুভূতি অপরিপক্ক হলে বিদ্যার্জনও হবে অসম্পূর্ণ।

---

(১) উপমহাদেশে

www.nagorikpathagar.org

* শিশুদের স্বাবলম্বী হতে শিখাবে। মানটেসুরী বিদ্যালয়সমূহে এ বিষয়ের প্রতি পুরো লক্ষ্য রাখা হয়। শিশু নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করে, হাত মুখ ধৌত করে, গোসল করে, নিজের সামান বিন্যাস করে রাখে, শিক্ষা উপকরণ ও চেয়ার টেবিল নিজ হাতে স্থানান্তর করে। নিজের পোষাক নিজেই পরিবর্তন করে। আর নিজের কাজের জন্যে কারো মুখাপেক্ষী থাকে না। এসব কাজ কোন বহির্চাপ দ্বারা সম্ভব নয় বরং স্বাধীনতার পরিবেশেই সম্ভব।

* শিশুদের দৈহিক শাস্তি প্রদান থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে।

* খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করবে।

* নৈতিক প্রশিক্ষণ দেবে। তবে এ প্রসংগে অবশ্যই কঠোরতা আরোপ করবে না, বরং হাসি খুশীতে ও স্বাধীনতা দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার চিন্তা করা শেখাবে।

মানটেসুরী বিদ্যালয়

বিদ্যালয় ঘর সাধারণত আলো বায়ু সম্পন্ন খোলামেলা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হয়। পাশে ছায়া দেয়ার মত বৃক্ষ এবং সামনে ফুলের চারা লাগানো হয়। কক্ষসমূহের দেয়াল থাকে সুদর্শন ছবি ও আকর্ষণীয় রংয়ের আর্ট করা সজ্জিত। গোসল করার ও খাওয়া দাওয়ার কক্ষ স্বতন্ত্র থাকে। মধ্যে একটা সুসজ্জিত হল থাকে। এতে এমন ছোট ছোট চেয়ার থাকে যা হাল্কা পাতলা হওয়ায় শিশুরা নিজের হাতে স্থানান্তর করতে পারে। কক্ষে ছোট ছোট ব্লাকবোর্ড থাকে। যাতে শিশুরা নিজের পছন্দনীয় ছবি আঁকতে পারে। আলমিরায় এমন উঁচুতে শিক্ষা উপকরণসমূহ বিন্যাস করে রাখা হয় যেন শিশুরা সহজেই তা নাগাল পায়। একটা কক্ষ যাকে তাদের বিনোদনের জন্যে নির্দিষ্ট যা বিশেষভাবে সজ্জিত থাকে। শিশুদের চিত্তাকর্ষণের জন্যে তাতে বিশেষ বিশেষ আসবাবপত্র বা সামান রাখা হয়। সেখানে শিশুরা স্বাধীনভাবে কথাবার্তা বলতে পারে, হাসি ঠাট্টা করতে পারে। সাধারণত শিক্ষিকাদের দিয়ে কাজ চালানো হয়। শিক্ষিকারা সেখানে এসে শিশুদের কিসসা কাহিনী বলে চিত্তবিনোদনে সহায়তা করে থাকে। এই কক্ষে সোফা ও গদী যুক্ত ফার্নিচার থাকে, যেখানে শিশুরা স্বাধীনভাবে বসতে শুতে পারে। খাওয়া, পরা, শোয়া, খেলাধূলা যাবতীয় কাজে সব ধরনের সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। শিশুরা বিদ্যালয়কে নিজেদের বাড়ী মনে করে।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা উপকরণাদি

মানটেসুরী স্কুলে শিক্ষা উপকরণের বেশ প্রয়োজন হয়। সেখানে কাঠের বিভিন্ন টুকরো ও খেলনা ব্যবহৃত হয়। সামনের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেয়া গেল।

১) কাঠের বিভিন্ন রংগীন টুকরো– গোল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, লম্বা চতুষ্কোণ এবং বেলুনের আকৃতির হয়ে থাকে।

২) বিভিন্ন ওজনের টিক্যা।

৩) কার্ডের সেট (যেগুলোর সাহায্যে বর্ণ, শব্দ, সংখ্যা, গণনা ইত্যাদি শেখানো হয়।)

৪) বিভিন্ন ধরনের ঘন্টি।

এসব সরঞ্জাম ও হাতিয়ার দিয়ে শিশুদের অনুভূতির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং তাদেরকে মসৃণ, অমসৃণ, নরম, কঠিন, গরম, শীতল, ভারী ও হাল্কা ইত্যাদির ধারণা দেয়া হয়। বিভিন্ন রং ও আকারের পরিচয় বলে দেয়া হয়, বিভিন্ন ধরনের ধ্বনির পার্থক্য শেখানো হয়।

মানটেসুরীর প্রথম উদ্দেশ্য লেখাপড়া শেখানো ছিল না, কিন্তু পরে তা অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হয়েছে। এখন এই স্কীমের মাধ্যমে কচি শিশুদের আকর্ষণীয় পদ্ধতিতেও শিক্ষাপোকরণের সাহায্যে লেখাপড়া, কথা বলা; গণনা করা ইত্যাদি শেখানো হয়। বাগান করানো ও দৈনন্দিন বাস্তব কাজের মাধ্যমে হাতে কলমে শিক্ষাদান করা হয়।

সুবিধাসমূহ

এই শিক্ষা পদ্ধতিতে বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ

* শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য রাখা হয়।

* কচি শিশুদের জন্যে এই শিক্ষা স্কীম উপযোগী প্রমাণিত হয়েছে।

* ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রতি অসাধারণ দৃষ্টি দেয়া হয়।

* দৈহিক, কার্যত ও নৈতিক প্রশিক্ষণের উপযোগী ব্যবস্থা হয়।

* বিদ্যালয়ে শিশুরা ঘরের পরিবেশ অনুভব করে। আর পুরো স্বাধীনতা সহকারে সারাদিন বিভিন্ন কাজে রত থাকে।

* শিশুদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা সৃষ্টি হয় আর প্রথম থেকেই তারা স্বাবলম্বী

www.nagorikpathagar.org

হয়ে উঠে।

* গঠনমূলক যোগ্যতা ও প্রতিভার বিকাশ সাধনের বন্দোবস্ত হয়।

* খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং হাতে কলমে শিক্ষা লাভের বহু সৌন্দর্য এতে নিহিত রয়েছে।

অসুবিধাসমূহ

* এই শিক্ষাদান পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অধিকাংশের জন্যে অসহনীয়।

* শিশুরা খেলাধূলার প্রকৃত সুখ ও আনন্দ থেকে কিছুটা বঞ্চিত হয় কারণ, শিক্ষা লক্ষ্যস্থল হওয়ার কারণে খেলাটাও কাজে পরিণত হয়।

* শিশুদের উপর সময় আসার পূর্বেই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

* কাল্পনিক ক্ষমতার প্রশিক্ষণের দিকে কোন দৃষ্টি দেয়া হয় না।

* ব্যক্তিগত উন্নতির উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হয় যে সামষ্টিক গুণাবলীর প্রতি কোন লক্ষ্য দেয়া হয় না। ফলে শিশুদের মধ্যে সাধারণত স্বার্থপরতা জন্ম নেয়।

তবুও শিক্ষা দীক্ষাকে আকর্ষণীয় ও সহজ সাধ্য করে তোলার জন্যে এবং তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ে মানটেসুরীর অবদান অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষাপোকরণ ও সরঞ্জামাদির জন্যে সব চাইতে অধিক প্রয়োজনীয়তার কথা তিনিই বলেছেন এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রশিক্ষণের উপর তিনিই সর্ব প্রথম পুরো কঠোরতার সাথে দৃষ্টি দিয়েছেন।

কিন্ডার গার্টেন ও মানটেসুরী স্কীমের তুলনা

সামঞ্জস্য

১) উভয় পদ্দতিতেই শিশুদের (৩–৭ বছরের) শিক্ষার বিস্তারিত চিত্র পেশ করা হয়েছে।

২) শিশুদের আভ্যন্তরীণ প্রতিভার বিকাশ সাধনের জন্যে উভয় পদ্ধতিতেই অসাধারণ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৩) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে শিক্ষাপোকরণের সাহায্য গ্রহণের জন্যে উভয় পদ্ধতিতেই বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৪) ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রশিক্ষণের উপর উভয় পদ্ধতিতেই লক্ষ্য রাখা হয়,

www.nagorikpathagar.org

অবশ্য মানটেসুরী পদ্ধতিতে এর ব্যবস্থা করা হয়েছে বেশ সুন্দরভাবে।

৫) স্বাধীনতা ও আনন্দের পরিবেশে শিক্ষাদানের প্রতি উভয় পদ্ধতিতেই লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

৬) নিজে করে শিখতে (হাতে কলমে শিক্ষা) এবং খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার জন্যে উভয় পদ্ধতিতেই জোর দেয়া হয়েছে।

৭) বিদ্যালয়ের পরিবেশ চিত্তাকর্ষক ও আকর্ষণীয় করার এবং তাকে ঘরের পরিবেশ অনুভব করানোর জন্যে উভয় পদ্ধতিতেই চিন্তা করা হয়েছে।

অসামঞ্জস্য

কিন্ডার কার্টেন	মানটেসুরী
১) সামষ্টিক গুণাবলী সৃষ্টির উপর জোর দেয়া হয়।	১) ব্যক্তিগত উন্নতির দিকে অধিক লক্ষ্য রাখা হয়।
২) বুনিয়াদসমূহ দর্শনের উপর ভিত্তিশীল। কারণ, 'ফ্রুবেল' ছিলেন দার্শনিক।	২) বুনিয়াদসমূহ বিজ্ঞান ভিত্তিক কারণ, মানটেসুরী ছিলেন ডাক্তার।
৩) সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাদান করা হয়।	৩) শ্রেণীবদ্ধ শিক্ষার বিপরীত অধিকতর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষা দেয়া হয়।
৪) ইন্দ্রিয়ানুভূতির শিক্ষাদান করা হয় সরঞ্জামাদি ও খেলার সাহায্যে।	৪) ইন্দ্রিয়ানুভূতির শিক্ষাদানের জন্যে শিক্ষাপোকরণ ও হাতিয়ারের সাহায্য নেয়া হয়।
৫) সরঞ্জাম ছাড়াও শিক্ষা দেয়া যায়, এ জন্যে বিভিন্ন বিদ্যালয় আংশিক পরিবর্তনের সাহায্যে নিজেরা চালিয়ে নিতে পারে।	৫) সরঞ্জামাদি ও হাতিয়ার ছাড়া শিক্ষাদান সম্ভব নয়। এ জন্যে এই পদ্ধতিকে আয়ত্ব করা অত্যন্ত কঠিন।

www.nagorikpathagar.org

৬) হস্তশিল্প ও খেলাধূলার প্রতি জোর দেয়া হয়।

৬) বাস্তব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত কাজের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়।

পরিকল্পিত পদ্ধতি (প্রজেক্ট মেথড)

পরিকল্পনা বলতে বুঝায় এমন স্কীম বা কাঠামোকে যা আরদ্ধ কোন ব্যাপক কাজ সম্পর্কে প্রথমেই তৈরী করে নেয়া হয়। যেমন– ভাগড়া নাঙ্গল প্রজেক্ট।

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিভাষায় পরিকল্পনা বলতে বুঝায় এমন সমাধান কামী সমস্যাকে যাতে বাস্তব কাজ থাকে আর যার পূর্ণতা তার স্বভাবজাত পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশের মধ্যে নিহিত থাকে। যেমন– ঈদের দিন শিশুদের মিলেমিশে ঈদ উদযাপন করা। রুগীদের হেফাজতের জন্যে নর্দমা পরিষ্কার করা।

পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাইওনিয়ার হলেন আমেরিকার স্যার, যার শুরু হয়েছিল ১৮৮৯ সালে আমেরিকার 'রিচার্ড সন'–এর হাতে। কলপিড়ক তাতে আংশিক সংশোধনী পেশ করেছেন এবং স্টুনস ১৯২১ ইং সনে তাকে পূর্ণতায় পৌছিয়েছেন। এই স্কীম প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্যে।

পরিকল্পিত পদ্ধতি বাস্তবায়ন কিভাবে?

এ পদ্ধতির বাস্তবায়ন পর্যায়সমূহ–

১) বিশেষপরিস্থিতির উদ্ভব করাঃ সর্ব প্রথম শিক্ষক মহোদয় কোন বিষয়ে বক্তব্য শুরু করে অথবা তর্কবিতর্ক করে শিশুদের সামনে একটা বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব করে। যেমন– ছুটির দিনগুলো কোথায় কিভাবে কাটাবে? কোন একটা পর্ব কিভাবে উদ্‌যাপন করবে? ভ্রমণ ও বিনোদনের সময় কিভাবে বের করবে? জনপদকে রোগমুক্ত রাখতে, অসমর্থদের সাহায্য করতে, লোকদের নামাযী বানাতে এবং গরীব ছাত্রদের সাহায্যের জন্যে কি ব্যবস্থা করা যায়?

২) উপযোগী পরিকল্পনা নির্বাচন করাঃ কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষার্থীরা আলোচনা পর্যালোচনা ও পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে পরিকল্পনা নির্বাচন করে থাকে। নির্বাচনে পুরো স্বাধীনতা দেয়া হয় যেন শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ রুচী, ইচ্ছা ও আশা আকাংখা অনুযায়ী পুরো স্থিরতা সহকারে কাজ করতে পারে। নির্বাচনের বিভিন্ন দিক প্রত্যেকের হাতে লিখিয়ে নেয়া হয়।

৩) বাস্তবায়ন অঙ্গীকারঃ নির্বাচনের পরে পরিকল্পনাকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্যে ছাত্রদের থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়।

৪) কাঠামো বিন্যাস করাঃ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে এবার পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তৈরী করা হয়। এই কাজটা শিক্ষকের নির্দেশ মোতাবেক ছাত্র নিজেই করে। ছাত্রের মতামত গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেককে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়। মতামত বিচার করা হয় আর পূর্ণ কাঠামো বিন্যাস করে লিখে নেয়া হয়।

৫) বাস্তবায়নঃ এ হচ্ছে পরিকল্পনার সব চাইতে বড় অংশ। এ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মতৎপরতা থাকে। যেমন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা, লেখাপড়া করা, বিভিন্ন স্থান সফর করা। চিত্র, ছবি ও গ্রন্থ দেখা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করা, বাজার দর জেনে নেয়া, ব্যয়ের খাত নির্ণয় করা এবং পুরো পরিকল্পনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করা। কাঠামো বিন্যস্ত হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্রভাবে ও সামগ্রিকভাবে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শিক্ষক তাঁর পর্যবেক্ষণে ও তত্বাবধানে পুরো পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন। প্রয়োজন বোধে কাঠামোতে পরিবর্তনের পূর্ণ অবকাশ রাখা হয়। প্রত্যেক শিক্ষানবীশকে বাস্তবে অংশ গ্রহণ ও পরিকল্পনায় জড়িত হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয় আর সে সুযোগও দেয়া হয়। শিশুদের যথাসাধ্য নিজ হাতে কাজ করার অধিকতর সুযোগদানের চেষ্টা করা হয়।

৬) নিরীক্ষণঃ কাজ শেষ করার পর পূর্ণ কাজের নিরীক্ষা করা হয়। এই নিরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ত্রুটি ও ভুল জানা সহজ হয়। ফলে তারা ভবিষ্যতের জন্যে সংশোধন হয়ে যেতে পারে।

৭) রেকর্ড সংরক্ষণঃ শিক্ষার্থীরা একটা কপিতে পুরো পরিকল্পনার রেকর্ড লিখে রাখে। যেমন– কি পর্যালোচনা হলো? কি সিদ্ধান্ত নেয়া হলো? কিভাবে কোন কাঠামো তৈরী হলো? কিভাবে বাস্তবায়িত হলো? কোন গ্রন্থের সহায়তা

www.nagorikpathagar.org

নেয়া হয়েছে? কিভাবে কাজ বন্টিত হলো? কার সহযোগিতা গ্রহণ করা হলো ইত্যাদি।

সুবিধাসমূহ

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্যে এই পদ্ধতি বিভিন্ন দিক থেকে অনেক উপকারী ও সুবিধাজনক। কারণ এই পদ্ধতিঃ

* ব্যক্তিগত স্বভাব নীতির সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে শিশুদের সম্মুখেই পূর্ণ লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারিত থাকে, তারা নিজেরাই তা বাস্তবায়িত করে। তারা কাজের সুযোগ পায়। শিক্ষাদান কাজে তাদের ইচ্ছা আকাংখার ভূমিকা থাকে, তাই তারা পুরো একাগ্রতা সহকারে কাজ করে।

* পুরো জীবনের সাথে শিক্ষার গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সমস্ত জ্ঞান ও শিক্ষাগত যোগ্যতা স্মৃতিপটে সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খলিত হয়।

* শিক্ষাদান কাজে শিক্ষার্থীরা অপরিচিত শ্রোতার পরিবর্তে কর্মবিধায়ক কর্মী হিসেবে পরিগণিত হয়।

* শিক্ষার উন্নতির গতি শিক্ষার্থীরাই অনুমান করতে পারে। অন্যরাও সহজেই তার যোগ্যতার পরিমাপ করতে সক্ষম হয়।

* শিশুরা নিজ নিজ মতামতের মর্যাদা জানতে পারে।

* জ্ঞান বিজ্ঞান শিখতে দ্রুততা, শ্রেষ্ঠতা ও পরিপক্কতা আসে।

* শিশুরা বাহ্যিক মানুষ না হয়ে বাস্তব মানুষে পরিণত হয়।

* দায়িত্ব পালনের প্রশিক্ষণ লাভ করে আর শিশুদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা জন্মে।

* মনোযোগ সহকারে পরিশ্রম করা এবং কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছানোর অভ্যাস হয়।

* সামষ্টিক পরিকল্পনার ও সমবায় কাজ কারবারের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

* মুখস্থ শক্তির উপর চাপ পড়ে কম, স্মৃতি ও সৃজনী শক্তি প্রবৃদ্ধি লাভ করে।

* অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি ও নিজে সমস্যা সমাধানের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

www.nagorikpathagar.org

ত্রুটিসমূহ

* শিশুরা যা কিছু শিখে তার অনুশীলন ও পুণরাবৃত্তির সুযোগ পায় না।
* অনেক জ্ঞান সাময়িক প্রয়োজনে আসে যার স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা মূল্য নেই।
* হস্ত কর্মের পরিমাণ বেশী জ্ঞান সম্পর্কিত কাজের পরিমাণ কম।
* শিক্ষাদান উপকরণ অবিন্যস্ত হয়, পাঠ্য তালিকা পাল্টে যায়।
* সিলেবাসের কোন কোন অংশে সময় লাগে অনেক, আর কোন কোন অংশ বাদ পড়ে যায়।

যথাযথ পাঠ্য বই প্রস্তুতি এবং যোগ্য শিক্ষক সংগ্রহ করতে বেশ বেগ পেতে হয়।

কিন্তু তার মানে এ নয়, যে এই ব্যবস্থা থেকে উপকৃত হওয়ার দরকার নেই। যদি মাঝে মধ্যে বন্ধের সময় অথবা দৈনিক কয়েক ঘন্টা এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হয়, বাকী সময় সাধারণ নিয়মে শিক্ষা দেয়া হয় তবে তা শিশুদের জন্যে নিসন্দেহে উপকারী প্রমাণিত হবে। বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান ও চার পাশের পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা সফর ইত্যাদিতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা চাই। এতে শিক্ষার্থীরা উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজ করবে, আর তাদের উপকারও হবে যথেষ্ট পরিমাণে।

ডাল্টিন প্লান

শ্রেণীবদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি সম্পর্কে উপরে বলা হয়েছে। এসব দোষত্রুটি দূর করার জন্যে আধুনিক যুগে অসংখ্য প্রচেষ্টা চলছে। তন্মধ্যে ডাল্টিন প্লান হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর আবিষ্কারক হলো আমেরিকার 'মিস পার্ক হিরস্ট'। তিনি ১৯২০ সালে ডাল্টিন হাই স্কুলে এর পরীক্ষা করে দেখেছেন। এ পদ্ধতি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্যে বেশ উপযোগী। সবচেয়ে বড় কথা হলোঃ

প্রচলিত শ্রেণীগত পদ্ধতির আংশিক পরিবর্তন ও স্বল্প ব্যয়ে কাজ চালানো যায়।

* সিলেবাসে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে না।

www.nagorikpathagar.org

* শিক্ষার্থীদের তাদের স্বভাবজাত গতিতে অগ্রগামী হতে সাহায্য পাওয়া যায় আর তাদের স্বাতন্ত্র বজায় থাকে।

* শিক্ষাদান পদ্ধতিও অত্যন্ত সরল সহজ।

পরিকল্পনা পরিচয়

এই স্কীমেঃ

* শিক্ষক মন্ডলীকে সারা বছরের কাজ এমনভাবে বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস করতে হয় যাতে প্রতি বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ এবং এ প্রসংগে তাদের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হতে পারে।

* বছরের কাজকে মাসিক কাজে বিভক্ত করে দেয়া হয়।

* সাধারণ নিয়ম বলে দিয়ে শিক্ষার্থীদের থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে কাজ সমাধা করার অঙ্গীকার নেয়া হয়।

* মেয়াদের মধ্যে উদ্ভূত শ্রম ও জটিলতা বিদূরণে সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত সাহায্য দেয়া হয়।

* একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে যত কাজ অর্পণ করা হয় তা পরিপূর্ণ করার পর দ্বিতীয় কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়।

* শিক্ষার্থীদের সাহায্যের জন্যে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক ও গ্রন্থাগার থাকে, আর বিভিন্ন বই পুস্তক, চার্ট, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, যেন পুরো শ্রেণী একই সময় উপকৃত হতে পারে।

* প্রত্যহ অর্ধেক সময়ে শিক্ষার্থীরা স্বতন্ত্রভাবে বা সামগ্রিকভাবে নিজের ইচ্ছা মোতাবেক শিক্ষা কার্যে রত থাকে। বাকী অর্ধেক সময় সামগ্রিক অসুবিধা বিদূরণে এবং নতুন নিয়ম শেখানোর জন্যে নির্দিষ্ট থাকে।

* শ্রেণীকে কনফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করা হয়। শিক্ষার্থীরা উক্ত কনফারেন্সের ভিত্তি আর শ্রেণীসমূহ কর্মক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। কাজ ন্যস্ত করা, কাজ সমাধা করার অঙ্গীকার হলো অঙ্গীকার আর সমাধার সময়কালকে বলে মিকাত (মেয়াদ)।

* একটা কাজ শেষ করে শিশুরা দ্বিতীয় কাজ শুরু করতে পারে। অবশ্য সে জন্যে শিক্ষককে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

* শিশুরা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করবে কি একত্রিত হয়ে করবে, তা নির্ভর করে তাদের ইচ্ছার উপর।

www.nagorikpathagar.org

* কাজ ও অগ্রগতি জানার জন্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাছেই চার্ট থাকে। ছাত্রদের হাতে একটা স্বতন্ত্র চার্ট ও একটা সামষ্টিক চার্ট থাকে।

উপকারিতা

উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলে নিম্নোক্ত উপকারিতা আশা করা যায়ঃ

* প্রত্যেক ছাত্র নিজের গতিতে অগ্রসর হয়। সুতরাং মেধাবী ও অমেধাবী উভয়ই উপকার পায়।

* দায়িত্ব গ্রহণ ও কাজ সমাধা করার অঙ্গীকার করার কারণে ধীর গতি সম্পন্ন শিক্ষার্থীও কঠোর পরিশ্রম করে নিজের কাজ সমাধা করে।

* শিক্ষার্থীরা কেবল শিক্ষকদের ওপর ভরসা করে বসে থাকে না, বরং গ্রন্থরাজি, চার্ট, পোস্টার ইত্যাদি থেকে উপকৃত হওয়ার নিজস্ব পথ করে নেয়।

* অনুসন্ধান ও ব্যুৎপত্তির রুচী সৃষ্টি হয়।

* অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ায় শিক্ষার্থীরা মনযোগ ও আগ্রহ সহকারে কাজ করে। কারণ এই পদ্ধতির শিক্ষার ব্যাপারে তার নিজস্ব মতামতও অন্তর্ভূক্ত থাকে।

* শিক্ষার্থীর ভূমিকা থাকে কার্যকরী, তারা কর্মগ্রহণকারী হয় না, তারা অজ্ঞ শ্রোতার মত হয় না বরং নিজেরা করেই শিখে।

* শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই অগ্রগতির যথার্থ অনুমান করতে পারে।

* প্রত্যেক বিষয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যায়। তাই দুর্বল বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে দুর্বলতা দূর করা সম্ভব হয়।

* বাইরের চাপ ছাড়াই নিজের দায়িত্ব পালনের প্রশিক্ষন লাভ করা যায়।

* শিশুদের স্বাধীনতা থাকে, তারা যখন যত ইচ্ছা পড়তে পারে। হোম ওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা বাকী থাকে না।

* নিয়ম-শৃংখলার সমস্যা তেমন কষ্টকর হয়ে থাকে না। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে।

* শিশু অনুভব করে যে তার পরে ভরসা করা হচ্ছে। তাই সে এই ভরসাকে অক্ষত রাখতে চায়। তাকে ঘন্টা বাজার সাথে সাথে কাজ পরিত্যাগ করার অথবা নতুন কাজ শুরু করার, অথবা রুটীন অনুসরণ করার জন্যে বাধ্য করা হয় না।

* সীমাবদ্ধ সময় পরিসরে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিরীক্ষণের পরিবর্তে

www.nagorikpathagar.org

গ্রাফ ও দৈনন্দিন কাজের বিস্তারিত বিবরণের মাধ্যমে অগ্রগতির সঠিক অনুমান করা বেশ সহজ হয়।

ক্ষতিসমূহ

এই পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে কিছু ক্ষতিরও সম্মুখীন হতে হয়। যেমন-

* অল্প বয়সের শিশুরা যে ধরনের রেফারেন্সের পুস্তক' থেকে উপকৃত হতে পারে, সে ধরনের পুস্তক বাজারে কমই পাওয়া যায়, বরং বাজারে নেই বললেই চলে।

* অধিকাংশ শিক্ষক নতুন স্কীমের অভিজ্ঞতা হাসিলের পক্ষপাতি নয়। তাঁরা ছাত্রদের স্বাধীনতাকে ভারী মনে করেন। তাঁরা এই পদ্ধতি অবলম্বনের প্রতি উদ্বুদ্ধ হন না।

* অনেক বড় বড় গ্রন্থাগার ও অনেক বেশী শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজন হয়। আর তা সংগ্রহে খুব কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠানই সামর্থ রাখে।

* যথোপযুক্ত দায়িত্ব নির্ধারণে উত্তম যোগ্যতা ও দক্ষতা, বিশ্লেষণ রুচী ও যথেষ্ট অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষকই তা থেকে বঞ্চিত।

* অনেক বিষয় ও কাজের শিক্ষাদান সামগ্রিকভাবেই উপযোগী হয়ে থাকে। যেমন- পদ্যাংশ, মৌখিক পাঠ, পাঠ্য বহির্ভূত বিষয়, ড্রিল ইত্যাদি।

* কোন কোন শিক্ষার্থী স্বাধীনতা পেয়ে কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে।

উপরোক্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও স্কীমের উপকারিতা পাওয়ার জন্যে ছাত্রদের থেকে এই পদ্ধতির কিছু কাজ করানো দরকার। প্রতিটি পাঠ শিক্ষাদানের পরে ব্যক্তিগতভাবে সমাধা করার জন্যে কিছু লেখা বা কাজ অর্পণ করা আবশ্যক। কাঠামো তৈরী করে এবং রেফারেন্স ঠিক করে প্রবন্ধ তৈরী বা বক্তৃতা প্রস্তুত করার প্রতি শিশুদের উদ্বুদ্ধ করা চাই। এভাবে তারা পুস্তক থেকে নিজে নিজে উপকৃত হতে শিখবে।

www.nagorikpathagar.org

বিবিধ সমস্যাবলী

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজ নিজ দায়িত্ব আনজাম দানে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তন্মধ্য থেকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নিম্নে পর্যালোচনা করা হলো।

উপস্থিতির সমস্যা

এ হচ্ছে একটা মৌলিক সমস্যা। প্রায় প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এর সম্মুখীন হতে হয়। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় তো এ সমস্যায় একেবারেই বিব্রত। উপস্থিতিও সময়ানুবর্তিতার ব্যাপারে ছাত্র শিক্ষক উভয়কেই অবহেলা প্রদর্শন করতে দেখা যায়। এতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বেশ একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে। শিক্ষকমন্ডলীর অনুপস্থিতি বা দেরীতে উপস্থিতিতে শিক্ষার ক্ষতি তো হয়ই। তাছাড়া শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃংখলায় চরম ব্যাঘাত ঘটে। শিশুরা শ্রেণীতে মারামারি, ঝগড়াঝাটি ও হৈহল্লা করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ কলুষিত হয়ে পড়ে। বিবাদ মীমাংসা করার জন্যে যথেষ্ট সময় নষ্ট হয় আর নিয়ম-শৃংখলা রক্ষার জন্যে ছড়ি ব্যবহার করতে হয়। পোষাক ছেঁড়া যায়, দোয়াত ভেঙে যায় আর অন্যান্য সামান বিনষ্ট হয়। শিশুর অনুপস্থিতিতে ক্ষতি হয় একজনের আর শিক্ষকের অনুপস্থিতি, বিলম্বে উপস্থিতি অথবা শ্রেণীতে বিলম্বে প্রবেশের ফলে ত্রিশ চল্লিশ জন ছাত্রের পুরো শ্রেণীটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র শিক্ষকের পক্ষ থেকে এমনি ধরনের অবহেলা যেমন আশ্চর্যজনক তেমনি দুঃখজনক আর আক্ষেপময়ও বটে। কারণ,

www.nagorikpathagar.org

যে সম্প্রদায়ের ব্যক্তির উপর দৈনিক পাঁচ বার নামায যথাসময়ে ফরজ করা হয়েছে, যাদের শিশুদের সাত বছর বয়স থেকে নামাযের সময়ানুবর্তিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, যারা সময়টাকে আল্লার আমানত মনে করে, আর এ কথাও স্মরণ রাখে যে প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব তাকে আল্লার কাছে অবশ্যই পেশ করতে হবে। তাদের তো উচিত সময়ানুবর্তিতায় সমস্ত পৃথিবীর সামনে দৃষ্টান্ত পেশ করা। সঙ্গত কারণ ছাড়া তো কোন অবস্থাতেই তাদের জন্যে অনুপস্থিতি বা বিলম্বে উপস্থিতি জায়েয নয়। এমতাবস্থায় অবহেলাটা কোন মৌলিক ত্রুটিই ইংগিত করে থাকে যার মূলোৎপাটনের চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষকমন্ডলী সাধারণত নিম্নলিখিত কারণে অনুপস্থিত থাকেনঃ

১) অসুস্থতা বা স্বাস্থ্যের ত্রুটি।

২) সাময়িক প্রয়োজনে পারিবারিক ব্যস্ততা।

৩) আত্মীয়-স্বজনের কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ।

৪) অলসতা, দুর্বলতা অথবা দায়িত্বানুভূতি ও কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন।

৫) প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও নিয়ম-কানুন মান্য করার ব্যাপারে বেপরোয়া হওয়া।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের কারণ মূলত নিসন্দেহে যুক্তিযুক্ত ওজর বিশেষ, এ ধরনের অনুপস্থিতি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত। অবশ্য শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে এমন স্পৃহা থাকা উচিত যে তিনি যেন বিদ্যালয়ের উপস্থিতিকে সব কিছুর উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেন।

বাকী কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনুপস্থিত থাকার ব্যাপারে কথা হলো অনুষ্ঠানের তারিখ পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়। আর বিদ্যালয়ে ছোট বড় অনেক বন্ধ থাকে। এগুলোকে সহজেই বন্ধের মধ্যে চালিয়ে নেয়া যেতে পারে। অনুপস্থিতির জন্যে এটা কোন ওজর হতেই পারে না।

শেষ দুটো কারণের কথা বাকী থেকে গেলো। এ তো মূলত অনেক খারাপীর জন্ম দান করে। এ ধরনের দুর্বলতাকে কোন ক্রমেই সহ্য করা উচিত নয়। যে সব শিক্ষকের মধ্যে এসব ত্রুটি পাওয়া যায় তারা অনেক বেশী প্রশিক্ষণ ও সংশোধনের মুখাপেক্ষী। দৃষ্টি আকর্ষণে তারা সংশোধিত না হলে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে তাদের বহিষ্কার করা প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.org

ছাত্ররা বিভিন্ন কারণে অনুপস্থিত থাকে

* অসুস্থতাঃ সাধারণত ছোট শিশুরা পুনঃ পুনঃ অসুস্থ হয়ে পড়ে আর অনুপস্থিত থাকে। এতে শিক্ষা গ্রহণ বিঘ্নিত হয়।

* পারিবারিক কাজঃ বিশেষত পরিবার সদস্যদের অসুস্থতা, মেহমানের আগমন, দোকান বাজার করার প্রয়োজনীয়তা এবং মেয়েদের পারিবারিক কাজে জড়িত হওয়া।

* মাতাপিতার অসচেতনতা এবং সন্তানাদির শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা।

* বাড়ী থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব অধিক হওয়া আর পথে আকর্ষণীয় কাজের সুযোগ থাকা।

* মৌসুমের প্রতিকূলতাঃ বৃষ্টি অথবা অত্যধিক শীত পড়া।

* বাড়ীর কাজ (Home work) করতে না পারা।

* পরিবারে, বাড়ীতে, পাড়ায় বা মহল্লায় বিশেষ অনুষ্ঠানাদি থাকা।

* ছাত্র বা শিক্ষকের অসদাচরণ ইত্যাদি।

উপস্থিত থাকার অভ্যাস সৃষ্টির উপায়

* ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের উপস্থিতি ও সময়ের মূল্যের গুরুত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত করানো আর অন্যথা করলে যথাসময়ে পাকড়াও করা।

* প্রতিষ্ঠান প্রধান নিজে উপস্থিতি ও সময়ানুবর্তিতার ব্যাপারে সর্বোচ্চ আদর্শ পেশ করবেন।

* সুনির্দিষ্ট সময়ে ঘন্টা বাজানোর ব্যবস্থা করবে। এই ঘন্টা বাজানোতে ছাত্ররা যেন সতর্ক হতে পারে। শিক্ষকগণ ঘন্টার সাথে সাথে শ্রেণীতে পৌছার কাজে অভ্যস্ত হতে হবে।

* ছাত্র শিক্ষক উভয়ের হাজিরা খাতা যথাযথভাবে তৈরী করতে হবে। শিক্ষকবৃন্দ হাজিরা খাতায় দস্তখতের সাথে আগমন সময়ও নোট করবেন।

* শ্রেণী ভিত্তিক উপস্থিতি গ্রহণের পূর্বে সামগ্রিক উপস্থিতি নেয়ার ব্যবস্থা করবে, যেন সেখানে সকল ছাত্র শিক্ষকের উপস্থিতির ব্যবস্থা থাকে। ছাত্রদের শ্রেণী ও উচ্চতার ক্রমানুসারে দাঁড় করাবে। তবে এখানে খাতায় উপস্থিতি রাখার আবশ্যকতা নেই। শ্রেণী শিক্ষকগণের মোটামুটিভাবে এক নজরে দেখে নেয়াই যথেষ্ট। অলসতা ও অসচেতনতার কারণে দেরীতে উপস্থিত হওয়ার অভ্যস্তদের

www.nagorikpathagar.org

সংশোধনের জন্যে এ হচ্ছে অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি। প্রত্যেকে সামগ্রিক প্রেসার অনুভব করে এবং সমালোচনা ছাড়াই লজ্জিত হয় আর ভবিষ্যতের জন্যে সংশোধিত হয়।

* আবেদন বা অনুমতি পত্রের মাধ্যমে ছুটি নেয়ায় অভ্যস্ত বানাবে এবং আবেদনপত্র বা দরখাস্ত ছাড়া অনুপস্থিত থাকা বা বিলম্বে পৌছার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

* উপস্থিতিতে রেকর্ড সৃষ্টিকারী ছাত্র বা শ্রেণীকে উৎসাহিত করবে। সে জন্যে নম্বর, সনদ, শীল্ড অথবা পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তেমনিভাবে অযৌক্তিক অনুপস্থিতির কারণে অসদাচরণ, জরিমানা এবং পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ বা প্রমোশন স্থগিত রাখার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

* সময় সময় শিক্ষার্থীদের ডাক্তারী পরীক্ষা করানোর মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়ার প্রতি যথাসময়ে মাতাপিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

পলায়নী মনোভাবের শিশু

কোন কোন শিশু প্রথম থেকেই শিক্ষা গ্রহণ থেকে পলায়ন করে থাকে। এটা অত্যন্ত বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। শিক্ষা গ্রহণ থেকে পলায়নের কারণ সমূহ হচ্ছেঃ

* শিক্ষকের কঠোরতা, দয়ামায়াহীনতা ও অসদাচরণ। যদি শিক্ষক দয়াবান হন আর শিশুদের ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাহলে শিশু শিক্ষার পথে অসংখ্য কষ্ট সহ্য করতে তৈরী থাকে। কিন্তু শিক্ষকের ব্যবহার খারাপ হলে তারা মোটেই টিকে উঠে না।

* শিশুর সম্মুখে প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষকের অবমাননা করা।

* বিদ্যালয়ের পরিবেশ আকর্ষণীয় না হওয়া। অর্থাৎ যেখানে শিশুদের খেলাধূলা, গঠনমূলক কাজকর্ম এবং শিক্ষা সফরের সুযোগ না থাকে।

* সহপাঠীদের অশোভনীয় আচরণ, মারামারি, হাতাহাতি, বকাবকি, হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা ইত্যাদি। এই আচরণ তাদের দৈহিক ও নৈতিক ক্রটির কারণেই হোক অথবা মাতাপিতার আর্থিক দৈন্যতার কারণেই হোক।

* পরিবার অথবা পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে এমন সব সংগী সাথী থাকা যারা কেবল খেলাধূলা, গফ সফ ও দৌড়াদৌড়িতে মত্ত থাকে।

www.nagorikpathagar.org

* অসুস্থতা অথবা দীর্ঘদিন শ্রেণীতে নিজের স্থান থেকে নীচে নেমে যাওয়া।

* মেধা বা দেহের দুর্বলতার কারণে শ্রেণীতে অচল প্রমাণিত হওয়া।

* সন্তানাদির শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে মাতাপিতার উদাসীনতা।

* মেধাবী ছাত্রগণ শ্রেণী থেকে তাদের গতি মোতাবেক কাজ না পাওয়া।

* অমনোযোগিতা অথবা পারিবারিক কাজের দরুন বাড়ীর কাজ সমাধা করতে অথবা পাঠ তৈরী করতে অপারগ হওয়া।

সঠিক কারণ অন্বেষণ করে যথার্থ সংশোধনের জন্যে পুরো চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ না করুন কোন শিশু শিক্ষক বা বিদ্যালয়ের অবহেলার দরুন যদি দ্বীনি শিক্ষা থেকে পালাতে থাকে, তাহলে কতই না বিপদের কারণ হতে পারে!

স্থূল বুদ্ধি

প্রত্যেক শ্রেণীতে এমন কিছু শিক্ষার্থী থাকে যারা শ্রেণীতে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সমপর্যায়ে চলতে পারে না। তাদের বলা হয় স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন। এমনি তো প্রায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীই সাময়িকভাবে কোন কোন বিষয়ে মন্থরতা বা স্থূলবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকে। এ হচ্ছে প্রকৃতিগত ব্যাপার। এ জন্যে কোন উদ্বেগের কারণ নেই। এটা সামান্য সতর্কতা দ্বারা সত্বর বা কিছু বিলম্বে বিদূরিত হয়ে থাকে। তবে শিক্ষার্থী নিজের শিক্ষক, সহপাঠী অথবা পরিবার সদস্যদের কারো ভৎর্সনার শিকার হলে, তাদের প্রতিকূল আচরণে বা অন্য কোন কারণে নিজেকে হেয় মনে করলে অথবা নিরাশ হলে অন্য কথা। এ থেকে শিশুদের সর্বদা রক্ষা করা কর্তব্য। অবশ্য কিছু কিছু শিশু বাস্তবেই মেধাহীন ও স্থূল বুদ্ধির হয়ে থাকে আর পাঠ্য বিষয়ে তারা সাধারণ ছাত্রদের সমমানে চলতে পারে না। আর কোন কোন শিশু ভাল মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন বিষয়ে পিছিয়ে থাকে। এ জাতীয় শিশুদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট দৃষ্টি দেয়া উচিত।

মেধাহীন ও মন্থর মেধার শিশুদের স্থূলবুদ্ধি তো তাদের স্মৃতির দুর্বলতা ও স্বল্প বোধগম্যতার কারণে হয়ে থাকে। তাদেরকে স্ব স্ব গতিতে এগিয়ে নেয়াই সমীচীন হবে। সে জন্যে পাঠ্য তালিকা, শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং ক্লাস রুটীন ইত্যাদিতে বিশেষ লক্ষ্য রাখা চাই। কিন্তু যে সব শিক্ষার্থী মেধার দিক থেকে স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোন কারণে স্থূলবুদ্ধি হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে

www.nagorikpathagar.org

প্রথমে স্থূলতার কারণগুলো খুঁজে বের করতে হবে আর সেগুলো দূরীভূত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

স্থূল বুদ্ধির কারণসমূহ

সাধারণত স্থূল বুদ্ধির কারণগুলো নিম্নরূপঃ

* শিশুদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে না যাওয়া, অনুপস্থিত থাকা, বিলম্বে উপস্থিতি, ক্লাস ত্যাগ করার অভ্যাস– যে কোন কারণেই হোক না কেন।

* শিক্ষকের অশোভনীয় আচরণ, ত্রুটি পূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণের অভাবের কারণে কোন বিষয়ে শিশুদের ঘৃণার উদ্রেক বা নৈরাশ্য এসে যাওয়া।

* শিশুদের বয়স এবং মেধাগত যোগ্যতার বিচার না করে তাদের থেকে অনেক কিছু আশা করা, তাদের ক্ষমতার অধিক বোঝা অর্পণ করা অথবা কোন বিষয়ে যথা নিয়মে শিক্ষাদানে তড়িঘড়ি করা অথবা সময় বাঁচানোর জন্যে যোগ্যতার তুলনায় উর্ধতন শ্রেণীতে ভর্তি করানো।

* মানোন্নয়নে অধিক তাড়াহুড়া করা অথবা অধিক বিলম্ব করা।

* বদলী, রূপ পরিবর্তন অথবা অন্য কোন কারণে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থেকে শিক্ষাদানের পরিবর্তে বার বার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করা।

* শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাড়ীর পরিবেশের মধ্যে গরমিল ও সহযোগিতার অভাব।

* শ্রেণী বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অরুচিকর পরিবেশ– যে কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে মনই বসে না।

* পরিবারে প্রতিকূল পরিবেশ। যেমন– মাতাপিতার পারস্পরিক সম্পর্কে অসন্তোষ ও উত্তেজনা, অসুস্থতা, অজ্ঞতা, দুঃখ বেদনা, দারিদ্র, বেকারত্ব, হীনতা অথবা কপর্দকহীনতার কারণে তাদের শিশুদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতে না পারা অথবা তাদের সাথে যথাযথ সম্পর্ক ও আচরণ করতে অক্ষম হওয়া।

* অসৎ সংগের কারণে শিশুর শিক্ষার পরিবর্তে অন্য কোন ব্যস্ততায় নিজের মেধা ও শক্তি ব্যয় করা।

* শিশুর শ্রবন বা দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি।

www.nagorikpathagar.org

স্থূল বুদ্ধির প্রতিকারঃ

স্থূল বুদ্ধি এমন এক মারাত্মক ব্যাধি যার যথাসময়ে চিকিৎসা না করলে শিশু শিক্ষার আলো থেকে দূরে থাকে এবং তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মাতাপিতা ও শিক্ষকমন্ডলীর অসতর্কতার কারণে অনেক সময় ভাল ভাল শিশুরাও এই মারাত্মক ব্যাধির শিকার হয়ে ক্রমে ক্রমে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে শিশুদের পরীক্ষা করা উচিত এবং স্থূলতার চিহ্ন দেখা মাত্রই যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করে যথাসময়ে বিদূরীত করার পদক্ষেপ নেয়া চাই। যদি শিক্ষক অথবা মাতাপিতার কোন অশোভন আচরণ সে জন্যে দায়ী হয় তবে অতিসত্ত্বর নিজের আচরণ ঠিক করে নিতে হবে। যদি বিদ্যালয় অথবা বাড়ীর পরিবেশ প্রতিকূল থাকে তবে তাকে অনুকূলে আনার চেষ্টা করতে হবে। দৃষ্টি শক্তি বা শ্রবন শক্তির ক্রটি থাকলে তা চিকিৎসা করাতে হবে। মোট কথা যে কারণই থাকুক না কেন তা অতিসত্ত্বর বিদূরীত করতে হবে। তাহলে আশা করা যায় যে সময় মত উদ্দেশ্য সফল হবে। কিন্তু যদি এ রোগ কোন পর্যায়ে পুরাতন হয়ে পড়ে তাহলে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।

* স্থূল বুদ্ধির শিশুদের একটা স্বতন্ত্র দল বানিয়ে তাদের গতিতে চালানোর জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাদের শ্রেণীটা স্বতন্ত্র হলে তো ভাল কথা না হয় অন্যান্য শিশুদের তুলনায় তাদের প্রতি অত্যধিক দৃষ্টি দিতে হবে। যথাসম্ভব স্বতন্ত্র দৃষ্টি দিয়ে তাদের সহযোগিতা করে সংগে নিয়ে চলার চেষ্টা করবে।

* তাদের পুনরালোচনা ও অনুশীলনের বেশ সুযোগ দিবে আর বিদ্যালয়ের সময়ের বাইরেও তাদের পেছনে কিছু সময় লাগাবে।

* তাদের এমন অনুশীলনী দেবে যা তারা স্বল্প মেহনতে সমাধা করতে সক্ষম হয়। এভাবে তাদের সাহসও বাড়বে আর অধিকতর মনোনিবেশ সহকারে কাজ করার প্রবনতাও সৃষ্টি হবে।

* পাঠক্রমের ব্যাখ্যার জন্যে অধিক পরিমাণে পাঠোপকরণ, মানচিত্র, মডেল, তালিকা ইত্যাদি ব্যবহার করবে এবং করে শেখার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে।

* পাঠক্রম বহির্ভূত কাজকর্ম, আর্ট ক্রাফট এবং অন্যান্য কাজে এ জাতীয় শিশুরা তুলনামূলকভাবে অধিক আকর্ষণ ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

তাদের মধ্যে এগুলোর বৃদ্ধি করে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা যেতে পারে। এতে নিজেকে হেয় মনে করা ও নৈরাশ্য ভাব কেটে যাবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যকার ঘৃণ্য ভাব দূর হতে থাকবে। উপরোক্ত বিষয়সমূহ অন্য এমন কোন শিক্ষককে দিয়ে পড়ানো ভাল হতে পারে যিনি আরও অধিকতর স্নেহ মমতা দিয়ে শিক্ষা দিতে পারেন।

* এমন শিশুদের যা কিছু শিক্ষা দেয়া হবে তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেবে।

মোট কথা, স্থূল বুদ্ধির শিশুরা আমাদের অধিক মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য। তাদের নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা থেকে বাঁচানোর সর্ব প্রকার সম্ভাব্য চেষ্টা করবে এবং নিজের পক্ষ থেকে পুরোপুরি চেষ্টা করতে হবে যেন তাদের স্থূলতার কারণ আমরা নিজেরা না হই।

অবসাদ

অনেক সময় পর্যন্ত লেখাপড়া অথবা কোন মানসিক বা দৈহিক কাজ করলে দেহে অবসন্নতার ছাপ ফুটে উঠে। শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্ক যেমন যথাযথ কাজে অক্ষম হয়ে পড়ে তেমনি দেহও অধিক কাজের শক্তি হারিয়ে বসে। এটাই অবসাদ। অবসাদ মূলত এক ধরনের সাবধানতা যে বিশ্রাম ছাড়া আর কাজ করা যাবে না।অন্যথায়দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

অবসাদের কারণসমূহ

কাজ করলে দেহের এনার্জি নষ্ট হয়। এই এনার্জি দেহের কোন কোন অংশ জ্বলে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে। ঐসব অংশকে জ্বালিয়ে তাদের এনার্জিতে পরিণত করার কাজ রক্তের সাথে মিশ্রিত অক্সিজেন[১] সমাধা করে থাকে।

কাজেই আমরা দীর্ঘক্ষণ কর্মরত থাকলেঃ

* এনার্জিতে পরিবর্তিত হওয়ার অংশগুলো জ্বলে যায়।

---

১) অক্সিজেন বিশুদ্ধ বায়ুর সেই পঞ্চমাংশে $\frac{১}{৫}$ যার বৈশিষ্ট বস্তুকে জ্বালানোর কাজে সাহায্য করা। শ্বাসের সাথে এই অক্সিজেন অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং রক্তের সাথে মিশে সমস্ত দেহকে উত্তপ্ত রাখে।

www.nagorikpathagar.org

* রক্তে মিশ্রিত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়, আর অধিকতর এনার্জি সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন অনুপাতে পাওয়া যায় না।

* জ্বলে যাওয়া বিষাক্ত জঞ্জাল রক্তে মিশ্রিত হয়ে সারা দেহে ছেয়ে যায়। ফলে দেহের সাথে মস্তিষ্কও প্রভাবিত হয় এবং যে যে জোড়ায় উক্ত জঞ্জাল জমাটবদ্ধ হয়ে থাকে সেখানে ব্যথা লাগতে থাকে।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিকার না হবে, আরো কাজ করা অধিকতর ক্ষতির কারণ হতে পারে। কিন্তু তার অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে অবসাদের ভয়ে অধিক পরিশ্রম করা যাবে না। অবসন্নতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। শিশুরা অধিক পরিশ্রম করলে ক্ষুধাও অধিক পরিমাণে অনুভব হয়, খাদ্য ভালভাবে হজম হয়, গভীর নিদ্রা আসে আর দেহের যে সব অংশ জ্বলে এনার্জির সঞ্চার করে সে সব অংশের স্থলে নতুন অংশ জন্ম নেয়– যা হয় অত্যধিক শক্তিশালী আর দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

অবসন্নতার প্রকারভেদ

অবসন্নতা দু' ধরনের হয়ে থাকে– ১) মানসিক ২) দৈহিক।

মানসিক কাজের দ্বারা মস্তিষ্ক অবসন্ন হয়ে পড়ে। পরিণামে মানসিক অবসাদ হয় এবং দৈহিক কাজ অথবা খেলাধূলা করলে দেহ অবসন্ন হয়ে পড়ে আর দৈহিক অবসন্নতা দেখা দেয়। দৈহিক বা মানসিক যে কোন একটির অবসন্নতা বেড়ে গেলে অন্যান্য বহু ধরনের অবসন্নতা দেখা দেয়। দেহ যদি অবসাদ গ্রস্থ হয়ে ভেঙে আসে তাহলে মস্তিষ্কও যথার্থ কাজ করতে পারে না। মানসিক অবসাদ ও দু'প্রকার– ১) প্রকৃত অবসাদ ২) সৃজিত অবসাদ অথবা বিষণ্নতা ও অপারগতা।

সৃজিত অবসাদ প্রকৃত পক্ষে অবসাদই নয়। বরং কাজটি আকর্ষণীয় না হওয়ায় তাতে মন বসে না আর মনে হয় যেন অবসাদ এসেছে। কোন মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারলে অধিকতর কাজ করা সম্ভব হবে।

অবসাদের চিহ্নসমূহ

নিম্নলিখিত চিহ্ন দেখা গেলে বুঝতে হবে যে শিশুর অবসাদ এসেছে। তখন অবসাদের যথাযথ চিকিৎসা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

www.nagorikpathagar.org

দৈহিক আলামত

* দেহে মন্থরতা ও অলসতা এবং গতিহীনতা।

* চেহারা বিবর্ণ ও দুর্বল।

* জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা অনুভূত হওয়া, বার বার হাই তোলা, ঝিমানো।

* অনিচ্ছাকৃত নড়চড় প্রকাশ পাওয়া।

* মাথা নুয়ে পড়া, মেরুদন্ড ঝুঁকে যাওয়া, দৃষ্টি নিবদ্ধ না হওয়া, অথবা দাঁড়াতে গিয়ে ঠেক লাগানোর চেষ্টা করা।

মানসিক আলামত

* মনযোগ বার বার বিনষ্ট হওয়া।

* স্মৃতি হ্রাস পাওয়া।

* প্রশ্ন বুঝতে বা উত্তর দানে বার বার ভুল করা।

* বুঝিয়ে দিলে না বুঝা, চিন্তা-গবেষণা ও স্মরণ হ্রাস।

* বার বার বিরক্তিভাবের উদ্রেক হওয়া, কোন শব্দে আতঙ্কিত হওয়া।

অকস্মাৎ অবসন্নকারী অবস্থা

কোন কাজ যে সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন করা হয় উক্ত কাজের উপর সেই সময়ের একটা অসাধারণ প্রভাব পড়ে থাকে। মৌসুম আনন্দময় ও পরিবেশ শান্ত থাকলে, কাজটা আকর্ষণীয় এবং মনটা কাজে বসলে কাজটি যেমন অত্যন্ত মনোনিবেশের সাথে করা হয় তেমনি অনেকক্ষণ কাজ করলেও কোন প্রকার অবসাদ অনুভব হয় না। পক্ষান্তরে নিম্নোক্ত অবস্থায় শিশুরা সত্বর অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং মনযোগ, একাগ্রতা ও মনোনিবেশ সহকারে কাজ করার পরিবর্তে অবসাদ, ঘৃণা ও বিমর্ষ ভাব প্রদর্শন করে থাকে।

* ঋতুর কাঠিন্য, ভীষণ শীত, অত্যন্ত গরম, প্রখর রোদ্র, বর্ষার গরম, কুয়াশা ইত্যাদি।

* পরিষ্কার আলো অথবা নির্মল ও খোলা বাতাসের অভাব।

* অত্যধিক অথবা ক্রমাগত হৈ হল্লা, শোরগোল ইত্যাদি।

* অসুস্থতা, অসম খাদ্য, বে-মানান পোষাক, কষ্টদায়ক বাসস্থান এবং প্রতিকূল কক্ষ।

* প্রকৃতিগত চাহিদা অথবা স্বভাবগত কামনা পুরো না হওয়া।

www.nagorikpathagar.org

* মনোযোগ আকর্ষণ না করে পাঠদান শুরু করা, অথবা পাঠ কঠিন হওয়া, আকর্ষণীয় না হওয়া বা বোধগম্য না হওয়া।

* একই ধরনের কাজ সর্বদা একই পদ্ধতিতে আনজাম দিতে থাকা, কারণ এভাবে দেহের একই প্রকারের এনার্জি বের হতে হতে অবসন্নতা ঘিরে ফেলে।

উপরোক্ত কারণসমূহ বিদূরণের চেষ্টা যত বেশী হবে কাজ ততই অধিক পরিমাণে আনজাম পাবে।

অবসন্নতার প্রতিকার

শিশু বাস্তবিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাকে কিছু অবকাশ দেয়া এবং খাওয়ার জন্যে মিষ্টিযুক্ত দ্রব্য সরবরাহ করা আবশ্যক। এতে শিশু নতুন জীবনী শক্তি নিয়ে কার্যরত হতে পারবে। কিন্তু অবসন্নতা অসাধারণ হলে সামান্য অবকাশে কাজ হবে না। বরং তখন পূর্ণ বিশ্রাম ও গভীর নিদ্রার প্রয়োজন। কারণ এভাবেই জ্বলে যাওয়া দেহের অংশের স্থলে নতুন অংশ সৃষ্টি হতে পারে। চা অথবা কফি দিয়ে তো সাময়িকভাবে এনার্জি অনুভব করা যায়, কিন্তু এটা অবসন্নতার প্রকৃত প্রতিকার নয়। বরং এগুলো পান করা এবং তারপর অনেক্ষণ কর্মরত থাকা শিশু তো দূরের কথা বড়দের জন্যেও তা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এগুলোর পরিবর্তে ছোলাবুট ভিজিয়ে খাওয়ানো, আর সামর্থ থাকলে দুধ, দধি, ফলমূল ইত্যাদি অবসন্নতা দূর করতে বেশ সহায়ক হয়ে থাকে।

অবশ্য অবসন্নতা সাধারণ হলে অথবা বিমর্ষতা বা বিরক্তির কারণে শিশু অবসন্ন ভাব দেখালে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

* বিভিন্ন কৌশলে পাঠকে আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা করবে।

* উদ্বুদ্ধকরণ, মনের প্রফুল্লতা, সাহস ও আগ্রহ সৃষ্টি করে কাজ আদায় করা।

* কাজের ধরন পরিবর্তন করবে, অর্থাৎ মানসিক কাজের পরে দৈহিক কাজ, মৌখিকের পরে হাতে কলমে কাজ। পড়ানোর পর লিখানো ইত্যাদি।

* বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনে শিশুদের অনেকক্ষণ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে কাজ করায় অভ্যস্ত করে গড়ে তুলবে।

শিশুদের মনোযোগ সত্বর বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং প্রথম প্রথম একই কাজে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মনোনিবেশ করতে পারে না। তবে তারা শ্রম দানে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে অনেকক্ষণ পর্যন্ত অবসন্নতা অনুভব করবে না।

www.nagorikpathagar.org

ক্লাস রুটীনে অবসন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখা

ক্লাস রুটীন তৈরীর সময় অবসন্নতার প্রতিকারে নিম্নোক্ত বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যকঃ

* কচি শিশুরা বড়দের তুলনায় অতি সত্ত্বর অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিরক্তি ও বিমর্ষতা অনুভব করে। এ জন্যে প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে গ্রীষ্মে ৩০ মিনিট এবং শীতে ৩৫ মিনিট রাখবে। এর বেশী সময় নেয়া যাবে না।

* গ্রীষ্মে মর্নিং স্কুল করবে এবং দুপুর পর্যন্ত শিক্ষাদান কার্য সমাপ্ত করবে। অবশ্য শীতকালে যথারীতি ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত শিক্ষাদানই সমীচীন।

* দিনের প্রথম ভাগে শিশুদের মন তাজা থাকে, এ জন্যে কঠিন বিষয়াদি যেমন- অংক, ভাষা ইত্যাদি প্রথম দিকেই রাখবে। প্রথম ঘন্টায় তো অবসন্ন হয় না সত্য কিন্তু মনোযোগ তো বিক্ষিপ্ত হয় আর শেষের ঘন্টায় তারা অবসন্ন হয়ে পড়ে। এ জন্যে মধ্যবর্তী ঘন্টাগুলো কঠিন বিষয়ের জন্যে নির্ধারিত হওয়া চাই। বিরতির পর শিশুরা পুনরায় নতুন চেতনা লাভ করে থাকে। সুতরাং দ্বিতীয় ঘন্টায় তুলনামূলকভাবে স্বল্প কঠিন বিষয়াদি রাখা যেতে পারে। যেমন- সমাজ বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ইত্যাদি। বাকী ঘন্টাগুলোতে আকর্ষণীয় বিষয়াদি অথবা হাতে কলমে বিষয়াদি বা লেখার কাজ রাখবে। যেমন- ইসলামিয়াত, আর্ট ক্রাফট, বানান, লেখা, রচনা ইত্যাদি।

* বিভিন্ন ঘন্টায় বিষয়াদির এমনভাবে ধারাবাহিকতা রাখবে যেন কাজের ধরন পরিবর্তিত হয় এবং একই ধরনের বিষয় একাধারে না পড়ে। যেমন- মৌখিকের পরে লিখনী, মানসিকের পরে দৈহিক এবং দেখাদেখির পরে হাতে কলমে কাজ আসে। এভাবে অবসাদ কমই হবে।

* বিরতি দ্বারা অবসন্নতা কেটে যায়। এ জন্যে পাঠক্রমের এক তৃতীয়াংশ সম্পন্ন হওয়ার পর দশ মিনিটের একটা সংক্ষিপ্ত বিরতি এবং দুই তৃতীয়াংশ শেষ হওয়ার পর একটা লম্বা বিরতি দেয়া চাই। কচি শিশুরা যদি প্রতি ঘন্টার পর দু' চার মিনিট পেয়ে যায় তবে তাই তাদের জন্যে সমীচীন হবে। একটু উঠা বসা এবং সামান্য ছুটাছুটি, দৌড়ঝাপের মাধ্যমে দেহের বিষাক্ত রক্ত কণিকা ও পরিত্যক্তাংশ রক্ত সঞ্চালনের দ্রুততায় বেরিয়ে যায় আর লম্বা শ্বাস গ্রহণের

www.nagorikpathagar.org

ফলে অক্সিজেনের অভাব পূরণ হয়।

* অবসাদ ও একাগ্রতায় হ্রাস-বৃদ্ধি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পর্যায়েও হয়ে থাকে। সাপ্তাহিক ছুটির পরে যখন শিশু বিদ্যালয়ে আসে তখন ছুটি ভোগ করার কারণে সে প্রফুল্ল মন থাকে কিন্তু ছুটির মোহ তখনো কেটে না উঠায় তার মন পাঠে বসতে চায় না। আর অধিকাংশ শিশুদের তো বিদ্যালয়ে আনতে অনেক জোর লাগে। তাই প্রথম দিন শিক্ষাদান কার্য হালকা ধরনের হতে হবে। সপ্তাহের মধ্যবর্তী পর্যায়ে মনযোগ প্রবল হয় ও একাগ্রতা বেড়ে যায় আর অবসন্নতাও তেমন একটা হয় না। অবশ্য শেষ দিনে অবসন্নতা বেড়ে যাওয়ার কারণে একাগ্রতা ছুটে যায়। আর শ্রমধর্মী কাজে মনও বসে না। এ জন্যে শেষ দিনেও হালকা ও আকর্ষণীয় কাজ হওয়া উচিত। যেমন– পুনরালোচনা এবং শিক্ষার্থীদের সভা অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের কোন উপলক্ষ যেমন– পিকনিক, শিক্ষা সফর, জনসেবা বা পরিচ্ছন্নতা অভিযান ইত্যাদি। শিক্ষাবর্ষ আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই এই অবস্থা হয়ে থাকে। বন্ধের মধ্যে শিশুদের উপর শিক্ষার চাপ না থাকায় খেলার সাথে সাথে তাদের দেহে সবলতা থাকলেও শিক্ষার প্রতি তেমন একটা মন বসে না। সে জন্যে প্রথম দিকে কিছু হালকা ধরনের কাজ দিতে হবে আর অবশ্য পেছনের পাঠের পুনরালোচনার পরে নতুন পাঠ আরম্ভ করতে হবে। অতপর কয়েক মাস খুব পরিশ্রমের মাধ্যমে পুনরালোচনা ও ষান্মাসিক পরীক্ষা নেবে। এর মধ্যেও সংক্ষিপ্ত অবকাশ দেয়া অথবা পিকনিক বা শিক্ষা সফরে নিয়ে যাওয়া চাই। ষান্মাসিক পরীক্ষার পরে বড় অবকাশের মত দু'এক সপ্তাহের ছুটি থাকা চাই। এমনিভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষে যথেষ্ট ছুটি দেয়া উচিত। ছুটি ছাটার ব্যাপারে কোন কোন প্রতিষ্ঠান খুব কৃপণ হয় আর কোন কোনটা হয় বেশ উদার। দু'টোই ভুল। ছুটির ব্যাপারে কৃপণতা যেমন ঠিক নয়, তেমনি বেশী বন্ধ দেয়াও সমীচীন নয়। বিভিন্ন কারণে বন্ধের প্রয়োজন রয়েছে। তবে মধ্যম পন্থাই ভাল।

ক্লাস রুটীন

আবশ্যকতা ও উপকারিতা

শিশু শিক্ষার অনেক কিছুই তাদের ক্লাস রুটীনের উপর নির্ভর করে থাকে। কারণ রুটীনের ফলে–

www.nagorikpathagar.org

* শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদান কার্য সুশৃংখলার সাথে আনজাম পেয়ে থাকে।

* সময়ের অপচয় হয় না, স্বল্প সময়ে বেশ কাজ হয়ে থাকে।

* প্রত্যেক আবশ্যকীয় বিষয় ও কাজের যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় আর কোন কাজ বাকীও পড়ে থাকে না।

* শিক্ষকমন্ডলীর যোগ্যতানুসারে কর্ম বন্টন হয়ে থাকে। ফলে তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে অধিকতর সুবিধা পাওয়া যায়।

* কাজে ভারসাম্য আসে। কারণ এতে শিক্ষকমন্ডলীর রুচীও ঝোঁক প্রবনতা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যথায় সব কাজ তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলে অধিকাংশ শিক্ষক নিজ নিজ রুচীর বিষয় নিয়ে সময় কাটাবে অথচ অনেক জরুরী বিষয় পড়ে থাকবে।

* সময়ানুবর্তিতা, সময়ের মূল্যবোধ, শ্রম একাগ্রতা এবং ধারাবাহিকতার সাথে কাজ করার অভ্যাস গড়ে উঠে।

* শিক্ষার্থীরা সময় কাজে লাগাতে পারে, ফলে শৃংখলা ঠিক থাকে। ব্যস্ততার কারণে দুষ্টামী করার অবকাশ পায় না। তাই শাস্তিরও প্রয়োজন হয় না।

* ছাত্র শিক্ষক সবাই জানে যে অমুক ঘন্টায় কি করতে হবে। এতে আবশ্যকীয় প্রস্তুতি প্রথমেই গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

* প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য সকল দায়িত্বশীলের জানা থাকে যে কোন শিক্ষক অথবা কোন শ্রেণীর ছাত্র কোথায় কি কাজে রত আছে।

লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কোন না কোন ধরনের রুটীন থেকে থাকে। সে হিসেবেই উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান কার্য আনজাম দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে খুব কমই আদর্শ স্থানীয় দেখা যায়। কোথায়ও দেখা গেলেও তদানুসারে খুব কমই কাজ চলে থাকে। কারণ–

* খুব কম প্রতিষ্ঠানেই প্রয়োজন অনুপাতে পুরো ষ্টাফ থাকে।

* অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের বদলী, রিজাইন, বহিষ্কার, দীর্ঘদিনের অবকাশ দান ইত্যাদি শিক্ষাবর্ষের মধ্যেই চলতে থাকে।

* রুটীন তৈরীর সময় অজ্ঞতা বা দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার কারণে অনেক আবশ্যকীয় দিক অন্তর্ভূক্ত করা হয় না।

যথাসম্ভব এসব বাধা হ্রাস করা উচিত এবং নিম্নোক্ত লক্ষ্যণীয় বিষয়াদি

www.nagorikpathagar.org

সামনে রেখে যথাসম্ভব আদর্শ রুটীন তৈরী করা এবং তদানুসারে কাজ চলা উচিত। তবেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান কার্য অধিকতর ফলপ্রসূ হতে পারে।

* সর্ব প্রথম বিষয়াদি ও কাজ কর্মের একটা তালিকা তৈরী করবে। তারপর সেগুলোর গুণাগুণ, গুরুত্ব, উপকারীতা, সহজ বোধগম্যতা ও কাঠিন্য এবং আকর্ষণীয় ও শুষ্ক হওয়া অনুযায়ী সেগুলোকে শ্রেণী বিভক্ত করবে। যেমন– ইসলামিয়াত সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদী বিষয়। সুতরাং প্রত্যেক বিষয় ও কর্মের মধ্যে তা প্রতিফলিত হতে হবে। তাছাড়া এ বিষয়টিও খুব বিস্তৃত ও ব্যাপক। কারণ এতে কুরআনুল হাকীম বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা, কিছু অংশ মুখস্থ করা, ফিকহ, আকায়িদ, সীরাতুন্নবী, রাসূলদের ও বিশিষ্ট মনীষীদের জীবনী, চরিত্র ও সামাজিকতা ইত্যাদি বিষয়ে আবশ্যকীয় ও সমীচীন প্রশিক্ষণ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তাই এ বিষয়ে সবচাইতে অধিক সময় ও মনোনিবেশ ব্যয় করা চাই। এর পরই হচ্ছে মাতৃভাষা ও অংক শাস্ত্রের স্থান। প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে যদি উপরোক্ত বিষয়দ্বয়ে যোগ্যতা অর্জিত হয় তাহলে অন্যান্য বিষয় সহজ হয়ে যায়। সে জন্যে এ দু'টো বিষয়ে বেশী সময় ব্যয় করা উচিত।

* শিক্ষক মন্ডলীর সংখ্যা, তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা আর তাদের পছন্দনীয় বিষয় ও কর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই।

শিক্ষক মন্ডলীর মধ্যে কর্ম বন্টনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তাঁদের যোগ্যতা ছাত্রদের অধিকতর কাজে আসে। যথাসম্ভব তাদের পরামর্শ মোতাবেক কর্ম বন্টন করা উচিত। তাহলে পুরো আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা সহকারে অর্পিত দায়িত্ব আনজাম দিতে পারবেন। প্রাইমারী শ্রেণীতে এবং পরবর্তী শ্রেণীসমূহে বিষয় ও কাজ অনুপাতে কর্ম বন্টন উপযোগী হয়ে থাকে। প্রাথমিক দু'তিন শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের সাথে ভাল সম্পর্কশীল, সে বিষয়ে অভিজ্ঞ ও স্বতন্ত্র স্বভাবের শিক্ষক মন্ডলীর উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা চাই। প্রাইমারী পর্যায়ের শিক্ষক মন্ডলীর মধ্যে এমন সব যোগ্যতা অবশ্যই থাকা চাই যেন তিনি একই শ্রেণীর অনেক বিষয় পড়াতে পারেন। সামান্য পরিশ্রম করলে প্রত্যেক শিক্ষকই এতটুকু যোগ্যতা হাসিল করতে পারেন। শ্রেণী বেশী বড় হওয়া ঠিক নয়। কারণ, তাতে ছাত্রদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়াও সম্ভব হবে না এবং তারা যথোচিত প্রশিক্ষণও পাবে না। প্রাইমারী পর্যায়ে ২৫/৩০ জনের অধিক ছাত্র থাকা ঠিক নয়। শিক্ষকমন্ডলীর সংখ্যা অন্তত শ্রেণীর সংখ্যার সমান হতে হবে। যেন একজন শিক্ষক এক ঘন্টায় একটি শ্রেণীতে পড়াতে পারেন। কোন সময় যদি

www.nagorikpathagar.org

একই শিক্ষকের উপর দুটো শ্রেণীর দায়িত্ব দেয়ার বাধ্যবাধকতা দেখা দেয়, তাহলে সে সব শ্রেণী মিলিয়ে নেবে যাদের বয়স ও যোগ্যতার পার্থক্য বেশী না থাকে। তাহলে এক সাথে নেয়া কঠিন হবে না। কিন্তু প্রাথমিক দুটো শ্রেণীর সাথে অন্য কোন শ্রেণীতে মিলিয়ে নেয়া কিছুতেই সমীচীন নয়। কারণ তাদের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে।

* অবসন্নতা ও একাগ্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখাঃ বিদ্যালয় আরম্ভের সময় শিশুদের অবসন্নতা তো থাকে না কিন্তু একাগ্রতা এদিক সেদিক বিক্ষিপ্ত থাকে। এ জন্যে তৎক্ষণাৎ যথারীতি শিক্ষাদান ফলপ্রসূ হয় না। সে জন্যে প্রথম ৩০ মিনিট নিম্নোক্ত কাজে ব্যয় করা যেতে পারে।

সর্ব প্রথম প্রস্তুতি ঘন্টা বাজাবে যাতে সময় ছাত্র সচেতন হয়ে নিজ কাজ সংক্ষেপ করে দেয়। পাঁচ মিনিট পরে দ্বিতীয় ঘন্টা বাজার সাথে সাথে দেহের উচ্চতানুসারে শ্রেণী ভিত্তিক সারিতে প্রতিষ্ঠানের মাঠে সমস্ত ছাত্র দাঁড়িয়ে যাবে। সকল শিক্ষকও সেখানে উপস্থিত থাকবে। একজন শিক্ষক দশ মিনিট সময় হালকা ধরনের পি, টি অথবা ড্রিল করাবে। তৎপর প্রত্যেক শ্রেণী শিক্ষক নিজ নিজ শ্রেণীর ছাত্রদের দেহ ও পোষাকের পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করবে। তারপর হামদ অথবা সামষ্টিক সঙ্গীত সশব্দে পড়াবে। সর্বশেষে জরুরী নির্দেশ বা ঘোষণা দেয়ার পর শ্রেণী ভিত্তিক সারিতে নিরবতা সহকারে শ্রেণীতে ছাত্রদের পাঠিয়ে দেবে। সেখানে তাদের শ্রেণী শিক্ষক হাজিরা ডেকে যথারীতি ক্লাসের শিক্ষাদান কাজ আরম্ভ করবে। এভাবে এই আবশ্যকীয় কাজ আনজাম পাবে, অন্যদিকে মনোযোগ আকর্ষণের সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে।

প্রাইমারী পর্যায়ের ছাত্রদের মনোযোগ বার বার বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আর তারা সত্ত্বর অবসন্নও হয়ে পড়ে। সুতরাং পিরিয়ড (ঘন্টা) গ্রীষ্মে ত্রিশ মিনিট এবং শীতকালে পঁয়ত্রিশ মিনিটের অধিক লম্বা হবে না। প্রথম তিন পিরিয়ড শিশুরা প্রফুল্ল মন থাকে। তখন তাদের ইসলামিয়াত, বাংলা ও অংক পড়ানো উচিত। অতপর সামান্য বিরতি দিয়ে তাদের সতেজ মন করে নেবে। তারপর দু'পিরিয়ড পড়ানোর পর লম্বা বিরতি দিতে হবে যাতে শিশুরা কিছু খেয়ে দেয়ে যোহরের নামায আদায় করে সতেজ মনে আরও কিছু কাজ করতে পারে।

* পরিবর্তন করার প্রতি লক্ষ্য রাখাঃ কাজ করলে একঘেঁয়েমি ও অবসন্নতা আসে, এ জন্যে ছাত্র শিক্ষক উভয়ের দিক থেকে পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখা চাই। একজন শিক্ষক একই শ্রেণীতে একাধারে দু'তিন পিরিয়ডের অধিক থাকবে না।

www.nagorikpathagar.org

আর একই বিষয় অথবা এক জাতীয় বিষয় বা কাজও এভাবে রাখবে না বরং পড়ার সাথে লিখা, মৌখিকের সাথে হাতে কলমে এবং কঠিন বিষয়ের পরে সহজ বিষয় রাখবে। শিশুদের স্থান ও নিজেদের নড়াচড়ার সুযোগ দিতে হবে। একই ধরনে বেশীক্ষণ বসে থাকলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব্যথা আসে আর অবসন্নতা অনুভূত হয়। আর্ট ক্রাফট, তিলাওয়াত, কিরাত ইত্যাদির জন্যে স্বতন্ত্র কামরা থাকলে শিশুরা নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে সেখানে যাবে। এতে তাদের মধ্যে কর্ম প্রেরণা ও সজীবতার অনুভূতি সৃষ্টি হবে। এভাবে সৃষ্টি অবলোকন, ড্রিল এবং হাতে কলমে কাজের জন্যে মাঠে গেলে প্রফুল্লতা আসে।

* শিক্ষকের জন্যে ঘন্টা খালি রাখাঃ প্রত্যেক শিক্ষকের জন্যে অন্তত এক ঘন্টা করে খালি রাখতে হবে। এতে কয়েকটি উপকারিতা আছে।

১) ঘটনাক্রমে কোন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে তার পিরিয়ড চালানো যাবে। এভাবে ছাত্রদের অভিযোগও থাকবে না আর তারা বিশৃংখলা থেকে সংরক্ষিতও থাকবে।

২) শিশুদের লেখা সম্পর্কিত কাজের পরীক্ষা এবং এ জাতীয় বিভিন্ন রেকর্ড পত্র করার জন্যে শিক্ষক সময় পাবে। যদি স্টাফ কম থাকে, তবে বাস্তব কাজ, খেলাধূলা, আর্ট ক্রাফট ইত্যাদি দুটো শ্রেণীকে একত্রে মিলিয়ে একজন শিক্ষকের তত্বাবধানে দিয়ে দিবে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষককে শেষ ঘন্টায় ছুটি দিয়ে এবং প্রধান শিক্ষককে কিছু পিরিয়ড দিয়ে অন্যান্য শিক্ষকের ঘন্টা খালি করার চেষ্টা করবে।

* গন্ডগোল ও হৈ চৈ শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখাঃ বিভিন্ন শ্রেণীর জন্যে পৃথক কক্ষ রাখাই উত্তম। এতে হৈ চৈ শব্দ হওয়ার আশংকা থাকবে না। কিন্তু সে সুযোগ না থাকলে ঘন্টার ধারাবাহিকতা এমনভাবে রাখবে যেন সশব্দে পড়ানোর বিভিন্ন শ্রেণীর বিষয়গুলো একই পিরিয়ডে না রাখা হয়। যেমনঃ তিলাওয়াত, কিরাত, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়। অন্যথায় গন্ডগোলও হবে আর হৈ চৈ এর কারণে মনোযোগও আকর্ষিত হবে না। এমতাবস্থায় এক শ্রেণীতে সশব্দে শিক্ষাদান কাজ চলতে থাকলে অন্য শ্রেণীতে অংক, ড্রইং অথবা লেখার কাজ হওয়া চাই।

* পুনরালোচনা ও পরীক্ষা করাঃ পুনরালোচনার জন্যে সপ্তাহের শেষ দিন নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ শেষ দিন পর্যন্ত অবসন্নতা বেড়ে যায় আর নতুন পাঠের জন্যে মেধা প্রস্তুত থাকে না। আর পরীক্ষা করার কাজ সর্বদা সপ্তাহের

www.nagorikpathagar.org

প্রথম দিনে রাখা চাই, যেন সাপ্তাহিক ছুটিতে শিশুরা প্রস্তুতি নিতে সুযোগ পায়।

* রুটীন হবে এমন যেন ছাত্র শিক্ষকের তা মুখস্থ হয়ে যায়। তাহলে তাদের দৈনিক ও প্রতি ঘন্টায় তা দেখার প্রয়োজন হবে না। যে বিষয় প্রথম দিন যে ঘন্টায় পড়বে তা যেন পুরো সপ্তাহে সেই ঘন্টায়ই পড়ে। যদি কোন বিষয়ে প্রতিদিন ঘন্টা না থাকে বরং সপ্তাহে ২/৩ ঘন্টা থাকে তাহলে সে বিষয় যেন একাধারে না রাখা হয়। যেমন– ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়। কারণ একাধারে ২/৩ দিন থাকলে লম্বা বিরতির কারণে ভুলে যাওয়ার আশংকা থাকে। এ জাতীয় বিষয় সপ্তাহে একদিন করে অথবা দু'দিন করে বিরতি সহকারে রাখা যেতে পারে।

* প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ক্রিয়াকান্ড থাকে এবং ছাত্র শিক্ষকের উচিত নিজেদের কাজকর্মকে প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল রাখা। তবুও রুটীন তৈরীর সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যেন অধিকাংশ ব্যক্তি তা অনুসরণে অসুবিধার সম্মুখীন না হয় আর নাস্তা, খাদ্য, নামায, খেলাধূলা ইত্যাদি রুটীন বহির্ভূত কাজ কর্ম ও বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে থাকে। তেমনিভাবে কুরআন হাকীমের শিক্ষা যথাসম্ভব প্রথম ঘন্টায় অথবা লম্বা বিরতির পরে রাখা চাই। তাহলে শিশুদের ওজু করতে কষ্ট ভোগ করতে হবে না আর ওজু করে পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠতে সহজ হবে।

* শিশুদের সমাবেশ, শিক্ষা সফর ও পিকনিকঃ এ সবের জন্যেও সপ্তাহের শেষ দিনটি সমীচীন হবে। সমাবেশের জন্যে প্রতি ঘন্টা পাঁচ মিনিট হ্রাস করে দেবে আর শেষ ঘন্টা বাতিল করে কমপক্ষে দেড় ঘন্টার প্রোগ্রাম তৈরী করবে। এতে শিশুরা বক্তৃতা, কবিতা, কাহিনী ও কৌতুক ইত্যাদি পেশ করবে। এভাবে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্যেও এ দিনটিই উপযুক্ত। কারণ এ দিনের পর দিন বিশ্রামের অবকাশ পাওয়া যাচ্ছে।

* নিজ প্রতিষ্ঠানের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখাঃ অন্য প্রতিষ্ঠানের রুটীন যতই উৎকৃষ্ট ও উন্নত হোক না কেন, তাকে হুবহু অনুকরণ করা আরেকটি প্রতিষ্ঠানের জন্যে কোন ক্রমেই উপকারী নয়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে নিজের অবস্থা, প্রয়োজনীয়তা ও নিজ শিক্ষক মন্ডলীর সংখ্যা ও যোগ্যতা এবং নিজস্ব ঘরের একোমোডেশনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নিজেদের রুটীন নিজেরাই তৈরী করবে।

www.nagorikpathagar.org

* মোট তিনটি রুটীন থাকা চাইঃ

১) পুরো প্রতিষ্ঠানের সাধারণ রুটীন–এর এক কপি প্রধান শিক্ষকের নিকট থাকবে এবং দ্বিতীয় কপি থাকবে নোটীশ বোর্ডে। এই রুটীনটা এমন হবে যেন যে কেউ তা দেখে বলতে পারেন যে কোন ঘন্টায় কোন শিক্ষক কোন শ্রেণীতে কি বিষয় পড়াচ্ছেন এবং তাদের শ্রেণী শিক্ষকই বা কে আছেন এবং প্রতিষ্ঠানে কি ধরনের কাজ হচ্ছে।

২) শ্রেণী ভিত্তিক বিস্তারিত রুটীনঃ প্রত্যেক শ্রেণী শিক্ষক সাধারণ রুটীন থেকে নিজ অংশ কপি করে নিজের শ্রেণীতে লাগিয়ে দেবে ও ছাত্রদের নোট করিয়ে দেবে। শেখা বিষয় দেখে নেয়া, বাড়ীর কাজ দেয়া এবং পাঠ্য তালিকা বহির্ভূত কাজও এতে সন্নিবেশিত থাকবে।

৩) শিক্ষক অনুযায়ী রুটীনঃ এতে দেখানো হবে প্রত্যেক শিক্ষক সপ্তাহে কোন কোন শ্রেণীতে কি কি বিষয় শিক্ষা দেন আর কার ঘন্টা খালি থাকে এটাও থাকবে প্রধান শিক্ষকের দপ্তরে। প্রত্যেক শিক্ষক নিজের বিষয় নিজের ডায়েরীতে তুলে নিবে।

রেজিস্টার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র

প্রত্যেক সুশৃংখল প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রেজিস্টার ও রেকর্ড ফাইল সংরক্ষণ করতে হয়। এগুলোতে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রেকর্ড রাখা হয়। এগুলো রাখা বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত জরুরী।

প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

* এগুলোর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও অগ্রগতি অনুমান করা যায়।

* শিক্ষক ও ছাত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

* প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতার ধারণা লাভ করা যায়।

* প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয় ইত্যাদির সম্পর্কে জানা যায়।

* প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণ, শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্রদের অভিভাবকবৃন্দ ছাত্রদের উপস্থিতি, পরীক্ষার ফলাফল, অগ্রগতি ইত্যাদির অনুমান হয়ে থাকে।

* প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দায়িত্বশীলদের প্রতিক্রিয়া, নির্দেশাদি, উপদেশ ইত্যাদি

www.nagorikpathagar.org

জানা যায়।

* প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও কল্যাণের জন্যে চিন্তা করা ও ভবিষ্যতের জন্যে পরিকল্পনা তৈরীতে সাহায্য পাওয়া যায়।

* ছাত্রদের ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, উন্নতি ও শ্রেণীবদ্ধ হওয়া সহজ হয়।

লক্ষ্যণীয় বিষয়াদি

রেজিস্টার ও ফাইল রাখার ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

* এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে করে অফিসিয়াল কাজ অতি স্বল্প পরিমাণে করার প্রয়োজন থাকে।

* কেবল অবশ্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদিই সংরক্ষণ করবে। যে সব ছাড়া কাজ চলতে পারে, সে সবের পেছনে সময় ও সামর্থ ব্যয় করা অবৈধ ও অযৌক্তিক। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক মন্ডলীর সময় এমন সব কাজে ব্যয় করানো হয় যে সব কাজের প্রদর্শনী ছাড়া কোন উপকারিতা নেই। এ সময়টা যদি কোন দুর্বল ছাত্রের পেছনে লাগানো যেতো তবে তা বেশ ফলপ্রসূ ও উপকারী প্রমাণিত হতো।

* অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে রেকর্ড সংরক্ষণ করা চাই। বিশুদ্ধভাবে পুরো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত যেন কোন প্রকার অস্পষ্টতা না থাকে এবং এগুলোর উপর পুরো ভরসা রাখা সম্ভব হয়।

* রেকর্ড সংরক্ষণের জন্যে শিক্ষকমন্ডলীর সময় যেন এ পরিমাণ না লাগানো হয় যাতে শিক্ষাদান কার্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ জাতীয় কাজের জন্যে দৈনিক দু'এক পিরিয়ড সময় বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। মাসিক রেকর্ড সংরক্ষণেও রেজিস্টার পূরণ করার কাজে মাসের শেষ দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ছাত্রদের ছুটি দিয়ে দিবে।

* প্রত্যেক কাজের জন্যে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র রেজিস্টার রাখবে। এতে প্রয়োজনে যথাসময়ে আবশ্যকীয় বিষয়াদি জানা যাবে।

* বিষয়াদির সন্নিবেশন যথাসময়ে হওয়া আবশ্যক। এতে বিলম্বের অবকাশ রাখবে না। অন্যান্য এমন অপূর্ণাঙ্গ রেকর্ড সংরক্ষণের উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়ে পড়বে।

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেঃ

১) ভর্তি রেজিস্টার

এটা অত্যন্ত জরুরী রেজিস্টার। এতে ভর্তিকৃত ছাত্রদের বিস্তারিত তথ্য থাকে। যেমন– ভর্তির ক্রমিক নং, ছাত্রের নাম, জন্ম তারিখ, মাতাপিতার নাম ও পূর্ণ ঠিকানা, অভিভাবকের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা (পিতা ছাড়া অন্য কেহ হলে) ধর্ম, পিতা/অভিভাবকের পেশা, যে শ্রেণীতে ভর্তি হলো, প্রত্যেক শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণের তারিখ, বিদ্যালয় পরিবর্তনের তারিখ, আচার আচরণ ইত্যাদি।

এই রেজিস্টারের সকল তথ্য যথাসময়ে অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে সংরক্ষণ করা চাই।

২) ছাত্রদের উপস্থিতি রেজিস্টার (হাজিরা খাতা)

এ হচ্ছে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্টার। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সংখ্যা কম হলে তো কেবল একটা রেজিস্টারই যথেষ্ট। অন্যথায় প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে স্বতন্ত্র রেজিস্টার থাকা চাই। হাজিরা খাতা সংরক্ষণ করা ও যথারীতি হাজিরা নেয়ার দায়িত্ব শ্রেণী শিক্ষকের উপর ন্যস্ত। হাজিরা যথাসময়ে হতে হবে। অনুপস্থিতি অথবা বিলম্বে উপস্থিতির কারণে ছাত্রদের জিজ্ঞাসাবাদ করা চাই এবং তাদের অভিভাবকের সত্যায়িত আবেদন পত্র জমা দেয়ার অভ্যস্ত বানাবে। কোন কোন বিদ্যালয়ে মাসিক বেতনের হিসাব ও অত্র রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হয়। এসব অন্তর্ভূক্তি অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে করা চাই এবং দৈনিক যে পরিমাণ বেতন ফিস পাওয়া যাবে তা ক্যাশিয়ারের হাতে জমা দেবে। প্রত্যেক মাসের শেষে প্রত্যেক ছাত্রের পুরো মাসের উপস্থিতির হিসাব এবং পূর্ববর্তী মাসের হাজিরা মিলিয়ে এবং বেতনের অবস্থা লিপিবদ্ধ করে প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর গ্রহণ করবে। দৈনিক হাজিরা গ্রহণের পর উপস্থিত ছাত্রদের সংখ্যা নিচে লিখে স্বাক্ষর করে দেবে।

৩) শিক্ষক হাজিরা

এটাও অত্যন্ত আবশ্যকীয় রেজিস্টার। শিক্ষক সংখ্যা সীমিত থাকলে রেজিস্টারের পরিবর্তে একটা সাধারণ খাতায় এ কাজ আনজাম দেয়া যেতে পারে।

এই রেজিস্টার থাকবে স্টাফ রুমে। শিক্ষকমন্ডলী ঘন্টা বাজার অন্তত পাঁচ মিনিট পূর্বে উপস্থিত হয়ে যথারীতি এতে নিজের নামের সামনে দস্তখত করে আসার (প্রয়োজনে প্রস্থানেরও) সময় নোট করে রাখবেন। এই রেজিস্টারে বন্ধের

www.nagorikpathagar.org

বিবরণ এবং প্রত্যেক শিক্ষকের ছুটির প্রকার অন্তর্ভূক্ত থাকবে। শিক্ষক মন্ডলী আবেদন করে ছুটি ভোগ করার রীতি চালু করবেন। আবেদনে অধ্যক্ষের নিজের অথবা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের অনুমোদন থাকবে। অবশ্য কোন বিশেষ সাময়িক পরিস্থিতিতে পূর্বানুমোদন নেয়া সম্ভব না হলে তা স্বতন্ত্র কথা। ছুটির ব্যবহার এমন হওয়া উচিত নয় যে তা স্থায়ীভাবে প্রাপ্য হিসাবে গণ্য হবে। বরং তা নেহাত প্রয়োজনের খাতিরে গ্রহণ করবে। মাস শেষে পুরো মাসের ছুটির শ্রেণী বিন্যাসসহ হিসাব নোট করে নেবে। সাথে সাথে প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ভোগকৃত ছুটির শ্রেণীসহ হিসাব রাখবে। যেমন– (ক্যাজুয়েল লীভ) নৈমিত্তিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি ইত্যাদি। মঞ্জুরী প্রাপ্ত ও মঞ্জুরী অপ্রাপ্ত সকল আবেদন সতর্কতা সহকারে অফিসে সংরক্ষণ করা চাই।

৪) ব্যয় নির্বাহ খাতা

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে একটা ব্যয় নির্বাহ বই থাকে। এতে প্রত্যেক কর্মচারীর নাম, পদবী, বেতন ভাতা, কর্তনসমূহ ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত থাকা চাই। বেতন প্রদানের সময় প্রত্যেক কর্মচারী থেকে তাতে স্বাক্ষর নিয়ে নেবে। স্টাফ সংখ্যা স্বল্প হলে রেজিস্টারের পরিবর্তে একটা সাধারণ খাতায় এ কাজ করা যেতে পারে।

৫) আয় ব্যয় হিসাব রেজিস্টার (ক্যাশ বুক)

প্রতিষ্ঠানে দৈনিক যে লেনদেন হয়, তা এই রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখবে। ছাত্র বেতন, ফিস, সাহায্য, চাঁদা ইত্যাদি আয়ের খাতে এবং কর্মচারীদের বেতন, বৃত্তি, কেনা দ্রব্যাদির পরিশোধিত দাম ইত্যাদি ব্যয়ের খাতে লিখবে। আয়সমূহ নির্দিষ্ট রসিদ মারফত সংরক্ষণ করবে এবং ব্যয়সমূহ ও নির্ধারিত রসিদ ও ভাউচারের মাধ্যমে নির্বাহ করবে। হিসাব অত্যন্ত পরিষ্কার রাখবে, যেন কেউ কোন প্রকার সন্দেহ করতে না পারে। আয়ের অর্থ অতিসত্ত্বর ক্যাশিয়ারের (ট্রেজারার) কাছে জমা দেবে, নিজের কাছে রাখবে না।

৬) মওজুদ রেজিস্টার (স্টক রেজিস্টার)

একটা স্টক রেজিস্টার আবশ্যকীয়। এতে বিদ্যালয়ের মওজুদ দ্রব্যাদির হিসাব সংরক্ষণ করবে। বিদ্যালয়ের জন্যে যখনি কোন কিছু ক্রয় করা হবে অথবা কোথায়ও থেকে পাওয়া যাবে, তখন সাথে সাথে তা রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্ত করে নেবে। যেমন– চেয়ার, আলমারি, আসবাব, কাটলারী, ব্লাকবোর্ড, খেলার সরঞ্জামাদি, সিন্দুক ইত্যাদি। বস্তুর নামের পাশে ক্রয়ের বা গ্রহণের তারিখ এবং

www.nagorikpathagar.org

দাম সন্নিবেশিত করবে। বিদ্যালয়ের সমস্ত মালিকানার দেখাশোনা, সংরক্ষণ এবং স্টক রেজিস্টার মাঝে মধ্যে নিরীক্ষিত হওয়া চাই। যে সব দ্রব্য বিনষ্ট হবে বা হারিয়ে যাবে সেগুলোকে দায়িত্বশীলের অনুমতিক্রমে বাদ দিবে অথবা পরিবর্তে দ্রব্য নিয়ে নিবে।

৭) মন্তব্য খাতা

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটা মন্তব্য খাতা থাকা উচিত। এতে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদের প্রতিক্রিয়া ও মন্তব্য, হেদায়াত, পরামর্শ ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

৮) গ্রন্থাগার রেজিস্টার

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারেরও একটা রেজিস্টার থাকা চাই। এতে বইয়ের সংখ্যা, বইয়ের নাম, গ্রন্থকারের নাম, ক্রয়ের তারিখ, দাম ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত থাকবে। গ্রন্থাগার বড় ধরনের হলে এমন এক রেজিস্টার থাকা চাই যাতে সমস্ত বইয়ের বিষয় ভিত্তিক উল্লেখ থাকে। যেমন– তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, ইসলামের ইতিহাস, বাংলা সাহিত্য, অংক শাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির অধীনে শ্রেণী বিভাগ থাকে। তাহলে পাঠক নিজের রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী সহজেই বই খুঁজে বের করতে পারে।

৯) অফিস নির্দেশ রেজিস্টার

একটি রেজিস্টার এমনও থাকতে হবে যাতে প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের অথবা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত নির্দেশাদি, হেদায়াত, নোটিশ ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করা হয়। প্রত্যেক নির্দেশে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর নিয়ে রাখবে। নোটিশ যদি ছাত্র সম্পর্কে হয় তাহলে শ্রেণী শিক্ষক নিজের স্বাক্ষরের সাথে শ্রেণীর নাম লিখে দিবে।

১০) যোগাযোগ রেজিস্টার

প্রতিষ্ঠানে আগত অথবা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রেরিত চিঠি পত্রাদির আবশ্যকীয় বিষয়াদি স্মরণ রাখার একটা রেজিস্টার থাকা আবশ্যক। এতে পত্র প্রেরণ ও প্রাপ্তির তারিখ, প্রেরক ও প্রাপকের নাম এবং সংক্ষেপে পত্রের বিষয়ের উল্লেখ থাকবে যেন প্রয়োজনে সূত্র উল্লেখ করা সহজ হয়।

এসব রেজিস্টার ছাড়া প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মচারীর এক একটি ফাইল থাকা চাই। এতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদি সংরক্ষিত থাকবে। যেমন নিয়োগপত্র, শর্তাবলী, শিক্ষাগত যোগ্যতা,

www.nagorikpathagar.org

গ্রেড, কর্মের রিপোর্ট, পদোন্নতি ও অবনতি বিশেষ ছুটিসমূহ ইত্যাদি।

এ ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষকের এক একটি ডায়েরী থাকা চাই। ডায়েরীতে যথা সময়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদি লিখে রাখবে এবং অধ্যক্ষ সাহেব বিভিন্ন সময়ে তা নিরীক্ষা করে দেখবেন। ডায়েরীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সংক্ষেপ, বিস্তারিত সিলেবাস, পুরো শিক্ষাবর্ষের চার্ট, শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নোট ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত থাকা চাই।

সিলেবাস বহির্ভূত কার্যক্রম

মাতাপিতা ও শিক্ষক মন্ডলীর ইচ্ছা হলো শিশুরা যেন লেখাপড়ায় খুব মেধাবী হয় এবং পরিশ্রম করে কেতাবী ইলম হাসিল করে। নিসন্দেহে তাঁদের এই বাসনা যথার্থ আর তা অর্জনের জন্যে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু কেবল কিতাবী ইলম অর্জন করলেই শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য হাসিল হতে পারে না। তাই এমন সব কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত যাতে বাস্তব ভূমিকা নিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের বিকাশ সাধনে সক্ষম হতে পারে। এ সব কার্যক্রমই সিলেবাস বহির্ভূত কার্যক্রম। এ সবের গুরুত্ব কিছুতেই সিলেবাসভূক্ত কার্যক্রমের চাইতে কোন অংশে কম নয়। আজ কাল এদিকে এ জন্যেই বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়ে থাকে।

কার্যক্রম ও ব্যস্ততা

বিদ্যালয় সমূহে নিম্নোক্ত কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এবং শিশুরা তাতে বাস্তব ভূমিকা গ্রহণ করলে তাদের প্রশিক্ষণে বেশ সহযোগিতা হতে পারে।

* শিশুদের সম্মেলন অনুষ্ঠান করাঃ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ঘন্টা কমিয়ে এ জন্যে সময় বের করতে হবে। মাসে তিনটি সম্মেলন হবে শ্রেণী শিক্ষকের তত্বাবধানে শ্রেণী ভিত্তিকভাবে। প্রথমটা হবে ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণমূলক। এতে শ্রেণীর পরিচ্ছন্নতা, বিনোদন, ব্যবস্থাপনা, কল্যাণ ও মঙ্গল সংক্রান্ত কর্মসূচী থাকবে এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে কর্ম বন্টন করা হবে। দ্বিতীয় সম্মেলনে শিশুদের বক্তৃতা, কথোপকথন, কাহিনী, কবিতা, চুটকি, ধাঁধা ইত্যাদি উপস্থাপন করা অনুশীলন করাবে। প্রত্যেক

www.nagorikpathagar.org

শ্রেণীর প্রতিটি শিশু যে কোন একটা বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারে এমন ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বশেষ সম্মেলন হবে পুরো প্রতিষ্ঠানের মাসিক অনুষ্ঠান যাতে সমস্ত শিশু উপস্থিত থাকবে আর প্রত্যেক শ্রেণীর শিশুদের প্রতিনিধি কর্মসূচীতে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে পারে। এসব কর্মসূচীতে বিছানা সাজানো থেকে শুরু করে কর্মসূচীর সমাপ্তি পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষকদের নির্দেশনায় ছাত্রগণ নিজেরা ও তাদের সাথীরা আনজাম দেবে। সভাপতি ও সচিব ছাত্রদের থেকেই হবে আর তাদের তত্ত্বাবধানেই কর্মসূচী পরিচালনা করা হবে।

* বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানাদি, অভিভাবকদের সম্মেলন, মেহমানদের দেখাশুনা, পুরস্কার বিতরণী সভা, শিক্ষা সপ্তাহ ইত্যাদির বিভিন্ন কর্মসূচী ও ব্যবস্থাপনায় বাস্তব ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দেবে।

* ছাত্রদের বিভিন্ন প্রকারের সংগঠন থাকবে যাদের হাতে নিম্নোক্ত কাজ থাকবে, আর এসব কাজ তারা শিক্ষক মন্ডলীর নির্দেশনায় আনজাম দেবে।

১) সাধারণ স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার দেখাশুনা, খেলাধূলা, পি. টি. ও বিভিন্ন প্রকারের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

২) পিকনিক, শিক্ষা সফর, দেয়াল পত্রিকা, পাঠাগার, নতুন ও দুর্বল এবং অসহায় ছাত্রদের সাহায্য, শিশুদের দোকান, সামষ্টিক খাবারের গুরুত্ব।

৩) প্রদর্শনী ও বিদ্যালয়ের যাদুঘরের জন্যে আশ্চর্য বস্তু সামগ্রী সংস্থান করা ও আসবাব তৈরী করা, মেহমানদারী, রুগীর সেবা ও পরিচর্চা ইত্যাদি।

৪) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সামাজিক আচার আচরণ শেখানো, নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা, অন্যায় ও খারাবী থেকে বাঁচানো, নামাযের অনুকরণ করায় সহযোগিতা করা।

গুরুত্ব ও উপকারিতা

এসব কার্যক্রমের গুরুত্ব অত্যধিক। এসবের মাধ্যমেঃ

* শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের ভারসাম্যপূর্ণ প্রশিক্ষণ লাভ হবে।

* বই পুস্তকে যা কিছু পড়া হয় তা জীবনে বাস্তবায়নের সুযোগ পাওয়া যায়। আর তারা গ্রন্থের পোকা হওয়ার পরিবর্তে বাস্তব মানুষ রূপে গড়ে উঠে।

* দায়িত্বানুভূতি, বিধি-বিধানের অনুসরণ, মনোনিবেশ, পারস্পরিক সহযোগিতা, অন্যকে অগ্রাধিকার দান, জনসেবা ইত্যাদি সামাজিক গুণাবলী ও

www.nagorikpathagar.org

গঠনমূলক চরিত্র সৃষ্টিতে সাহায্য পাওয়া যাবে।

* অবকাশকাল আকর্ষণীয় ও উপকারী কাজে এবং সামাজিক কাজে ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ হবে।

* বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজের মধ্যকার ব্যবধান সৃষ্টিকারী বস্তু বিদূরণে সাহায্য পাওয়া যাবে।

* শিশুদের প্রাকৃতিক যোগ্যতা বিকাশের সুযোগ পাওয়া যাবে।

* নানা স্বভাবের, মানসিকতার ও যোগ্যতার শিশুদের বিদ্যালয়ের ভারসাম্য পূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হবে আর তারা শিক্ষা থেকে পলায়ন করবে না।

কিন্তু এসব উপকারিতা তখনই সাধিত হবে যখনঃ

প্রত্যেক শিশু নিজ যোগ্যতানুযায়ী বাস্তবে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাবে, কোন শিশু বঞ্চিত না থাকে। অলস, লজ্জাশীল ও সাহসহীন শিশুকেও অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে।

* প্রতিটি কর্মসূচী বা উদ্দেশ্য উপকারী ও বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং শিশুর ব্যক্তিত্বের কোন না কোন অংশের প্রশিক্ষণে সরাসরি বা পরোক্ষ সম্পর্ক থাকে।

* ছাত্রদের রুচি, বাসনা ও আকাংখার প্রতি যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখা হবে যেন তারা পুরো সচেতনা ও মনোনিবেশ সহকারে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

* বৈধ সীমারেখার ভেতরে স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। বাধ্যবাধ্যকতা, চাপ প্রয়োগ এবং অনধিকার চর্চা থেকে বিরত থাকতে হবে।

* প্রতিষ্ঠানের সামর্থ, যোগ্যতা, শিক্ষকমন্ডলীর দক্ষতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন প্রকারের ও সর্বাধিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করবে। প্রত্যেক শিশু যেন নিজ নিজ পছন্দের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

* কর্মসূচী এমনভাবে তৈরী করতে হবে যেন এক একজন শিক্ষার্থী একাধিক কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

* কোন কোন ছেলে কিছু কাজে এমনভাবে জড়িয়ে যায় যে অন্য শিশুরা তাতে কোন সুযোগই পায় না আর তাদেরও সে কাজে অনেক সময় ও সামর্থ ব্যয়িত হয় এবং তাদের সিলেবাস ভুক্ত কার্যক্রম বাদ দিতে হয়। এমনটি হতে দেয়া ঠিক নয়।

* সিলেবাসভূক্ত ও সিলেবাস বহির্ভূত কাজের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা

www.nagorikpathagar.org

করাবে এবং দু'টোকে পরস্পরের পরিপূরক বা সহায়ক বানিয়ে নেবে। একটার কারণে অপরটি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

* এমন কর্মসূচী তৈরী করবে না যাতে অধিক ব্যয় করতে হয় এবং অভিভাবকদের পকেটের উপর অধিকতর চাপ পড়ে।

* তত্ত্বাবধান ও পথ প্রদর্শনের পুরো ব্যবস্থা করবে যাতে শিশুদের যোগ্যতা ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হতে না পারে এবং তাদের মধ্যে উচ্চতর গুণরাজি সৃষ্টির পরিবর্তে মন্দ স্বভাব সৃষ্টি হতে না পারে।

পরিবার ও বিদ্যালয়ের সহযোগিতা

শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুশৃংখল প্রতিষ্ঠান হলো বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের সুদক্ষ একদল শিক্ষক এই দায়িত্ব আনজাম দানে নির্দেশিত হন। ওসব অঞ্চলে সমাজের ইসলাহের কেন্দ্র হিসেবে পরিণত হয় এসব বিদ্যালয় সমূহ। এ জন্যে যথার্থই এ সবের সাথে বড় আশা আকাংখা সম্পৃক্ত থাকে। বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে মাতাপিতা সাধারণত শিশুর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। তারা নিশ্চিন্ত হয় যে এখন এ কাজ তো বিদ্যালয় নিজেই আনজাম দেবে। শিক্ষকমন্ডলী ও মাতাপিতার কর্ম ব্যস্ততা অথবা অজ্ঞতার কারণে তাদের অক্ষম মনে করে এবং তাদের থেকে সহযোগিতা হাসিলের চেষ্টা থেকে বিরত থাকে। এভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যে কাজটি যৌথভাবে আনজাম পাওয়ার কথা তা কেবল বিদ্যালয়ের উপর এসে বর্তায়, সীমিত সময়ে যা আনজাম দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠে না। আর যে কাজ বিদ্যালয় থেকে আশা করা হয় তা পুরো হয় না। এ জন্যে নিজের কর্তব্য যথাযথ পালনের জন্যে আবশ্যক হলো শিক্ষক্মন্ডলী শিশুদের মাতাপিতা বিশেষত তাদের মাতাদের সহযোগিতা হাসিলের চেষ্টা করবে।

অভিভাবকদের সাহায্য লাভের জন্যে আবশ্যক হলোঃ

* শিক্ষকমন্ডলী উত্তম স্বভাবের ও হাসি খুশী এবং মিশুক হতে হবে। সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে সময় বের করে নেবে, উদার মনে মিশবে ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সাক্ষাৎ করবে।

* তাদের অভিযোগ, আপত্তি অথবা পরামর্শ প্রশস্ত মনে শুনবে।

www.nagorikpathagar.org

* তাদের শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা ও ভাল মন্দের ব্যাপারে পুরোপুরি অংশ নেবে।

* তাদের সন্তানাদির অগ্রগতির অবস্থা সর্বদা তাদের অবহিত করতে থাকবে।

* শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য উত্তম বাক্যে স্মরণ করিয়ে দেবে।

* বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের দাওয়াত করবে এবং কর্মসূচীতে যথাসম্ভব তাদের রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

* বিভিন্ন সময় অভিভাবকদের সম্মেলন আহ্বান করবে।

অভিভাবক সম্মেলন

প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে অন্তত দু'বার অভিভাবকদের সম্মেলন আহ্বান করবে। প্রথমটি শিক্ষা বর্ষের প্রারম্ভে ভর্তি শেষ হওয়ার পরে। দ্বিতীয় বর্ষের মধ্যম পর্যায়ে শিক্ষা সপ্তাহ ইত্যাদি উপলক্ষে।

প্রথম সম্মেলন কিছুটা এমনিভাবের হবেঃ

১) সর্ব প্রথম বোধগম্য হয় এমনভাবে খুব সংক্ষিপ্ত রূপে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, লিপি ও কর্মসূচী বুঝিয়ে দেবে।

২) অতপর শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয়ের উন্নতি ও কল্যাণের জন্যে তাদের সাহায্য সহযোগিতার গুরুত্বের কথা পেশ করবে।

৩) অতপর সহযোগিতার জন্যে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

ক) পারিবারিক পরিবেশকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপযুক্ত করে বানাবে এবং পরিবার ও বিদ্যালয়ের জীবনের মধ্যকার ব্যবধান হ্রাস করার চেষ্টা করবে।

খ) প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধান, নিয়ম প্রথা ও সিদ্ধান্ত মেনে চলবে।

গ) শিশুদের নিয়মিত হাজির থাকায় অভ্যস্ত করা, পাঠ তৈরী ও বাড়ীর কাজ আনজাম দেয়ার ব্যবস্থা করা।

ঘ) বিদ্যালয়ের কর্মসূচী বাস্তবায়নে অবকাশের সময় শিশুদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত কার্যাদি আনজাম দেয়া।

ঙ) অসৎ সংঘ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা সাধনা করা।

চ) সিলেবাস বহির্ভূত কার্যক্রম থেকে উপকৃত হওয়ার কাজে সহযোগিতা করা।

www.nagorikpathagar.org

ছ) নামাযের অনুগত, পছন্দনীয় অভ্যাস প্রতিষ্ঠা এবং পারিবারিক কাজে শিশুদের ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ করতে থাকবে।

জ) শিশুদের সম্মুখে প্রতিষ্ঠানের দুর্ণাম হতে না দেয়া।

ঝ) প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ, উপকার ও উন্নতির জন্যে পরামর্শ এবং বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকা।

৪) সর্বশেষ শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয়ে কল্যাণ ও উপকারের জন্যে অভিভাবকদের পরামর্শ গ্রহণ করবে এবং তৎপ্রতি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা ভাবনা করবে।

দ্বিতীয় সম্মেলনে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচী এবং শিশুদের কাজ দেখাবে আর সেই সহযোগিতার যথার্থ মূল্যায়ন করবে যা বিদ্যালয় ও পরিবার পরস্পরের জন্যে করেছে। লক্ষ্যণীয় বিষয়ের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেবে।

এসব সম্মেলনের গুরুত্ব ও উপকারিতা

এ কাজ যথারীতি আনজাম দিলে নিম্নোক্ত উপকারিতার আশা করা যায়।

* শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অভিভাবকদের পুরো সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

* বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার সৃষ্টি হবে।

* পরিবার ও বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে।

* শিশুদের সাথে তাদের পরিবারের সংশোধন কার্যেও সাহায্য পাওয়া যাবে।

* বিদ্যালয় অধিকতর দক্ষতার সাথে নিজ কর্তব্য সাধনে সক্ষম হবে।

* শুভাকাংখীদের পরিসর বেড়ে যাবে যাতে বিদ্যালয়ের প্রসার ও গ্রহণ ক্ষমতায় যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে।

* অভিভাবকদের ভুল বুঝাবুঝি বিদূরিত হবে আর তারা নিজ নিজ কর্তব্য অনুভব করতে থাকবে।

অভিভাবকদের সম্মেলন থেকে এসব উপকারিতা লাভের জন্যে সর্বাবস্থায় সচেষ্ট থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা সপ্তাহ বা বার্ষিক সভা

প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বৎসরে একটা বড় অনুষ্ঠান অবশ্যই উদযাপন করা চাই। তাতে অনেক উপকার হয়ে থাকে।

* প্রতিষ্ঠানের সেবা কর্মের ব্যাপারে লোকজন অবহিত হতে পারে। আর তার গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবে।

* প্রভাব ও বাস্তব মাধ্যম সমূহ জনসাধারণের হাতে আসবে। মানুষের সহযোগিতা ও আন্তরিকতা অর্জনের পথ প্রশস্ত হবে এবং বিদ্যালয়ের প্রসার ও অগ্রগতির ব্যাপারে আগ্রহীদের সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করবে।

* শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাবে। আর বিদ্যালয়ের জন্যে তাদের হৃদ্যতা অনেকগুণ বেড়ে যাবে।

* শিশুদের বিশুদ্ধ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের জন্যে অভিভাবক বৃন্দের মাঝে অনুভূতি সৃষ্টি হবে এবং দ্বীনি শিক্ষা প্রচারে সাহায্য মিলবে।

* আশপাশের সংশোধন এবং মানুষের মাঝে দ্বীনি রূহ্ জাগ্রত করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

কর্মসূচী

এই অনুষ্ঠানের কর্মসূচী নিম্নোক্ত শীর্ষক বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। স্বীয় অবস্থা, আবশ্যকতা ও সামর্থানুযায়ী এগুলোতে সংশোধনী ও সংযোজনী করা যেতে পারে। যদি কোন একটি প্রতিষ্ঠান এককভাবে কোন কার্যকর ও সফল কর্মসূচী নিতে না পারে তাহলে আশপাশের কতিপয় প্রতিষ্ঠান মিলে পালাক্রমে এক একটি প্রতিষ্ঠানে এ কাজ আনজাম দেয়া উচিত।

* দ্বীনের চাহিদা ও দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য পেশের ব্যবস্থা করা, বক্তব্যসমূহ সংক্ষিপ্ত পূর্ণাঙ্গ, সজ্জিত ও কার্যকরী হওয়া চাই একই বৈঠকে দুয়ের অধিক হওয়া ঠিক নয়।

* শিক্ষা প্রদর্শনীতে ছাত্র শিক্ষকের তৈরী করা জিনিসপত্রাদি, তাদের যোগাড় করা দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পোষ্টার, দ্বীনি শিক্ষার তালিকা, বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের সর্বাত্তক শিক্ষা উপকরণ, স্বাস্থ্য পরিচ্ছন্নতা ও সাধারণ জ্ঞানের মানচিত্রাদি, চিত্রাবলী ও মানচিত্র, মডেল ইত্যাদি সুবিন্যস্তভাবে সংরক্ষণ করবে এবং শান্তভাবে দেখানোর এবং ভালভাবে বুঝানোর ব্যবস্থা করবে। প্রদর্শনী যেন সংরক্ষিত এলাকায় হয়। এক

www.nagorikpathagar.org

দিক থেকে প্রবেশ দ্বার দিয়ে ঢুকে সমস্ত প্রদর্শনী দেখে অন্যদিকে বাহির হওয়ার পথ রাখতে হবে। রাস্তার পার্শ্বে কিছু বিধৃত অংশ রাখবে, যাতে দর্শকগণ হাত লাগাতে না পারে। প্রচুর আলোর ব্যবস্থা থাকলে রাতের বেলায় প্রদর্শনী খুব ভাল লাগে।

* খেলার প্রতিযোগিতা ও পি, টি, ফার্স্ট এইড, কুস্তি, লাঠি ইত্যাদির প্রদর্শনী। খেলাধূলার মধ্যে ফুটবল, ভলিবল, কাবাডি, রশি টানাটানি, হাই জাম্প, লং জাম্প, ছোট শিশুদের চেয়ার দৌড়, নারকেল দৌড়, জিলাপী দৌড়, চামচ দৌড়, রুমাল বেঁধে দৌড়, ভিতর বাহির, তিন পায়ে দৌড় ইত্যাদি সবার প্রিয়।

* কবিতা চর্চা, বক্তৃতা পেশ, সুন্দর হস্তাক্ষর এবং রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

* সাহিত্য সভার ব্যবস্থা অথবা শিশুদের কবিতা আবৃত্তি যেখানে শিশুরা বিখ্যাত কবিদের রুচি পছন্দ এবং শিক্ষণীয় কবিতা গুটিয়ে পেশ করতে পারে।

* শিশুদের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্বোধন। এতে শিশুরা জনসাধারণের সম্মুখে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ, কথোপকথন, চুটকি, ইংগিত ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় পেশ করতে হবে।

* পুরস্কার বিতরণী সভা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের প্রোগ্রাম সফলভাবে সংগঠনকারীগণ, পরীক্ষায় বিশেষ স্থান অধিকারকারীগণ এবং প্রদর্শনীর জন্যে উত্তম সামান সংস্থানকারী শিশুগণকে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করবে। পুরস্কারের মধ্যে উৎকৃষ্ট, আকর্ষণীয় ও বোধগম্য গ্রন্থরাজি, লেখাপড়ার সামান, সার্টিফিকেট, শিক্ষামূলক খেলনা দেয়া উচিত। পুরস্কার তো পুরস্কারই, তা দামী হওয়া জরুরী নয়।

লক্ষ্যণীয় বিষয়াদি

এই অনুষ্ঠানকে উপকারী, কার্যকরী ও সফল করার জন্যে আবশ্যক হলোঃ

* অনুষ্ঠান উপযোগী মৌসুমে রাখা, আর আবশ্যকীয় কর্মসূচী এমন সময় রাখতে হবে যখন অধিকাংশ লোক অবসর থাকে এবং সহজে অংশ গ্রহণ করতে পারে। যেমন– সাধারণ সভা, সাহিত্য সভা, শিশুদের কবিতা আবৃত্তি, প্রদর্শনী ইত্যাদি রাত্রে আর বিভিন্ন প্রতিযোগিতা দিনে হবে। মৌসুমের অসুবিধা না থাকলে ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার পরে রাখা অধিকতর ভাল।

www.nagorikpathagar.org

তখন শিক্ষাদান ব্যস্ততা থাকে না বিধায় প্রস্তুতি গ্রহণের বেশ সুযোগ পাওয়া যায়।

* বিস্তারিত কর্মসূচীর খুব ভালভাবে প্রচার হতে হবে।

* প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় দলাদলীর উর্ধে রাখবে যেন সবাই অনুষ্ঠানে আসতে পারে।

বক্তৃতায় ক্ষুদ্র মত পার্থক্য এড়িয়ে যাবে, যেন ভুল বুঝাবুঝি প্রচার হতে বা প্রচার করতে সুযোগ না থাকে। সংশোধনমূলক কর্মসূচীও হবে সাধারণ ও পজিটিভ ধরনের। শিশুদের দিয়ে কোন ক্রমেই বড়দের সমালোচনা করাবে না।

* এমন কর্মসূচী পেশ করতে হবে যে গুলোর খুব ভালভাবে প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে এবং বেশ অনুশীলনী করা হয়েছে।

* ছোট বড়, পুরুষ স্ত্রী প্রত্যেকের রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

* দাওয়াতপত্র বিলি করতে অত্যন্ত উদার পদক্ষেপ নেবে।

* প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন নিজের বয়স ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কোন না কোন কর্মসূচীতে অবশ্যই অংশ নিতে পারে, সে জন্যে চেষ্টা করবে।

* সমস্ত কাজ যথা সম্ভব নিজের তত্বাবধানে ছাত্রদের দিয়ে আনজাম দেবে। এতে তারা সর্ব প্রকার কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

* অংশ গ্রহণকারীদের সম্মান প্রদর্শন করবে। তাদের সর্ব প্রকার আরামের ব্যবস্থা করবে।

ছাত্রাবাস(বোর্ডিং হাউস)

মাতাপিতা নিজেদের সময়াভাবে অথবা প্রশিক্ষণ বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে নিজ সন্তানাদির প্রতি পুরো লক্ষ্য রাখতে পারে না। এ দিকে শিল্প বিপ্লব পারিবারিক ব্যবস্থাকে চরমভাবে ভেঙে খান খান করে দিয়েছে। সমাজ দিন দিন বস্তু পূজায়, নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার শিকার হতে চলছে। ধর্ম ও নৈতিকতার বন্ধন ক্রমান্বয়েই শ্লথ হয়ে আসবে। পরিবেশ সাধারণত নোংরা এবং নানা প্রকার খারাবির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়সমূহ যথাসম্ভব আবাসিক হতে হবে। অথবা অন্তত এমন হতে হবে যেন শিশুরা নিজেদের অধিক

www.nagorikpathagar.org

সময় শিক্ষক মন্ডলীর সংস্পর্শে অতিবাহিত করতে পারে। এভাবে তাদের উপযুক্ত দেখাশোনা, লালন পালন ও প্রশিক্ষণ হতে পারে। তারা কুসংসর্গ থেকে বেঁচে থাকতে পারে এবং স্বাধীনভাবে সিলেবাস বহির্ভূত কার্যক্রমের জন্যেও যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

তাছাড়া হোস্টেলের আবাসিক জীবনঃ

* ছাত্রদের মধ্যে আত্মনির্ভরতার সৃষ্টি হয়। তারা সত্ত্বর নিজের সাহায্য নিজে করা শেখে এবং প্রত্যেক কাজে বড়দের মুখাপেক্ষী থাকে না।

* বিভিন্ন স্বভাব-প্রকৃতি ও সামাজিক মানের শিশুদের সাথে জীবন যাপনের ও সমন্বয় করে থাকার পদ্ধতি শিখতে পারে।

* পছন্দনীয় অভ্যাস সৃষ্টি, আচার-আচরণ ও সামাজিক রীতিনীতি শেখার এবং চরিত্র গঠনের মত অনুকরণীয় আদর্শ ও উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।

* জীবনে নিয়ম-শৃংখলা সৃষ্টি হয়। উদ্দীপনা-স্পৃহা নিয়ন্ত্রণ করার ও বিধি-বিধান মেনে চলার অভ্যাস গড়ে উঠে।

* সংগী সাথীদের সাথে মিলে মিশে কাজ করার, অন্যদের কাজে আসার, ভালবাসা, সম্প্রীতি, অপরের জন্যে ত্যাগ স্বীকার ও অন্যকে অগ্রাধিকার দানের মনোভাব প্রকাশ করার অথবা রোগীর সেবা, মেহমানদারী, খিদমত, আনুগত্য ও নেতৃত্বদানের যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়।

* অন্তরের প্রশস্ততা, জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি ও সৎ-সাহসের সৃষ্টি হয়।

* সর্বোপরি জীবন যাপনের জন্যে পবিত্র পরিবেশ ও উৎকৃষ্ট সাথী সাহচর্য পাওয়া যায়। এতে জীবনে সুদূর প্রভাব পতিত হয় এবং তা আজীবন স্মৃতিবহ হয়ে থাকে।

লক্ষ্যণীয় বিষয়াদি

ছাত্রাবাস জীবনে কাম্য উপকারিতা হাসিলের জন্যে যথাসম্ভব নিম্নোক্ত বিষয়াদি সামনে রাখা চাই-

* হোস্টেল বা ছাত্রাবাস হতে হবে জনবসতি হতে একটু দূরে, বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী পুরো প্রশস্ত ও খোলামেলা স্থানে।

* থাকার কক্ষ বাতাস যুক্ত, আলোযুক্ত ও এমন প্রশস্ত হতে হবেযেনদশ পনের জন শিশু একত্রে একই কক্ষে অবস্থান করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

* কক্ষ আবশ্যকীয় মাল-সামানে সজ্জিত থাকবে এবং শিশুর ব্যক্তিগত মালামালের হেফাজত, পরিচ্ছন্নতা বিধান, প্রশিক্ষণ এবং যথারীতি রেখে দেয়ার পুরো বন্দোবস্ত থাকতে হবে।

* দালান ঘর যথাসম্ভব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব হবে এবং স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাবলী ও হোস্টেলের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে বানাতে হবে, সাধারণত ভাড়া করা দালানসমূহ হোস্টেলের জন্যে উপযোগী হয় না।

* বোর্ডিং এর তত্বাবধানের দায়িত্ব এমন ব্যক্তিকে ন্যস্ত করবে যিনি স্নেহ মমতায়, সহমর্মিতায় ও আন্তরিকতায় মাতাপিতার যোগ্য স্থলাভিষিক্ত হবেন। যিনি মাতাপিতার মতই শিশুদের সাহায্য ও পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন। তাহলে শিশুদের মনোযোগ আকর্ষিত হবে আর বেশী বেশী করে বাড়ী ঘরের কথা মনে হবে না। শিশুদের নিয়ন্ত্রণ করণের, তাদের লালন-পালনের এবং তাদের কাজ-কারবার গুছানোর মত যোগ্যতা সম্পন্ন হবেন। দালানের সংলগ্ন অথবা বাসস্থানের এক পার্শ্বে তত্বাবধায়কের অবস্থান করা আবশ্যক।

* তত্বাবধায়ক বিশেষত নিম্নোক্ত বিষয়ে তত্বাবধান করতে হবে-

১) স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, ২) খাদ্য ও নাস্তা, ৩) পাঠ তৈরী, ৪) খেলাধূলা, ৫) অবসর সময়ের কাজ কর্ম, ৬) চালচলন পারস্পারিক সম্পর্ক, ৭) নামাযের প্রতি সতর্কতা, ৮) সামাজিক আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, ৯) যাবতীয় দায়িত্ব আনজাম দানে একাগ্রতা ও নিয়মতান্ত্রিকতা, ১০) আসবাবপত্র বিন্যাস ও সংরক্ষণ।

* বোর্ডিং-এ যদি শিশুদের সংখ্যা বেশ স্বল্প থাকে তবে তো ভাল কথা, তখন তত্বাবধানের দায়িত্ব এমন একজন দক্ষ শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করা যায়, যিনি শিক্ষাদানের পাশাপাশি এ কাজেও যথেষ্ট সময় ও মনোযোগ ব্যয় করতে পারেন। অথবা এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যে তত্বাবধানকারী সার্বক্ষণিকভাবে এ কাজে রত থাকবেন অথবা তার দায়িত্বে শিক্ষাদান বা বিদ্যালয়ের অন্য কোন কাজ থাকবে না যেন তিনি শিক্ষার্থীদের লালন-পালন ও প্রশিক্ষণ কাজে পূর্ণ দৃষ্টি দিতে পারেন।

* পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষত শিশুদের পরিচ্ছদ, বিছানাপত্র, থাকার কক্ষ, রান্নাঘর, ডাইনিং, পেশাবখানা, পায়খানা, গোছলখানা, ড্রেন, মেঝে, বের হওয়ার পথ ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতার প্রতি অসাধারণ দৃষ্টি দিতে হবে। ফিনাল, ডিডিটি ও চুনা ছিটানো, মাঝে মাঝে কক্ষ ধুয়ে ফেলা, ধূপ-লোবান

www.nagorikpathagar.org

জ্বালানো ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে।

* মাঝে মাঝে শিশুদের মেডিক্যাল চেক আপ করাবে। টিকাদান ও মহামারী রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে ইনজেকশান লাগাবে। সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থা বোর্ডিং থেকেই করবে। রুগ্ন শিশুদের জন্যে স্বতন্ত্র কক্ষের ব্যবস্থা করবে।

* ছোট ও বড় শিশুদের পৃথকভাবে রাখবে। এক কক্ষে যথাসম্ভব একই বয়সের ও একই মেধার শিশুদের রাখবে। বড় শিশুদের ভর্তির সময় তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। আর অনেক বেশী উশৃংখল শিশুদের বোর্ডিং এ অবশ্যই ভর্তি করবে না, অন্যথায় একটি মাত্র মৎসই পুরো কুয়াকে নষ্ট করে দিবে।

* প্রত্যেক কক্ষে একজন মনিটর থাকবে, যে কক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আসবাবপত্রের হিসাব ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং কক্ষের নিয়ম-শৃংখলা ইত্যাদি ব্যাপারে বোর্ডিং এর তত্বাবধায়কের সহযোগিতা করতে পারে।

* ছাত্রদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে পালাক্রমে প্রত্যেক দল মনিটর বা ক্যাপ্টেনের তত্বাবধান কার্যে, বাসস্থানের পরিচ্ছন্নতার কাজে, খাবার খেতে, রুগ্ন ছাত্রের সেবা শুশ্রুষার কাজে, পাঠ তৈরীতে, হোম ওয়ার্ক সমাধানে, পাঠাগার থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে, মেহমানদের আতিথেয়তায়, নামায আদায়ের ব্যবস্থায় এবং নতুন ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারে, খেলাধূলায়, পাকঘরের কাজে সহযোগিতা ইত্যাদি দায়িত্ব আনজাম দানের সুযোগ দেবে।

* বাসস্থানের জন্যে একটা রুটীন তৈরী করে দেবে এবং বিভিন্ন কাজ কর্মে সংক্ষিপ্ত নীতিমালা তৈরী করে দিয়ে তা অনুসরণ করবে। বিভিন্ন স্থানের আদব শেখাবে।

* নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সরল, ভারসাম্যপূর্ণ, সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব দায়িত্বে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবে। ঠিকায় দায়িত্ব অর্পণ করবে না। অন্যথায় যুক্তিসংগত ব্যবস্থা হবে না। শিশুদের স্বাস্থ্য ও তাদের তৃপ্তির জন্যে খাওয়া-দাওয়ার যথার্থ ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

* শিশুদের শ্রম-মেহনতের, সহজ জীবন যাপনের এবং ক্রমান্বয়ে সমস্ত কাজ নিজে করায় অভ্যস্ত বানাবে। সে জন্যে স্বতন্ত্র ও সামষ্টিক দায়িত্ব অর্পণ করবে। আর সেভাবে কাজ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে।

www.nagorikpathagar.org

* অবসর সময় উপযোগী কাজ, বৈধ সীমারেখায় শিশুদের স্পৃহার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং খেলাধূলা ও বিনোদনের পূর্ণ ব্যবস্থা থাকা চাই। এসব বিষয়ে অবহেলা প্রদর্শন বিভিন্ন খারাবির জন্ম দিতে পারে। শিশুদের মনযোগ আকর্ষণের জন্যেও এসব কাজ আবশ্যকীয়তা না হলে শিশুরা বাসস্থানকে জেলখানা মনে করে থাকে।

* শিশুদের আচার-আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। তা না হলে তাদের আবাসিক জীবনের অসংখ্য উপকারিতার স্থলে চাল-চলনে বক্রতা, ভবঘুরে ধরনের জীবন, চুরি, অমিতব্যয়িতা, হীনমন্যতা, অন্য শিশুদের বশ্যতা, উদাসীনতা ইত্যাদির বেশ আশংকা থাকে। শিশুদের পকেট খরচের অর্থ তত্বাবধায়কের হাতে থাকবে। অবশ্য তাদের প্রয়োজনীয়তার মুখে সহজেই যেন পাওয়া যায়।

* পছন্দনীয় অভ্যাস সৃষ্টি, আচার-ব্যবহার ও আদব শিক্ষা দেয়ার জন্যে বিভিন্ন ধরনের সপ্তাহ পালন করবে। শিশুদের সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে লক্ষ্যণীয় কাজ-কর্মের প্রতি আকৃষ্ট করবে। আর আবাসিক জীবনের কাম্য বিষয়াদি সবিস্তারে বুঝিয়ে দেবে এবং সে মতে চলার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নেবে। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করে তাদের সাহায্য ও পথ প্রদর্শন করবে।

* বোর্ডিং-এ শিশুদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়াদি সংরক্ষিত হওয়া চাইঃ

ক) প্রত্যেক শিশুর নাম, কক্ষ নং, পিতার নাম, জন্ম তাং, বিস্তারিত ঠিকানা, ভর্তির তারিখ ইত্যাদি।

খ) প্রত্যেক শিশুর আসবাবপত্রের পূর্ণাঙ্গ তালিকা থাকা চাই, যাতে নির্বিঘ্নে সংযোজন ও বিয়োজন সম্ভবপর হয়। পোষাক, বিছানা ও অন্যান্য জিনিসপত্রে শিশুর নাম লিখে রাখবে যেন পরিচিতির অসুবিধা দেখা না দেয়।

গ) হিসাব কিতাব ও খরচের বিস্তারিত বিবরণ।

* নিয়মিতভাবে শিশুদের হাজিরা ডাকবে। অনুমতি ছাড়া বোর্ডিং-এর বাইরে যেতে দেবে না এবং বাইরে রাত কাটাতে দেবে না। শোয়ার সময়ও শিশুদের একবার দেখে নেবে।

* শিশুদের বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন, মেহমান ও অন্যান্য লোককে শিশুদের সাথে বোর্ডিং-এ থাকার অনুমতি দেবে না বরং তাদের জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করবে। অন্যাথায় বিভিন্ন প্রকার সমস্যার আশংকা থাকে।

www.nagorikpathagar.org

পাঠ ও পাঠদান পদ্ধতি

পাঠদানে সাফল্য তিনটি কথার উপর নির্ভরশীলঃ
* শিক্ষকের পরিশ্রম করে পাঠক্রম তৈরী করা।
* শ্রেণীতে দক্ষতার সাথে পাঠদান করা।
* ছাত্রদের পাঠে পুরো মনোনিবেশ করা।

পাঠক্রম প্রস্তুতি

পাঠদানের পূর্বে সুন্দরভাবে তা তৈরী করে নেয়া উচিত। প্রস্তুতি ছাড়া পাঠদান করা শিক্ষকের সম্মানহানিকর ও বিদ্যার অবজ্ঞা ছাড়া কিছু নয়। যারা এই ভুল করে বসে তারা পাঠদানের হক আদায় করতে পারে না আর অনেক সময় তারা বেশ অপমানিত হয়ে থাকে।

প্রস্তুতকরণের গুরুত্ব

প্রস্তুতি ছাড়া পাঠদান কখনো সফল ও কার্যকর হয় না। পাঠ কঠিন বা সহজ হোক, শ্রেণী উচ্চতর হোক অথবা নিম্নতর হোক সর্বাবস্থায়ই পাঠ প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। কেননা–

* পাঠ তৈরী করে নিলে শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস জন্মে।

* তিনি ছাত্রদের সম্মুখে নিজের বক্তব্য পূর্ণ বিশ্বস্ততা, নির্ভরশীলতা ও যথাযথভাবে পেশ করতে পারেন।

* শিক্ষাদানের উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন, ফলে শিক্ষার্থীরা পুরোপুরি উপকৃত হতে পারে।

* শিক্ষার্থীদের উত্তম রূপে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম হয়।

কোন কোন শিক্ষক প্রবীন ও অভিজ্ঞ হওয়ার কারণে পূর্বে পাঠদান

www.nagorikpathagar.org

করা বিষয়াদির প্রস্তুতি নেন না; এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে তিনি তো এই বিষয়ে পূর্বে পাঠদান করেছেন। সুতরাং সে জন্যে প্রস্তুতির কিইবা প্রয়োজন থাকতে পারে? কিন্তু এটা তাদের মারাত্মক ভুল। অভিজ্ঞতা অবশ্যই সফল শিক্ষাদানের সহায়ক বটে কিন্তু তা প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন মিটাতে পারে না। কারণ প্রতি বছর যেসব নতুন নতুন ছাত্র ভর্তি হয় তাদের মেধা পূর্বের বর্ষের ছাত্রদের তুলনায় বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। তাই পাঠের পুরো কাঠামোই পরিবর্তন করে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পূর্বের শিক্ষাও অকেজো হয়ে পড়ে। ভূমিকা ও উপযুক্ত প্রশ্নাবলী নতুন করে তৈরী করতে হয়। তাছাড়া শিক্ষকের সামনে সব সময় প্রয়োজনীয় উপকরণও মওজুদ থাকে না। এমনও হতে পারে যে পাঠের কিছু অংশ বিস্মৃত হয়ে গেছে শিক্ষক তখন শ্রেণীতে অপমানিত হওয়ার সম্মুখীন হতে পারে। তাই সর্বাবস্থায়ই শিক্ষকের প্রস্তুতি গ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়।

প্রস্তুতির ব্যাপারে লক্ষ্যণীয় বিষয়াদিঃ

সর্ব প্রথম দেখতে হবে কোন শ্রেণীতে কোন পিরিয়ডে কি পড়া রয়েছে? কি পরিমাণ সময়ের মধ্যে পাঠদান শেষ করতে হবে? যেসব শিশুদের পড়াতে হবে তাদের বয়স, যোগ্যতা ও রুচী কি? এই পাঠ সম্পর্কে তাদের পূর্ব ধারণা কতটুকু। যা কিছু পড়াতে হবে তৎপ্রতি শিক্ষকের কতটুকু হাত আছে। কিছু ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করে নেবে।

* আবশ্যকীয় তথ্যাদি একত্র করে দু'তিনটে উপযুক্ত বিভাগে শ্রেণী বিন্যাস করে একটা শীর্ষ নাম ঠিক করে বিভিন্ন বিভাগের উপশিরোণাম ঠিক করবে অতঃপর প্রত্যেক উপশিরোণামের বক্তব্য চিন্তা করে নেবে।

* পাঠের জন্যে শিক্ষার্থীদের মনযোগ আকর্ষণ করার জন্যে উপযুক্ত ভূমিকা চিন্তা করে নেবে আর পূর্ব প্রতিভা যাচাই করার জন্যে কতিপয় প্রশ্ন তৈরী করে রাখবে।

* প্রত্যেক অংশের শেষে অথবা পাঠদান সমাপনান্তে যে সব প্রশ্নাবলী করার তা তৈরী করে নেবে।

* শিক্ষার্থীদের জন্যে কঠিন ও জটিল হতে পারে এমন বিষয়াদি সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা করে নেবে এবং তার সমাধান চিন্তা করে নেবে।

* পাঠ যথার্থভাবে চিত্রপটে অংকিত করে দেয়ার জন্যে আবশ্যকীয়

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষাগত ও বিশ্লেষণাত্মক সামগ্রী, মানচিত্র, চার্ট ইত্যাদি তৈরী করে অথবা যোগাড় করে নেবে।

* ছাত্রদের নোট করানোর জন্যে অথবা ব্লাকবোর্ডে দেখানোর জন্যে পাঠের সারাংশ বিন্যাস করে নেবে।

* পাঠ সংক্রান্ত হোম ওয়ার্ক বা অন্য কোন দায়িত্ব পূর্বেই চিন্তা করে নেবে।

* ছাত্রদের যেসব প্রশ্নোত্তর নিতে হবে তা প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে তাদের সম্মুখে বিজ্ঞানের যে অভিজ্ঞতা কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত যে প্রাকটিক্যাল প্রদর্শনী করতে হবে তার অনুশীলন করে নেবে যেন ভুল-ক্রটির সম্ভাবনা না থাকে।

* নতুন শিক্ষকগণ সংক্ষিপ্ত পাঠ সংকেত তৈরী করে নেবে। অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ ও সংক্ষিপ্ত নোট অবশ্যই তৈরী করবে।

পাঠ সংকেত

* পাঠ সংকেত যথাসম্ভব লিখিত হতে হবে। তাতে নিম্নোক্ত শিরোণামের অধীনে জ্ঞাতব্য বিষয়াদি সন্নিবেশিত হতে হবেঃ

১) তারিখ, ২) শ্রেণী, ৩) মধ্যম বয়স, ৪) পিরিয়ড ও সময়, ৫) বিষয়, ৬) শিরোণাম ও উপশিরোণাম, ৭) সাধারণ উদ্দেশ্য, ৮) সম্পর্ক, ৯) আবশ্যকীয় সামানের ক্রমিক অনুসারে তালিকা, ১০) পূর্ব দক্ষতা, ১১) ভূমিকা, ১২) মূল বিষয়ের প্রারম্ভিক বিষয়, (শিক্ষাদান পদ্ধতিসহ), ১৩) অনুশীলনযোগ্য পুণঃপৌণিক প্রশ্নাবলী, ১৪) ব্লাকবোর্ডের সারাংশ, ১৫) দায়িত্ব (হোম ওয়ার্ক)।

* প্রত্যেক পাঠের উদ্দেশ্য দু'টো- ১) সাধারণ উদ্দেশ্য, ২) বিশেষ উদ্দেশ্য সংকেতে উভয়ই অন্তর্ভূক্ত হতে হবে।

* শিশুদের পূর্বতন প্রতিভার উপরই নতুন পাঠের ভিত্তি নির্ভর করে। তাই সংক্ষেপে তারও আলোচনা হতে হবে। এথেকে বুঝা যাবে যে আপনি নতুন পাঠকে কি পরিমাণে তার সাথে সম্পৃক্ত করে পাঠ দান করেছেন।

* ভূমিকা সংক্ষিপ্ত কিন্তু শক্তিশালী হতে হবে আর তাতে পূর্ব পাঠের অভিজ্ঞতা ও পাঠের প্রতি উৎসাহিত করার জন্যে কিছু প্রশ্নাবলী অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

* যে সব মূল বিষয় পেশ করতে হবে তাকেও সংক্ষিপ্তাকারে ক্রমিক নম্বার অনুসারে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে আর তা পাঠ দানের পদ্ধতিও অন্তর্ভূক্ত

www.nagorikpathagar.org

হবে।

* প্রত্যেক অংশের শেষে এমন সব প্রশ্নাবলী অন্তর্ভূক্ত করতে হবে যেগুলো আলোচ্য অংশের উপর ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করতে হবে।

* শেষের দিকে দু'তিনটি অনুশীলনী বা পুনরালোচনামূলক প্রশ্নাবলী অন্তর্ভূক্ত করবে, আর এ প্রশ্নগুলো পুরো পাঠের বিষয়াদি থেকে করা হবে।

* পাঠ দানের সময় ব্লাকবোর্ডের উপর যা কিছু লিখতে হবে বা আঁকতে হবে তা অন্তর্ভূক্ত করা চাই।

* সর্বশেষে হোম ওয়ার্ক বা অনুশীলনীর জন্যে নির্ধারিত বিষয়াদিও নোট করে দিতে হবে।

পাঠক্রম প্রস্তুতির জন্যে আবশ্যকীয় শর্তাবলী

উপরোল্লেখিত কাজ সুচারুরূপে আনজাম দিতে হলে-

* পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষকের পূর্ণ অভিজ্ঞতা অথবা যে বিষয় শিক্ষাদান করতে হবে তাতে শিক্ষকের অবশ্যই দক্ষতা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীর সাথে তাঁর সম্পর্ক থাকবে গভীর। যেন তিনি ছাত্রের প্রাকৃতিক যোগ্যতা, তার স্বভাবগত কৈফিয়ত এবং তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকেন।

* বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকা চাই।

* শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য এবং প্রত্যেক বিষয়ের মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত হতে হবে।

* উপযুক্ত প্রশ্নাবলী তৈরী করার যোগ্যতা থাকতে হবে।

* ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণাত্মক ও শিক্ষামূলক উপকরণাদি তৈরী করার যোগ্যতা অথবা সংস্থান করার উপায় জানা থাকতে হবে।

* পাঠ তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে অনুভূতি থাকতে হবে আর সে জন্যে সময় বের করার চিন্তা থাকতে হবে।

পাঠের শ্রেণী বিভাগ

পাঠ সাধারণত তিন প্রকারঃ

১) জ্ঞান হাসিল সম্পর্কিতঃ এর উদ্দেশ্য শিশুদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করা। যেমন- ফিকহ, সীরাত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ সম্পর্কিত পাঠ।

www.nagorikpathagar.org

২) কর্ম বা দক্ষতা সম্পর্কিতঃ এর উদ্দেশ্য কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা। যেমন- আর্ট ক্রাফট, সেলাই, বয়ন, সুন্দর লেখা ইত্যাদি সম্পর্কিত পাঠ।

৩) সমালোচনা ও পর্যালোচনামূলকঃ এর উদ্দেশ্য ভাল মন্দ ও সুন্দর কুৎসিতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা অথবা সুরুচী ও উত্তম স্পৃহা বৃদ্ধি করা। যেমন- ইসলামিয়াত, সাহিত্য, কুরআন তিলাওয়াত (কিরাআত) কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত পাঠ।

এ সব পাঠও দু'প্রকার- ১) নতুন, ২) অনুশীলনীমূলক।

* নতুন পাঠঃ যাতে কোন নতুন নীতিমালা বা বিধিবিধান স্মৃতিপটে অংকিত করে দেয়া হয়। যেমন- অংক শাস্ত্র অথবা ব্যাকরণ সম্পর্কিত নীতি নিয়ম অথবা কোন নতুন নিয়ম সংগ্রহ করা। যেমন- ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কিত নতুন জ্ঞান অর্জন।

* অনুশীলনীমূলক বা পুনরালোচনামূলকঃ যার উদ্দেশ্য প্রথম থেকে শিক্ষা দেয়া কোন নিয়ম-নীতির অনুশীলন করানো অথবা পূর্ব জ্ঞান শিক্ষার পুনরোক্তি করানো।

জ্ঞানার্জন সম্পর্কি পাঠ শিক্ষাদানের পদ্ধতি

জ্ঞান সম্পর্কিত পাঠ খুব ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে প্রত্যেক পাঠে নিম্নোক্ত পাঁচটি পর্যায় থাকা আবশ্যকঃ

১) ভূমিকা, ২) পাঠের অবতরণিকা, ৩) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ৪) সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ, ৫) ব্যবহার বা অনুশীলন।

১) ভূমিকা

প্রত্যেক পাঠের একটা যথাযথ ভূমিকা আবশ্যকীয়, যার উদ্দেশ্য মূলত শিশুদের অন্তরকে নতুন পাঠের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। ভূমিকা হতে হবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাণবন্ত। এতে সময় যেমন স্বল্প ব্যয়িত হয়, তেমনি নতুন শিক্ষা অর্জনের জন্যে শিশুরা অনুসন্ধিৎসুও হয়, আর তাদের মনোনিবেশ পুরোপুরিভাবে নিবদ্ধ হয়ে থাকে। আলোচ্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সংলাপ, একটা ছোট্ট কাহিনী, দৃষ্টি আকর্ষণকারী ছবি বা মডেল, পূর্ব পাঠ পর্যালোচনা এবং পরবর্তী পাঠ সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্যে কতিপয় উপযোগী প্রশ্নাবলী- একটা উত্তম ভূমিকা হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকার প্রশ্নাবলী এত সহজ হবে যেন প্রত্যেক শিশু সহজেই উত্তর দিতে সক্ষম হয়। অনুকূল পরিবেশে প্রশ্ন করা চাই যেন সবাই খোলাখুলি নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়। প্রশ্নাবলী পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হতে হবে যেন ক্রমিক ধারাণুযায়ী স্মরণ থাকে। শেষ প্রশ্নটি এমন হবে যেন পাঠের লক্ষ্য উদ্দেশ্য শিশুদের বোধগম্য হয় আর তাদের অন্তরে নতুন শিক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা অনুভূত হয়।

২) পাঠের সূচনা

শিশুদের নতুন পাঠের জন্যে পুরোপুরি তৈরী করে নেয়ার পর মূল পাঠ পেশ করবে। পুরো পাঠ একত্রে পেশ না করে সুবিধা মত দু'তিন ভাগে বিভক্ত করে নেবে। ক্রমিক অনুসারে একটা একটা অংশ নেবে। মাঝে মাঝে এবং প্রত্যেক অংশ সমাপ্ত হবার পর কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করবে। প্রত্যেক অংশের শেষ প্রশ্নটি এমন হবে যেন পূর্ববর্তী প্রশ্নের বিষয়বস্তুর প্রতি মন আকর্ষিত হয়। মূল বিষয় ব্লাকবোর্ডে লিখবে। সর্বশেষে কতিপয় প্রশ্ন করে সমস্ত অংশকে পরস্পর সম্পর্কিত করে দেবে। অংশগুলোর ক্রমিক এমনভাবে বিন্যস্ত করবে যেন প্রথমে সরল–সহজ তারপর ক্রমাগত কঠিন ও জটিল জ্ঞাতব্য সামনে আসে। এভাবে পুরো পাঠ সহজেই বুঝে আসবে।

৩) ব্যাখ্যা ও তুলনামুলক আলোচনা

পাঠের যে অংশ পেশ করা হবে তাতে ভালভাবে ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যে শিশুদের পূর্ব দক্ষতার সাথে এর সম্পর্ক স্থাপন করবে। নতুন পাঠের অনুরূপ অথবা বিপরীত যে সব কথা শিশুদের পূর্বে জ্ঞাত আছে। তাকে নতুন পাঠের সাথে তুলনা করে দেখাবে ও উদাহরণ পেশ করবে। অধিক ব্যাখ্যার জন্যে ছবি, চিত্র, তালিকা ইত্যাদি ব্যবহার করবে। অথবা হাতে কলমে দেখাবে এভাবে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা স্মৃতিতে অংকিত হতে পারবে।

৪) ফলাফল অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সাধারণ নিয়ম বের করা

পুরো পাঠ যথা নিয়মে পেশ করা ও ভালভাবে এর ব্যাখ্যা প্রদানের পর উপযুক্ত প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে পাঠের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বিধিবিধান, নিয়মাবলী, মূলনীতি অথবা সিদ্ধান্ত বের করাবে। যেমন– অংক শাস্ত্রের কোন নিয়ম

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞানের কোন মূলনীতি ইত্যাদি। ফলাফল বের করার ব্যাপারে প্রয়োজন অনুযায়ী শিশুদের সাহায্য করবে আর তারা যদি মোটেই না পারে তাহলে পাঠ প্রথম থেকেই পুনরায় আলোচনা করবে। ফলাফল ব্লাকবোর্ডে লিখে ছাত্রদের নোট করিয়ে দেবে।

৫) ব্যবহার বা অনুশীলন

শিশুরা যা কিছু শিখলো তা পরীক্ষা করে দেখার, তা বাস্তবে ব্যবহার করার এবং তা অনুশীলন করার সুযোগ পেতে হবে। সে জন্যে পরিশেষে কিছু মৌখিক প্রশ্নাবলী উপস্থাপন করবে অথবা কোন লেখা অথবা ব্যবহারিক কাজ দেবে। তাতেই প্রতিয়মান হবে যে শিশু কতটুকু শিখেছে এবং শিক্ষক পাঠ শিক্ষাদানে কতটুকু সফল হয়েছে। তাছাড়া ব্যবহারের ফলে শিশুদের তা স্মরণ থাকবে। যেমন– অংকের কোন নিয়ম শিখিয়ে অথবা বিজ্ঞানের কোন মূলনীতি বুঝিয়ে দেয়ার পর সে বিষয়ে এমন দু' তিনটে প্রশ্ন উত্থাপন করবে যা উক্ত নিয়মে বের করা সম্ভব হয়। শিশু সমাধান পেশ করতে সক্ষম হলে পাঠদান সফল হলো। ব্যবহারের ফলে অথবা অনুশীলনীর মাধ্যমে শিশুদের উক্ত নিয়ম ভালভাবে স্মরণ থাকবে।

এ পাঁচটি পদক্ষেপ নিয়ে পাঠ শিক্ষাদান ফলপ্রসূ ও উপকারী সাব্যস্ত হয়ে থাকে। এগুলোর সার সংক্ষেপ আরেক বার দেখা যেতে পারে।

১) উপযুক্ত ভূমিকার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠে উদ্বুদ্ধ করা।

২) আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে নতুন মুল বিষয়াদি পেশ করা।

৩) ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা করে পাঠকে পরিষ্কার করে দেয়া, তাছাড়া শিক্ষার্থীদের পূর্ব পাঠের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন বিষয়বস্তুর তুলনা করে এবং দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নতুন বিষয়ের সম্পর্ক জুড়ে পাঠকে তাদের বোধগম্য করে দেয়া।

৪) শিক্ষার্থীদের সেই নিয়মের বাস্তবায়ন করে অথবা তা ব্যবহারে নেয়ার সুযোগ দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া।

নিসন্দেহে কেবল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে উক্ত পাঁচটি পদক্ষেপ অত্যন্ত উপকারী ও কার্যকর প্রমাণিত হয়। তবে এর সবচাইতে বড় ত্রুটি হলো এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের নিজেরা করে লেখার সুযোগ থাকে

www.nagorikpathagar.org

কম। সাধারণভাবে এতে তাদের অবস্থান হয় অজ্ঞ শ্রোতার মত। ফলে তারা বাস্তবে অনুভব করে নিতান্ত স্বল্প। যদি কোন জ্ঞানমূলক পাঠে (বিশেষভ অংক শাস্ত্র, সাধারণ বিজ্ঞান ও ভূগোল ইত্যাদি) উপরোক্তগুলোর পরিবর্তে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, তাহলে অধিকতর উপকার ও কার্যকর প্রমাণিত হবে।

১) নতুন পাঠ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সামনে কোন সমাধানযোগ্য প্রশ্ন পেশ করা হয়, যেন তারা চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে তার সমাধান খুঁজে বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

২) তার সমাধানের জন্যে শিক্ষার্থীদের মতামত চাইবে।

৩) বিভিন্ন মতামত পরীক্ষা করা আর কোন কোনটাকে ব্যবহার করে সমাধান বের করার চেষ্টা করা।

৪) যথাযথ দিকনির্দেশনার মাধ্যমে বিশুদ্ধ সমাধানে উপনীতি হওয়া।

৫) এই সমাধানের প্রমাণ ও সত্যতার জন্যে অধিকতর গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানো।

এভাবে শিশুরা পুরোপুরি আগ্রহী হবে, আর তাদের জ্ঞান অদিকতর দৃঢ় হবে। তাছাড়া চিন্তা গবেষণা, প্রমাণ সংগ্রহ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পাবে। অংক শাস্ত্রের প্রতিটি প্রশ্নই তো সমাধানযোগ্য হয়ে থাকে। সাধারণ বিজ্ঞান ও ভূগোল শাস্ত্রেও এই পদ্ধতিতে অধিকতর কাজ করা যায়।

ব্যবহারিক অথবা নৈপূণ্যমূলক পাঠ পড়ানোর পদ্ধতি

আর্ট ক্রাফট, সুন্দর হস্তাক্ষর অথবা অন্যান্য নৈপূণ্যজনক পাঠে নিম্নোক্ত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যকঃ

* শিক্ষার্থীদের সে বিষয় শেখার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুভব করিয়ে দেবে যেন শেখার আবশ্যকতা বাড়ে ও জোর প্রচেষ্টা চলে।

* তাদের যা কিছু শেখাতে হবে তা যেন এত কঠিন না হয় যাতে শিশুদের নৈরাশ্য, ঘৃণার উদ্রেক হয়, আর না এত লম্বা হয় যে তারা বিরক্ত হয়ে পড়ে।

* শিশুদের কাজের সবলতা ও পরিচ্ছন্নতার এতটুকু মানদন্ডের আশা করা যায় যা স্বাভাবিক চেষ্টা সাধনায় অর্জন করা সম্ভব হয়। প্রকাশ থাকে যে অনেক

www.nagorikpathagar.org

দিনের ক্রমাগত শ্রম ও অনুশীলনের পরেই বিষয়াদিতে নৈপূণ্য সৃষ্টি হয়। আর শিশুদের থেকে সূক্ষ্ম কাজের আশা মূলত অস্বাভাবিক চাওয়া বৈকি? নৈপূণ্যতামূলক পাঠের পদক্ষেপ হলোঃ

১) ভূমিকা বা প্রচেষ্টাঃ শিশুদের সম্মুখে কোন মডেল পেশ করে তা অনুকরণের প্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ করবে। তাদের মাঝে এমন ভাবধারার সৃষ্টি করবে যেন তারা কোন বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা হাসিলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। যেমনঃ ঈদের মৌসুমে প্রিয়জনদের পাঠানোর জন্যে স্বহস্তে খাম ও ঈদ কার্ড তৈরী করার আবশ্যকতা, নিজ নিজ পুস্তকের কভার তৈরী ও তা লাগানোর প্রয়োজনীয়তা- ইত্যাদি।

২) সূচনাঃ পূর্বে তৈরীকৃত কোন মডেল ভালভাবে প্রত্যক্ষ করাবে। আর তার এক একটি অংশের আকৃতি প্রকৃতি ভালভাবে আয়ত্ব করিয়ে দেবে। তার একটা বিস্তৃত চিত্র ব্লাকবোর্ডে অংকিত করে বুঝিয়ে দেবে, প্রয়োজনে পুরো মডেলটা তৈরী করে শিশুদের সম্মুখে রেখে দেবে। মডেলটা পুরো শ্রেণীতে টহল দিয়ে নেবে যেন প্রতিটি শিশু স্বহস্তে নিকট থেকে তা দেখে নিতে পারে।

৩) নিয়ম-নীতিঃ সংক্ষিপ্তভাবে সেই নিয়ম-নীতি বুঝিয়ে দেবে যাতে করে মডেলটি তৈরী করতে সাহায্য পাওয়া যায়।

৪) বাস্তবায়নঃ আবশ্যকীয় উপকরণাদি যোগাড় করে শিক্ষার্থীদের কাজে নিয়োজিত করবে। শিশুরা হাতে কলমে কাজে রত হয়ে পড়লে শিক্ষক মন্ডলী সমস্ত শ্রেণীতে ঘুরে ফিরে দেখতে থাকবে যেঃ

* শিক্ষার্থীদের আসন ঠিক আছে, চোখ ও খাতা বইয়ের দূরত্ব যুক্তিসংগত আছে, কোমর সোজা আছে।

* কলম, ব্রাস ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির ধারণ বিশুদ্ধ আছে।

* আসবাব যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

* কাজ সঠিকভাবে ও পরিচ্ছন্নতা সহকারে আনজাম পাচ্ছে।

* কোন কোন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সাহায্য আবশ্যক আর যেখানে যে ধরনের সাহায্য দরকার তা যথা সময়ে করতে হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তত্বাবধান ও ব্যক্তিগত সাহায্য যত যত্নসহকারে হবে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনে ততই সহজ হবে। কাজ বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্নভাবে হবে। আর সরঞ্জামাদিও বিনষ্ট হবে না। তত্বাবধানের ব্যাপারে অবহেলা নানা প্রকারের অসুবিধা সৃষ্টির

www.nagorikpathagar.org

কারণ হয়ে থাকে।

৫) সম্পন্নঃ শেখা কিছু কৌশল কাজে লাগানোর জন্যে কিছু এমন চিত্তাকর্ষণমূলক কাজ সম্পন্ন করতে হবে, যাতে অধিকতর অনুশীলনী হয়ে থাকে। যেমন– ডিজাইয়েন বা সাইজ তৈরীর পদ্ধতি শেখানোর পর কোন চিত্র অংকন করে ঝুলানোর জন্যে বলা।

সমালোচনা ও পর্যালোচনামূলক পাঠ

এগুলোর মধ্যে ব্যবহারিক সৌজন্যবোধ, নৈতিক কাহিনী, আকর্ষণীয় কবিতা, শিক্ষামূলক ঘটনাপঞ্জী ইত্যাদি সম্বলিত পাঠ অন্তর্ভূক্ত, যা শিশুদের স্পৃহা ও নৈতিক প্রশিক্ষণে তাদের মধ্যে উন্নত রুচী বোধ ও সুক্ষ্ম জযবা সৃষ্টির এবং তাদের ধ্যানধারণা ও চিন্তাধারা এবং জীবনের উদ্দেশ্যকে উন্নত বানাবার সহযোগী হয়। এ জাতীয় পাঠক্রমের সফলতার জন্যে আবশ্যকঃ

* শিক্ষক নিজে সহানুভূতিশীল, অনুভূতিপূর্ণ ও মঙ্গলাকাংখী ব্যক্তি হবেন।
* ভালমন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা সম্পন্ন হবেন।
* অন্যদের প্রভাবিত করার মত যোগ্যতা রাখেন।
* শিশুদের বয়স, রুচী ও পর্যায় অনুযায়ী উপকরণাদি সংগ্রহ করতে পারেন।

এ জাতীয় পাঠদানের জন্যে নিম্নোক্ত পাঁচটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেঃ

১) উপযুক্ত পরিবেশঃ যথাযথ ভূমিকার মাধ্যমে পাঠের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবে। পরিবেশ যত শান্ত ও পূর্ণ নিরব এবং শিক্ষার্থীরা যতই বিক্ষিপ্তমনা থেকে সংরক্ষিত থাকবে পাঠ ততই অধিকতর কার্যকর হবে।

২) উপকরণ উপস্থাপনঃ পাঠ বেশী হলে দু'তিন ভাগে বিভক্ত করে অথবা পুরোটাই একত্রে উপস্থাপন করে ইপ্সিত অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে।

৩) তুলনা যাচাই এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা শিক্ষার্থীদের অনুধাবনযোগ্য বানাবে।

৪) প্রশ্নাবলী উত্থাপন করে শিক্ষার্থীদের নিজেদের শেখার ও চিন্তা গবেষণা করার সুযোগ দেবে।

৫) যথাযথ প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে মনোভাব ও স্পৃহার প্রকাশ করানো এবং

www.nagorikpathagar.org

সমালোচনা, পর্যালোচনা বা বিষদ বিবরণ পেশ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করবে।

পুনরালোচনা বা অনুশীলনমূলক পাঠ দানের পদ্ধতি

এ ধরনের পাঠে মাত্র তিনটি পদক্ষেপ আছেঃ

১) ভূমিকাঃ শেখানো 'নিয়ম নীতি' সম্পর্কে এমন দু'তিনটে প্রশ্ন করবে যেগুলোর উত্তর শিশুরা মুখে মুখে দিতে পারে।

২) অনুশীলনঃ পুনরালোচনা অথবা অনুশীলনের জন্যে এমন দু'তিনটি প্রশ্ন পেশ করতে হবে যেগুলো পঠিত নিয়মে সমাধান করা যায়। তবে যেসব প্রশ্নের সমাধানের জন্যে চিন্তা গবেষণা ও শ্রমের প্রয়োজন সে সব প্রশ্নের সমাধান করার সময় শিক্ষক মহোদয় সমস্ত হলে ঘুরে ঘুরে তত্ত্বাবধান করবেন এবং আবশ্যক মত সাহায্য করবেন। দুর্বল ছাত্রদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন আর মেধাবী ছাত্ররা সত্তর সমাধান বের করতে পারলে তাদের অতিরিক্ত কাজ দেবেন যেন তারা নিজেরা ব্যস্ত থাকে আর অন্যের কাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার সুযোগ না পায়। যদি একাধিক ছাত্র সমাধান করতে না পারে তবে ব্লাকবোর্ডে সঠিক সমাধান লিখে অথবা তাদের একজনকে দিয়ে লিখিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।

৩) সমর্পণঃ পরিশেষে পড়ানো নিয়মের অধীন এমন কিছু কাজ দেবে যা শিশুরা সাধারণ দৃষ্টিতে নিজে নিজে করতে সক্ষম হয়। এ কাজ শ্রেণীতেও করানো যেতে পারে অথবা বাড়ী থেকে করে আনতেও দেয়া যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি

শিক্ষাদান ও শিক্ষাদান পদ্ধতির মৌলনীতি আলোচনার পর এবারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আবশ্যকীয় কতিপয় জ্ঞাতব্য সংগ্রহ করে দেয়া যুক্তিসংগত বলে মনে করি।

ইসলামিয়াত

বিষয়টি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। এটা সমস্ত বিষয় ও কর্মকান্ডের প্রাণশক্তি হিসেবে পরিগণিত। এজন্যে পুরো প্রতিষ্ঠানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রত্যেক শিক্ষককে ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত পাঠক্রম ভুক্ত ও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কর্মকান্ডে এই বিষয়কে কেন্দ্রীয় মর্যাদা দান করা উচিত এবং প্রতিষ্ঠানকে তার প্রতিটি কাজে এবং শিক্ষকদেরকে নিজ নিজ কথা, কাজ, কর্ম ও চরিত্রে এর যথার্থ সাক্ষ্য পেশ করা উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে এমনভাবে তৈরী করে নেবে ও সংরক্ষণ করবে যাতে ইসলামী শক্তির প্রাধান্য ও স্বাতন্ত্র বজায় থাকে আর শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় গ্রহণ করার মত আদর্শের নমুনা পেয়ে যায়। পছন্দনীয় অভ্যাস গ্রহণ ও অপছন্দনীয় অভ্যাস পরিত্যাগের পূর্ণ ব্যবস্থা করবে আর লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ভাল কাজের প্রসার ও মন্দ কাজের মূলোৎপাটন সম্ভব হয়।

প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে ইসলামিয়াতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি ও কর্মকান্ড অন্তর্ভূক্ত থাকবেঃ

* কুরআন হাকীম, নাজেরা সহীহ উচ্চারণ সহ পুরো কুরআন তিলাওয়াত এবং নির্দিষ্ট নির্বাচিত আয়াত ও সূরা মুখস্থ করবে।

* সংক্ষিপ্ত সীরাতুন্নবী (সঃ) আম্বিয়ায়ে কিরাম, শ্রেষ্ঠ মনীষীবর্গ ও বিখ্যাত

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জী এবং ঐতিহাসিক কাহিনী, আকায়েদ ও ইবাদাত সম্পর্কিত আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য।

* নৈতিক ও সামাজিক প্রশিক্ষণ।

* ওজু, নামায, রোযা ইত্যাদির বাস্তব প্রশিক্ষণ।

এগুলো শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য থাকবে শিশুদের কথা, কাজ, ইলম, আমল, আকিদা ও চিন্তা গবেষণা ইসলামী শিক্ষার আলোকে হতে হবে। আল্লার সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁর মর্জি অনুযায়ী ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামগ্রিক জীবন যাপনের পদ্ধতি জানা এবং এ জাতীয় দায়িত্ব আনজাম দানের বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া, ইলম অনুযায়ী নিজে আমল করা ও অন্যের কাছে তা পৌছিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা জারী রাখা।

শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্দেশিকা

* সাধারণ কুরআনী নিয়মে শুরু করবে না। কারণ এটা শিশুদের জন্যে শুষ্ক ধরনের হয়ে থাকে। বর্ণমালা পরিচিতি, শব্দ গঠন। অক্ষর মিলানো এবং পুস্তকে লিপিবদ্ধ সরল পাঠ্য পড়াতে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করবে। শব্দ ও ভাষা বাংলা হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন শিশুদের জন্যে বোধগম্য হয়।

* বর্ণমালা তালিকা, পুস্তিকা, "এসো আরবী শিখি"- (ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি) দিয়ে শুরু করবে। এর নির্দেশিকা অনুস্মরণ করবে আর ব্লাকবোর্ডের ব্যবহার করলে শিশুরা অত্যন্ত সহজেই বাংলা ভাষা যেমন শিখবে তেমনি আরবী বর্ণমালা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে। আর প্রথম থেকেই বাংলার জন্যে স্বতন্ত্র ও কুরআন মজীদের জন্যে স্বতন্ত্র গ্রামারের প্রয়োজন হবে না।

* বর্ণমালা ও শব্দাবলী উচ্চারণে মাখরাজের বিশুদ্ধতার প্রতি প্রথম থেকেই পুরো লক্ষ্য রাখতে হবে।

* দ্বিতীয় বর্ষে "ইয়াচ্ছারনাল কুরআনা" অথবা এই ধরনের লেখা অথবা অন্য কোন ধরনের মনোপুত লেখার সাহায্যে সেই সব আবশ্যকীয় নিয়ম পদ্ধতি ও ব্লাকবোর্ডে লিখে স্মৃতিবদ্ধ করাবে যেগুলো চালু করে পাঠাভ্যাস করার জন্যে প্রয়োজনীয়। সমস্ত নিয়ম নীতি এই পর্যায়ে বলে দেয়া আবশ্যকীয় নয়। এখন "আম পারা" শুরু করিয়ে দেবে এবং বিশেষ কাওয়ায়েদ, ছাপার অক্ষর, বিরাম চিহ্নাদি ইত্যাদি পড়ার সময় প্রয়োজনীয় স্থানে শিখিয়ে দেবে।

www.nagorikpathagar.org

* শিক্ষক নিজেকেবিশুদ্ধ উচ্চারণ ও আকর্ষণীয়ভাবে পড়ার আদর্শ পেশ করতে হবে এবং শিশুদেরকেও স্বতন্ত্রভাবে ও সামষ্টিকভাবে ঠিক সেই রকম আদায় করতে হবে। বানান করানোর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করলে শিশুরা চালু করে পড়তে বাধা পায়, এ জন্যে যেখানে শিশুরা ভুল করবে কেবল সেখানে থেমে বানান করাবে।

* কুরআন মজীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার বিষয়ে প্রথম থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করাবে আর নিজে অনুকরণযোগ্য আদর্শ পেশ করবে।

* কুরআন মজীদ শিক্ষাদানের সময় শ্রেণীর পরিবেশ অত্যন্ত আনন্দঘন রাখতে হবে, স্নেহ মমতা প্রদর্শন করতে হবে। কঠোরতা ও ধমক দেয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে, যেন আলোচ্য পুস্তকের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়।

* দীনিয়াত শিক্ষা প্রসংগে একটা ক্রমিক ধারায় আল্লার সত্তা ও গুণাবলীর সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করবে, তার ইহ্সানসমূহ বুঝিয়ে দেবে, তাঁর মর্জি অনুযায়ী জীবন যাপন পদ্ধতি শেখাবে আর এ প্রসংগে মহানবী (সঃ) ছাহাবায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট মনীষীদের আদর্শ পেশ করবে।

* ইবাদত, মুয়ামালাত অথবা নৈতিকতা ও সামাজিকতা সম্পর্কে মৌখিক, উপদেশ দানের পরিবর্তে অথবা কেবল কতিপয় নিয়ম নীতি বলে দেয়ার স্থলে তাদেরকে বাস্তবে তা শিখিয়ে দেবে ঐতিহাসিক ও নৈতিক কাহিনীর সাহায্য নেবে। তাছাড়া কার্যে পরিণত করার যথেষ্ট সুযোগ দেবে। দেহ্ ও পোষাক পবিত্র করার, গোছল ও ওজু করার এবং নামায আদায় করার পুরো নিয়ম বাস্তবে শিখিয়ে দেবে। নামাযের বিভিন্ন প্রকার ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নাত, মুস্তাহাব–ইত্যাদিতে বিভক্ত করে এগুলোর লম্বা তালিকা মানার জন্যে শিশুদের প্রতি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যাবে না। অন্যথা শিক্ষার্থীদের উপর অকাল বোঝা অর্পণ করা হবে আর তাদের ঘৃণার উন্মেষ ঘটবে। এর লম্বা তালিকা সাধারণত শিশুদের এ বিষয়ে ঘৃণা ভাব জাগ্রত করে। পুরো পদ্ধতি বাস্তবে শিখিয়ে দিলে তারা সহজেই আনন্দের সাথে লিখে নিতে পারে এবং যথাযথভাবে তা অনুস্মরণ করতে সক্ষম হয়। নামাযের দোয়া ও সূরা ইত্যাদি শেখানোর জন্যে প্রথম দিকে দু'তিন শ্রেণীতে পুরো নামায উচ্চ স্বরে জামায়াতের সাথে এমন একটা শিশুর ইমামতে আদায় করাবে যে তুলনামূলকভাবে বেশী স্মরণ রাখতে পারে আর শিক্ষক আরকান ও উচ্চারণের বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ

www.nagorikpathagar.org

করতে হবেঃ

১) বিভিন্ন স্থানের ইসলামী আদব বুঝিয়ে দিয়ে তা অনুসরণ করাবে।

২) নামায ও মসজিদকে প্রশিক্ষণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবে। অনাবিল পরিবেশ, সামষ্টিক গতিধারা, পবিত্রতা ও নম্রতা সৃষ্টির ব্যাপারে এগুলো থেকে বেশ সাহায্য পাওয়া যাবে।

৩) সামষ্টিক অনুষ্ঠানে উচ্চ স্বরে এমন হামদ ও নাতের (ইসলামী গানের) ব্যবস্থা করবে যার শব্দ গঠন ও বাক্য বিন্যাস এবং কবিতা বোধগম্য হয়। বার বার একই হামদ নাত বলবে না।

৪) অনুষ্ঠানাদি ও ধর্মীয় উৎসব উদযাপনের ব্যবস্থা করবে। এতে করে দ্বীনি জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হবে আর দ্বীনের ব্যাপারে জযবা সৃষ্টির সুবিধা হবে।

৫) আয়াত, হাদীস, মনীষীদের বাণী, ধর্মীয় পোস্টার ইত্যাদি সুন্দরভাবে স্থানে স্থানে এঁটে দেবে। এগুলোর ভাষা হবে সহজ সরল, সুস্পষ্ট বর্ণ, চিত্তাকর্ষক বাচনভঙ্গি ও দৃষ্টি আকর্ষণকারী।

৬) আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করবে অথবা ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করবে।

৭) দ্বীনি বই পত্র ও পত্রিকা সাময়িকীর ব্যবস্থা করবে।

৮) দ্বীনি ও প্রচারমূলক সভা সমিতিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেবে।

৯) কল্যাণমূলক কাজ ও জনসেবামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করবে এবং তৎপ্রতি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

১০) ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধমূলক কাজের জন্যে সপ্তাহ্ পালন করবে।

মাতৃভাষা (বাংলা)

মাতৃভাষা হওয়ার কারণে সিলেবাসে বাংলার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। নিজের বক্তব্য পেশ করতে ও অন্যের বুঝানোর জন্যে এ হচ্ছে স্বাভাবিক ও কার্যকর মাধ্যম। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক পুঁজি ও দ্বীনি সাহিত্য এ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য ভাষার তুলনায় আমাদের জন্যে কুরআন হাদীস বুঝার জন্যে এ ভাষাই অধিকতর উপযোগী। কারণ,

www.nagorikpathagar.org

অক্ষর জ্ঞান, বিভিন্ন শব্দ বাক্য প্রণালী, বাকধারা ও বাকবিধি, উপমা, উদাহরণ, ধারণা ও আবেগ, রীতিনীতি, আচরণ ইত্যাদির সাথে শিক্ষার্থীরা এ ভাষারই মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করে। নিজের মাতৃভাষা ও তার রীতিনীতির সাথে শিক্ষার্থীদের যে স্বাভাবিক সৌহার্দমূলক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তা অন্য কোন ভাষার সাথে কখনো সম্ভবপর হয়ে উঠে না। মাতৃভাষা হওয়ার কারণে প্রত্যেক বিষয় শিক্ষা লাভের জন্যে এটাই মাধ্যম হয়ে থাকে কাজেই এ ভাষায় উৎকর্ষ লাভের উপরই অন্যসব ভাষায় উন্নতি লাভ করা নির্ভর করে।

এ ভাষা শেখার পেছনে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যাবলী সামনে থাকা চাইঃ

* শিক্ষার্থীদের মনোভাব মৌলিক ও লিখিতভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জিত হওয়া, অন্যদের ধারণা ও আগ্রহ লিখিত ও মৌখিক সর্বাবস্থায়ই যেন তারা হৃদয়ংগম করতে পারে। আর তাদের শব্দ ভান্ডার যেন সমৃদ্ধ হতে পারে।

* মাতৃভাষার শিক্ষা গ্রহণে বলা, পড়া ও লেখা তিনটিতেই সমানভাবে যোগ্যতা সৃষ্টি করা অন্তর্ভূক্ত। যদি এ তিনটির একটির প্রতিও বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন করা হয় অথবা এর কোন একটি দিকের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ না করা হয়, তাহলে ভাষা শিক্ষা অপূর্ণাঙ্গই থেকে যাবে।

বলা শেখানোর পদ্ধতি

এটাই ভাষার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক। মনোভাব প্রকাশ করার জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এভাবেই কাজ করতে হয়। তাই এ মাতৃভাষা শেখানোর প্রতি অধিকতর লক্ষ্য দেয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে মাদরাসা গুলোতে সাধারণত এদিকে খুবই অবহেলা প্রদর্শন করা হয়। তারা কেবল লেখা শিক্ষা দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেন। অথচ সবচাইতে অধিক ও সর্বাগ্রে এদিকেই দৃষ্টি দেয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা চাইঃ

* শিশুদের এ পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে যেন তারা নির্দ্বিধায় মনোভাব ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়।

* তার মাতাপিতা, ভাইবোন, প্রতিবেশী, পারিবারিক জীবন, তার প্রিয় খেলা ও খেলনা, খাদ্য, পোষাক, গৃহপালিত জন্তু জানোয়ার ইত্যাদি সম্পর্কে আলাপ করতে পারে তবেই সে অতিসত্ত্বর পরিচিতি লাভে সক্ষম হবে। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

এসব বিষয়ে অধিকতর ব্যাখ্যার দিকে যাবে না। বরং কেবল সে সব দিকের আলোচনা করবে যে সব দিক সম্পর্কে শিশুরা পরিচিত।

* নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে, শ্রেণী কক্ষের সম্মুখে এসে, সভাস্থলে দাঁড়িয়ে কিছু বরার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যেমন– কোন প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়া, প্রশ্ন করা, কোন ঘোষণা দেয়া, অথবা বার্তা পৌছানো, কবিতা আবৃত্তি, কিরাআত পড়া, প্রচলিত বাক্যাবলী উচ্চারণ করা, জন্তু জানোয়ারের বুলি ও চালচলন নকল করা ইত্যাদি আড়ষ্টতা ও সংকোচ বিদূরণের সহায়ক।

* বিভিন্ন সিলেবাস ভূক্ত ও সিলেবাস বহির্ভূত কর্মকান্ডে জড়িত হওয়া বিশেষ আর্ট ক্রাফট, ওজু, নামায, কাহিনী, খেলাধূলা ইত্যাদি আলাপ আলোচনার জন্যে যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এসব থেকে উপকৃত হওয়া যায়।

* শিশুদের সাথে কথাবার্তা বলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কথাবার্তা রীতি প্রথার উর্ধে স্বভাবজাত হয়, বাচনভংগি যেন চিত্তাকর্ষক হয়, মার্জিত ও মধুর হয়। সুস্পষ্টভাবে ও বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে পুর্ণ উত্তর দানে এবং যথাযথ পদ্ধতি করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

* কথোপকথনের সময় শিশুদের ভুল ত্রুটির প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দেবে। কিন্তু হীনমন্যতা সৃষ্টি হতে দেবে না। ভুল শব্দ, বাক্য বা পদ্ধতির সংশোধনের জন্যে নিজে বিশুদ্ধভাবে বলা শিখিয়ে দেয়া উত্তম।

* আবার চারপাশের জিনিসপত্র, প্রাণীকূল, দৈনন্দিন ঘটনা ইত্যাদির ব্যাপারে ক্রমাগত প্রাসংগিক আলাপ করবে। এতে লেখার সহায়তা হতে পারে।

* পরিশেষে কাহিনী, কথোপকথন, কৌতুক, সংক্ষিপ্ত সুশৃংখল বাক্য বক্তব্যাকারে সভায় পেশ করার অনুশীলন করাবে, বই পড়ানোর ধরনে না হয়ে বলার ভংগিতে হওয়া চাই।

পড়া শেখানোর পদ্ধতি

আজকে প্রচলিত বর্ণমালা ভিত্তিক পাঠদানের পরিবর্তে যৌগিক পদ্ধতিতে পড়া আরম্ভ করাবে। বিস্তারিত নির্দেশাদি জানার জন্যে পুস্তিকা ও আদর্শ লিপি দেখবে ও সেগুলো থেকে সাহায্য নেবে। পদ্য ও গদ্য পড়ানোর জন্যে

www.nagorikpathagar.org

নির্ভরযোগ্য ইসলামী সংস্থার প্রকাশিত পুস্তক সেটের নির্দেশিকা অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবে। (বাংলাদেশে "ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি" প্রকাশিত বই দেখা যেতে পারে।)

* প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে ব্যাকরণ পৃথক না পড়িয়ে বলায় ও পড়ায় যে সব ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তা সংশোধন করে বিশুদ্ধ বলার ও লেখার যে নিয়ম লংঘন করা হয়েছে তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত করবে।

লেখা শেখানোর পদ্ধতি

* ড্রইং দিয়ে আরম্ভ করাবে। সরল রেখা, চতুর্ভূজ, ত্রিভূজ ও বৃত্তে আংশিক পরিবর্তন করে চিত্র অংকন এবং আকর্ষণীয় রঙ্গিন কারুকার্যের অভ্যাস; নার্ভ নিয়ন্ত্রণ এবং চক্ষু, মস্তিষ্ক ও হাতে একই সময়ে কাজ করার অনুশীলন করাবে। এ কাজ রঙ্গিন পেন্সিলে শ্লেটের উপর অথবা রঙ্গিন চক দিয়ে ব্লাকবোর্ডের উপর আরম্ভ করাবে।

* অতঃপর ক্রমাগত বর্ণ ও শব্দের ড্রইং করানোর দিকে এগুবে। যতটুকু পড়া হবে প্রথম দিকে ততটুকু লেখাবে। এতে বানান ঠিক হওয়ার সাথে সাথে পাঠ তৈরীর কাজ আনজাম পাবে। লেখার সময় কলম ধারণ করা ও বসার পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য রাখবে। তারপর ব্লাকবোর্ডে খড়িমাটি দিয়ে লেখার অনুশীলন করাবে। বানান শেখাবে কেবল সে সব অংশের যেগুলো বেশ কয়েক বার অনুশীলন করেছে। এতে ভুল হবে অনেক কম। প্রথম দিকে কেবল পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট লেখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবে। অতপর বিশুদ্ধ ও সুন্দর হস্তাক্ষরের প্রতি। বিসমিল্লাহ্ বলে আরম্ভ করার, পরিমিত মার্জিন রাখার, পরিষ্কার লেখার প্রতি লক্ষ্য রাখা শেখাবে। হাতে কালি লাগানো, চারদিকে কালি ছিটকানো, দেওয়াল, বই খাতায় আঁকা ও নিষ্প্রয়োজনে লেখার অভ্যাস প্রথম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করবে।

রচনা শেখানোর পদ্ধতি

* নির্দিষ্ট বিষয়ে লেখা আরম্ভ করার পূর্বে মৌখিক পর্যালোচনা ও ভাব প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। এতে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবে। বিষয় নির্বাচনে শিশুদের ঝোঁক প্রবনতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

* প্রথম দিকে কেবল এমন সব বিষয়ে রচনা লিখতে দেবে যেগুলো

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কে তারা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ অর্জন করেছে। এতে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

* রচনা তৈরীর আদর্শিক উদাহরণ পেশ করবে।

* রচনার কাজ দেবে পরিমিত পরিমাণে ও যথেষ্ট অবকাশের পরে।

* রচনায় ধারাবাহিকতা এবং ভাব প্রকাশে নিয়ম শৃংখলা রক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখতে দেবে।

* সংক্ষিপ্ত ও বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত কথা লেখার প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

* প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে শূন্যস্থান পূরণ করা, শব্দ থেকে বাক্য গঠন, উপযুক্ত শব্দ চয়ন ইত্যাদির অনুশীলন করাবে, তারপর প্রদত্ত বিষয়ে কতিপয় বাক্য লেখা শেখাবে। তারপর ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখাবে। শিশুদের দিয়ে দীর্ঘ রচনা লেখানোর আশা করা ঠিক নয়।

* লেখার কাজের তাৎক্ষণিক শুধরিয়ে দেবে। কিন্তু যাবতীয় ভুল একত্রে শোধরাতে যাবে না। বরং ধীরে ধীরে ত্রুটি সংশোধন করিয়ে নেবে। প্রথমত মারাত্মক ত্রুটি ধরবে তারপর ধরবে ছোট খাট দোষত্রুটি।

* ত্রুটির পরিমাণ বেশী থাকলে দু'বার লিখতে দেবে, পরিমাণের চাইতে মানের প্রতি গুরুত্ব দেবে অধিক।

* ভাল রচনার উপর নম্বর দেয়ার সাথে উপযুক্ত মন্তব্যও লিখে দেবে। প্রত্যেক রচনায় কিছু আবশ্যকীয় নির্দেশিকা দেবে।

পত্র লিখন

পত্র লিখন অনুশীলন করাবে। শিক্ষার্থীদের বিসমিল্লাহ্ বলে আরম্ভ করতে ও পত্রের উপরে 'মহান আল্লার নামে' লিখতে শিখাবে। উপরে ডান দিকে সংক্ষিপ্ত ঠিকানা ও তারিখ লিখবে, সংক্ষিপ্ত পদবী দিয়ে সম্বোধন করবে। পদবীর সাথে সাথে সালাম বা আস্‌সালামু আলাইকুম লিখবে। নতুন অনুচ্ছেদে নিজের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করবে। পরিশেষে প্রাপকের সাথে নিজের সম্পর্কে কথা উল্লেখ করে নিজের নাম লিখবে ক্রোধের সময় পত্র লিখবে না। পত্রাদির উত্তর অবশ্যই দেবে। সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখবে প্রত্যেক পত্রে অবশ্যই নিজের ঠিকানা লিখবে। বিপদে সহানুভূতিমূলক চিঠি আর সুখের ও খুশীর সময় ধন্যবাদ জ্ঞাপক পত্র লিখবে। অনুমতি ছাড়া অপরের চিঠি পড়বে না। ঠিকানা সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখবে। পাঠানোর পূর্বে দ্বিতীয় বার পড়ে নেবে।

www.nagorikpathagar.org

ত লোকদের কাছ থেকে উত্তর পেতে হলে উত্তরের জন্যে খাম বা টিকিট পাঠাবে। ডাকে দেয়ার জন্যে কেউ পত্র হাতে দিলে তা অবশ্যই ডাক ফলে দিবে।

শাস্ত্র

মামাদের দৈনন্দিন জীবনে অংক শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। কোন ব্যক্তি .কান পেশায় নিয়োজিত থাকুন না কেন। অংক শাস্ত্র ছাড়া তার কাজ চই পারে না। সদাইপাতি, উসর যাকাত, লেনদেন, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদত্ত ন ও ফরায়েজ প্রত্যেক ক্ষেত্রে অংকের প্রয়োজন রয়েছে। সিলেবাসে মিয়াত ও মাতৃভাষার পরেই অংকের স্থান। অন্যান্য বিষয়ের দুর্বলতা সামান্য লক্ষ্য রাখলে পরেও দূর করা সম্ভব, কিন্তু লেখাপড়া বা অংকে ন কোন মৌলিক ত্রুটি থেকে যায় তাহলে তার প্রতিকার অত্যন্ত কঠিন। ং এমনটি হলে সম্মুখে অগ্রসর হওয়াই দুষ্কর। যেমন শতকিয়া জানা না চলে যোগ বিয়োগ শেখানো সম্ভব নয়। চার নিয়ম (যোগ, বিয়োগ, গুণ ও গ) ভালভাবে জানা না থাকলে পরবর্তী নিয়ম কিছুতেই শেখানো যায় না। তাই প্রথমেই এগুলোর যথাযথ নিয়ম শেখানো ও ভিত্তি সুদৃঢ় করার চিন্তা থাকা চাই।

লক্ষ্যণীয় বিষয়াদি

* প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে অংক শাস্ত্র শেখানোর উদ্দেশ্য মূলত দৈনন্দিন জীবনে ও বিভিন্ন বিষয় ও কাজে সম্পৃক্ত অংক বিষয়ক সমস্যাদির সমাধান অনুধাবন করা এবং বিশুদ্ধভাবে তৎক্ষণাৎ তার সমাধান করার মত যোগ্যতা ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টি করা। সুতরাং শতকিয়া হিসাব ও গণনার নিয়মাবলী শিশুদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট হওয়া চাই।

* শিশুদের মাঝে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবে যে অংক শাস্ত্রের যে নিয়ম পদ্ধতি তাদের শেখানো হয় তার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে তারা নিজেরাই যেন সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। এতে মনোযোগও সৃষ্টি হবে আর পুরো মনোনিবেশ সহকারে বুঝার ও স্মরণ রাখার চেষ্টা সাধনাও করতে

www.nagorikpathagar.org

পারবে।

শতকিয়া, যোগ বিয়োগ শেখানোর জন্যে সংশ্লিষ্ট বস্তু থেকে ৷ দিকে যাবে অর্থাৎ বল ফ্রেম, গুলি, তেঁতুলের বিচি, আংগুল, ব্যব বস্তুসমূহ, খেলনাসমূহ ইত্যাদির সাহায্যে বুঝাবে। তারপর সংখ্যা গণন শেখাবে।

* নতুন নিয়ম শেখাতে গিয়ে তাড়াহুড়া করবে না। একটা নিয়ম ভা বুঝে নেয়ার আগে অন্য নিয়ম শুরু করা যাবে না।

* প্রত্যেক নিয়মের বার বার অনুশীলন করাবে পুনরালোচনা করলে বি ও দ্রুততার সাথে প্রশ্নাবলীর সমাধান করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। অংক শ জন্যে বেশ পরিশ্রম আবশ্যক। যথেষ্ট অনুশীলনী ছাড়া অংক শেখা যায় না। ভ বিরাগ ও বিরক্তি থেকে সংরক্ষিত থাকার জন্যে অনুসন্ধান, সাধ অনুরক্ততার প্রতি পুরো খেয়াল রাখবে। একই বৈঠকে পুনরালোচনার ৷ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময় নেবে।

* বিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতার সাথে শতকিয়া লেখার প্রতি প্রথম থেকে মনোযোগ দেবে। দুই বা ততোধিক সংখ্যার অংকে প্রত্যেক সংখ্যার স্থানীয় ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। যেমন সাতাশ লিখতে দশকের ঘরে ৷ আর এককের ঘরে সাত। লেখার সময় দুই বা ততোধিক সংখ্যার অংক বাঁ দি থেকে লেখাবে। যেমন ২৭ লিখতে প্রথমে ২ এবং পরে ৭ লেখার অভ্যাস করাবে।

* প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে একাধিক উদাহরণসহ নিয়ম বের করাবে। নিয়ম বুঝে নেয়ার পরেও অনুশীলন করার যথেষ্ট সুযোগ দেবে।

* ক্রমাগত এমন অনুশীলন করাবে যে যোগ, বিয়োগ ও বিভাজন পড়ার মধ্যে এক বারেই উত্তর দিতে পারে, পুরা হিসাব নেয়ার দরকার যেন না হয়। যেমন সাত আর পাঁচ মিলে বার হয়, সাত আটে ছাপ্পান্ন ইত্যাদি। আঙুলে আট, নয়, দশ, এগার, বার এভাবে নয়। অথবা আট একে আট নামতা পড়ে সাত আটে ছাপ্পান্ন পর্যন্ত পৌছে নয়।

* পুরণ, ভাগের নামতা শেখানোর পূর্বে শিখিয়ে দেবে কেন এমনটি হয়।

* অনুশীলনী করাতে এমন অতি বড় অংক অবশ্যই নেবে না যা জীবনে খুব কমই ব্যবহৃত হয়। অথবা এমন ছোট অংকও নেবে না জীবনে যার চিন্তাও করা যায় না। যেমন আমাদের সমাজে চালু আছে, যে প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে মহাসংখ্যা

www.nagorikpathagar.org

নুশীলন করানো হয়।

একই 'সমাধান' বিভিন্ন পদ্ধতিতে বুঝিয়ে দেয়া। যেমন– ৩, ২, ৫ ৫ থেকে ৩ সংখ্যাটি ২ কম; অথবা ৩ এর চাইতে ৫ সংখ্যাটি ২ বেশী।

৩ x ৫ = ১৫ এবং ৩ + ৫ = ৫ + ৩

প্রশ্ন দিয়ে সমাধান করিয়েই যথেষ্ট মনে করবে না। বরং বিশুদ্ধ সমাধানের া পদ্ধতিও শেখাবে আর শিক্ষার্থীদের যাচাই করে জেনে নেবে। মাঝে মাঝে র্থীদেরও প্রশ্ন করতে বলবে।

* লিখিত প্রশ্নের সাথে সাথে মৌখিক প্রশ্নের জবাব দানের প্রতিও বিশেষ ্য রাখতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষকে হিসাব কিতাবের এমন কর সম্মুখীন খুব কমই হতে হয় যে জন্যে কাগজ কলম নিয়ে বসতে হয়। ারণত মৌখিকভাবেই কাজ সমাধা করতে হয়। সুতরাং সমস্যার মৌখিক াধান করার আবশ্যকীয় যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে। মৌখিক প্রশ্নের সমাধান নুশীলন করলে লিখিত প্রশ্নের সমাধান বিশুদ্ধ ও দ্রুততার সাথে করারও বরণী প্রশ্নাবলী বুঝার বেশ সহায়ক হয়ে থাকে। প্রত্যেক পাঠের প্রথম কয়েক নিট মৌখিক প্রশ্নের জন্যে নির্দিষ্ট রাখবে আর মাঝে মাঝে সে জন্যে পুরো ন্টা কাজে লাগাবে। প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে তো মৌখিক প্রশ্নাবলীর পেছনে প্রায় অর্ধ ঘন্টা ব্যয় করা চাই।

* বিবরণমূলক প্রশ্নাবলীতে বিবরণ সহজ ও অনুধাবনযোগ্য রাখতে হবে, যেন শিশুরা স্বল্প প্রচেষ্টায় সমাধান করতে পারে। তারপর ক্রমাগত জটিলতার দিকে ধাবিত হবে।

গণনা শেখানো

* বিদ্যালয়ে আসার পূর্বে শিশুদের সীমিত সংখ্যা বিচ্ছিন্নভাবে মুখস্থ থাকে। তারা সাধারণতঃ বস্তুর আনুমানিক পরিমাণ লক্ষ্য করে। কোন কিছু সম্পর্কে অল্প বা বেশীর ধারণা লাভ করে। আর তাতেই সে নিশ্চিন্ত থাকে।

* গণনা শুরু করতে হবে এমন সব বস্তু দিয়ে যা স্পর্শ করা যায় অথবা এদিক সেদিক নেয়া যায়। যেমন তেতুলের বিচি, গুলি ইত্যাদি।

* গণনা শিক্ষার জন্যে কবিতার সাহায্যও নেয়া যেতে পারে। যেমন– এক, দুই, তিন... কায়েম কর দ্বীন ইত্যাদি।

www.nagorikpathagar.org

* প্রথমে পাঁচ পর্যন্ত তারপর দশ পর্যন্ত ক্রমিক ধারায় ও বিপরী' গণনা শেখাবে, তারপর তা লেখা শেখাবে। ক্রমাগত সম্মুখের দিকে হবে। ক্রমিক ধারায় লিখানোর পরে বিক্ষিপ্তভাবে লেখার বেশ অ করাবে।

চার নিয়ম পদ্ধতি

* গণনা শেখানোর পরে ধীরে ধীরে যোগ বিয়োগের ধারণা দেবে। অ পরিমাণে অনুশীলন করাবে যে বস্তুর সাহায্য ছাড়াও গণনা করতে পারে। যে ৩ থেকে ২, এক কম আর ২ থেকে ৩ এক বেশী।

* যোগ বিয়োগের হিসাবে আঙ্গুলি ব্যবহার করবে। কিন্তু কিছুদিন পর অভ্যাস ত্যাগ করাবে।

* বান্ডেল অথবা দিয়াশলাইয়ের খালি ডিব্বায় তেতুলের বিচি দশ দ' রেখে দশকের ধারণা দেবে। আর এক একটি বাড়িয়ে পরবর্তী সংখ্যা শেখাবে বল ফ্রেমের সাহায্যেও একক দশকের ধারণা শেখাবে আর তাকে সংখ্যায় গণ করার পদ্ধতিও শেখাবে।

* বিশ পর্যন্ত গণনা শেখানোর পরে জোড়া জোড়া রেখে গুণের নাম' শেখাবে। আর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেবে যে জোড়ের সহজ পদ্ধতি নামতার সাহায্য গ্রহণ।

* দশ অথবা তারচেয়ে কম বস্তু নিয়ে (২, ২) (৩, ৩) (৪, ৪) এর স্তুপ করে সমসংখ্যক শিশুদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে ভাগ অংকের ধারণা দেবে। তবে সংখ্যা যেন নিঃশেষে বিভাজ্য হয়ে যায় এমন সংখ্যা নিতে হবে।

* প্রথম শ্রেণীতে এভাবে ৫০ (পঞ্চাশ) পর্যন্ত গণনা, ৫ (পাঁচ) পর্যন্ত গুণের নামতা। আর এরমধ্যে যোগ বিয়োগের প্রশ্নাবলী খুব অনুশীলন করাবে। যোগের প্রশ্নাবলীতে দশকের সংখ্যা যোগ করা যায় কিন্তু বিয়োগের প্রশ্নে দশক থেকে ধার নেয়া ঠিক হবে না।

* জোড় ২০ পর্যন্ত আর বাকীগুলোর ১০ পর্যন্ত সংখ্যা নিয়ে শেখাবে। যেমন– এক + এক = দুই) (এক + দুই =তিন) (এক + তিন =চার) ইত্যাদি অথবা (এক – এক = শূন্য) (দুই – এক = এক) ইত্যাদি।

* চার নিয়ম (যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ) দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভালভাবে শিখিয়ে দেবে তবে অনুশীলনীর ধারা আরও সামনেও চালাবে।

www.nagorikpathagar.org

ভংগ্নাংশের ধারণা

ফল, কাগজের চৌকোণ টুকরো, ছড়ি ইত্যাদি কেটে $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$, ১$\frac{১}{২}$, $\frac{৩}{৪}$ ইত্যাদির ধারণা সহজেই দেয়া যায়। ধীরে ধীরে ১০ পর্যন্ত ও এর ভগ্নাংশ করে নামতা বানিয়ে মুখস্থ করাবে।

* কাগজের চার ভাগ বানিয়ে $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৮}$ ভাগে বিভক্ত করবে আর তাদের এই ভাগসমূহের সাহায্যে

১। $\frac{১}{২} + \frac{১}{৪} = \frac{৩}{৪}$ ২। $\frac{১}{২} + \frac{২}{৪} = \frac{৪}{৮}$ ৩। $\frac{১}{২}$ এর $\frac{১}{২} = \frac{১}{৪}$ ৪। $\frac{১}{২} \div ২ = \frac{১}{৪}$

ইত্যাদির ধারণা দেবে।

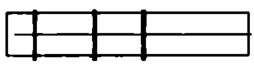

ভূগোল

আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকূলের স্রষ্ঠা, অন্নদাতা ও মালিক। তিনি তাঁর অসীম সাম্রাজ্যের একটা ক্ষুদ্রাংশ পৃথিবীতে মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি (খলীফা) বানিয়েছেন। এর মাটি থেকেই মানুষ সৃষ্টি। তার ওপর সে আজীবন বসবাস করে থাকে। এর বস্তু সামগ্রী দিয়ে উপকৃত হয়ে থাকে। নানা প্রকার কার্যাবলী সম্পাদন করে। আর মৃত্যুর পর এরিমধ্যে দাফন করা হয়। মোট কথা প্রতিনিধি হিসেবে এই পৃথিবীই তার কর্মস্থল। তাই এ পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা লাভ করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে আবশ্যকীয়।

'ভূগোল' সেই শাস্ত্রের নাম যাদ্বারা ভূপৃষ্ঠের জ্ঞান লাভ করা যায়। বিশেষত কোন বিশেষ পরিবেশে মানুষের জীবন যাপন করার জ্ঞান। মানুষের জীবন যাপন ও বসবাসের উপর তার স্বভাবজাত পরিবেশ, ভূমির গঠন, জলবায়ু, উদ্ভিদরাজি, উৎপাদন জীব জন্তু ইত্যাদির প্রভাব বিদ্যমান থাকে। ভূগোল থেকে এসব বিষয়েও জ্ঞান লাভ করা যায়। বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ নিজের পরিবেশের নানা প্রকার পরিবর্তন সাধন করে তাকে

www.nagorikpathagar.org

নিজের জন্যে অনুকূল করে তৈরী করেছে। মানুষের বসবাসের উপর পরিবেশের জ্ঞান এবং পরিবেশের উপর তার চেষ্টা সাধনার প্রভাব সম্পর্কিত জ্ঞান এই ভূগোল থেকেই লাভ করা যায়। এ জন্যে ভূগোলের জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশ্যক।

প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে একটা ক্রমিক ধারায় স্থানীয় থানা , জেলা, বিভাগ ও রাষ্ট্রীয় ভূগোল সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞান, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী শিশুদের আকার আকৃতি, পোষাক, বসবাস ও জীবন যাপন প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সমস্যাবলী ও কার্যাবলী থেকে পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত জ্ঞান ইত্যাদি সিলেবাসভূক্ত হয়ে থাকে।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

* চারপাশের ভৌগলিক অবস্থা, পৃথিবীতে প্রকৃতির কার্যকর নিয়ামকসমূহ এবং পরিবেশকে অনুকূল করে তৈরী করা সম্পর্কে মানবীয় প্রচেষ্টার জ্ঞান দানের জন্যে কখনো কখনো বাইরে নিয়ে নদী নালা, ক্ষেত খামার, হাট বাজার, কলকারখানা ইত্যাদি দেখিয়ে নেবে।

* দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার ও ধারণা স্বচ্ছ করার জন্যে ছবি, তালিকা, গ্লোব, মানচিত্র, নৌকার দৃশ্য, মডেল এবং সম্ভব হলে ডেমনষ্ট্রেটর ও মেজিক লন্ঠনের সাহায্য নেবে।

* পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের শিশুদের সম্পর্কে জ্ঞান সংগ্রহ করবে ভৌগলিক কাহিনী থেকে।

* পর্যটন, জল, স্থল ও শূন্যলোকের পরিমাপ সম্পর্কিত সমস্যাদি সম্পর্কে বর্ণনামূলক আলোচনা করবে।

* বিভিন্ন শিল্প, প্রাকৃতিক প্রদর্শনী, নদী, পাহাড়, ভূমি ইত্যাদি সংক্রান্ত আবশ্যকীয় জ্ঞান সংগ্রহ করে পেশ করবে। সর্বশেষে অঞ্চল ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত জ্ঞান তুলে ধরবে।

* বিভিন্ন খনিজ, তরিতরকারী, বীজ এবং নানা প্রকার উৎপন্ন দ্রব্যের নমুনা এবং বিভিন্ন দেশের টিকেট সংগ্রহের ব্যবস্থা করবে।

* কক্ষকে ভূগোল সম্পর্কিত চিত্র, দৃশ্যাবলী, তালিকা ও মানচিত্র ইত্যাদি দিয়ে সুসজ্জিত করবে। আর প্রয়োজনে সেগুলোর সাহায্য নেবে।

www.nagorikpathagar.org

সাধারণ বিজ্ঞান

এ বিষয়ে ১) স্বাস্থ্য রক্ষা, ২) অংগ-প্রত্যংগ পরিচিতি, ৩) প্রকৃতির জ্ঞান, ৪) প্রাণীবিদ্যা, ৫) ভূ-তত্ব, ৬) সৌরজগত, ৭) জ্যোতির্বিদা ইত্যাদির সেই আবশ্যকীয় জ্ঞান অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, যা শিশুদের স্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ, ক্ষমতার, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে দরকারী।

উদ্দেশ্য

এ বিষয় শিক্ষাদানের পেছনে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সামনে থাকা আবশ্যক।

১) প্রাকৃতিক পরিবেশে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা অসংখ্য নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করিয়ে সৃষ্টিকর্তার সত্তা ও গুণাবলী ক্রমাগতভাবে শিক্ষার্থীদের স্মৃতিপটে অংকিত করে দেবে।

২) চারপাশের প্রাণীকূল, উদ্ভিদরাজি, জড় পদার্থ, প্রাকৃতিক দৃশ্য, সৃষ্টি রহস্য অবলোকনের অভ্যাস করানো, এ সম্পর্কে আবশ্যকীয় জ্ঞান দান করা, প্রকৃতির কারিগরের নির্ধারিত সেই সব বিধিবিধান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করানো যেগুলো তাদের পিঠের উপর কার্যকর রয়েছে। এতে তারা অন্ধ বিশ্বাস ও জাহেলী আকিদা থেকে রেহাই পেতে পারে।

৩) দেহের গঠন প্রণালী, অংগ-প্রত্যঙ্গের কার্যাবলী, স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাবলী, প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য এবং প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

৪) বিশ্ব স্রষ্টার দানকৃত অসংখ্য ধনাগারের মূল্য অনুধাবন এবং সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার করে মানবতার উপকার ও ক্ষতির চেষ্টার মোটামুটি খতিয়ান নেয়ার উপযুক্ত করে তৈরী করা।

৫) শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসু স্বভাব প্রকৃতিকে উদ্বুদ্ধ করা, তার প্রশান্তি ও সান্ত্বনার সুযোগ করে দেয়া। যাতে সে বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে কি, কেন, কিভাবে ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞাত হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষাদান পদ্ধতি

* সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষায় যথাসাধ্য পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অথবা নিজে পরীক্ষা করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সর্বাধিক সুযোগ দেবে। কেবল মৌখিক শিক্ষাদানকে যথেষ্ট মনে করবে।

* যে সব বস্তুর পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতা সম্ভব না হয় সেগুলোর মডেল, তালিকা, ছবি ইত্যাদি যোগাড় করবে যেন ধারণা পরিষ্কার হতে পারে।

* পর্যবেক্ষণের জন্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে মাঝে বাইরে ক্ষেত-খামারে, বাগানে, পুকুরে ইত্যাদিতে সফরে নিয়ে যাবে এবং পর্যবেক্ষণ উপযোগী দিকসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

* দেহের গঠন, অংগ-প্রত্যঙ্গের কার্যাবলী এবং স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাবলী ভালভাবে বুঝিয়ে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস সৃষ্টি করার, সতর্কতামূলক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দান করবে।

* প্রত্যেক বিদ্যালয়ের নিজস্ব যাদুঘর তৈরী করা চাই। এতে ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের সাহায্যে শংখ, ঝিনুক, পাখীর পালক, ফুল পাতা, বিভিন্ন প্রকারের বীজ, ধাতুর টুকরা, প্রাণীর দেহ কাঠামো, বস্তুর মডেল, পোস্টার, ছবি, প্রতিকৃতি ইত্যাদি যোগাড় করে সুবিন্যস্তভাবে রেখে দেবে। যাদুঘরের জন্যে স্বতন্ত্র কক্ষ থাকা ভাল। না হয় অন্তত শ্রেণীর তাকে, আলমিরায় ইত্যাদিতে এসব কিছু বিন্যস্ত করে রাখবে যেন দেখতে অসুবিধা না হয়।

* সম্ভব হলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের বাগান থাকা চাই। এতে নানা প্রকারের ফুল, চারা লাগানো হবে এবং পালিত জন্তু ও পাখী রাখার ব্যবস্থা থাকবে। এগুলোর তত্ত্বাবধানের বেশীর ভাগ কাজ শিক্ষার্থীদের দায়িত্বে থাকবে।

* পর্যবেক্ষণের জন্যে স্বল্প দামের সংক্ষিপ্ত হাতিয়ার ও সামান সংস্থানের ব্যবস্থা করবে।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী চিন্তাবিদগণের দৃষ্টিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

নিম্নে বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদের বক্তব্য ও চিন্তার সংক্ষিপ্ত সার পেশ করা হলোঃ

* 'ইলম' রাসূলদের মিরাস, আর ধন সম্পদ ফেরাউন, কারুণ প্রমুখ কাফিরদের। – হযরত আবু বকর (রাঃ)

* দুনিয়াদারকে 'ইলম' শেখানো ডাকাতের হাতে অস্ত্র বিক্রির সমতুল্য। – হযরত ওমর (রাঃ)

* যে ইলম অনুযায়ী আমল করা হবে না তা ব্যর্থ। – হযরত উছমান (রাঃ)

* জ্ঞান ও আদবই আভিজাত্য, সম্পদ ও বংশ নয়। – হযরত আলী (রাঃ)

* আমি জিজ্ঞাসু রসনা ও গবেষক মন–মস্তিষ্ক থেকে 'ইলম' শিখেছি "بِلِسَانٍ سَئُوْلٍ وَبِقَلْبٍ عَقُوْلٍ" –হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)

* আমি কোন কথা বুঝতে পারলেও তার রহস্য ও হিকমত অনুধাবন করতে পারলে "আলহামদু লিল্লাহ" বলে থাকি। ফলে আমার ইলমে উন্নতি সাধিত হয়েছে। – ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)

* একাকীত্বে উপদেশ দান ও বুঝানো ভদ্রতার প্রমাণ এবং সংশোধনের নিশ্চয়তা। – ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)

* আমি ইলম হাসিল করেছি এমনভাবে যে অন্যদের উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হতে হয় না; আর অন্যদের উপকার করতে কখনো আক্ষেপ করিনি। – ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)

* আমাদের এই কাজ (ইলমী ব্যস্ততা) শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। যে ব্যক্তি এক ঘন্টার জন্যেও বাদ দিতে চায় তাকে সে ঘন্টাই ছেড়ে দেয় (অর্থাৎ তার মৃত্যুই শ্রেয়)। – ইমাম মুহম্মদ (রহঃ)

www.nagorikpathagar.org

* আল্লার কছম খাদ্য গ্রহণের সময় ইলমী ব্যস্ততা ছুটে যাওয়ার কারণে আমার আক্ষেপ লাগে। কারণ, অবসর সময়টা আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। –ইমাম রাবী (রহঃ)

* শিক্ষক মন্ডলী শিক্ষানবীশদের জন্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সাধারণের বোধগম্য এমন সব পুস্তক নির্বাচন করেন যেসব বইতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত আবশ্যকীয় বিষয়াদির উল্লেখ থাকে। – ইমাম শরফুদ্দীন আকিলী (রহঃ)

* পাঠের পরিমাণ প্রথম দিকে এ পরিমাণ হতে হবে যা কেবল দু'বার বললেই আয়ত্বে এসে যায়। – ইমাম গাযযালী (রহঃ)

* শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। তারা মাতাপিতার কাছে আমানত স্বরূপ। তাদের অন্তর একটা উৎকৃষ্ট জওহার যা পরিচ্ছন্ন, সর্ব প্রকার দাগ চেহারা থেকে পরিষ্কার এবং যে কোন চিত্রাংকনের উপযুক্ত। যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই সে ধাবিত হওয়ার যোগ্য। যেমন– তাকে উৎকৃষ্ট কাজের শিক্ষা দিলেও সেই অভ্যস্ত করলে বড় হয়ে তেমনিই থাকবে আর উভয় জাহানের সাফল্য লাভে সক্ষম হবে এবং এর প্রতিদান প্রাপ্তিতে মাতাপিতা, শিক্ষক ও মুরব্বীগণ সবাই অংশীদার থাকবে। পক্ষান্তরে যদি মন্দ কাজের অভ্যস্ত হয় এবং জন্তু–জানোয়োরের মত নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে ধ্বংস ও নিষ্পেষিত হয়ে যাবে, আর এর কুফল তার মুরব্বীদের ভোগ করতে হবে।

* শিশু কোন উত্তম কাজ করলে তাকে কিছু পুরষ্কার দেয়া চাই। তাতে সে খুশী হবে। তাছাড়া মানব সমাজে তার প্রশংসা করা চাই। যদি কখনো কোন ত্রুটি প্রকাশ পায় তবে তা এড়িয়ে যাওয়া উচিত। আর তার গোমর ফাঁক করা ঠিক নয়। বিশেষত শিশু নিজেই যখন তা প্রকাশ না করে গোপন রাখতে চেষ্টা করে। কারণ, সে যদি জেনে ফেলে তার গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরও কিছু হলো না, তাহলে ভবিষ্যতের জন্যে অপকর্মের ব্যাপারে নিসংশয় হয়ে পড়বে আর রহস্য উন্মোচনের ভীতি রহিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় বার একই ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে একাকীত্বে তাকে ভর্ৎসনা করা চাই আর গুরুত্ব সহকারে বলে দিবে যে ভবিষ্যতে যেন অমনটি না করে। যদি পুনরায় এমনটি করে তবে সকলের সম্মুখে লজ্জিত হবে।

* শিশুদের সর্বদা ধমক দেয়া উচিত নয়। কারণ, এতে তারা অভিশাপ ভর্ৎসনার অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে আর

www.nagorikpathagar.org

উপদেশের কোন প্রভাব থাকে না।

* শিশুদের মকতবে পাঠিয়ে কুরআন, হাদীস ও মনীষীদের কাহিনী শেখানো চাই। এতে তাদের অন্তরে মনীষীদের ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

* উঠা বসার আদব শেখাতে হবে। বেশী কথা বলা থেকে বিরত রাখবে।

* এমন অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে যেন সবার আগে কথা বলতে অভ্যস্থ না হয়। অন্যরা কথা বললে যেন মনযোগ দিয়ে শুনতে থাকে। বড়দের দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করবে আর তাদের জন্যে স্থান খালি করে দেবে।

* শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ফিরে এলে শিশুকে উত্তম খেলাধূলার সুযোগ করে দেবে। এতে বিদ্যালয়ের বিষণ্নতা মুক্ত হয়ে প্রশান্তি অনুভব করবে কিন্তু খেলাধূলা এমন ধরনের যেন না হয় যাতে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়। যদি খেলাধূলা থেকে বঞ্চিত রেখে সর্বক্ষণ লেখাপড়ায় মশগুল রাখা হয় তাহলে শিশুর অন্তর মরে যায়, তার মেধা কমে যায়, জীবন হয়ে পড়ে একঘেঁয়ে। শেষ পর্যন্ত সে শিক্ষা থেকে পলায়ন করতে ও মুক্তি পেতে চিন্তা করে।

* তাকে মাতাপিতা, শিক্ষক ও মুরব্বীদের আনুগত্য করার অভ্যস্ত করবে। বয়জ্যেষ্ঠদের আদব ও সম্মান প্রদর্শন শেখাবে, তারা আত্মীয় বা অনাত্মীয় যাই হোক না কেন।

* মোট কথা, শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দান একান্ত আবশ্যক। কারণ, শৈশবকালে তার অন্তর সর্ব প্রকার যোগ্যতার আধার স্বরূপ। তখন সে ভাল মন্দ উভয়ই শিখতে পারে। আর মাতা পিতারই এ সুযোগ রয়েছে যে তারা যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই অনুরক্ত করতে পারেন।

* যদি কোন ডাক্তার সকল রুগীকে একই ব্যবস্থা পত্র দিয়ে একই ঔষধ দেয়, তাহলে অধিকাংশই ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের সেই একই অবস্থা। তারা যদি অধীনস্ত সকল শিশুদের একই লাঠি দিয়ে হাঁকিয়ে থাকে তবে তাদের ধ্বংস করেই ছাড়বে। তাদের অন্তরকে মৃত্যুর সম্মুখীন করে দেবে। শিক্ষক ও অভিভাবকের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের প্রতিপাল্য শিশুদের প্রত্যেকের অবস্থা, বয়স, স্বভাব অনুযায়ী তাদের জন্যে পথ ঠিক করবে আর তাদের জন্যে এমন কার্যক্রম নির্ধারণ করবে যা তাদের আয়ত্বাধীন।

www.nagorikpathagar.org

আহনাফ ইবনে কায়েস হযরত আমীর মুআবিয়া (রাঃ) কে যে উপদেশ দিলেন

শিশুরা আমাদের স্তম্ভ যাতে আমাদের পিঠ হেলান দিতে পারে। তারা আমাদের অন্তরের বাসনা বা আকাংখিত ফল স্বরূপ। তারা আমাদের নয়ন শীতলকারী। তাদের নিয়েই আমরা শত্রুদের উপর আক্রমণ চালাই। আমাদের পরে তারাই আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। সুতরাং তোমার উচিত, তুমি তাদের জন্যে কোমল ভূমি হয়ে যাবে। তারা চাইলে তাদের দাও। তারা তোমার খুশী কামনা করলে তাদের প্রতি তুমি খুশী থাক। তাদের তুমি নিজ ভালবাসা স্নেহ থেকে বঞ্চিত করো না। অন্যথায় তারা তোমার নিকট থেকে ভাগবে, তোমার জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, আর তোমার মৃত্যু কামনা করবে।

ইবনে খালদুন

শিক্ষাদানকালে শিক্ষার্থীদের প্রহার করা সমীচীন নয়। বিশেষত স্বল্প বয়সের শিশুদের উপর মোটেই কঠোরতা আরোপ করা ঠিক নয়। যে ব্যক্তি শিশুদের উপর কঠোরতা আরোপ করে সে তাদের অন্তর থেকে খুশী ছিনিয়ে নেয়, তাদের অকর্মণ্য ও অকেজো করে রাখে। তাদের মিথ্যুক ও কুমতলবী করে ছাড়ে। (তাদের মধ্যে প্রদর্শনী ভাব ও মুনাফিকীর বীজ প্রতিপালিত হয়) তারা এমন সব কথা বলতে শুরু করে যা তাদের মনের বিপরীত। কারণ, তারা এমনটি না করলে তিরস্কার ও ভৎর্সনার শিকার হয়ে পড়ে, তারা ধোকা ও প্রতারণায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কারণ, এটা ছাড়া তাদের কাজ চলে না। অবশেষে এ অভ্যাসই তাদের চরিত্র ও কর্মের অংশে পরিণত হয়।

সুতরাং শিক্ষকের উচিত তার ছাত্রের উপর এবং পিতা নিজ সন্তানের উপর ক্রোধ ও জবরদস্তি প্রদর্শন না করা এবং জোর যবরদস্তি করে প্রতিপালন (প্রশিক্ষণ) না করা।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

* নিসন্দেহে বলা যায় যে, বর্তমানে দ্বীনি ইলমের মাদরাসাসমূহ মুসলমানদের জন্যে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহান নেয়ামত। বর্তমানে দুনিয়াতে যদি ইসলাম বাকী থাকার কোন ব্যবস্থা থাকে তবে তা হচ্ছে এই মাদরাসাসমূহ।

www.nagorikpathagar.org

তবে সংগে সংগে বলতে হয় যে ঐ সব মাদরাসায় সংশোধন অযোগ্য কাজ দেয়া যায় আর তা সংশোধন না হওয়ায় ইলমধারীদের জামায়াত ভর্ৎসনার যোগ্য হয়। আর এসব মাদরাসা প্রতিষ্ঠার যে রূহ ও লক্ষ্য রয়েছে (অর্থাৎ দ্বীনের আমল) তাও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মানুষ দ্বীনি শিক্ষার ব্যাপারে হিংস্র ও বিদ্বেষী হয়ে পড়ে। ফলে ইলমের এই জামায়াত যেন يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ আল্লার পথের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

* এখন পর্যন্ত নিয়ম হলো প্রথমে শিক্ষার্থীরা পাঠ পড়ে যায় এবং শিক্ষক অর্থ বলে দেয়। কেউ কোন সন্দেহ করলে জিজ্ঞেস করে নেয় অন্যথায় সামনে বাড়তে থাকে। এই পদ্ধতি প্রাথমিক বিদ্যার্থীদের জন্যে বরং মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্যেও উপকারী নয়। এর সংশোধন পদ্ধতি হলো, কেবল শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা কাজে লাগাবে, নিষ্প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করবে না। তাদের দিয়েই বিষয়ের সারাংশ বলাবে। তাছাড়া প্রতিটি নিয়মের একাধিক উদাহরণ সহকারে অনুশীলন করাবে।

* বিদ্যালয়সমূহে নিয়ম চালু করতে হবে যে দশ দশ ও বিশ বিশ জনের গ্রুপ করে প্রত্যেক গ্রুপের জন্যে একজন তত্বাবধায়ক সংগঠক নির্ধারিত থাকবে। এই তত্বাবধায়ক ছাত্রদের এই তত্বাবধান করবে যে তাদের কোন বড় ছাত্রের সাথে মিশতে দেবে না, তত্বাবধায়ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পর কথা বলবে না। তাদের মাথা নেড়া করবেন, পান খেতে দেবে না; পোষাক সাদাসিদা হবে, নামায ও জামায়াতে তাদের উপস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। চিত্তবিনোদনের জন্যে বাজারে বের হলে তাদের সাথে যাবে।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ)

* নেতৃত্বের সম্পর্ক সর্বদা ইলমের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। মানুষ পৃথিবীর খিলাফতের যে মর্যাদা পেয়েছে, তা ইলমের বদৌলতেই। মানুষকে শ্রবণ, দৃশ্য ও বোধ তিনটি শক্তি অর্পণ করা হয়েছে যা অন্য কোন পার্থিব সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। অথবা তার অনুপাতে অতি সামান্য দেয়া হয়েছে। তাই অন্যান্য সৃষ্টির উপর প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আবার মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তি বা

www.nagorikpathagar.org

গোষ্ঠী সেই 'ইলম' এর গুণে যত বেশী গুণান্বিত হবে সে তেমনি করে তাদের নেতা হতে পারবে যেমন করে পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টি রাজির উপর এই ইলমের কারণেই সে প্রতিনিধিত্বে (খিলাফতের) মর্যাদা লাভ করতে পেরেছিল।

* 'শ্রবণ' বলতে অন্যদের যোগাড়কৃত বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তাকে বুঝায়। 'দৃশ্য' বলতে বুঝায় নিজে স্বয়ং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে জ্ঞানের আলো পৌছানো। 'বোধ' বলতে বুঝায় উপরোক্ত মাধ্যম দ্বয়ের দ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে বিন্যাস করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এই তিন বস্তু মিলেই সেই 'ইলম' হয় যার যোগ্যতা মানুষকে দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এই তিন শক্তি অল্প পরিমাণে কাজে লাগায় সে পর্যুদস্ত ও পরাজিত থাকে। তাদেরকে বাধ্যগত ও অনুগত হয়ে থাকতে হয়। তাদের কাজে ভাটা পড়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা এই তিন শক্তিকে বেশ কাজে লাগাতে পারে তারা মর্যাদাবান ও বিজয়ী হয়ে থাকে তারা হয় অনুকরণীয় অনুসরণীয়। পথ প্রদর্শন ও নেতৃত্ব তাদেরই হাতে আসে।

* যে গোষ্ঠী বা দল চিন্তার রাজ্যে নেতা হয় এবং প্রাকৃতিক জগতের শক্তিসমূহে নিজের ইলম দিয়ে অধীন বানিয়ে নেয় তাদের নেতৃত্ব কেবল চিন্তার জগত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে তা পরিব্যপ্ত হয়ে পড়ে। পৃথিবীতে তাদের বিজয় সূচিত হয়। সম্পদের চাবিকাঠি তাদের হাতে চলে আসে, সে বৈজ্ঞানিক অভিলাসী হতে পারে। এ জন্যে গোটা মানব জীবনের যাবতীয় কাজ কারবার একমাত্র সেই লোকদের চিন্তাধারা ও মননশীলতা অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে এই ক্ষমতা যাদের হাতে থাকবে তারা যদি খোদা বিমুখ হয়, তবে তাদের অধীন কখনো এমন দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে সক্ষম হবে না যারা খোদামুখী হতে চায়।

* নেতৃত্বের বিপ্লবের জন্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লব অপরিহার্য।

* খোদা বিমুখ নেতৃত্বাধীন থেকে খোদামুখী ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না। সুতরাং যে কেউ এই ব্যবস্থায় বিশ্বাসী হয় তার সেই বিশ্বাসেরই দাবী হলো ঐ নেতৃত্ব নির্মূল করে আল্লাহ মুখী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রস্তুত হওয়া।

যে শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল প্রাচীন শ্রাব্য জ্ঞানের উপরই সীমাবদ্ধ তাতে এমন শক্তি নেই যে বিপ্লব সাধনের জন্যে নিজকে প্রস্তুত করতে পারে।

* যে শিক্ষা ব্যবস্থা সমস্ত শিক্ষাকে খোদা বিমুখ নেতাদের বিন্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এবং ভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দের তৈরী করা ভ্রান্ত সাংস্কৃতিক মেশিনের

www.nagorikpathagar.org

পার্ট হিসেবে মানুষ তৈরী করে; তা মূলত খোদাদ্রোহিতার পরীক্ষিত ব্যবস্থা স্বরূপ।

* ইসলামী শিক্ষার সাথে নতুন শিক্ষার সংযোগ করে শিক্ষা ব্যবস্থার সংশোধন করার কর্ম পদ্ধতি নিজেকে নেতৃত্বের বিপ্লব সাধনে তৈরী করতে সক্ষম নয়। কারণ দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য শাস্ত্র এখন পর্যন্ত যা বিন্যস্ত আকারে প্রচলিত আছে, তা সবই খোদা বিমুখ লোকদের চিন্তা চেতনার ফসল। আর এগুলোর বিন্যাস ও প্রণয়নে এই সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভংগি এমনভাবে জড়িত যে প্রকৃত তথ্যাবলীকে নিছক দৃষ্টিভংগি ও ধারণা এবং ইর্ষা ও প্রবৃত্তি ঝোঁক প্রবণতা থেকে পৃথক করা এবং খোদামুখী দৃষ্টিভংগিতে নিজেই বিন্যাস করে অন্যান্য মতবাদ কায়েম করা না প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আওতাধীন রয়েছে না রয়েছে প্রত্যেক শিক্ষকের সামর্থে।

কাম্য শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্টসমূহঃ

* দ্বীনি শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার স্বাতন্ত্র মিটিয়ে উভয়কে এক মুখী করা।

* শিক্ষাকে দ্বীনি ও দুনিয়াবী পৃথক পৃথক দু'ভাগে বিভক্ত করা। মূলত দ্বীন ও দুনিয়াকে পৃথক ভাবার উপর প্রতিষ্ঠিত, আর এই ধারণা মৌলিকভাবেই অনৈসলামিক। ইসলাম যে বিষয়কে দ্বীন বলে থাকে তা দুনিয়া থেকে পৃথক কোন কিছু নয়। বরং দুনিয়াকে এই দৃষ্টিতে দেখা যে এটা আল্লার রাজত্ব, নিজেদেরকে আল্লার প্রজা বলে স্বীকার করা এবং দুনিয়ার জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এমন পদক্ষেপ নেয়া যা আল্লার সন্তুষ্টি ও তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী হয়, এটারই নাম দ্বীন। দ্বীনের এই সংজ্ঞা সমস্ত দুনিয়াবী শিক্ষাকে দ্বীনি শিক্ষা বানিয়ে দেয়।

* প্রাথমিক পর্যায়ে তো শিক্ষার্থীদের সামনে অন্য কোন চিন্তাধারা আসতে দেয়াই ঠিক নয়। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে সমস্ত শিক্ষা তার সামনে এমনভাবে আসবে যে জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্ত বিন্যস্ত তথ্যের বিবরণ এবং ঘটনাপঞ্জীর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী দৃষ্টিভংগিতে হয়। কিন্তু এর বিপরীত অন্যান্য সমস্ত চিন্তাধারা পুরো সমালোচনার সাথে তার সামনে এমনভাবে রাখতে হবে যে এটা হচ্ছে مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ ضَالِّينَ অর্থাৎ ভ্রষ্ট ও অভিশপ্তদের চিন্তাধারা।

* প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সমাপনান্তে "মাওলানা" উপাধি প্রদান এবং

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেক ছাত্রকে যাবতীয় বিষয়ে ফতুয়া প্রদানের অনুমতি দেয়ার প্রথা বিলুপ্ত করতে হবে এবং তদস্থলে বিশেষ শিক্ষার সেই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যা দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীতে উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। মানুষের শিক্ষা বর্তমানে এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে কোন একজনের পক্ষে তার সবকিছু আয়ত্ব করা অসম্ভব। আর তাকে প্রত্যেক বিষয়ে যদি সাধারণ ধারণা দেয়া হয় তাহলে কোন বিশেষ বিষয়েই বিশেষজ্ঞ হতে পারবে না। সুতরাং উত্তম হলো প্রথম আট দশ বছর এমন কোর্স রাখবে যাতে একটা শিশুকে দুনিয়া, মানুষ ও তার জীবন সম্পর্কে অন্তত যত শিক্ষা শেখা দরকার সে শিক্ষা তাকে খাঁটি দ্বীনি দৃষ্টিভংগিতে প্রদান করবে। তার হৃদয়ে সৃষ্টি জগত সম্পর্কে এমন ধারণা অংকিত করে দেবে যা একজন মুসলমানের ধারণা হওয়া চাই। জীবন পদ্ধতির সেই নকশা অংকিত হতে হবে যা একজন মুসলমানের জীবন–পদ্ধতি। বাস্তব জীবন সম্পর্কে যেন একজন মানুষের আবশ্যকীয় সমস্ত জ্ঞান তার আয়ত্বে আসে আর সে যেন একজন মুসলিমের নিয়মে পরিচালনায় প্রস্তুত থাকে। তাকে স্বীয় মাতৃভাষার জ্ঞান থাকা চাই। আরবী ভাষায়ও এ পরিমাণ যোগ্যতা হাসিল করবে যে অধিক অধ্যয়নে তার সুবিধা হয়। তাছাড়া ইউরোপীয় ভাষায়ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে যেন সেই ভাষায় সংরক্ষিত জ্ঞান হাসিল করতে সক্ষম হয়। অতপর বিশেষ শিক্ষার কোর্সে ছয় সাত বছর পর্যন্ত হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে একজন শিক্ষার্থীকে সেই বিভাগের ডক্টর ঘোষণা দেবে।

* এই নতুন ব্যবস্থায় এমন কোন উদ্দেশ্য বিহীন শিক্ষা থাকবে না যা অধুনা উপমহাদেশে চালু রয়েছে। বরং শিক্ষাদাতা ও শিক্ষার্থী উভয়ের সম্মুখে একটা পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট জীবন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকবে। অর্থাৎ তাদের সবাইকে আল্লাহ মুখী ব্যবস্থার নেতৃত্বদানের জন্যে কঠোর জিহাদে অবতীর্ণ হতে হবে। এই উদ্দেশ্য উক্ত ব্যবস্থার প্রত্যেক পর্যায়ে এমনভাবে কার্যকর থাকবে যেমন করে মানব দেহের প্রত্যেকটি শিরায়–উপশিরায় তার রুহের কাজ চালু থাকে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জীবন, তাদের পারস্পরিক সম্মেলন, তাদের খেলাধূলা ও অবকাশে এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও পাঠক্রমের সমস্ত পর্যায়ে এই উদ্দেশ্যই কার্যকর থাকবে। এর ছাঁচে তাদের চরিত্র ও কর্মের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবে। এর উপর তাদের নৈতিকতা গড়ে তুলবে আর পুরো পরিবেশটি এমন করে তৈরী করবে যেন প্রত্যেক ব্যক্তি এক একজন "মুজাহিদ ফী সাবিল্লিাহ" – আল্লার সৈনিক।

–ঃ সমাপ্ত ঃ–

www.pathagar.com

KUWAIT JOINT RELIEF COMMITTEE